মাসুদ রানা

লাইমলাইট

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

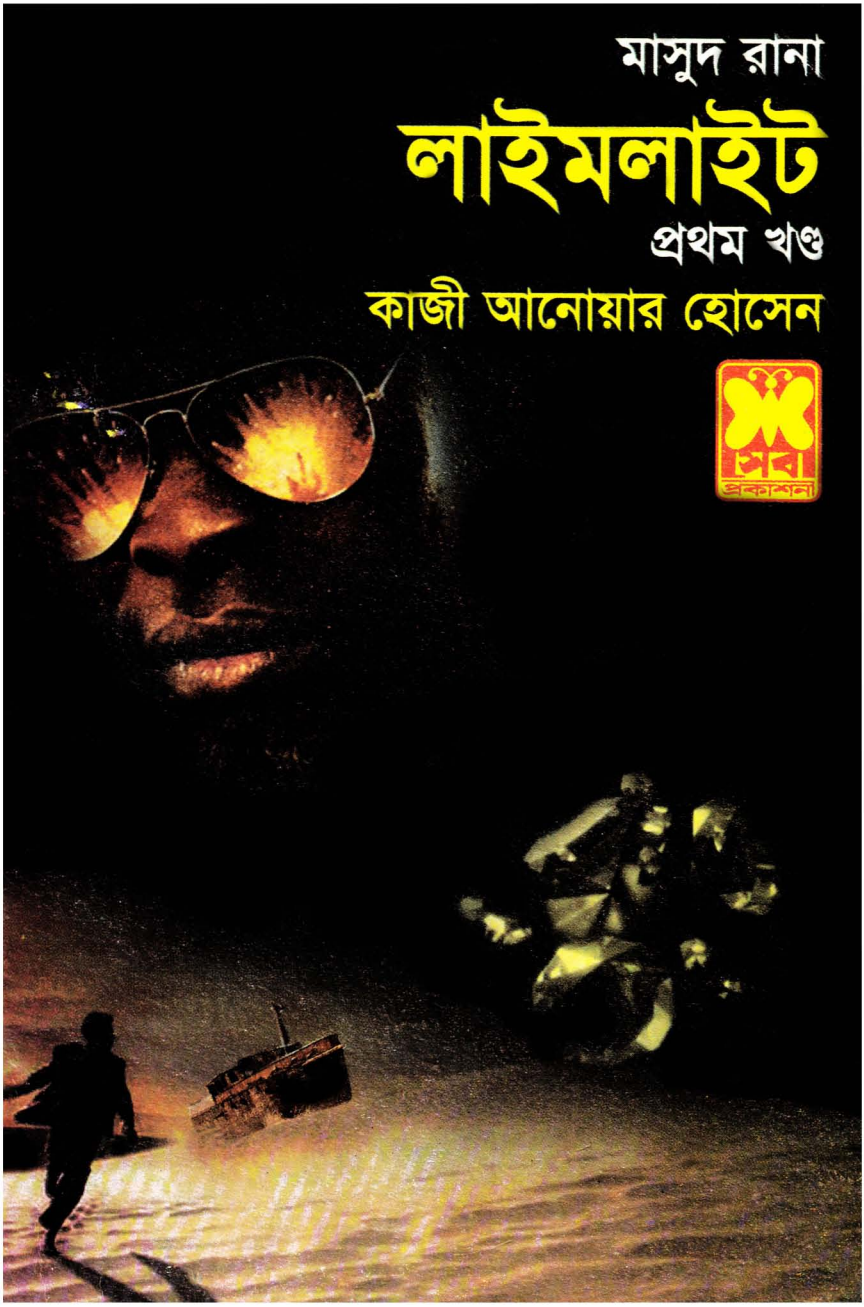

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা ৪২৩

লাইমলাইট

(প্রথম খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন

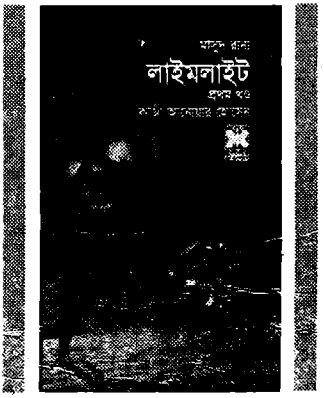

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7423-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৩

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০৩
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-423
LIMELIGHT
Part-I
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

ছিয়াশি টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্র: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক

এবার মৃত্যু অনিবার্য, ভাবছে জিম উফোর্ড। অস্ত্র ফেলে এসে মস্ত ভুল করেছে। কিন্তু আর কি কোনও উপায় ছিল? শেষ মালবোঝাই ঘোড়াটা পঙ্গু হতেই আবারও সব বাটোয়ারা হলো, তখন ত্যাগ করতে হয়েছে বেশির ভাগ ইকুইপমেন্ট। আরোহী না নিয়ে পানির ফ্লাস্ক বইছে ঘোড়া, স্যাডলব্যাগে রয়েছে মহামূল্যবান সব আনকাট ডায়মণ্ড। তাঁবু, বেডরোল, চল্লিশ পাউণ্ড খাবার, মার্টিনি-হেনরি রাইফেল ও অ্যামিউনিশন— সব ফেলে এসেছে। এরপরও যা রইল, তাতেই ধুঁকছে আধমরা ঘোড়াগুলো।

দূর-দিগন্তে উঁকি দিয়েছে জ্বলজ্বলে সোনালী সূর্য। একটু পর স্রেফ নরক হয়ে উঠবে চারপাশ। আজ যদি জিম উফোর্ড পানি না পায়, আগামীকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত টিকবে না একটা ঘোড়াও।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ— ঘটনাস্থল আফ্রিকার ভয়ঙ্কর ঊষর কালাহারি!

হ্যাঁ, বড় ভুল করেছে জিম উফোর্ড। অনভিজ্ঞ সঙ্গীদেরকে নিয়ে কালাহারি মরুভূমি পাড়ি দিতে যাওয়া মস্ত অন্যায়। বহুদিন হলো সে আফ্রিকায়। আগে সাসেক্সে মুনাফাশূন্য এক খামারের মালিক ছিল, কোনওমতে চলছিল দিন। তখনই শুনল কিম্বারলিতে পাওয়া গেছে হীরার বিশাল খনি। পাগল হয়ে উঠল সবাই, যেভাবেই হোক লাখপতি হতে হবে। মেতে উঠল জিম উফোর্ডও। আঠারো শ' আটষট্টি সালে পা রাখল আফ্রিকায়। কিন্তু তার ঢের

আগেই কোল্‌স্‌বার্গ কোপজের খাটো টিলাসারি দখল করে নিয়েছে আগে আসা লোকজন। শুধু তা-ই নয়, ওই এলাকার কয়েক মাইলের ভিতর কোনও জমিও পাওয়া গেল না। হীরা পাবে না বুঝে দ্বিতীয় সেরা কাজটি বেছে নিল জিম। হাজার হাজার শ্রমিকের পেট ভরাতে হবে, সেজন্য চাই মাংস। সুতরাং শিকারে মন দিল সে।

একজোড়া ওয়্যাগন, কয়েকটা রাইফেল, অজস্র গুলি ও দুই শ' বস্তা লবণ নিয়ে রওনা হলো সে। সঙ্গে দু'জন স্থানীয় গাইড। শিকার করতে গিয়ে কখনও চলে গেল হাজার মাইল দূরে। প্রায় নিঃসঙ্গ রইল জিম উফোর্ড, একাকী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেল, ভালবেসে ফেলল এই পথচলাকে, ভালবাসতে শিখল আফ্রিকার মাটিকে, মায়াবী সূর্যাস্ত ও গহীন অরণ্যকে। সুদূর এই দেশের ঝর্নার পানি এতই পরিষ্কার, যেন পানিই নয়, মসৃণ, স্বচ্ছ কাঁচ। কখনও দিগন্ত রইল এতই দূরে, যেন কখনও ফুরাবে না চলবার পথ। নানান উপজাতির কাছ থেকে শিখল বহু কিছু। ধীরে ধীরে জানল তাদের আচার-আচরণ। গড়গড় করে বলতে শিখল ম্যাটাবেল, ম্যাশোনা ও হিংস্র যোদ্ধাজাতি হারেরোদের মুখের ভাষা। এমন কী মরুভূমিতে বুশম্যান যে বিদ্‌ঘুটে টিকটিক আওয়াজ ও শিস দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাও কিছুটা বুঝে নিল।

এরপর সাফারি গাইডের কাজ নিল জিম উফোর্ড। ধনী ইংরেজ ও আমেরিকানদের শখ, তারা তাদের ম্যানশনের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখবে লোভনীয় ট্রফি। বড়লোকদের জন্য কাজ পেতে লাগল উফোর্ড। এক টেলিগ্রাফ কোম্পানির হয়ে খুঁজে বের করল কোন্ পথে টেলিগ্রাফের তার গেলে সুবিধা হবে। এ কাজ নিয়ে মহাদেশের দক্ষিণের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা ভ্রমণ করল। অন্তত বারোবার অ্যাম্বুশে পড়ল। তার হাতে মরল কমপক্ষে এক শ'

বিশজন জংলি। ততদিনে আফ্রিকার মানুষ ও মাটিকে ভাল করেই চিনে নিয়েছে। এবং সে-কারণেই মনের ভিতর উফোর্ড জানে, বেচুয়ানাল্যাণ্ডে গাঁইডের কাজ নেয়া ঠিক হয়নি। তাকে পাড়ি দিতে হবে বিশাল অনুর্বর কালাহারি মরুভূমি, সাগর তীরে পৌঁছে দিতে হবে মানুষগুলোকে। আগেই মনের গভীরে লোভ ছিল, এরা প্রচুর টাকা দেবে, কাজেই মানা করতে পারেনি। আর ওই প্রচুর টাকা উপার্জন করবে বলেই তো এসেছে সে আফ্রিকায়!

এখন কোনওমতে নিঠুর মরুভূমি পাড়ি দিলেই স্বপ্নের বিপুল সম্পদ পাবে, পায়ের উপর পা রেখে বাকি জীবন আয়েস করবে।

'উফোর্ড, আপনার কি মনে হয় ওরা এখনও আসছে?'

উদীয়মান সূর্যের দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল জিম উফোর্ড, রুক্ষ ত্বকের ভাঁজে হারিয়ে গেছে দুই চোখের মণি। দিগন্তে কোনও দলকে চোখে পড়ছে না। কচি রোদে ধূ-ধূ মরুভূমি থেকে ধোঁয়ার মত উঠছে বালির তাপ। ওই সূর্য এবং ওদের নিজেদের মাঝে শত শত সাদা বালির ঢিবি— এক একটা বিশাল ঢেউয়ের মত, সাইক্লোনের ঢেউয়ের চেয়ে কম বড় নয়— টানা হাওয়া ওগুলোর আকৃতি পাল্টে চলেছে অবিরত। ভোর হতেই মাতম শুরু করেছে হাওয়া, ঢিবির চূড়া থেকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বালি, তৈরি হচ্ছে ধুলোর মেঘ— বাতাস আরও জোরে বইলে মানুষের নুন-ছাল তুলে নেবে।

'হ্যাঁ, ওরা আসবে,' পাশে এসে দাঁড়িয়েছে যুবক, তার দিকে না চেয়ে বলল জিম উফোর্ড।

'আপনি কীভাবে এত নিশ্চিত হচ্ছেন?'

এবার মার্ল গাল্টের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল উফোর্ড। 'আমরা ওদের যে ক্ষতি করেছি, ওরা নরকের সদর-দরজা পর্যন্ত ধাওয়া করবে।'

কথাটা এতই গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল জিম উফোর্ড, ফ্যাকাসে

হয়ে গেল মার্ল গাল্টের মুখ। গাইডের মতই সে এবং অন্য তিন অভিযাত্রী ইংরেজ, দ্রুত বড়লোক হতে এসেছিল আফ্রিকায়। মরুভূমি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই এদের।

'এবার রওনা হওয়া উচিত,' বলল জিম উফোর্ড। গত কয়েক রাত অপেক্ষাকৃত শীতল পরিবেশে চলেছে তারা। 'সূর্য চারপাশ নরক করে তুলবার আগেই কয়েক মাইল এগুতে পারব।'

'আমার মনে হয় এখানেই ক্যাম্প করা উচিত,' বলল জ্যাক ডাল্। এ দলের সর্ব-কনিষ্ঠ সদস্য সে। সবচেয়ে করুণ অবস্থা তার। বালি-সাগরে ঢুকবার পর থেকে থেমে গেছে তার বড়াই। টলমল করে হেঁটে চলেছে, যেন নব্বুই বছরের বুড়ো। দুই চোখ ও মুখের কোণে জমেছে লবণের সাদা গুঁড়ো, ঝিকমিকে নীল মণিগুলোর ভাষা এখন ভোঁতা।

জ্যাক ডালের মুখে ফুটে উঠেছে ক্লান্তি। সবই বুঝল উফোর্ড। দশদিন আগে শেষবার এক ইঁদারা থেকে সামান্য লবণাক্ত পানি ফ্লাস্ক ও জেরিক্যানে ভরেছে ওরা, তারপর থেকে পানির রেশন করে চলেছে। কিন্তু অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি তৃষ্ণা ডালের। কোনও বাড়তি শক্তি খরচ করছে তা নয়, আসলে বেঁচে থাকতেই তার পানি বেশি লাগছে। জিম উফোর্ড একপলক দেখেই বলে দিতে পারবে আর কতখানি পানি আছে ওদের কাছে। পরিষ্কার টের পেল, সে যদি শীঘ্রি কোনও মরু-কূপ খুঁজে না পায়, সবচেয়ে আগে মরবে ওই জ্যাক ডাল্।

সেজন্য তাকে পানি দিতে পারবে না উফোর্ড। নিরাসক্ত স্বরে বলল, 'আমরা সামনে বাড়ব।'

পশ্চিমাকাশে মরীচিকা দেখল সে। যে দৃশ্য দেখছে, তা বহু পিছনে ফেলে এসেছে। একের পর এক বালির ঢিবি, তার যেন শেষ নেই। ওখান থেকে সূর্যের আলো ছিটকে উঠে জ্বলজ্বলে করে তুলেছে আকাশটাকে, যেন মস্ত কোনও ঝিকমিকে আয়না। নিজের

ঘোড়া পরীক্ষা করে দেখল উফোর্ড। বড়ই কষ্ট পাচ্ছে জন্তুটা। সেজন্য নিজেকে দোষী ভাবছে সে। তরুণ ডালের দোষ আছে, কিন্তু বেচারা ঘোড়ার কোনও দোষ নেই, বাধ্য হয়ে এসেছে এই নরকে। ছোট্ট ছুরি দিয়ে ঘোড়ার খুর থেকে খুঁচিয়ে পাথর বের করল সে। পিঠের স্ট্র্যাপ এঁটে বসেছে, সেগুলো ঠিক করল, ভালভাবে বসিয়ে দিল স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট। আগে ওর ঘোড়ার চামড়া চকচকে বাদামি ছিল, এখন ফ্যাকাসে হয়ে ঝুলে পড়েছে, সেসব জায়গায় ধসে গেছে পেশি।

প্রতিটি ঘোড়া পরীক্ষা করে দেখছে জিম উফোর্ড। আদর করে থুতনি চুলকে বিড়বিড় করে সান্ত্বনা দিচ্ছে কানের কাছে। একটা ঘোড়াও আরোহী বহন করতে পারবে না। ওজন কমিয়ে দেয়ার পরও টলছে। ওগুলোর রাশ নিল জিম উফোর্ড, এগুতে শুরু করল। সামনের ঢাল বেয়ে নেমে চলেছে, বালির উপর চেপে বসছে বুটজুতো। টানা হাওয়ায় পায়ের নীচ থেকে হিসহিস শব্দে সরছে বালি। নেমে যাওয়ার সময় পা ফস্কালে উল্টে পড়তে হবে ঘোড়াসহ। একবারও পিছন ফিরে চাইল না জিম উফোর্ড। সঙ্গীদের উপায় নেই, তাদের আসতেই হবে, নইলে পড়ে থেকে মরবে।

পাক্কা এক ঘণ্টা হাঁটল জিম উফোর্ড। ধীরে ধীরে মেঘশূন্য সোনালী আকাশ বেয়ে উঠল সূর্য। ততক্ষণে ঝাঁ-ঝাঁ রোদে জ্বলছে চারপাশ। দাঁত ও জিভের মাঝে নুড়িপাথর রেখেছে উফোর্ড, ক্লান্ত শরীরকে বোঝাতে চাইছে আসলে তার তৃষ্ণা নেই, সুতরাং ডিহাইড্রেশন হওয়া উচিত নয়। একবার থেমে বড়সড় হ্যাটের ভিতর হাত ভরল, টের পেল ক্রাউনের চাপে মাথা ও কপালের ত্বক লালচে হয়ে গেছে। ওখানে চিনচিনে ব্যথা। আরও এক ঘণ্টা হাঁটবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বাধ্য হয়ে থামল— সঙ্গীরা হতক্লান্ত হয়ে পড়েছে, এবার থামতেই হবে। এমন কোনও পরিস্থিতি হয়নি

যে সবাইকে ফেলে এগুবে। তাদেরকে নিয়ে সুউচ্চ এক ঢিবির গোড়ায় থামল সে, ঘোড়ার ব্ল্যাঙ্কেট তুলে নিয়ে দাঁড় করিয়ে ফেলল ছাউনি। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ ও রোদ থেকে ওটা আড়াল দেবে। ছাউনির নীচে বালির উপর ধুপ করে বসল সবাই, হাপরের মত হাঁপিয়ে চলেছে।

জ্যাক ডালের পাশে বসেছে জিম উফোর্ড। টের পেল, একদম হাল ছেড়ে দিয়েছে তরুণ। ঠোঁট ফেটে অসংখ্য ফোস্কা পড়েছে। ভিতরে জমেছে রস, ফোস্কা ফেটে গেলেই পানিটুকু গিলছে সে। রোদের কারণে গাল পুড়ে দগদগে ঘা হয়েছে, যেন তপ্ত শিক দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে কেউ।

উফোর্ড সাবধান করে দিল, বুটের ফিতা ঢিলা করতে পারে, কিন্তু ভুলেও কেউ যেন জুতো না খোলে। হাঁটতে গিয়ে সবার পা ফুলে গেছে, এখন জুতো খুললে আর পরতে পারবে না। ফলাফল: মরুভূমিতে পড়ে থেকে মৃত্যু। সবাই চাতকের মত চেয়ে রইল উফোর্ডের দিকে। উঠে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে কয়েকটা ক্যান্টিন নামাল সে, একটার মুখ খুলতেই হ্রেষাধ্বনি করল ঘোড়াগুলো। মিষ্টি পানির ঘ্রাণ পেয়েছে ওরা, ভিড় করে এগিয়ে এল। জিম উফোর্ডের কাঁধে থুতনি ঘষল তার ঘোড়াটা।

একফোঁটা পানি নষ্ট করা চলবে না। একটা গামলা নিল উফোর্ড, পরিমিত পানি ঢেলে ঘোড়াটাকে তৃষ্ণা মেটাতে দিল। সুড়ুৎ-সুড়ুৎ আওয়াজে পান করছে ওটা। পানি পড়তেই পেটের ভিতর শুরু হলো গুড়গুড় আওয়াজ। আজ তিনদিন পর পানি দেয়া হয়েছে। গামলা শুকিয়ে যেতেই আরও একটু পানি দিল উফোর্ড। একই ভাবে প্রতিটি ঘোড়াকে পানি দিল। নিজের তৃষ্ণার কথা ভুলে থাকতে চাইল। সঙ্গীরা কড়া চোখে দেখছে তাকে।

'ওরা যদি মরে, তোমরাও শেষ,' বাড়তি কিছু বলতে গেল না উফোর্ড।

সবাই জানে লোকটা ঠিক কথাই বলেছে।

এক গ্যালনের এক-চতুর্থ ভাগ পানি পেয়েছে প্রতিটি ঘোড়া, এখন আদর করলে ফিড ব্যাগ থেকে ভুট্টার দানা নেবে। পায়ে দড়ি বেঁধে ওগুলোকে ছেড়ে দিল উফোর্ড। কাজ শেষে সবাইকে পানি ঢেলে দিল। রেশনের বিষয়ে আরও কঠোর হয়েছে সে, প্রত্যেকের জন্য রইল শুধু এক ঢোক পানি, তারপর ক্যান্টিন রেখে দিল স্যাডলব্যাগে। কেউ প্রতিবাদ করল না। জিম উফোর্ড সঙ্গে না থাকলে কালাহারি পাড়ি দেয়ার কথা ভাবত না। এখনও ভরসা করছে গাইড তাদেরকে ঠিকই পৌঁছে দেবে গন্তব্যে।

ঘোড়ার ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে যতই ছাউনি দেয়া হোক, গরম মোটেও কমছে না। গোটা কালাহারি যেন তপ্ত আভন। এটা পৃথিবীর অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং শুকনো এলাকাগুলোর অন্যতম। বছরে একবার বৃষ্টি হলে সে-ই বেশি। আগুনের মত নরক ঢালছে সূর্য। ছাউনির নীচে অলস পড়ে রইল সবাই। গলা শুকিয়ে কাঠ, ব্যথায় টনটন করছে পা। আড়ষ্ট দেহ, তবুও মনের ভিতর লোভ ও আকাঙ্ক্ষা। একবার মরুভূমি পেরুতে পারলেই মস্ত বড়লোক হয়ে যাবে তারা। আগে কখনও ভাবেনি এত সম্পদ অর্জন করতে পারবে কোনদিন।

সূর্য মাঝ আকাশে উঠতে তাপের হাতুড়ি নিয়ে নেমে এলেন সূর্যদেব, ওদেরকে যেন শেষই করে দেবেন। ওদের মন বলল, যদি পারতাম ঠাণ্ডা পানিতে দেহ চুবিয়ে রাখতে! ঘেমে চলেছে, দেখতে না দেখতে শুকিয়ে যাচ্ছে লবণাক্ত বিন্দুগুলো। তপ্ত বাতাস ফুসফুসে জ্বেলে দিয়েছে আগুন, যেন দাউদাউ করে জ্বলছে দেহ।

গরম আরও বাড়ছে, যেন তপ্ত বালির সঙ্গে ওদেরকে মিশিয়ে দেবে। বহুকাল আগে এখানে এসেছিল জিম উফোর্ড, তার মনেই ছিল না পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ হতে পারে। ঠিক যেন নরক থেকে নেমে এসেছে স্বয়ং ইবলিস, খেপে গেছে সাধারণ মানুষ

তার ক্ষমতাকে হেলাফেলা করছে, তা-ই। খরতাপে নিজেদেরকে পাগল পাগল লাগছে ওদের। ধীরে ধীরে দুপুর পেরিয়ে বিকেল এল। বারবার ওরা প্রার্থনা করল, যেন শীঘ্রি সন্ধ্যা নামে।

ভোরে যেমন আচমকা তাপ বেড়েছে, ঠিক তেমনি পশ্চিম দিগন্তে সূর্য হেলান দিতেই ঝপ্ করে কমে এল গরম। বালির রাজ্যে লাল-হলুদ-খয়েরি রঙের খেলা শুরু হলো। একে একে ছাউনির নীচ থেকে বেরুল সবাই। নোংরা পোশাক ঝেড়ে নিল। ঢিবির উপর উঠবার জন্য পা বাড়াল জিম উফোর্ড। এই ঢিবি ওদেরকে রক্ষা করেছে দমকা হাওয়ার কবল থেকে। চূড়ায় উঠে কোলাপসিবল ব্রাস টেলিস্কোপ খুলল জিম, খেয়াল করে দেখল ফেলে আসা মরুভূমি। যারা ধাওয়া করছে, তাদের কোনও চিহ্ন চোখে পড়ল না। বাতাসের ঝাপটা খেয়ে ধীরে ধীরে সরছে বিশাল সব ঢিবি। হারিয়ে গেছে ওদের পায়ের ছাপ। তবে সেজন্য স্বস্তি পাওয়ার কোনোই কারণ নেই। যারা আসছে, তারা দুনিয়ার সেরা ট্র্যাকার। ঠিকই বালির সাগরে খুঁজে বের করবে ওদেরকে।

জানার উপায় নেই, তারা সারাদিনে কতটা পথ পেরিয়েছে। এই তপ্ত মরু ও জ্বলন্ত সূর্য কিছুই নয়, অতিমানবীয় ক্ষমতা আছে তাদের। জিম ধারণা করছে, মরুভূমিতে ঢুকে পড়বার আগে পাঁচ দিন পিছনে ছিল তারা। আর এখন যদি কোনও ভুল না হয়ে থাকে, তারা আছে মাত্র একদিন পিছনে। আজ রাতে আরও আধ বেলা এগিয়ে আসবে। আর তারপর? আগামীকাল মুখোমুখি হতেই হবে। প্যাকহর্স খোঁড়া হওয়ার পর অস্ত্র ফেলে আসতে হয়েছে।

এখন একটাই মাত্র উপায়: আজ রাতেই খুঁজে বের করতে হবে মরু-কূপ। সেক্ষেত্রে ঘোড়াগুলোকে পেট ভরে পানি দিতে পারবে। আবারও ওগুলোর পিঠে চেপে এগুনো সম্ভব হবে।

বাড়তি পানি নেই যে ঘোড়াগুলোকে দেবে। ভোরে নিজেরা

যে পরিমাণ নিয়েছে, এখন থেকে তার অর্ধেক পানি দিয়ে চালাতে হবে। দমে আসছে জিমের মন। সবার কাছে ফিরে এল সে, ক্যান্টিন থেকে সবাইকে একটু পানি দিল। নিজেও নিল। ওটুকু পানি মুখেই শুকিয়ে গেল, গলা ভিজল না। শুকনো মাংস খেল খানিক, তাতে শুরু হলো পেট ব্যথা।

সবাইকে দেখল উফোর্ড। রুক্ষ-ক্লান্ত চেহারা তাদের। ওর বুঝতে দেরি হলো না, আজ রাতে হেঁটে চলা কঠিন হবে। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে টলছে তরুণ জ্যাক ডাল। প্রায় একই অবস্থা মার্ল গাল্টের। শুধু দুই ভাই কাইল কেইসি ও চার্লস কেইসি এখন পর্যন্ত শক্ত। তারা ডাল ও গাল্টের চেয়ে অনেক বেশি দিন ধরে আছে আফ্রিকায়। গত দশ বছর একটা খামারে কাজ করেছে। আফ্রিকার সূর্যের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে অনেকটা।

দাড়ি হাতড়ে চলেছে জিম উফোর্ড, ঝেড়ে ফেলতে চাইছে বালি। আধপাকা চুল থেকেও। একটু পর বুটজুতোর ফিতা বাঁধতে উবু হলো। ওর মনে হলো, বয়স বেড়ে হয়েছে এক শ'। পিঠ ও উরুতে টনটনে ব্যথা। আবার যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল, মটমট করে ফুটল মেরুদণ্ডের হাড়।

'ঠিক আছে, বাছারা, আগেই বলেছি, রাতে আমরা পেট ভরে পানি পাব,' বলল সে।

মনে হলো না এ কথা শুনে কেউ উৎসাহিত হলো।

'বুশম্যানরা নিজেদের বলে স্যান, ওরা কিন্তু হাজার বছর ধরে মরুভূমিতে বেঁচে আছে,' বলল জিম। 'বলা হয় ওরা এক শ' মাইল দূর থেকে পানির ঘ্রাণ পায়। কথাটা কিন্তু ঠিক। বহু বছর আগে কালাহারিতে আসি, তখন আমার সঙ্গে ছিল এক স্যান গাইড। এমন জায়গা থেকে পানি সংগ্রহ করল, কখনও ভাবতে পারিনি। লতা থেকে মুচড়ে বের করল। ওই পানি জমেছিল রাতের কুয়াশা থেকে। এ ছাড়া মৃত জানোয়ারের রিউমেন থেকেও

বের করল। ওই জানোয়ার শিকার করেছিল বিষাক্ত তীর দিয়ে।'

'রিউমেন কী?' জানতে চাইল গাল্ট।

কাইল ও চার্লস কেইসির দিকে চাইল উফোর্ড। ওরা হয়তো কিছু বলতে পারে। কিন্তু কিছুই বলল না তারা।

'ওটা পাকস্থলির বাইরের অংশ। গরু আর অ্যান্টিলোপের ওখানে চর্বি তৈরি হয়। জিনিসটার বেশিরভাগই পানি আর লতাপাতার রস দিয়ে তৈরি।'

'ওই জিনিস পেলেও বর্তে যেতাম,' বিড়বিড় করে বলল জ্যাক ডাল। ফাটা ঠোঁটের কোণে এক বিন্দু রক্ত জমেছে, ওটা বালিতে পড়ে যাওয়ার আগেই তাড়াতাড়ি চেটে নিল।

'শুকিয়ে যাওয়া নদীর তলা থেকে পানি তোলে স্যানরা। ওই শুকনো নদী হয়তো কয়েক শ' বছর আগে বইত। সেই বালির নীচে থাকে পানি।'

'ওদের মত করে পানি পাবেন?' জানতে চাইল মার্ল গাল্ট।

'গত পাঁচ দিন ধরে ঝর্না ও নদী খাতের উপর চোখ রাখছি,' বলল জিম উফোর্ড।

কথাটা শুনে সবাই অবাক হলো। কেউ ভাবেনি শুকিয়ে যাওয়া নদীর উপর দিয়ে হেঁটে এসেছে। ওদের ধারণা ছিল মরুভূমিতে আছে শুধু শূন্যতা, দেখবার মত কিছুই নেই।

জিম উফোর্ড চাইছে শুকনো ঝর্না ও নদীর কথা শুনে যেন কিছুটা হলেও আস্থা জাগে ওদের মনে। সেক্ষেত্রে ভাবতে শুরু করবে, গাইড তাদেরকে এই দুঃস্বপ্নের ভিতর থেকে উদ্ধার করতে পারবে। কাজেই উফোর্ড বলল, 'গতকাল ভাল একটা জায়গা খুঁজে পাই, কিন্তু হাতে সময় নেই বলে থামিনি। আমার ভুলও হতে পারত। আন্দাজ করছি আমরা উপকূল থেকে দু' দিন বা তিনদিন দূরে। আর তার মানেই সাগরের কারণে মরুভূমির ওই অংশ ভেজা থাকবে। এসব জায়গায় মাঝে মাঝেই ঝড় হয়।

শপথ করে বলতে পারি, বাছারা, আমরা ঠিকই খুঁজে নেব পানি।'

অস্ত্র ফেলে আসবার পর প্রথমবার এত কথা বলল জিম উফোর্ড। তার ফলও পেল। হেসে ফেলল কাইল কেইসি ও চার্লস কেইসি। ঝুলে থাকা দুই কাঁধ সোজা করে দাঁড়াল মার্ল গাল্ট। এখন আর টলছে না জ্যাক ডাল।

সূর্য ডুবে যেতেই শেষ রক্তিম রশ্মি বিদায় নিল। হামাগুড়ি দিয়ে আকাশে উঠল শীতল চাঁদ। তাকে সঙ্গ দিতেই বোধহয় হাজির হলো অযুত নিযুত নক্ষত্র— সংখ্যায় এতই বেশি, এক শ' জনমেও গুণে শেষ করতে পারবে না মানুষ। বালি সরে যাওয়ার হিসহিস, ঘোড়ার খুরের ক্লপ-ক্লপ ও বুটের মশ-মশ শব্দ ছাড়া কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। কখনও স্যাডলের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হলে কানে বেমানান লাগছে। প্রতি পদক্ষেপ মেপে চলেছে মানুষগুলো।

উফোর্ড জানে, গত ক' দিনে দুর্বল হয়ে পড়েছে সবাই। তবে সবাই জানে, পিছন থেকে ধেয়ে আসছে নিশ্চিত মৃত্যু।

মাঝরাতে প্রথমবারের মত থামল উফোর্ড। ওর মনে হলো এখানে একটু বদলে গেছে মরুভূমির প্রকৃতি। পায়ের নীচে এখনও গোড়ালি সমান বালি, কিন্তু এসব উপত্যকায় ছড়িয়ে রয়েছে নুড়ি পাথর। কোনও কোনও ওয়াশে দেখেছে পুরনো গর্ত। আগে ওখানে পানি ছিল। কোথাও কোথাও ভূ-গর্ভস্থ পানি খুঁজতে গিয়ে জমি খুঁড়েছে ইল্যাণ্ড ও অ্যান্টিলোপ। উফোর্ড খেয়াল করেছে, ওখানে কোনও মানুষের চিহ্ন নেই। বহু আগেই শুকিয়ে গেছে ওসব গর্ত। তবে এ বিষয়ে টুঁ শব্দ করেনি। সবাই ভাবছে যে-কোনও মুহূর্তে পাওয়া যাবে কূপ।

সবাইকে দ্বিগুণ পরিমাণ পানি দিল উফোর্ড। ওর ধারণা, ভোরের আগেই খুঁজে নিতে পারবে কূপ। তখন ক্যাণ্টিন ভরে নেবে। যথেষ্ট পানি দিতে পারবে ঘোড়াগুলোকে। কিন্তু কূপ যদি

পাওয়াই না যায়, আর কিছু করবার থাকবে না। যতটুকু পানি থাকবে, তাতে কিছুই হবে না কারও। সেক্ষেত্রে আগামীকাল ওদেরকে মরতেই হবে। ওর ঘোড়াটাকে নিজের অর্ধেক পানি দিয়ে দিল উফোর্ড। অন্যরা তা করল না, কোনও বিবেচনা না করেই ঢকঢক করে গিলে নিল ভাগের সবটুকু।

ওরা আবার যখন হাঁটতে শুরু করল, তার আধ ঘণ্টা পর চাঁদ ঢাঁকা পড়ল কালো মেঘে। মরুভূমিতে ওই অদ্ভুত দৃশ্য বেশিক্ষণের জন্য থাকল না, সরে গেল পুরু চাদর, আবারও বালির উপর এসে পড়ল শীতল আলো। তখনই সামনে বালির মেঝেতে কী যেন দেখল উফোর্ড। নক্ষত্র ও তার কমপাস অনুযায়ী দল নিয়ে পশ্চিমে চলেছে, কিন্তু এবার দিক পরিবর্তন করল সে, রওনা হলো উত্তর দিকে। কেউ খেয়াল করে থাকলেও এ বিষয়ে কিছু বলল না। সবার আগে হাঁটতে শুরু করেছে উফোর্ড, টের পেল বুটের নীচে ঝুরঝুরে শুকনো মাটি মৃদু আওয়াজে গুঁড়ো হচ্ছে। নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে থামল সে, ওখানেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

এই উপত্যকার মেঝে মসৃণ সমতল, কিন্তু এখানে তিন ফুট জায়গা ঠিক পিরিচের মত। এই গর্তের চারপাশ দেখল উফোর্ড, ধীরে ধীরে ঠোঁটে ফুটে উঠল হাসি। এক পাশে কয়েকটা ভাঙা ডিমের খোসা। একটা প্রায় আস্ত, কিন্তু ফাটল ধরেছে ওটার গায়ে। একেকটা খোসা হাতের তালুতে এঁটে যাবে। প্রতিটি ডিমের মাথায় গোল গর্ত। ওটা ঢেকে দেওয়া হয়েছে শুকনো ঘাস ও স্থানীয় আঠা দিয়ে। এই জিনিস যে-কোনও স্যানের সেরা সম্পদের অন্যতম। অস্ট্রিচের এই ডিমের খোসা না থাকলে পানি বয়ে নেয়া তাদের জন্য হতো অসম্ভব। শেষ যে স্যান এখানে এসেছে, তার দিন মাটি হয়েছে একটা ডিমের খোসা ভেঙে যাওয়ায়।

কেমন যেন লেগে উঠল জিম উফোর্ডের। মনে হলো, প্রাচীন

এই নদীর তীরে এসে দাঁড়িয়েছে সুদূর অতীতের বুশম্যানরা। মাথায় লতার মুকুট, পরনে কাঁচা চামড়ার কোমর-বন্ধনী। ওখান থেকে ঝুলছে অস্ট্রিচের ডিমের খোসা। তূণের ভিতর বিষাক্ত তীর। পানি নেয়ার পর শিকার করতে রওনা হবে তারা।

'কিছু পেলেন, উফোর্ড?' জানতে চাইল মার্ল গাল্ট, গাইডের পাশে বসে পড়ল সে। কিছু দিন আগের সেই চকচকে চুলগুলো এলিয়ে পড়েছে কাঁধের উপর। জ্বলজ্বল করছে চোখ, চাহনি বেপরোয়া। এ ধরনের লোক স্বপ্ন দেখে হঠাৎ করেই একদিন বড়লোক হবে। সেজন্য মৃত্যুর ঝুঁকি নিতেও দেরি করে না। হয় বড়লোক হবে, নইলে শেষ হয়ে যাবে।

'পানি, মিস্টার গাল্ট,' বলল উফোর্ড। জুয়াড়ীর চেয়ে বয়সে সে বিশ বছরের বড়, তবে ক্লায়েন্টদের সঙ্গে সবসময় একটা দূরত্ব বজায় রাখে।

'কী বললেন? কোথায় দেখছেন? আমি তো কিছুই দেখছি না।'

দুই কেইসি ভাই বসেছে একটু দূরের এক বোল্ডারের উপর। তাদের পায়ের কাছে শুয়ে পড়েছে জ্যাক ডাল। দুই ভাইয়ের একজন বোল্ডার থেকে নামল, ডালকে দুই হাতে ধরে বোল্ডারে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিল। বুকের উপর নেমে এল তরুণের চিবুক, মাথা নড়ছে একটু একটু। অগভীর শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে।

'পানি আছে মাটির নীচে, আপনাদের আগেই বলেছি।'

'সেটা পাব কীভাবে?'

'গর্ত খুঁড়তে হবে।'

আর একটা কথাও হলো না দু'জনের ভিতর, দুই হাতে মাটি আঁচড়াতে শুরু করল তারা। শেষ বুশম্যান নতুন করে গর্ত বুজে দিয়ে গেছে, নইলে শুকিয়ে যেত কূপ। জিম উফোর্ডের হাত দুটো চওড়া, কড়াওয়ালা হাতে কোদালের মত মাটি খুঁড়ছে সে।

খড়খড়ে শুকনো মাটি সরাতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না তার। গাল্টের দু'হাত পাকা জুয়াড়ীর, মসৃণ, ক'দিন আগেও ম্যানিকিউর করা ছিল; কিন্তু এখন গাইডের মত করেই হামলে পড়েছে মাটি তুলতে। তৃষ্ণার কারণে পাত্তাই দিচ্ছে না খোঁচা খেয়ে কাটছে হাত। নখের পাশ থেকে রক্ত পড়তে শুরু করেছে।

দুই ফুট মাটি খুঁড়ে ফেলল তারা। তবুও পানির কোনও চিহ্ন নেই। তাদেরকে বড় করতে হচ্ছে গর্তটা, বুশম্যানদের চেয়ে আকারে ওরা অনেক বড়। কূপ তিন ফুট গভীর হওয়ার পর এক মুঠো মাটি তুলে নিল জিম উফোর্ড, আবারও ফেলে দিল, কিন্তু হাতে লেগে রইল ভেজা মাটি। চেঁছে নিল ওটুকু, একটা কাদার খুদে বল তৈরি হলো। জোরে চিপে দিতেই বেরিয়ে এল সামান্য পানি, চকচক করছে নক্ষত্রের আলোয়।

হই-হই করে উঠল মার্ল গাল্ট, এমন কী সদাগম্ভীর জিম উফোর্ডের মুখেও দেখা দিল মৃদু হাসি।

দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে নামল তারা, গর্ত থেকে তুলতে লাগল কাদা। আরও কিছুক্ষণ পর গাল্টের কাঁধে হাত রেখে নিষেধ করল উফোর্ড। যথেষ্ট গভীর হয়েছে গর্ত।

'এবার অপেক্ষা করব আমরা।'

কূপের চারপাশে জড় হয়েছে সবাই। নীরবে চেয়ে রইল অন্ধকার গর্তের দিকে। তারপর হঠাৎ ওখানে সাদা কী যেন দেখা দিল। চোখে পড়ল চাঁদের প্রতিচ্ছবি। চারপাশ থেকে আসা পানিতে ধীরে ধীরে ভরে উঠছে কূপ। শার্টের নীচের অংশ ছিঁড়ল উফোর্ড, ওটাকে ক্যান্টিনের মুখে ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করল। কাদা-পানিতে ক্যান্টিন নামাতেই ভিতরে ঢুকতে লাগল পানি। কয়েক মিনিট পর অর্ধেক ভরে গেল ক্যান্টিন। ক্যান্টিন নাড়তেই ছল-ছলাৎ আওয়াজ হয়েছে, শব্দটা শুনেই গুঙিয়ে উঠল জ্যাক ডাল।

'বাছা, আগে তুমিই নাও,' বলল উফোর্ড, বাড়িয়ে দিল ক্যান্টিন। ওটা প্রায় খামচে কেড়ে নিতে চাইল ডাল। কিন্তু ক্যান্টিন ছাড়ল না গাইড। 'খুব ধীরে, বাছা। অল্প অল্প করে পানি মুখে দেবে।'

উপদেশ শুনবার পরিস্থিতি নেই তরুণের, ঢক-ঢক করে পানি গিলতে চাইল। পরক্ষণে গলায় আটকে গেল পানি, বেদম কাশতে শুরু করল সে। মুখ ভরা পানি হারিয়ে গেল মরুভূমিতে। কিছুক্ষণ পর সামলে নিল ডাল, লজ্জিত চেহারায় সাবধানে একটু একটু করে গিলতে শুরু করল। যথেষ্ট পানি পেতে পুরো চার ঘণ্টা লাগল। সব ক'টা জেরিক্যান ও ক্যান্টিন ভরতে চাইল উফোর্ড। গত কয়েক দিনে এই প্রথম সবাই পেট পুরে খাবার খেল।

যখন পুব দিগন্তে সূর্য উঠতে শুরু করেছে, তখনও ঘোড়াগুলোকে পানি খাইয়ে চলেছে জিম উফোর্ড। এ বিষয়ে খুব সতর্ক সে, নইলে ঘোড়ার পেট ফুলে উঠবে, সেইসঙ্গে খিঁচ ধরবে। ধীরে ধীরে খাবার দিল জন্তুগুলোকে। বিশাল পেট থেকে গুড়গুড় আওয়াজ হচ্ছে। খাওয়া শেষে কয়েক দিনের ভিতর প্রথমবারের মত বিশ্রাম নিল ওগুলো।

তখনই 'মিস্টার উফোর্ড!' বলে চেঁচিয়ে উঠল কাইল কেইসি। নদী-তীর থেকে দূরে গিয়েছিল টয়লেট করতে, এই মাত্র ফিরছে। হ্যাট হাতে পাগলের মত পুব দিগন্তে সূর্যের দিকে কী যেন দেখিয়ে চলেছে সে।

তাড়াহুড়ো করে স্যাডলব্যাগ থেকে টেলিস্কোপ নিল উফোর্ড, ঘোড়া থেকে সরে গিয়ে দৌড়ে উঠতে লাগল ঢিবির উপর। চেহারা দেখে মনে হলো বদ্ধ উন্মাদ। উঠবার পথে কাইল কেইসির সঙ্গে ধাক্কা লাগল, দু'জনই পড়ে গেল বালির উপর। যুবক আপত্তি তুলবার আগেই খপ্ করে তার মুখ চেপে ধরল উফোর্ড। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'গলা নিচু রাখুন।

মরুভূমিতে বহুদূর যায় আওয়াজ।'

চূড়ার উপর শুয়ে টেলিস্কোপ খুলল সে, চোখে লাগাল। বিড়বিড় করে বলল, 'হায় ঈশ্বর! ওরা তো একেবারে কাছে চলে এসেছে!'

পাঁচজনের এই দলটি একসঙ্গে জুটেছে, এর একমাত্র কারণ জ্যাক ডাল তার বাবাকে ভীষণ ঘৃণা করে। সে-লোক অসম্ভব বদমেজাজি, কোন্ এক খারাপ রাতে স্বপ্ন দেখে তার ধারণা হয়েছে, তার উপর ওহি নেমেছে। স্বয়ং জিবরাঈল ফেরেস্তা স্টিফেন ডালকে বলেছেঃ সবকিছু বিক্রি করে দাও, চলে যাও আফ্রিকায়, এখন থেকে তোমাকে জংলিদের মাঝে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে হবে। এই স্বপ্ন দেখবার আগে ধার্মিক লোক ছিল না স্টিফেন ডাল, কিন্তু এরপর থেকে স্রেফ পাগল হয়ে উঠল। বাইবেলে ডুবে গেল সে। চলে গেল লণ্ডনের মিশনারি সোসাইটিতে, ধর্মের সাহায্যে বুনোদের উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে দরখাস্ত জমা দিল। তাকে এড়িয়ে যেতে চাইল কমিটি, তাদের ধারণা হয়েছেঃ লোকটা আসলে যিলট। কিন্তু শেষে পাগলের হাত থেকে বাঁচতেই রাজি হতে হলো তাদের। ঠিক হলো তাকে মিশনারি করা হবে, ইচ্ছে করলে স্টিফেন ডাল তার অনিচ্ছুক স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে যেতে পারে বেচুয়ানাল্যাণ্ডে। ওই অঞ্চলের মিশনারি মারা পড়েছে কঠিন ম্যালেরিয়ায়।

হারেরো জনগণের মাঝে, সভ্য সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন খুদে এক মিশনে এসে, ভয়ঙ্কর এক ধার্মিক দানব হয়ে উঠল লোকটা। ঈশ্বর নাকি জিবরাঈলকে দিয়ে তাকে বলে দিয়েছেন, এখন থেকে পুরোপুরি আত্মত্যাগ করতে হবে। কেউ সামান্যতম ত্রুটি করলে তাকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে। অন্য কারও উপর এসব প্রয়োগ করতে পারে না সে, কিন্তু নিজ ছেলে তো হাতের

মুঠোর ভিতর! খেতে বসে প্রার্থনার সময় শ্লোকের শেষ শব্দটি ঠিক উচ্চারণ করেনি, সে-কারণে জ্যাক ডালকে বহুবার পিটিয়েছে সে। সামান্যতম ভুল হলেই খাবার বন্ধ হয়, যখন তখন নির্দিষ্ট শ্লোক আউড়াতে ভুল হলে বেধড়ক মার খেতে হয়।

এই পরিবার যখন হারেরো অঞ্চলে এসে পৌঁছুল, তার কয়েক দশক আগেই ব্যাপটাইয হয়েছেন রাজা স্যামুয়েল হারেরো, তাঁর সঙ্গে তিক্ত বিরোধ চলছে কলোনিয়াল জার্মান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। তারাও পাঠিয়েছে জার্মান মিশনারি। কিন্তু তাকে পাত্তা না দিয়ে ইংরেজ এই পরিবারকে গুরুত্ব দিলেন রাজা। খুশি মনে শুনতে লাগলেন স্টিফেনের নরকের বর্ণনা।

বেশ ভালই থাকত কিশোর জ্যাক ডাল, রাজ-কুটিরের কাছেই ওদের বাড়ি, রাজার রয়েছে অসংখ্য নাতিপুতি, তাদের সঙ্গে খেলাধুলো করে সময় পেরুতে পারত; কিন্তু সমস্যা হলো: ওর বাবা যখন তখন জিবরাঈলের চোখ রাঙানি টের পায়, আর তখনই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, একের পর এক আদেশ দিতে থাকে; তাতে একটু এদিক ওদিক হলেই পিটিয়ে হাড় গুঁড়ো করতে চায়।

এভাবেই চলতে লাগল জ্যাক ডালের জীবন। তার প্রিয় বন্ধু রাজার নাতি হ্যাসা মাহারেরোর সঙ্গে পরিকল্পনা করে সে, একদিন সত্যিই পালিয়ে যাবে। কীভাবে তা সম্ভব, এ নিয়ে আলাপ করতে করতে একদিন দারুণ একটা জিনিস আবিষ্কার করল সে। ওটাই আমূল বদলে দিল তাকে।

একটা গোলাকার রণ্ডোভালের ভিতর ছিল সে, ওখানে রাজা কামাহারেরোর শত শত গরুর জন্য রাখা ছিল বিচালি। কখনও কখনও লুকিয়ে এই গুদামে খেলা করে রাজার নাতি মাহারেরো ও জ্যাক। সেদিন তখনও মাহারেরো আসেনি, চারপাশ ঘুরে দেখতে শুরু করল জ্যাক। বহুবার এখানে এসেছে, তবে এই প্রথম দেখল ঘাস ও কাদা দিয়ে তৈরি পিছন-দেয়ালের কাছে মাটি খুব মসৃণ।

ওই কালো মাটি অন্য জায়গা থেকে একদম আলাদা।

দুই হাতে মাটি খুঁড়তে শুরু করল জ্যাক ডাল। এক মিনিট পেরুনোর আগেই বুঝল, পাতলা স্তরের মাটি সরে যেতেই দেখা দিয়েছে ঘটির মত দেখতে বারোটা মাটির পাত্র। সাধারণত এসবের ভিতর রাখা হয় বিয়ার।

কিন্তু এখানে কেন লুকিয়ে রাখা হলো বিয়ার?

একেকটা পাত্র ওর মাথার সমান, প্রতিটির মুখ গরুর চামড়া দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা। গর্ত থেকে একটা পট তুলে আনল জ্যাক, ভিতরে ওজনদার কিছু আছে। তুলবার সময় ভিতরে খটা-খট আওয়াজ হয়েছে।

পটের মুখ থেকে সাবধানে চামড়া খুলে ফেলল জ্যাক, কাত করতেই হাতে নামল অদ্ভুত কিছু পাথর। আগে কখনও এ ধরনের পাথর দেখেনি সে। অজান্তেই শরীর কাঁপতে লাগল ওর। এগুলো হীরা নয়তো? গুনল জ্যাক, ওর হাতে ছয়টি আকাটা হীরা! সবচেয়ে ছোট পাথরটা গুলতির গুলির চেয়ে একটু ছোট। সবচেয়ে বড়টা তার দ্বিগুণ আকারের।

হাতের দিকে চেয়ে রইল জ্যাক, আর তখনই গুদামের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল হ্যাসা মাহারেরো। প্রিয় বন্ধু কী আবিষ্কার করেছে টের পেয়েই আঁৎকে উঠল সে। চট্ করে কাঁধের উপর দিয়ে বাইরে চাইল, ভয় পেয়ে গেছে। না, বড়দের কেউ আশপাশে নেই! একটু দূরে বেড়ার ওপাশে গরু চরাচ্ছে কয়েকটা ছেলে। এক শ' গজ দূরে এক মহিলা, মাথার উপর কাটা ঘাসের বোঝা নিয়ে আরেক দিকে চলেছে। না, আর কেউ নেই। একছুটে বন্ধুর কাছে পৌঁছে গেল মাহারেরো, ছোঁ দিয়ে জ্যাকের হাত থেকে পট সরিয়ে নিল।

'এ কী করেছ তুমি!' হিসহিস করে বলল, জার্মান উচ্চারণে ইংরেজি বলছে সে।

'কই, কিছুই তো করিনি,' দোষী গলায় বলল জ্যাক। 'এখানে দেখলাম মাটির নীচে কী যেন লুকিয়ে রাখা, তা-ই দেখছি।'

হাত বাড়িয়ে দিল মাহারেরো, তার হাতে পাথরগুলো দিয়ে দিল জ্যাক। পটের ভিতর হীরা রেখে দিল কিশোর রাজপুত্র, চামড়ার খাপ পরাতে শুরু করে বলল, 'খবরদার! আর কাউকে বলতে যেয়ো না, তা হলে ভীষণ কষ্ট পেয়ে মরবে তুমি।'

'ওগুলো হীরা, তা-ই না?'

আস্তে করে মাথা দোলাল মাহারেরো। 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এখানে এল কীভাবে? এখানে কোনও হীরার খনি নেই! খনি তো আছে শুধু কেপ কলোনির কিম্বারলিতে।'

ঠিক জায়গায় পাত্রটা রেখে দিল মাহারেরো, মাটি দিয়ে গর্ত বুজে দিতে লাগল। ওর মনেই থাকল না দাদা তাকে শপথ করিয়েছে, এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলা চলবে না। মাহারেরোর বয়স জ্যাকের চেয়ে তিনবছর কম, সবই জানে ভাবতেই ওর মনে গর্ব এল। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল, 'সবই বলব তোমাকে। কিন্তু শপথ করতে হবে আর কখনও এ কাজ করবে না।'

'এই যে আমি শপথ করছি।'

'ঠিক আছে। শোনো তা হলে: প্রথম যখন হীরার খনি আবিষ্কার হলো, আমাদের হারেরো জাতির অনেকে চলে গেল কিম্বারলির কূপগুলোয় কাজ করতে। এক বছরের জন্য চুক্তি করল তারা। কাজ শেষে আবার ফিরল সাদামানুষের দেয়া টাকা নিয়ে। কিন্তু সঙ্গে আনল অন্য কিছুও। তারা হীরা চুরি করে আনল।'

'শুনেছি খনি-ক্যাম্প থেকে বিদায় দেয়ার আগে সবাইকে ভাল করেই তল্লাশী করা হয়।'

'ওরা জানত না আমাদের লোক হাতে-পায়ে ক্ষত তৈরি করে তার ভিতর রেখে দেয় হীরা। ঘা শুকিয়ে গেলে বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। আবার এখানে আসার পর বর্শা দিয়ে শরীর

চিরে বের করে পাথর। সব উপহার দেয়া হয় আমার দাদা সর্দার কামাহারেরোকে। তাঁরই নির্দেশে দক্ষিণের কিম্বারলিতে গিয়ে হীরা আনে ওরা।'

'হ্যাসা, কয়েকটা পাথর তো দেখলাম রীতিমত বড়, ওগুলো আনতে গেলে তো ধরা পড়ে যাওয়ার কথা,' বলল জ্যাক।

হেসে ফেলল হ্যাসা। 'হারেরো যোদ্ধাদের অনেকে বিশালই হয়।' বলতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল সে। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে গল্প শেষ করতে। 'বছরের পর বছর এই চলল, ধরো, বিশ বছর ধরে? তারপর সাদামানুষ বুঝল হারেরোরা কী করছে। কয়েক শ' যোদ্ধাকে বন্দি করল তারা, কাউকে ছাড়ল না। যারা পাথর লুকায়নি, তাদেরকেও দোষী হিসাবে বিচার করল। মেরে ফেলা হলো সবাইকে।

'যখন ঠিক সময় আসবে, এসব হীরা বিক্রি করে জার্মান কলোনিয়াল অফিসকে এই দেশ থেকে ভাগিয়ে দেব আমরা।' চকচক করছে মাহারেরোর চোখ। 'আবারও স্বাধীনতা পাব আমরা। জ্যাক, আমার কাছে শপথ করো, এই গুপ্তধনের কথা ভুলেও কাউকে বলবে না।'

কমবয়সী বন্ধুর দিকে চাইল জ্যাক ডাল, আস্তে করে মাথা দুলিয়ে বলল, 'আমি শপথ করছি।'

তার ওই প্রতিজ্ঞা টিকল এক বছরেরও কম।

আঠারো বছর হতেই বাবার মিশন থেকে বিদায় নিল জ্যাক। কাউকে বলেনি কোথায় চলেছে, এমন কী মাকেও নয়। সেজন্য অপরাধ বোধে ভুগল সে। বেচারি মা রয়ে গেল স্টিফেন ডালের অসহ্য অত্যাচার সইতে।

জ্যাকের সবসময় মনে হয়েছে ও সত্যিকারের যোদ্ধা-পুরুষ।

কেন, হ্যাসা মাহারেরোর সঙ্গে বহুবার বিশাল তৃণ-ভূমিতে ক্যাম্প করেনি সে?

কিন্তু যখন পঞ্চাশ মাইল দূরের ট্রেডিং স্টেশনে গিয়ে পৌঁছুল, ততক্ষণে মরতে বসেছে ক্লান্তি ও তৃষ্ণায়। সঙ্গে শুধু জন্মদিনে মা'র দেয়া গোটা কয়েক কয়েন, ওই উপহারই তার একমাত্র সঞ্চয়। জ্যাকের বাবা কোনদিন কোনও উপহার দেয়নি। তার ধারণা, মহান যিশুর জন্মদিনে উৎসব ঠিক আছে, কিন্তু আর কারও জন্মদিন পালন করবার কোনও মানেই হয় না।

কাজেই জ্যাকের কাছে টাকা নেই বললেই চলে।

দু' এক দিন পর বিশটি মোষে টানা ওয়্যাগন নিয়ে কিম্বারলির দিকে রওনা হবে ওয়্যাগন মাস্টার। তার সঙ্গে থাকবে হাতির দাঁত ও লবণাক্ত মাংস। যৎসামান্য যে টাকা আছে জ্যাকের, তাতে কোনওমতে কিম্বারলি যাওয়ার ভাড়া হবে, এরপর প্রায় ফতুর হয়ে যাবে সে।

ওয়্যাগন মাস্টার বয়স্ক লোক, মাথায় বিশাল সাদা হ্যাট, দুই গালের মাঝ পর্যন্ত নেমে এসেছে জুলফি। এ লোকের সঙ্গে রয়েছে দুই ভাই। তারা কেপ কলোনিয়াল অফিস থেকে চারণ-ভূমি লিয নিয়েছিল। কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখে জমির দখল নিয়েছে ম্যাটাবেল উপজাতি। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে জমি উদ্ধার করা অসম্ভব, সুতরাং আবারও দক্ষিণে ফিরছে দুই ভাই। তাদের সঙ্গে রয়েছে হালকা-পাতলা এক লোক, নাম মার্ল গাল্ট। দেখলে মনে হয় ঠিক ক্ষুধার্ত বাজপাখি।

দু' দিন পর রওনা হলো ওয়্যাগন। কয়েক সপ্তাহ ধরে দক্ষিণে চলল ওরা। জ্যাক ডাল বুঝল না মার্ল গাল্ট কী কাজ করে, বা কেন কেপ কলোনি থেকে এত দূরে এসেছিল। অবশ্য এটা বুঝল, ওই লোককে কখনও বিশ্বাস করা চলবে না।

এক সন্ধ্যায় খরস্রোতা বিপজ্জনক এক নদী পেরুল ওরা। মাঝ নদীতে দুর্ঘটনাবশত কেইসিদের এক মোষের পিঠে লাফিয়ে পড়তে হলো জ্যাককে। জন্তুটা হাবুডুবু খেয়ে মরতে বসেছিল,

কিন্তু তাকে ঘোড়ার মত দাবড়ে নিয়ে অপর তীরে উঠল সে। এরপর নদীর তীরেই ক্যাম্প করল সবাই। বিকেলে বন্দুক দিয়ে গিনি ফাউল শিকার করেছে কাইল কেইসি। কাজেই সে রাতে সবাই ক্যাম্প-ফায়ারের চারপাশে বসবার পর কয়েকটা মদের বোতল বের করল মার্ল গাল্ট। ওই ব্র্যাণ্ডি কমদামি কড়া স্পিরিট বললেও চলে। মাংস খাওয়ার ফাঁকে দেখতে না দেখতে ফুরিয়ে গেল দুই বোতল মদ।

জীবনে এই প্রথম অ্যালকোহল স্পর্শ করল জ্যাক ডাল। প্রথম চুমুকে তার মনে হলো পৃথিবী সত্যিকারের আনন্দধাম। পরের তিন পেয়ালা তার মুখের আগল খুলে দিল।

কিছুক্ষণ পর আলাপের মোড় ঘুরে গেল। সোনা, রূপা ও হীরার খনি নিয়ে শুরু হলো গল্প। কথা হতে লাগল প্রায় প্রতিদিনই মিলছে হীরার খনি, সোনার রিফ ইত্যাদি। দেখতে না দেখতে বড়লোক হয়ে যাচ্ছে লোকে। আজ যে ফকির, পরদিনই সে আমির।

এসব শুনতে গিয়ে জ্যাক ডালের মনে হলো তারও কিছু বলা উচিত। বুকের ভিতর থেকে কে যেন সতর্ক করল: বন্ধু হ্যাসার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ তুমি। কিন্তু নিজেকে সামলে রাখা কঠিন হয়ে উঠল। রুক্ষ ও কঠোর এই মানুষগুলো খনির ব্যাপারে কতই না জানে, সে তুলনায় কিছুই তো সে জানে না! হুঁশিয়ার লোক এরা, বিশেষ করে জিম উফোর্ড ও মার্ল গাল্ট। হঠাৎ জ্যাকের মনে হলো এদের কাছ থেকে সম্মান আদায় করতে হবে ওকে। বুঝল, এ জীবনে এর বেশি কিছু চায়নি। কাজেই ঠিক করে বুঝবার আগেই মুখ খুলল সে। ব্র্যাণ্ডির নেশায় বলতে লাগল ওর জানা আছে কোথায় আছে বারোটা ঘটি ভরা আকাটা হীরাখণ্ড। এটাও জানিয়ে দিল রাজার বাড়িতে পাওয়া যাবে সব।

'এসব তুমি কোত্থেকে জানলে, ছেলে?' কেউটের মত ফোঁস

করে উঠল মার্ল গাল্ট।

'কারণ এই ছেলের বাবা হারেরোল্যাণ্ডের যাজক,' বলল জিম উফোর্ড। জ্যাকের দিকে চাইল। 'এখন বুঝছি কেন তোমাকে চেনা চেনা লাগছিল। বছর পাঁচেক আগে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হয়। রাজার কাছে গিয়েছিলাম, তার এলাকায় শিকারের অনুমতি নিতে।' সবার উপর চোখ বুলিয়ে নিল উফোর্ড। 'সে সময় হারেরোদের সঙ্গে বাস করত ওরা।'

'আমরা ছয় বছর ধরে ওদের সঙ্গে আছি,' গর্ব ভরে বলল জ্যাক। 'ওরা আমাকে চেনে, বিশ্বাসও করে।'

এরপর পনেরো মিনিট পেরুনোর আগেই খোলাখুলি আলাপ শুরু হলো— তারা হীরার পাত্রগুলো চুরি করলে কেমন হয়?

জ্যাক ডাল অবশ্য সবাইকে জানিয়ে দিল, প্রত্যেকে একটার বেশি ঘটি নিতে পারবে না। অন্য সাতটা থাকবে হারেরো রাজার জন্য। এতে যদি সবাই রাজি না হয়, তো বলবে না সে কোথায় রয়েছে হীরাগুলো।

সবাই একবাক্যে রাজি হয়ে গেল।

আরও এক শ' মাইল দক্ষিণে এসে ট্রেডিং পোস্টে পৌঁছুল ওরা। ওয়্যাগন ও তার ভিতরের সমস্ত মালামাল অর্ধেক দামে বিক্রি করে দিল জিম উফোর্ড। সে টাকায় সবার জন্য কেনা হলো ঘোড়া ও প্রয়োজনীয় মালামাল। এরইমধ্যে উফোর্ড ঠিক করে ফেলল, একবার চুরি ধরা পড়লে কীভাবে হারেরো রাজ্য থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। ওরা যে ট্রেডিং পোস্টে পৌঁচেছে, সেখান থেকে গেছে টেলিগ্রাফের তার। অন্যরা তিনদিন বিশ্রাম নিল, কিন্তু এ সময়ে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে উফোর্ড কেপ টাউনের পরিচিত এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে চুক্তি করে ফেলল। প্রচুর টাকা দিতে হবে তাকে, কিন্তু পরোয়া করল না, কারণ সে জানে, যে কাজ করতে চলেছে, তাতে হয় সে কোটিপতি হবে, নইলে শুকনো লাশ হয়ে

পড়ে থাকবে কালাহারি মরুভূমিতে।

রাজার ক্রালে লুকিয়ে পৌঁছুনো সম্ভব হলো না। আগেই রাজার কানে বার্তা পৌঁছে গেল, তাঁর রাজ্যে ঢুকেছে কয়েকজন সাদামানুষ। তাতে সমস্যা হলো না, জিম উফোর্ডকে আগে থেকেই চেনেন রাজা। তা ছাড়া, যাজক ব্যস্ত ছেলেকে ফিরে পেতে। জ্যাকের ধারণা হলো: আসলে ওকে পেটাতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে বাবা।

সীমান্ত থেকে রাজার ক্রাল পর্যন্ত পৌঁছুতে লাগল সাত দিন। অভিযাত্রীদেরকে নিজে অভ্যর্থনা দিলেন রাজা। তিনি জিম উফোর্ডের সঙ্গে টানা এক ঘণ্টা স্থানীয় ভাষায় আলাপ করলেন। নিজ রাজধানী থেকে তাঁকে অন্যত্র সরে যেতে বাধ্য করেছে জার্মান কলোনিয়াল অফিস। রাজাকে বাইরের দুনিয়ার সব খবর জানাল গাইড। তার কথা শেষে রাজা জ্যাককে জানালেন, তার বাবা-মা ঝোপঝাড়ের অঞ্চলে গেছেন। সে এলাকায় একদল মহিলা ও বাচ্চাকে ব্যাপটাইয করবেন স্টিফেন। তাঁদের ফিরতে দু'দিন লাগবে। এ কথা শুনে স্বস্তির শ্বাস ফেলল জ্যাক।

রাতে ওদেরকে এখানে থাকতে অনুমতি দিলেন রাজা। তবে জিম উফোর্ডের অনুরোধে এককথায় *না* বলে দিলেন, গতবারের মত হারেরো রাজ্যে শিকার করা চলবে না।

'কেউ একটু চেষ্টা করলে তাকে দোষ দেয়া যায় না, ইয়োর হাইনেস,' বলল জিম উফোর্ড।

'সাদামানুষ জোরাজুরি করে, এটা তাদের বাজে অভ্যেস।'

সেইরাতে রণ্ডোভালে ঢুকল ওরা। ছাত পর্যন্ত গাদি দিয়ে রাখা খড়, বাণ্ডিলগুলোর ভিতর দিয়ে ইঁদুরের মত পথ করে নিল তারা। হীরকখণ্ডের কাছে পৌঁছে গেল। চুরি করতে বেশিক্ষণ লাগল না। মার্ল গাল্ট দ্বিতীয় বাটির মাল স্যাডলব্যাগে ভরতেই জ্যাক ডাল বুঝল, প্রথম থেকেই ওকে ঠকিয়েছে এরা। দুই কেইসি ভাইও

বাদ পড়ল না, কয়েক বাটি হীরা ব্যাগে পুরল। শুধু জিম উফোর্ড কথা রাখল, মাত্র একটি পট খালি করল সে।

'আপনি যদি না নেন, আমি নেব,' আঁধারে ফিসফিস করে বলল মার্ল গাল্ট।

'আপনার ইচ্ছে,' বলল উফোর্ড। 'আমি এককথার মানুষ।'

সবার সঙ্গে যথেষ্ট ব্যাগ নেই যে সমস্ত হীরা নেবে। প্যান্টের পকেট ভরল তারা। তারপরও রয়ে গেল চারটে পেট-মোটা ঘটি। সাবধানে আবারও ঘটিগুলো মাটি চাপা দিল জিম উফোর্ড। সাধ্যমত চেষ্টা করল, যাতে সহজে চুরি ধরা না পড়ে। ভোরে আতিথেয়তার জন্য রাজাকে ধন্যবাদ দিল তারা, ক্যাম্প গুটিয়ে রওনা হয়ে গেল। হ্যাসা মাহারেরো জ্যাক ডালের কাছে জানতে চাইল, ওর মাকে কিছু বলতে হবে কি না। জবাবে আমতা আমতা করে জ্যাক বলল, 'তাঁকে বোলো, আমি সত্যিই দুঃখিত।'

মরু-কূপ থেকে একটু দূরে ঢিবির মাথায় শুয়ে পড়েছে জিম উফোর্ড। চোখে টেলিস্কোপ ধরে দেখছে, খুব দ্রুত ছুটে আসছে রাজার সেনাবাহিনী।

সাদামানুষ হীরাগুলো চুরি করবার পর গোটা ইমপি, অর্থাৎ এক হাজার সৈনিক পিছু নিয়েছে হারেরোল্যাণ্ড থেকে। এরপর পাঁচ শ' মাইল পেরিয়েছে তারা। ভয়ঙ্কর ঊষর মরুভূমিতে এসে কমে গেছে বাহিনীর লোকবল। জিম উফোর্ড দেখল, সংখ্যায় এখন তারা দেড় শ' জন। এরাই রাজার সবচেয়ে অনুগত, কষ্টসহিষ্ণু সৈনিক। সঙ্গে খাবার ও পানি নেই বললেই চলে, তারপরও কিছুই পরোয়া না করে ছুটে আসছে। এইমাত্র ঢিবিগুলোর ওপাশে সূর্য উঠেছে, সে রক্তিম রশ্মিতে চকচক করছে বর্শাগুলোর ধারালো ফলা। ওই অ্যাসেগাই নিয়ে যে-কোনও শত্রুর মুখোমুখি হয় হারেরো সৈনিক— শত্রু বধ করে, নইলে বরণ করে

মৃত্যু।

কাইল কেইসির পায়ে টোকা দিল জিম উফোর্ড। দু'জন পিছন দিকে পিছলে নামতে লাগল। শুকনো নদী-খাতে জড় হয়েছে অন্যরা, চিন্তিত এবং ভীত। ঘোড়াগুলো টের পেয়েছে দু' পেয়ে মনিবগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে। বালিতে পা ঠুকছে ওরা, নাড়ছে কানদুটো— যেন অগ্রসরমান বিপদ-সংকেত পেয়ে গেছে।

'সবাই ঘোড়ার পিঠে উঠুন,' নির্দেশ দিল উফোর্ড, ডালের হাত থেকে নিজের ঘোড়ার রাশ নিল।

'আমরা রোদের ভিতর চলব?' জানতে চাইল ডাল।

'হ্যাঁ, এ ছাড়া উপায় নেই। নইলে কামাহারেরোর সৈনিকদের কুঁড়েঘরে শোভা পাবে আমাদের মাথার খুলি। জলদি করো। ওরা মাত্র একমাইল দূরে। ঘোড়া কতক্ষণ আমাদের বইতে পারবে, জানি না। রোদ চড়তে শুরু করেছে।'

জিম উফোর্ড ভাল করেই জানে, গতরাতে যদি মরু-কূপ না পেত, হারেরো সৈনিকরা বাঘের মত ওদের উপর হামলে পড়ত। এখন পর্যন্ত নিজের একটা মাত্র ক্যান্টিন ভরতে পেরেছে সে, কিন্তু এ নিয়ে ভাবতে গেল না, চড়ে বসল ঘোড়ার পিঠে। নদী-খাত থেকে মরুভূমিতে উঠে এল তারা, বাঁক নিয়ে রওনা হয়ে গেল। ঘাড়ে ও পিঠে এসে পড়ল কড়া রোদ।

প্রথম কয়েক মাইল সবাইকে দুলকি চালে ঘোড়া চালাতে দিল জিম উফোর্ড। প্রতি তিন মাইলে হারেরো সৈনিকদের কাছ থেকে এক মাইল করে সরে যেতে লাগল তারা। ততক্ষণে অসহ্য গরম হয়ে উঠেছে মরুভূমি। ঘাম বেরুতে না বেরুতেই শুকিয়ে যেতে লাগল রোমকূপ থেকে। বিরাট হ্যাটের ছায়ায় চোখ বুজে বসে রইল জিম উফোর্ড। তারপরও পাতার ভিতর ঢুকছে জোরালো রশ্মি। বালি-ঢিবির উপর উজ্জ্বল রোদ ফেলছে সূর্য, চারপাশে বিকিরণ হচ্ছে আলোর।

ছাউনির নীচে আড়াল নিয়ে সবার মনে হয়েছে, কালাহারি হয়ে উঠেছে উত্তপ্ত আভেন, কিন্তু এবার খাঁ-খাঁ বালির ঢিবির রাজ্যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল সূর্যের তাপ। ঘোড়ার পিঠে চেপে চলতে গিয়ে জিম উফোর্ডের মনে হলো জীবনে এত কষ্টের কাজ করেনি। ভয়াবহ গরম ও জ্বলজ্বলে আলো পাগল করে দিতে চাইল। যেন ত্বকের ভিতর জ্বলছে দাউদাউ আগুন, মাথার ভিতর গলে পড়ছে ফুটন্ত মগজ। কখনও দু-এক চুমুক পানি নিল, তাতে মোটেও মিটল না তৃষ্ণা, বরং তপ্ত পানি পুড়িয়ে দিল জিভ।

সময়ের কথা ভুলে গেল তারা, মনোযোগ থাকল শুধু সামনের জ্বলন্ত মরুভূমিতে। কখনও কখনও কমপাস দেখল উফোর্ড, নিজ দল নিয়ে পশ্চিমে চলেছে। এমন কোনও ল্যাণ্ডমার্ক নেই যে ওদেরকে পথ দেখাবে। সম্পূর্ণ আন্দাজের উপর ভর করে চলেছে উফোর্ড। এ ছাড়া কোনও উপায়ও নেই।

সূর্যের সঙ্গী হয়ে অত্যাচারী হয়ে উঠল তপ্ত হাওয়া। জিম উফোর্ডের ধারণা হলো, তারা রয়েছে দক্ষিণ আটলান্টিক উপকূল থেকে বিশ মাইল দূরে। সাগর থেকে ঝিরঝিরে হাওয়া আসবার কথা, কিন্তু বদলে পিছন থেকে এল আগুনের হল্কার মত লূ-হাওয়া। যেন ওদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। মনে মনে প্রার্থনা করল উফোর্ড: এখন কমপাস ঠিক থাকলে হয়। ওই কাঁটাই দেখিয়ে দেবে কীভাবে খ্যাপা মরুভূমি পেরিয়ে পশ্চিম উপকূলে পৌঁছুতে হবে। একটু পর পর কমপাস দেখছে উফোর্ড, খুশি যে পিছনে এক সারিতে আসছে অন্যরা, তারা দেখবে না ওর চিন্তিত চেহারা।

হাওয়ার দাপট ক্রমেই বাড়ছে। একবার পিছন ফিরে চাইল উফোর্ড। ওর সঙ্গীরা ঠিকমতই আসছে। তবে পিছনে ফেলে আসা বালির ঢিবির চূড়া হারিয়ে গেছে, ওখানে আছে শুধু ঝোড়ো হাওয়ায় ভেসে ওঠা বালির চাদর। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত

ধরে ছুটে আসছে বালির পুরু দেয়াল। প্রথম ঝাপটা পুড়িয়ে দিতে চাইল ত্বক, বোজা চোখ থেকে দরদর করে বেরোল পানি। ভয় পেয়ে গেছে উফোর্ড, কু ডাকছে তার মন। তারা সঠিক পথেই চলেছে, কিন্তু এই মৌসুমে এরকম হাওয়া আসবার কথা নয়। ওরা যদি মরুঝড়ের ভিতর পড়ে, নিরাপদ কোনও আশ্রয় না পেলে বাঁচবে না কেউ।

একবার ভাবল, সবাইকে থামতে বলবে, একটা ছাউনি তৈরি করে অপেক্ষা করবে। কিন্তু সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। উপকূল এখনও বহু দূরে, মরুঝড় হোক বা না হোক, ঠিকই আসবে রাজার সেনাবাহিনী, একজনকেও বাঁচতে দেবে না। সূর্যাস্ত হতে এখনও এক ঘণ্টা। তুমুল বাতাস পিঠে নিয়ে এগুতে লাগল উফোর্ড। নাক নিচু করে ছুটছে ঘোড়া। তবে গতি কমে গেছে। তারপরও সেনাবাহিনীর গতির চেয়ে ঢের বেশি এগুতে পারছে।

আরও কিছুক্ষণ পর নাম-চিহ্নহীন এক ঢিবির উপর উঠে এল উফোর্ড। হঠাৎ টের পেল সামনে নতুন কোনও বালির স্তূপ নেই। অনেক নীচে চোখে পড়ল ধূসর পানির বিস্তার। খুশিতে ফুঁপিয়ে উঠল উফোর্ড। ওই যে দেখা যায় দক্ষিণ আটলান্টিক! প্রথমবারের মত লবণাক্ত পানির ঘ্রাণ পেল সে। মাথার উপর সাদা ফেনা নিয়ে গম্ভীর আওয়াজ তুলে একের পর এক ঢেউ আছড়ে পড়ছে চওড়া সৈকতে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল উফোর্ড, সারাদিন স্যাডলে বসে টনটন করছে তার নিতম্ব ও কোমর। শরীরে এত জোর নেই যে হই-হই করে উঠবে। নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। ঠোঁটে ফুটে উঠেছে চওড়া হাসি। বহু দূরে ওই কালো পানির ওপাশে হারাতে বসেছে সূর্য।

'কী হয়েছে, মিস্টার উফোর্ড? আপনি থামলেন কেন?' বিশ গজ দূর থেকে জানতে চাইল চার্লস কেইসি, ঘোড়া নিয়ে উঠে

আসছে ঢিবির উপর।

ফেলে আসা পথে চোখ বুলিয়ে নিল জিম উফোর্ড। চার্লসের ভাই একটু পিছনে। তারপর ঘোড়ার পিঠে ঝুলে আসছে জ্যাক ডাল। এখনও মার্ল গাল্টকে দেখা যাচ্ছে না। 'আমরা তীরে পৌঁছে গেছি।'

আর কিছুই বলল না উফোর্ড। ঘোড়া দাবড়ে ঢিবির উপর উঠে এল চার্লস কেইসি। সামনে বিস্তৃত সাগর দেখেই বিকট চিৎকার ছাড়ল সে। লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল, উফোর্ডের কাঁধ চাপড়ে দিতে লাগল। 'জানতাম আপনি ব্যর্থ হতে পারেন না, মিস্টার উফোর্ড! জানতাম আপনি ঠিকই তীরে পৌঁছে দেবেন!'

হাসল উফোর্ড। 'সন্দেহ করা উচিত ছিল। আমি নিজেই জানতাম না পারব কি না।'

পরবর্তী দশ মিনিটে ঢিবির উপর জড় হলো সবাই। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা মার্ল গাল্টের। উফোর্ড ধারণা করল, লোকটা রেশন না করে গোপনে ভোর থেকে পানি গিলছে।

'তা হলে সাগরের তীরে পৌঁছে গেলাম,' দমকা হাওয়ার উপর দিয়ে কোনমতে বলল মার্ল গাল্ট। 'এবার কী? পিছন থেকে ছুটে আসছে একদল জংলি!' কাঁপা আঙুল আটলান্টিকের দিকে তাক করল সে। 'আর আপনাদের বোধহয় মনেই নেই সাগর থেকে এক ফোঁটা খাবার পানি পাব না!'

জুয়াড়ীর হতাশার কথাকে পাত্তা দিল না উফোর্ড, পকেট থেকে বের করল হাণ্টারের অর্ধেক বামগার্ট, ডুবন্ত সূর্যের আলোয় ওটা দেখল। 'এখান থেকে এক বা দুই মাইল দূরে থাকবে উঁচু একটা টিলা। এক ঘণ্টার ভিতর ওটার চূড়ার উপর উঠতে হবে।'

'তারপর কী হবে?' জানতে চাইল জ্যাক ডাল।

'তারপর দেখব, আমি সত্যিকারের ন্যাভিগেটর কি না।'

চারদিকের অন্য ঢিবির চেয়ে অনেক উঁচু এই বালির ঢিবি।

দুই শ' ফুট নীচে সৈকত। ঢিবির চূড়ার উপর তুমুল হাওয়া বইছে। ভীত হয়ে উঠেছে ঘোড়াগুলো, বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে একই জায়গায়। বাতাসে ভাসছে পুরু বালির চাদর। দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল দলটি। দুই কেইসি ভাই ও মার্ল গাল্ট গেল উত্তর দিকে, দক্ষিণ দিক দেখতে গেল জ্যাক ডাল ও উফোর্ড।

কালো আঁধার ঘনিয়ে ডুবছে সূর্য। পকেট-ঘড়ি বের করে সময় দেখল উফোর্ড: সন্ধ্যা সাতটা। *ওদের তো আগেই সিগনাল দেয়ার কথা!* ওর মনে হলো পেটের ভিতর ভারী পাথরের মত কী যেন চেপে বসছে। সবাই বড় বেশি ভরসা করছে তার উপর। শত মাইল মরুভূমি পাড়ি দিয়ে এসেছে, তারপরও আশা করছে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেবে তাদেরকে। কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, কে জানে, ওরা হয়তো রন্দেভু থেকে এক শ' মাইল দূরে কোনও পয়েন্টে পৌঁচেছে!

'ওই যে!' চেঁচিয়ে উঠল ডাল, আঙুল তাক করেছে বহু দূরে। চোখ সরু করে আঁধারের দিকে চেয়ে রইল উফোর্ড। সাগর উপকূলে লাল বলের মত কী যেন একটা ঝুলছে। বাতিটা মাত্র এক সেকেণ্ড দেখা গেল, তারপর হারিয়ে গেল।

কোনও লোক সাগর-সমতলে তিন মাইলের বেশি দেখবে না, কিন্তু টিলার উপর উফোর্ডের দৃষ্টিসীমা দু' পাশে বেড়েছে সাড়ে আঠারো মাইল। তা ছাড়া, অনেক উপরে উঠেছে জ্বলজ্বলে ফ্লেয়ার। উফোর্ড আন্দাজ করল, উপকূলে রন্দেভুর জায়গা এখান থেকে বড়জোর বিশ মাইল দূরে। গর্ব হলো তার। ধূ-ধূ মরুভূমি ও ঢিবির রাজ্য পাড়ি দিয়ে প্রায় সঠিক জায়গাতেই পৌঁছে গেছে! কেউ বলতে পারবে না ভাল ন্যাভিগেশন করেনি সে!

ভীষণ কষ্টকর আটচল্লিশটা ঘণ্টা পার করেছে তারা, বহু পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে এখানে। বারবার মনে হয়েছে, এবার মরতেই হবে। কিছুক্ষণ পর আবারও জড় হলো দলটি। কারও বুঝতে

দেরি হলো না, সময় হয়েছে কষ্ট ফুরাবার। বদলে পেতে চলেছে বিপুল সম্পদ। আর মাত্র কয়েক মাইল যেতে হবে, তা হলেই মহাবিপদ থেকে সরে যেতে পারবে।

বালির অসংখ্য ঢিবি মরুঝড় থেকে আড়াল দিয়েছিল সৈকতকে, কিন্তু এখন প্রচুর বালি গিয়ে পড়ছে অগভীর পানিতে। একটু আগে ঢেউয়ের ফেনা ছিল সাদা, কিন্তু এখন হয়ে উঠছে কাদাটে। শত শত টন বালি পড়ছে সাগরের পানিতে, আগের চেয়ে অনেক ধীরে দুলছে ঢেউ, শ্লথ ভাবে লুটিয়ে পড়ছে তীরে।

মাঝরাতে ছোট একটা জাহাজের আলো দেখল ওরা, ওটা তীর থেকে বড়জোর এক শ' গজ দূরে। পেটা লোহা দিয়ে তৈরি খোল, ইঞ্জিন চলে কয়লার আগুনে। মালবাহী জাহাজ, দৈর্ঘ্যে মাত্র দুই শ' ফুট। সুপারস্ট্রাকচার বেশ পিছনে। মাত্র একটা চিমনি। সামনের দিকে চারটে হ্যাচ আড়াল দিয়েছে হোল্ডকে। দুটো লম্বা ও সরু ডেরিক দাঁড়িয়ে রয়েছে। বালিঝড় বয়ে চলেছে জাহাজের উপর দিয়ে। উফোর্ড নিশ্চিত নয় ওটার বয়লারে এখনও আগুন জ্বলছে কি না। বেশিরভাগ সময় বালির পর্দার আড়ালে থাকছে চাঁদ, বোঝা যাচ্ছে না চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে কি না।

স্টিমারের সামনে থামল সবাই, স্যাডলব্যাগ থেকে ছোট একটা ফ্লেয়ার বের করল জিম উফোর্ড। আকাটা হীরা ছাড়া ওটাই একমাত্র জিনিস, যেটা সে ফেলে আসেনি। ম্যাচ ধরিয়ে ফ্লেয়ার জ্বেলে নিল, মাথার উপর তুলে দোলাতে লাগল। সেই সঙ্গে চলল গলা ফাটানো চিৎকার। ঝড়ের শোঁ-শোঁ আওয়াজকে হার মানাতে চাইছে। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে চিৎকার শুরু করল সবাই। মনের ভিতর প্রত্যেকে জানে, খানিক পরই মিলবে নিরাপত্তা।

জাহাজের ফ্লাইং ব্রিজে জ্বলে উঠল সার্চলাইট। ধুলোবালির ভিতর দিয়ে আলো এসে পড়ল সবার উপর। বাতির ভিতর নাচতে শুরু করেছে সবাই, ভয় পেয়ে সরে গেল ঘোড়াগুলো।

কয়েক মুহূর্ত পর একটা ডোরি নামানো হলো জাহাজ থেকে। পেশাদারি দক্ষতায় বৈঠা বেয়ে আসছে দুই নাবিক। কিছুক্ষণের ভিতর তীরের কাছে পৌঁছে গেল নৌকা। তৃতীয় এক লোকও রয়েছে নৌকায়। পানির ধারে চলে এল অভিযাত্রীরা। ঠিক তখনই বালির ভিতর ঘ্যাঁচ করে আটকে গেল নৌকা।

'কে, জিম উফোর্ড নাকি?' একটা মোটা কণ্ঠ বলে উঠল।

'আর কাকে আশা করছ, টিম!'

এইচএমএস চ্যালেঞ্জারের ফার্স্ট অফিসার টিম হেণ্ডারসন, ডোরি থেকে লাফ দিয়ে হাঁটু পানিতে নামল সে। 'আগে কখনও এমন বানোয়াট গল্প শুনিনি। নাকি সত্যিই কাজটা করেছ তুমি, উফোর্ড?'

নিজের স্যাডলব্যাগ তুলে দেখাল গাইড। ঝাঁকি দিল বার কয়েক। তবে দমকা হাওয়ার গর্জনে হীরাখণ্ডের খটাখট আওয়াজ শোনা গেল না। 'যদি না-ই আসতাম, তোমরা সবাই মিলে কাঁদতে যে এত টাকা গচ্চা দিয়েছ। ...কবে এসেছ?'

'পাঁচদিন আগে। প্রতি রাতে সাতটার সময় একটা করে ফ্লেয়ার জ্বেলেছি।'

'তোমার জাহাজের ক্রোনোগ্রাফ ঠিক নেই, এক মিনিট স্লো চলছে।' কাউকে পরিচয় করিয়ে দিল না উফোর্ড। বদলে বলল, 'টিম, পিছন থেকে দেড় শ' হারেরো সেনা আসছে। তাড়াতাড়ি জাহাজ নিয়ে সরে পড়তে হবে।'

পরিশ্রান্ত নাবিকদের নির্দেশ দিতে শুরু করল টিম হেণ্ডারসন, তারপর অভিযাত্রীদের উদ্দেশে বলল, 'আপাতত সৈকত থেকে সরতে পারব না।'

তার নোংরা ইউনিফর্ম জ্যাকেটের আস্তিন ধরল উফোর্ড। 'কেন, কী হয়েছে?'

'জোর ভাটা, তার উপর জাহাজের খোল আটকে গেছে বালির

চড়ায়। এদিকের তীরে বালির বাঁধ খুব বিপজ্জনক। তবে পরের জোয়ারে বেরিয়ে যাব সাগরে। বেশি ভেবো না।'

'একটা কথা,' নৌকায় উঠল না উফোর্ড, 'তোমার সঙ্গে পিস্তল আছে?'

'কী? কেন?'

কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে চাইল গাইড। ওখানে জড় হয়েছে ভীত ঘোড়াগুলো। আরও বাড়ছে বালিঝড়।

'যতটুকু মনে পড়ে ক্যাপ্টেনের কাছে পুরনো একটা ওয়েবলি আছে,' বলল টিম হেণ্ডারসন।

'তুমি ওটা এনে দিলে খুব খুশি হব।'

'ঘোড়ার জন্য সময় নষ্ট করার দরকার কী?' আয়াস করে ডোরিতে উঠে বসেছে মার্ল গাল্ট।

'ওরা না থাকলে সবাইকে মরতে হতো। চাই না অভিশপ্ত সৈকতে ধীরে ধীরে কষ্ট পেয়ে মরুক।'

'আমি এনে দেব পিস্তল,' কথা দিল টিম হেণ্ডারসন।

ধাক্কা দিয়ে নৌকা ভাসিয়ে দিল উফোর্ড, ঘোড়াগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল। কানের কাছে আদুরে গলায় গল্প শোনাতে লাগল, মাথা ও ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিল।

পনেরো মিনিট পর ফিরল টিম হেণ্ডারসন, নীরবে বাড়িয়ে দিল পিস্তল।

এক মিনিট পর ক্লান্ত ভঙ্গিতে নৌকায় উঠল উফোর্ড, পাথরের মত মুখ করে বসে রইল। বৈঠা মেরে ওকে জাহাজের দিকে নিয়ে চলল হেণ্ডারসন।

ওয়ার্ডরুমে সবাইকে পেল উফোর্ড। তারা ব্যস্ত হয়ে প্লেট ভরা খাবার সাবাড় করছে, চোঁ-চোঁ করে মেটাচ্ছে পিপাসা। এরইমধ্যে সবজেটে হয়ে উঠেছে চেহারা। তাদের পাশেই বসল উফোর্ড, সাবধানে পানিতে চুমুক দিতে লাগল। আগেই অফিসারদের মেসে

খাওয়া শেষ হয়েছে, তবে রয়ে গেছে স্টু। এক চামচ মুখে নিল উফোর্ড। তখনই ছোট্ট কামরার ভিতর ঢুকলেন ক্যাপ্টেন জোসেফ নাই, সঙ্গে ফার্স্ট মেট টিম হেণ্ডারসন ও জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার।

'শুনেছি নয়টা জান বিড়ালের, তোমার তো দেখছি আরও বেশি, উফোর্ড,' বললেন ক্যাপ্টেন। বিশাল আকৃতির লোক তিনি, দেখতে সাদা ভালুকের মত। সারাদেহ ভরা ঘন রোম, বুক পর্যন্ত কুচকুচে কালো দাড়ি। 'অন্য কেউ বললে এককথায় তাকে মানা করে দিতাম।'

দু'জনই হাসছে, আন্তরিক ভাবে করমর্দন করল। 'তুমি যত টাকা দাবি করেছ, জানতাম নরকের আগুন নিভে গেলেও গ্যাঁট মেরে এখানে অপেক্ষা করবে।'

'কই, এখনও তো একটা পয়সাও ছাড়লে না!' ডান ভুরু কপালে তুললেন ক্যাপ্টেন নাই।

টেবিল থেকে মেঝেতে স্যাডলব্যাগ নামাল উফোর্ড, বাকল খুলতে লাগল। ঝুঁকে এল জাহাজের ক্রুরা, চোখে জ্বলজ্বলে লোভ। ফ্ল্যাপ খুলল উফোর্ড, ব্যাগের ভিতর মুঠো ভরে কী যেন খুঁজছে। কয়েক মুহূর্ত পর পছন্দমত জিনিস পেয়ে বের করে আনল হাত, টেবিলের উপর রাখল পাথরটা। হাঁ হয়ে গেল ক্রুরা। ওয়ার্ডরুমের ছাত থেকে ঝুলছে দুটো লণ্ঠন, সেই ম্লান হলুদ আলোয় নিতান্তই সাদামাটা একটা পাথর! কিন্তু চেনে ওরা আসলে ওটা অত্যন্ত দামি এক মস্ত হীরকখণ্ড।

'এতেই তোমার খরচ উঠে যাবে,' বলল উফোর্ড।

'বাড়তিও থাকবে,' মাথা দোলালেন ক্যাপ্টেন নাই। ভক্তির সঙ্গে এই প্রথম স্পর্শ করলেন পাথরটা।

ভোর ছয়টা। বদ্ধ কেবিনের ভিতর ঘুটঘুটে আঁধার। কাঁধে ধাক্কা দিল রুক্ষ একটা হাত, অর্ধসচেতন হলো জিম উফোর্ড। আবার

পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়তে চাইল। আবছা ভাবে ভাবল, টিম হেণ্ডারসনের ডিউটি এত তাড়াতাড়ি শেষ? এখনই বাঙ্ক ছেড়ে দিতে হবে?

'জিম উফোর্ড, জলদি ওঠো!'

'ওফ্! কেন, কী হয়েছে?' চোখ খুলল না উফোর্ড।

'শিগ্‌গির ওঠো!'

তিক্ত স্বরে বলা হয়েছে। টিম হেণ্ডারসনেরই গলা।

ধড়মড় করে উঠে বসল জিম উফোর্ড। পায়ের কাছে পোশাক হাতড়ে নিল। ঝুরঝুর করে বালি পড়ছে প্যান্ট থেকে। 'কী হয়েছে?'

'নিজের চোখকে বিশ্বাস করবে না!'

দ্রুত প্যান্ট পরল উফোর্ড, কাঁধে চড়িয়ে নিল শার্ট। টের পেয়েছে, বাইরে বইছে তুমুল ঝড়। হিংস্র জানোয়ারের মত গোঁ-গোঁ গর্জন ছাড়ছে জোরালো হাওয়া, খুবলে তুলতে চাইছে জাহাজের মাংস। প্রবল হাওয়ার তোড়ে থরথর করে কাঁপছে লোহার জলযান। উফোর্ডকে পথ দেখিয়ে ব্রিজে নিয়ে এল হেণ্ডারসন। উইণ্ডস্ক্রিন দিয়ে আসছে মরাটে ধূসর আলো, চ্যালেঞ্জারের বো দেখা গেল না। অথচ মাত্র দেড় শ' ফুট দূরে ওটা। এক পলকে উফোর্ড বুঝল, মূল সমস্যা কোথায়। ফ্রেইটারের ডেকে পড়েছে শত শত টন বালি। এখন ভরা জোয়ার, কিন্তু ডেকের বালির বিপুল ওজন জাহাজের খোলকে গেঁথে দিয়েছে সাগর-তলে। অন্য কারণে ভড়কে গেল জিম উফোর্ড। গতরাতে তীর ছিল এক শ' গজ দূরে, কিন্তু এখন পঞ্চাশ গজ এগিয়ে এসেছে!

হাজার কোটি বছর ধরে চলছে কালাহারি মরুভূমি ও আটলান্টিক মহাসাগরের এই দ্বন্দ্ব। উভয়েই চাইছে নিজ এলাকা বাড়িয়ে নেবে। একপক্ষের রয়েছে বিপুল পরিমাণ বালি, অন্য

পক্ষের বিশাল জলরাশি আর ঢেউ। প্রতিনিয়ত বদলে চলেছে আফ্রিকার উপকূল। পৃথিবীর শুরু থেকেই পাল্টে যাচ্ছে সাগরের স্রোত, নিয়মিত আসছে জোয়ার-ভাটা, কিন্তু ক্রমশ এক ফুট এক ফুট করে সামনে বাড়ছে কালাহারি মরুভূমি। এমনও হয়েছে, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টায় সামনে বেড়েছে এক মাইল। দুই দানবীয় পক্ষের কোনও খেয়ালই নেই মাঝে পড়ে কেমন হিমশিম খাচ্ছে ছোট্ট জাহাজটা।

'প্রত্যেককে লাগবে এখন, কোদাল দিয়ে বালি ফেলতে হবে,' বললেন ক্যাপ্টেন নাই। কালো হয়ে গেছে মুখ। 'ঝড় যদি না থামে, সন্ধ্যার আগেই জাহাজ আটকা পড়বে মরুভূমির ভেতর।'

হেণ্ডারসন ও উফোর্ড গিয়ে ঘুম থেকে ডেকে তুলল ক্রুদেরকে, তাড়িয়ে নিয়ে এল উপরে। ইঞ্জিনরুম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে কোদাল ও কিচেনের প্যান। ক্যাপ্টেনের বাথরুমের বালতিও বাদ পড়েনি। সব নিয়ে ঝড়ের ভিতর বেরুল সবাই। শোঁ-শোঁ হাওয়া উড়িয়ে নিতে চাইল ওদের। রুমাল দিয়ে বেঁধে নিয়েছে নাক-মুখ। এতই জোরালো হাওয়া বইছে, কেউ কারও কথা শুনতে পেল না। ব্যস্ত হয়ে ডেক থেকে বালি ফেলতে লাগল। কপালকে দোষ দিয়ে চলেছে। এক কোদাল বালি ফেলতে না ফেলতেই প্রবল হাওয়া সবটুকু মুখের উপর এনে ফেলছে। বালির পুরু চাদর উড়ছে চারপাশে। ডেকের উপর দেখতে দেখতেই বাড়ছে ঢিবি।

এ যেন ভয়ঙ্কর শক্তিশালী এক জোয়ার, একে ঠেকানো যায় না। ওরা হয়তো একটা হ্যাচ পরিষ্কার করছে, কাজ শেষ হতে না হতেই টের পাচ্ছে, অন্য তিন হ্যাচ চাপা পড়েছে চার ফুট বালির চাপড়ার নীচে। পাঁচ অভিযাত্রী ও বিশজন ক্রু হতক্লান্ত হয়ে পড়ছে। সামনে তিন ফুটের বেশি দৃষ্টি চলে না। অন্ধের মত কাজ করে যাচ্ছে সবাই। শক্ত করে বুজে রেখেছে চোখ। শরীরে তীক্ষ্ণ পিনের মত বিঁধছে বালিকণা ও কাঁকর। মহা আক্রোশে অসহায়

জাহাজটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে খ্যাপা মরুঝড়।

একঘণ্টা বদ্ধ পাগলের মত কাজ করল সবাই, তারপর টিম হেণ্ডারসনের খোঁজে গেল জিম উফোর্ড। ব্রিজে ঢুকে বলল, 'এভাবে অযথা শক্তিক্ষয় করে কোনও লাভ নেই। ঝড় কমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।' টিম হেণ্ডারসনের কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে কথা বলেছে সে। ভয়ঙ্কর ঝড়ের কারণে একই কথা তৃতীয়বার বলতে হলো।

'ঠিকই বলেছ,' চেঁচাল ফার্স্ট মেট।

ঝড়ের ভিতর বেরুল তারা, সবাইকে ফিরিয়ে আনবে।

পাঁচ মিনিট পর টলতে টলতে সুপারস্ট্রাকচারের ভিতর এসে ঢুকল ক্রুরা, প্রতি পদক্ষেপে জামা-কাপড় থেকে ঝুর-ঝুর করে পড়ছে বালি। সবার পিছনে এল উফোর্ড ও গাল্ট।

গাইডের দায়িত্ব কেউ আসতে বাদ পড়েছে কি না, তা দেখা।

তুমুল ঝড়ের ভিতর কমপ্যানিয়নওয়েতে কারও কণ্ঠ শোনা কঠিন হয়ে উঠেছে।

'হায়, যিশু! এই অভিশপ্ত ঝড় থামিয়ে দিন, ঈশ্বর!' চেঁচিয়ে উঠল জ্যাক ডাল, ভয় পেয়ে ফোঁপাতে শুরু করেছে।

'সবাই ফিরতে পেরেছে?' জানতে চাইল হেণ্ডারসন।

'মনে তো হয়,' একটা বাল্‌কহেডে হেলান দিয়ে দাঁড়াল উফোর্ড। 'তুমি মাথা গুণে দেখোনি?'

নিজের ক্রুদের গুণতে শুরু করল টিম হেণ্ডারসন। এমন সময় হ্যাচওয়ের উপর জোরালো করাঘাত হলো।

'আয়-হায়, এই ঝড়ে বাইরে কে!' একজন বলে উঠল।

হ্যাচের সবচেয়ে কাছে রয়েছে মার্ল গাল্ট, সে খুলে দিল ছিটকিনি। তুমুল হাওয়ায় দড়াম করে খুলে গেল কবাট। মেঘের মত ঢুকল বালিকণা, দেয়াল থেকে ঘষে তুলল সাদা রং। দরজায় কেউ নেই, বোধহয় খোলা কোনও ইকুইপমেণ্ট আছড়ে পড়েছে।

টলতে টলতে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে চাইল মার্ল গাল্ট। প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে কবাট, এমন সময় দীর্ঘ রুপালি একটা ফলা তার পিঠ ভেদ করে বেরিয়ে এল! বর্শার ডগা থেকে টপটপ করে পড়ছে তাজা রক্ত! পরক্ষণে এক টানে ক্ষত থেকে বের করে নেয়া হলো ফলা। ছিটকে বেরুল রক্ত। চমকে গেছে সবাই। চরকির মত ঘুরেই ধুপ করে ডেকের উপর পড়ল জুয়াড়ী। মস্ত হাঁ করে নিঃশব্দে কী যেন বলতে চাইল। শার্ট ভরে উঠেছে লাল রঙে। ঘরে এসে ঢুকেছে কুচকুচে কালো এক লোক। মাথায় গোঁজা পাখির পালক, কোমরে এক টুকরো কাপড়। হাতে বর্শা নিয়ে জুয়াড়ীর পাশে থেমেছে সে। পিছনে আরও অনেক লোক, তেড়ে আসছে! ঝড়ের উপর দিয়ে শোনা গেল ওদের ভয়াল হুঙ্কার!

'হারেরো ইমপি!' প্রলাপের মত করে বলল জিম উফোর্ড।

ঝড়ের মতই এল হারেরো রাজার সেনারা।

ওই প্রবল ঝড় ছিল দামাল প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল। প্রায় প্রতি শতাব্দিতে এমনি করেই খেলে সে। এবারের তুমুল ঝড় চলেছে দশ দিন ধরে, পাল্টে দিয়েছে আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল। বিশাল সব বালির ঢিবি সমান করে দিয়েছে, তৈরি করেছে অন্য কোথাও নতুন বালির টিলা। আগে যেখানে ছিল উপসাগর, সেখানে রয়েছে বালির বিশাল পেনিনসুলা— আঙুল বাড়িয়ে রেখেছে দক্ষিণ আটলান্টিকের শীতল জলের উপর। আফ্রিকা কোথাও কোথাও এগিয়ে গেছে পাঁচ থেকে দশ মাইল। পুরনো শত্রুকে এবার হারিয়ে দিয়ে জিতেছে কালাহারি মরুভূমি। কেউ যদি আফ্রিকার উপকূলের মানচিত্র নতুন করে আঁকতে চায়, তাকে শত শত মাইল বদলে নিতে হবে। কিন্তু কেউ তা করবে না, দক্ষ নাবিক জানে, জাহাজ সরিয়ে রাখতে হবে ওই উপকূল থেকে।

এর কিছুদিন পর এইচএমএস চ্যালেঞ্জার ও ওটার নাবিকদের

বিষয়ে অফিশিয়াল রিপোর্ট প্রকাশিত হলো: *সবই হারিয়ে গেছে আটলান্টিক মহাসাগরে।*

তাদের খুব ভুল হয়নি। তবে ওই জাহাজ শত শত ফুট পানির নীচে নেই, রয়েছে কালাহারির এক শ' ফুট তলে! বরফ-ঠাণ্ডা বেঙ্গুয়েলা স্রোত যেখানে অবিরত আছড়ে পড়ছে আফ্রিকার স্কেলিটন কোস্টে। সেখান থেকে আট মাইল ভিতরে রয়েছে এইচএমএস চ্যালেঞ্জার।

দুই

বর্তমান সময়।

আসিফ হায়দার চৌধুরি-নিকোলাস ক্রিস্টোফার ল্যাবোরেটরিজ।

জেনেভা, সুইটযারল্যাণ্ড।

যেভাবে মরা জানোয়ারের উপর হামলে পড়ে ক্ষুধার্ত শকুন, তেমনি করে মাইক্রোস্কোপের উপর ঝুঁকে পড়েছে ক্যারেন কুম্বস্— অতি মনোযোগ দিয়ে দেখছে স্লাইড। সে যেন কোনও গ্রিক মিথোলজির দেবী, জগৎ ভরা অসহায় মানুষের ছুটোছুটি দেখে আমোদ পাচ্ছে। এক অর্থে ওকে দেবীই বলা যায়। ওই স্লাইডে রয়েছে ওর নিজের তৈরি ইঞ্জিনিয়ার্ড অর্গানিজম। অনেক খাটনি দিয়ে ওটাকে প্রাণ দিয়েছে ক্যারেন।

একঘণ্টার বেশি পেরুল, মাইক্রোস্কোপের আই পিস থেকে চোখ সরায়নি সে। স্লাইডে যা দেখছে, তাতে ক্রমেই হয়ে উঠছে

আত্মবিশ্বাসী।

এত কম সময়ে এমন সফল পরীক্ষা, সত্যিই বিস্মিত হওয়ার মত!

অবশ্য আরও কিছু পরীক্ষা চাই, নইলে ত্রুটি থেকে যেতে পারে কাজে। এ মুহূর্তে সায়েন্টিফিক প্রিন্সিপ্‌ল্ মানল না ক্যারেন, ওর মন বলছে, সব ঠিক পথেই চলছে। স্কোপ থেকে সরিয়ে নিল স্লাইড, পাশের ওঅর্কবেঞ্চের উপর রাখল। বিশাল কামরার পিছন-দেয়ালে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কুলার, ওখানে চলে গেল, প্রকাণ্ড দরজা খুলে বের করে নিল এক গ্যালনের জগ। ভিতরে আরও কয়েকটি জগ রেখেছে সে। প্রতিটির তাপমাত্রা ঠিক আটষট্টি ডিগ্রি ফারেনহাইট।

সঠিক নিয়ম মেনেই তোলা হয়েছে পানি, একদিন পেরুনোর আগেই বিমানে করে পৌঁছে দেয়া হয়েছে গবেষণাগারে। এই এক্সপেরিমেন্টে অত্যন্ত দামি হয়ে উঠছে সাধারণ তাজা পানি। ওর তৈরি প্রাণীর ডিটেইল্ড জিন সিকিউয়েন্স বের করতেও এত খরচ হয়নি।

জগের মুখ খুলল ক্যারেন, নাকের কাছে নিয়ে শুঁকে দেখল। সাগরের পানি, কেমন একটু নোনা গন্ধ। জগের ভিতর ড্রপার নামিয়ে দিল, সামান্য পানি নিয়ে ফেলল স্লাইডের উপর। জগ নিয়ে ফিরে এল ওঅর্কবেঞ্চের পাশে। মাইক্রোস্কোপের নীচে রাখল স্লাইড, দেখছে অতি ক্ষুদ্র প্রাণীগুলোকে। মাত্র কয়েক মিলিলিটার পানিতে অজস্র যুপ্লাংকটন ও ডায়াটম। এককোষী এসব জীব সাগরের ফুড চেইনের প্রথম ধাপ।

গত পরীক্ষায় যেসব মাইক্রোস্কোপিক প্রাণী ও গাছ দেখেছে, সব সরিয়ে রেখেছে আগেই। এখন যেগুলো দেখছে কোনওটা জেনেটিকালি মডিফায়েড নয়।

কিছুক্ষণ পর সন্তুষ্ট হলো ক্যারেন। যাক, ট্র্যান্সপোর্টেশনের

সময় পানির স্যাম্পল সামান্যতমও নষ্ট হয়নি। বিকারের ভিতর আরও একটু পানি দিয়েছে। চোখের সামনে তুলে ধরল বিকার। ওদিক থেকে আসছে ফ্লুরোসেন্ট বাতির আলো, সে-কারণে চকচক করছে বড় ডায়াটমগুলো। ক্যারেন কুম্বস্ কাজে এতই মগ্ন, শুনতে পেল না খুলে গেছে ল্যাবোরেটরির দরজা। ভাবেইনি কেউ বিরক্ত করবে।

'ওটার ভিতর কী?' ভরাট কণ্ঠ শুনে ভড়কে গেল ক্যারেন, আরেকটু হলে ফেলে দিত বিকার।

'ওহ্, ডক্টর চৌধুরি!' নিজেকে সামলে নিতে চাইল ক্যারেন। 'বুঝতে পারিনি আপনি এসেছেন।'

'এই কোম্পানির সবাইকে বলেছি, আমাকে ডক্টর বলতে হবে না। তুমি আমাকে আসিফ বলেই ডেকো।'

সামান্য ভুরু কুঁচকাল ক্যারেন। ডক্টর আসিফ হায়দার চৌধুরিকে দেখে মন্দ লোক বলে মনে হয় না। সবার সঙ্গে নরম স্বরে কথা বলে, কেউ কখনও দেখেনি সে রেগে উঠেছে। আর সে কারণেই সন্দেহ হয়, এ লোকের ভয়ঙ্কর একটা উল্টো রূপ থাকতেও পারে। আসিফ হায়দার চৌধুরি-নিকোলাস ক্রিস্টোফার ল্যাবোরেটরিজে ক্যারেনের মত যেসব কর্মী রয়েছে, তারা ডক্টরেট পাওয়ার জন্য কাজ করলে তাদের প্রতি বাড়তি মনোযোগ দেয় আসিফ হায়দার চৌধুরি। লোকটার বয়স ঊনচল্লিশ। অবিবাহিত। নিয়মিত ব্যায়াম করে সুঠাম দেহ ধরে রেখেছে। সারা বছর স্কিইং করে। সুইস আল্পস্-এ গ্রীষ্ম এলে চলে যায় দক্ষিণ আমেরিকায়। পোশাক-আশাকে মার্জিত, কথা বলে খুব গুছিয়ে। কিছুদিন আগে মুখে প্লাস্টিক সার্জারি করেছে। ফেস লিফটের কারণে টানটান থাকে ত্বক। কেমিস্ট্রির ডক্টরেট, কিন্তু বহুদিন হলো ছেড়ে দিয়েছে ল্যাব ওঅর্ক। নিজে কাজ না করে সময়টা ব্যয় করে সবার উপর নজর রাখার কাজে। এই কোম্পানির

পিছনে প্রচুর সময় দেয়। বিশেষ করে তার বন্ধু, এক্স-পার্টনার নিকোলাস ক্রিস্টোফার কোম্পানি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে।

'ক' মাস আগে বলেছিলে কী যেন এক্সপেরিমেন্ট করবে, এটাই তোমার সেই ফ্লোকিউলেন্ট প্রজেক্ট?' ক্যারেনের হাত থেকে বিকার নিল ডক্টর চৌধুরি, কাঁচের ভিতর দিয়ে ডায়াটমগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

লোকটাকে ল্যাব থেকে বিদায় করতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু মিথ্যা খুব একটা আসে না ক্যারেনের, কাজেই বলল, 'হ্যাঁ, ডক্টর... আই মিন আসিফ।'

'তুমি যখন এই ইন্টারেস্টিং আইডিয়া নিয়ে এলে, আমি ভেবে পাইনি এটা দিয়ে কী করবে,' মন্তব্য করল ডক্টর চৌধুরি। বিকার ফিরিয়ে দিল। 'যাই হোক, আমাদের কাজই তো নানান এক্সপেরিমেন্ট করা। বিশেষ কোনও ভাবনা নিয়ে এগিয়ে চলি আমরা, চেষ্টা করি কোথাও গিয়ে পৌঁছুতে পারি কি না। ...তোমার এই প্রজেক্ট ঠিক মত চলছে?'

'এখন পর্যন্ত তা-ই মনে হচ্ছে,' বলল ক্যারেন। বস ভদ্র ভাবেই আলাপ করছে, কিন্তু তার উপস্থিতিতে মন ছোট হচ্ছে। সত্যি বলতে, বেশিরভাগ লোকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মন খারাপ হয় ওর। এটা বোধহয় কোনও বাজে মানসিক রোগ। শুধু বস নন, যে বাড়িওয়ালী বুড়ির কাছ থেকে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছে, বা সকালে যার ক্যাফে থেকে কফি কেনে, এদের সবাইকে দেখলে মনে হয়, এরা ওর পিছনে সবসময় যা-তা বলছে। 'এখন একটা আনসায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম।'

'গুড! তোমার সঙ্গে আমিও দেখব। কাজ শুরু করো।'

ক্যারেনের হাত কাঁপতে শুরু করেছে, সাবধানে স্ট্যাণ্ডের উপর রেখে দিল বিকার। প্রথম স্লাইড আবার নিল, ওটার ভিতর রয়েছে ইঞ্জিনিয়ার্ড ফাইটোপ্ল্যাংকটন। ড্রপার দিয়ে পানিটুকু টেনে নিল

সে, সব রাখল বিকারের ভিতর।

'তুমি কী নিয়ে কাজ করছিলে, ভুলে গেছি,' মেয়েটির কাঁধের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ডক্টর চৌধুরি। 'আমরা এখন কী দেখতে পাব?'

লোকটা এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কী করতে! ভীষণ অস্বস্তি লাগছে ক্যারেনের। 'আপনি তো জানেন, এসব ডায়াটমের মত ফাইটোপ্ল্যাংকটনের কোষে সিলিকা দিয়ে তৈরি একটিমাত্র দেয়াল আছে। আমি ওই দেয়ালটা গলিয়ে দিতে চাই। সেক্ষেত্রে ভিকুয়োলের ভিতর পাব সেলের ঘন স্যাপ। পানিতে আমার ইঞ্জিনিয়ার্ড স্পেসিমেন স্বাভাবিক ডায়াটমকে আক্রমণ করবে, উন্মত্তের মত নিজের মত সব ডায়াটম তৈরি করবে। এখন যদি সবই ঠিক ভাবে...' মিইয়ে গেল ক্যারেনের কণ্ঠ। আবার বিকারটা তুলে নেবে বলে হাত বাড়াল সে ইনসুলেটেড গ্লাভ্‌সের দিকে। ওটা ছাড়া ধরতেই পারবে না কাঁচ— এত গরম। এবার কাত করে ধরল বিকার, সতর্ক থাকল যেন নীচে না পড়ে পানি। একটু আগের সাদা পানি হয়ে উঠেছে খাবার তেলের মত চটচটে। ল্যাব টেবিলের উপর পানি পড়বার আগেই আবার বিকার রেখে দিল ক্যারেন।

'বাহ্!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ডক্টর চৌধুরি। যেন এইমাত্র জাদু দেখেছে। 'তুমি আঠালো করে দিয়েছ পানিকে।'

'ঠিক তা-ই। গুচ্ছের ভিতর একসঙ্গে আটকা পড়ছে এসব ডায়াটম, আর স্যাপের ভিতর বন্দি হচ্ছে পানি। ...পানি কিন্তু ঠিকই আছে, কিন্তু সাসপেনশনের ভিতর নড়তে পারছে না।'

'অকল্পনীয়! ওয়েল ডান, ক্যারেন, ওয়েল ডান!'

'এখনও পুরো সফলতা আসেনি,' বলল ক্যারেন। 'স্যাপের রিঅ্যাকশন থেকে তৈরি হচ্ছে প্রচণ্ড তাপ। ঠিক ভাবে কাজ করলে এক শ' চল্লিশ ডিগ্রি তাপ তৈরি করবে। সেজন্য বাধ্য হয়ে পুরু

গ্লাভস্ পরতে হয়েছে। এসব ইঞ্জিনিয়ার্ড ডায়াটম থকথকে জেল তৈরি করছে, তবে চব্বিশ ঘণ্টা পর সবই মারা পড়বে, আবারও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে পানি। এই রিঅ্যাকশনের প্রসেস কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আন্দাজ করছি, ওটা কোনও ধরনের কেমিকেল প্রতিক্রিয়া। জানি না একে কীভাবে ঠেকানো যায়।'

'সত্যিই দারুণ জিনিস আবিষ্কার করেছ। ...কিন্তু এ থেকে ঠিক কী আশা করছ? পানিকে আঠালো করে তুললে নিশ্চয়ই কোনও কাজে আসবে? যখন নিকোলাস ক্রিস্টোফার ও আমি অর্গানিক উপায়ে সালফার আটকে ফেললাম, ভেবেছিলাম ওটা দিয়ে পাওয়ার প্লান্টের এমিশন কমাতে পারব। এই প্রজেক্টের পিছনে নিশ্চয়ই তোমার বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য আছে?'

পিটপিট করে চাইল ক্যারেন কুম্বস্। এই লোক এমনি এমনি এত উপরে ওঠেনি। সবকিছুর পিছনে কোনও না কোনও কারণ থাকে, জানতে চাইছে সেটাই। 'আপনি ঠিকই বলেছেন,' বলল ক্যারেন। 'আমি ভেবেছি খনির পুকুরে বা পানি-শোধন প্লান্টে এটা লাগতে পারে। হয়তো ঠেকিয়ে দেয়া যাবে অয়েল স্পিলও।'

'ঠিক বলেছ। ওসব কাজে লাগতে পারে। ...তোমার পারসোনেল ফাইলে দেখেছি, তুমি এসেছ আলাস্কা থেকে।'

'জী, আলাস্কার সিওয়ার্ড থেকে।'

'তুমি বোধহয় এক্সসন ভালদেজের অয়েল স্পিল দেখেছ। তাতে ধ্বংস হয়ে যায় রিফ, সব তেল গিয়ে পড়ে প্রিন্স উইলিয়াম সাউণ্ডে। তখন বোধহয় অর্থনৈতিক কষ্টের ভিতর পড়ে তোমার পরিবার। ওই অয়েল স্পিলে ফতুর হয়ে গিয়েছিল বহু মানুষ।'

বিরক্তি চেপে কাঁধ ঝাঁকাল ক্যারেন। 'আমাদের কিছু হয়নি। আমার বাবা-মা চালাতেন ছোট হোটেল। অয়েল ক্লিনআপ ক্রুরা দক্ষ ছিল, কিন্তু আমার বান্ধবীদের অভিভাবকরা সবই হারান। আমার প্রিয় বন্ধুর বাবা-মা'র ডিভোর্স হয়ে যায়। ক্যানারির চাকরি

হারান ভদ্রলোক।'

মৃদু হাসল ডক্টর। 'জানতাম, এই রিসার্চের পিছনে নিশ্চয়ই তোমার একান্ত ব্যক্তিগত কোনও উদ্দেশ্য আছে।'

মনে মনে রেগে উঠছে ক্যারেন। লোকটা ওকে অপমান করছে? কেমন যেন ছোট করবার ভঙ্গি কণ্ঠে! 'আমার ধারণা, পরিবেশ নিয়ে ভাবে এমন যে-কেউ এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হবে।'

মৃদু হাসল আসিফ হায়দার চৌধুরি। 'নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আমি কী বলতে চেয়েছি? তুমি সেই ক্যান্সার রিসার্চারের মত, যার বাবা-মা মারা গেছেন লিউকিমিয়ায়। বা সেই ফায়ারম্যানের মত, যার বাড়ি ছোটবেলায় পুড়ে ছাই হয়েছে। তুমি কচি বয়সে ভয়ানক একটা দানব দেখেছ, এখন তার বিরুদ্ধে লড়তে চাইছ।' কিছুই বলছে না ক্যারেন কুম্বস। ডক্টর চৌধুরি ধরে নিল ওর মত করেই ভাবছে মেয়েটি। 'শত্রুর উপর প্রতিশোধ নিতে চাইলে, সেজন্য কোনও প্রতিজ্ঞা নিলে, তা খারাপ নয়, ক্যারেন। ক্যান্সার, আগুন, বা ইকোলজিকাল দুঃস্বপ্নের বিরুদ্ধে লড়াই কখনও মন্দ হতে পারে না। এসব ঠেকাতে গিয়ে তোমার মনোযোগ আরও বাড়বে। তুমি শুধু বেতনের জন্য কাজ করছ না। তোমার প্রশংসা না করে পারছি না। আজ রাতে যা দেখলাম, তাতে মনে হয়েছে তুমি সঠিক পথেই যাচ্ছ।'

'আপনাকে ধন্যবাদ,' এ কথা বলতে গিয়ে একটু লজ্জাই পেল ক্যারেন। 'কাজ শেষ করতে এখনও বহু সপ্তাহ বাকি। হয়তো লাগবে বছরের পর বছর। টেস্ট টিউবের ভিতর সামান্য স্যাম্পল মানেই বিশাল কোনও অয়েল স্পিলকে ঠেকিয়ে দেয়া নয়।'

'আমি শুধু বলব, মন দিয়ে কাজ করো। তোমার কাজ তোমাকে যেখানেই নিয়ে যাক, যত সময়ই লাগুক, হাল ছাড়বে না।' ডক্টর আসিফ হায়দার চৌধুরির বদলে অন্য কেউ হলে নিজ পিঠ চাপড়ে দিয়ে মনে মনে হাসত— দিলাম তো ছুঁড়িকে

ফুলিয়ে! কিন্তু অন্তরের গভীর থেকে কথাগুলো বলেছে বাঙালি বিজ্ঞানী।

ডক্টর চৌধুরি ল্যাবোরেটরিতে ঢুকবার পর এই প্রথমবারের মত তার চোখে চোখ রাখল ক্যারেন। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, আসিফ। আপনার কথা শুনবার পর কাজে আরও মনোযোগ দেব।'

'ভবিষ্যৎ তোমার জন্য কী রেখেছে, আমরা জানি না। আমরা যখন সালফার স্ক্রাবারের পেটেন্ট করলাম, পরিবেশবাদী একদল লোক হামলে পড়ল— আমাদের আবিষ্কার যথেষ্ট পলিউশন দূর করে না। দেখা যাক, তুমি আমাদের সুনাম পুনরুদ্ধার করতে পারো কি না।' মৃদু হেসে বিদায় নিয়ে চলে গেল আসিফ হায়দার চৌধুরি।

আবারও কাজে মন দিল ক্যারেন কুম্বস। প্রটেকটিভ গ্লাভস হাতে বিকার নাড়ছে। মাত্র দশ মিনিটে জেনেটিকালি মডিফায়েড ডায়াটমগুলো গদের আঠা হয়ে উঠেছে। ঝাঁকি দিতেই বিকারের পানি গলগলে জেলের মত নীচের দিকে নামল।

মৃতপ্রায় অটার ও সামুদ্রিক পাখিগুলোর সেই করুণ দৃশ্য মনে পড়ে গেছে ক্যারেনের, ছোটবেলায় দেখেছে প্রাণীগুলো কী ভয়ঙ্কর কষ্ট পেয়েই না মরেছে— দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে কাজে মন দিল সে।

তিন

মাতাদির দক্ষিণে, কঙ্গো নদী। গভীর রাত।

পরিত্যক্ত বিশাল প্ল্যান্টেশন এবং কাঠের তিন শ' ফুটি

পিয়ারকে ক্রমশ গ্রাস করছে গহীন অরণ্য। নিশাচর পাখি ও পোকামাকড়ের আওয়াজ ছাড়া কোথাও কোনও শব্দ নেই। নদী-তীর থেকে এক মাইল ভিতর প্ল্যান্টেশনের মূল দালান। দালানের কাঠ সব পচে গেছে, সবই ছেয়ে ফেলেছে ঝোপঝাড়, লতা ও জংলা গাছে। বেশি দিন নেই, ভেঙে পড়বে এই কাঠের ডকও। একটু দূরে মালবোঝাই বুড়ো ঘোড়ার পিঠের মত নুয়ে পড়েছে ধাতব ওয়্যারহাউসের ছাত। করাগেটেড টিনের দেয়ালগুলোর রং জ্বলে গেছে, ভালভাবেই ধরেছে জং। চারপাশে এসে পড়েছে পূর্ণিমা চাঁদের ক্ষীর-সাদা জ্যোৎস্না, কিন্তু এ এলাকা ভীষণ ভুতুড়ে, যেন অশুভ— এখানে নেচে চলেছে একদল অশরীরী প্রেতাত্মা।

পিয়ারের পাশে ভিড়তে শুরু করেছে মস্ত এক ফ্রেইটার। ওটা এতই বড়, খুদে বামন বানিয়ে দিয়েছে বিশালাকৃতি ওয়্যার-হাউসটাকে। ভাটির দিকে বো তাক করে রেখেছে জাহাজ, আপাতত রিভার্সে চলছে ইঞ্জিন। ফ্যানটেইলের নীচে খলখল শব্দে চলেছে নদী। স্রোত ঠেলে সঠিক জায়গায় থাকতে চাইছে ফ্রেইটার। কাজটা খুবই কঠিন, কঙ্গো নদীর উল্টোপাল্টা স্রোত আর জোরালো ভাটা সরিয়ে দিতে চাইছে ওটাকে।

ওয়াকি-টকি ঠোঁটে তুলে আদেশ দিয়ে চলেছে ক্যাপ্টেন, নাটকীয় ভাবে নাড়ছে আরেক হাত। পায়চারি করছে স্টারবোর্ড উইং ব্রিজে। কড়া স্বরে হেলমসম্যান ও ইঞ্জিনিয়ারকে বকে চলেছে: 'হ্যাঁ! আবার কী, বললাম না বামে সরবে!'

পাঁচ শ' ষাট ফুটি ফ্রেইটার সামান্য সরল।

একদল লোক অপেক্ষা করছে ডকে, পরনে কালো ফেটিগ, জুলজুল চোখে দেখছে জাহাজটাকে। একজন ছাড়া সবার সঙ্গে অ্যাসল্ট রাইফেল। যে লোকের একে-৪৭ নেই, তার কোমরে মস্ত বড় হোলস্টার। এই আঁধারে পরেছে রে-ব্যান সানগ্লাস। তাকে

দলের নেতা বলেই মনে হচ্ছে। হাতে একটা লিকলিকে চাবুক।

জাহাজের ক্যাপ্টেন বিশাল লোক, মাথায় গ্রিক ফিশারম্যান-ক্যাপ। একের পর এক আদেশ দিয়ে চলেছে। ব্রিজ উইঙে তার পাশে এক লোক। দৈর্ঘ্যে সে ক্যাপ্টেনের চেয়ে এক ইঞ্চি খাটো। কিন্তু ক্ষমতা যেন বেশি। কুচকুচে কালো মণিদুটো সবই দেখছে। প্রতিটি নড়চড়া মাপা।

সমতল থেকে তিনতলা উপরে ব্রিজ, কেউ এদের কথা শুনবে না।

'আপনার কী মনে হয়, স্যর?' জানতে চাইল ক্যাপ্টেন।

ডকে সশস্ত্র সেনাবাহিনী, ক্যাপ্টেনের সঙ্গী লোকটা সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে খেয়াল করছে কীভাবে পিয়ারে ভিড়ছে জাহাজ। 'ওরা অধৈর্য হয়ে উঠছে। ...আর আপনার ওয়াকি-টকির অভিনয় চমৎকার হচ্ছে, আপা।'

যন্ত্রে ব্যাটারি নেই। প্রকাণ্ড হাতের ভিতর খুদে লাগছে ওয়াকি-টকি। একবার ওটা দেখে নিল ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা। এ অপরেশনে মাসুদ রানার পরিবর্তে জাহাজের ক্যাপ্টেনের অভিনয় করছে সে। মোফিজ বিল্লাহ্ কুচকুচে কালো করে দিয়েছে সর্বাঙ্গ। কন্সোলিজ আর্মি অভ রেভোলিউশনের চিফ, টমাস গাধাধার যে লোককে পাঠিয়েছে, জানা কথা, সে কৃষ্ণ বর্ণেরই হবে। সে নিজ বর্ণের কাউকে দেখলে স্বস্তি বোধ করবে, এই ভেবেই কালো ভূত হয়েছে সবাই।

রেলিঙের দিকে চাইল নিশাত। স্থির ভাসছে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস। 'ঠিক আছে,' বলে উঠল। 'এবার সামনে-পিছনের দড়ি ফেলো।'

স্টার্ন ও বো-র হওসহোল দিয়ে মোটা দড়ি নামিয়ে দিল নাবিকরা। মাথা দোলাল সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার। দুই সৈনিক কাঁধে ঝুলিয়ে নিল রাইফেল, জাহাজের দড়ির লুপ পরিয়ে দিল

জং-ধরা বোলার্ডে। উইণ্ডল্যাসগুলো বাড়তি দড়ি টেনে নিল। ফেণ্ডারের কাজ করছে পুরনো ট্রাকের চাকা, মৃদু শব্দে পিয়ারে ভিড়ল জাহাজ। স্টার্নে জোরালো স্রোত ও কাদাটে ফেনা ছিটকে চলেছে। জাহাজটাকে একই জায়গায় আটকে রেখেছে রিভার্স থ্রাস্ট, নইলে বহু আগেই বোলার্ড উপড়ে নিয়ে রওনা হয়ে যেত ভাটিতে।

ফ্রেইটারের স্টেশন, পজিশন, গজিং কারেন্ট, উইণ্ডেজ, রাডার ও ইঞ্জিনের শক্তি দেখে নিতে এক মিনিটও লাগল না মাসুদ রানার। সন্তুষ্ট হয়ে নিশাতের দিকে চাইল। 'ঠিক আছে, আপা, চলুন এবার ব্যবসা শেষ করি।'

জাহাজের মেইন ব্রিজে ঢুকল রানা ও নিশাত। ঘরে জ্বলছে টিমটিমে দুটো লাল বাতি, সে আলোয় আবছাভাবে দেখা গেল, জায়গাটা যেন নরকের কোনও অংশ। সবই নষ্ট ও পুরনো। লিনোলিয়াম মেঝে কখনও মোছা হয় না, ওটা ফাটল ধরা, কোনাগুলো উঠে এসেছে। জানালার ভিতর অংশে প্রচুর ধুলো, বাইরে লবণের নীলচে স্তর। সিলগুলো মৃত পোকার গোরস্থান। বহুদিন ধরেই ইঞ্জিনের ব্রাস টেলিগ্রাফের একটা কাঁটা ভাঙা। পাইলটের হুইলের কিছু স্পোক নেই। এ জাহাজে মনে হয় ন্যাভিগেশনের আধুনিক কোনও যন্ত্র নেই বললেই চলে। ব্রিজের পিছনে রেডিও শ্যাক, সেখানে যে যন্ত্র, তার সাধ্য নেই বারো মাইল দূরে খবর পাঠাবে।

হেলমসম্যানের দিকে চেয়ে মৃদু মাথা দোলাল রানা। জবাবে হাসল যুবক। বয়স তার চব্বিশ, নাম জলিল খান। দক্ষ কমাণ্ডো, জাহাজের মার্কসম্যান সে। বাংলাদেশ আর্মি থেকে অব্যাহতি নিয়ে যোগ দিয়েছে রানা এজেন্সিতে। এরইমধ্যে কয়েকটি মিশনে কাজও করেছে।

ব্রিজ থেকে বেরুল রানা ও নিশাত, কমপ্যানিয়নওয়েতে চলে

এল। ঘোরালো পথে নামতে লাগল ওরা। ছাতে একটু দূরে দূরে ঝুলছে তারের খাঁচা, ভিতরে জ্বলছে নিচু ওয়াটের আলো। আড়াই মিনিট পর মেইন ডেকে নেমে এল ওরা।

এখানে অপেক্ষা করছে সুদর্শন এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবক। একবার দেখলেই বোঝা যায়, খুবই বেপরোয়া মানুষ।

'তুই তৈরি, সোহেল?' জানতে চাইল রানা।

'হুঁ।'

কারও বুঝবার উপায় নেই যুবকের বাম কনুই থেকে হাতের নীচের অংশ যান্ত্রিক। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার সে, রানার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রানার টানেই সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে যোগ দেয় তদানীন্তন পিসিআই-এ, অল্পদিনেই হয়ে ওঠে অন্যতম সেরা এজেন্ট। কিন্তু একটি মিশনে রানাকে বাঁচাতে গিয়ে চলন্ত ট্রেনের চাকার নীচে কাটা পড়ে ওর বামহাত। এরপর তাকে অ্যাকটিভ এজেন্টের কাজ থেকে সরিয়ে বসিয়ে দেয়া হয় ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের দায়িত্ব দিয়ে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বন্দি হন পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। চিফের দায়িত্ব বর্তায় মাসুদ রানার উপর। ওদিকে পিসিআইয়ের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কর্নেল শেখ ফিরে গেছেন পাকিস্তানে। তখনই হেড অফিসে ডেকে নিয়ে ওই গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার চাপিয়ে দেয় রানা সোহেলের উপর। এমনই যোগ্যতার সঙ্গে সে-দায়িত্ব পালন করল সোহেল যে পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফেরার পর সোহেলকে ওই পদেই রেখে দিয়েছেন রাহাত খান, রানা ফিরে গেছে তার পছন্দের অ্যাকটিভ এসপিওনাজে।

দুজনের বন্ধুত্ব অটুট রয়েছে আজও। অফিশিয়াল কাজ করতে করতে যখন হাঁপিয়ে ওঠে সোহেল, খাঁচায় বন্দি বাঘের মত

ছটফট করতে থাকে বিপজ্জনক কাজে ঝাঁপ দেবার জন্যে— তখন ওর মনের অবস্থা ঠিকই টের পান তীক্ষ্ণধী চিফ রাহাত খান, ওকে আটকে না রেখে ছেড়ে দেন কিছুদিনের জন্যে। রানার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে সে-ও রোমাঞ্চকর অভিযানে। এবারও চলে এসেছে ও বসের অনুমতি নিয়ে।

ডেক থেকে অ্যাটাশে কেস তুলে নিল সোহেল আহমেদ। 'মার্সেনারির সেরা বন্ধু হীরা।'

বিড়বিড় করল নিশাত, 'তা-ই নাকি? জানতাম না!'

দু' মাস আগে এই কাজের প্রস্তাব পেয়েছে ভিনসেন্ট গগল। বার কয়েক বৈঠকের পরই বদলে গেছে কঙ্গোলিজ আর্মি অভ রেভোলিউশনের চিফ টমাস গাধাধারের মনোভাব, এখন তার ধারণা, গগলই তার একমাত্র বুজুম ফ্রেণ্ড। সপ্তাহখানেক আগে ঠিক হলো কোথায় ডেলিভারি নেবে সে অস্ত্রগুলো। এই চুক্তি খুব সোজাসাপ্টা: সিকি পাউণ্ড আকাটা হীরা পাবে ভিনসেন্ট গগল, বদলে দেবে পাঁচ শ' একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল, দু' শ' রকেট-প্রপেল্ড গ্রেনেড, এক শ'টি আরপিজি লঞ্চার এবং পঞ্চাশ হাজার ওয়ারসও প্যাক্ট ৭.৬২ এমএম অ্যামিউনিশন। টমাস গাধাধার যেমন জিজ্ঞেস করেনি এত মিলিটারি হার্ডওয়্যার কোথায় পাবে ইতালিয়ান ব্যবসায়ী। তেমনি ভিনসেন্ট গগলও জানতে চায়নি কোথায় পেল গাধাধার এত হীরা। আফ্রিকার এদিকে এসব হীরকখণ্ডকে বলা হয় রক্তাক্ত হীরা। পাহাড়ি খনিতে মজুর ক্রীতদাসদেরকে ভয়ানক কষ্ট করে সংগ্রহ করতে হয় এসব পাথর— নইলে বিপ্লবের অস্ত্র আসবে কোত্থেকে?

টমাস গাধাধারের কঙ্গোলিজ আর্মি অভ রেভোলিউশনে রয়েছে তেরো বছর বয়সী বালক থেকে শুরু করে মাঝ বয়সী সৈনিক, তাদের জন্য দরকার প্রচুর অস্ত্র। এবারের এই শিপমেন্ট পেলেই নড়বড়ে বৈধ সরকারের উপর হামলে পড়বে তারা। এবং

বলা যায় না, হয়তো মুখ থুবড়ে পড়বে কঙ্গোর নাজুক সরকার।

কাঠের ডকে গ্যাংপ্লাঙ্ক নামিয়ে দিয়েছে এক নাবিক, তার দিকে না চেয়েই পিয়ারে নেমে এল নিশাত সুলতানা। বুঝবার উপায় নেই সে মহিলা! ওর পিছু নিয়ে নামল মাসুদ রানা ও সোহেল আহমেদ।

ডকে প্রহরীদের কাছ থেকে সরে এল অফিসার, সামনে এসে খটাস্ করে স্যালিউট দিল ক্যাপ্টেন নিশাতকে। পাল্টা ক্যাপের বিল স্পর্শ করল নিশাত।

'ক্যাপ্টেন রউফ, আমি কঙ্গোলিজ আর্মি অভ রেভোলিউশনের কর্নেল আদি মাধাভ মাধানা,' ফ্রেঞ্চ ও স্থানীয় সুরের মিশেল লোকটার কণ্ঠে। কোনও উত্থান বা পতন নেই, মনে হলো, রোবট কথা বলছে। চোখ থেকে সরায়নি সানগ্লাস। বাম হাতে ঝুলছে লিকলিকে চাবুক।

'কর্নেল,' হাত বাড়িয়ে দিল নিশাত সুলতানা, কিন্তু ওর পাশে চলে এসেছে মাধানার এক এইড। পাশ থেকে সে সার্চ করে দেখল কোনও অস্ত্র আছে কি না।

এবার নিশাতের হাত নিয়ে ঝাঁকিয়ে দিল মাধানা। 'আমাদের সর্বোচ্চ নেতা জেনারেল টমাস গাধাধার বলেছেন, তিনি নিজে আসতে পারেননি, সেজন্য দুঃখিত।'

আজ ক' বছর হলো জঙ্গলের ভিতর গোপন এক বেস থেকে হামলা করছে টমাস গাধাধার। স্থানীয়দের ধারণা, সত্যিই সে স্বয়ং বিষ্ণু। বহুবার তাকে ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে সরকার, একবারও লোকটার আস্তানা খুঁজে পায়নি। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সে, কিন্তু প্রতিবার পাল্টা হামলা করেছে। চোরাগোপ্তা হামলায় এরই মধ্যে মারা পড়েছে কয়েক হাজার রেগুলার সৈনিক।

'আপনারা অস্ত্র এনেছেন,' কোনও প্রশ্ন নয়, স্রেফ মন্তব্য করল কর্নেল মাধানা।

'আমার সহযোগী হীরা পরীক্ষা শেষ করলেই আপনারা অস্ত্র পাবেন,' সোহেলের দিকে হাতের ইশারা করল নিশাত।

'ঠিক যেমন চুক্তি হয়েছে,' বলল মাধানা। 'আসুন।'

ডকের উপর একটা টেবিল। পাশেই পোর্টেবল জেনারেটার চলছে। বৈদ্যুতিক তার উঠেছে টেবিলের ল্যাম্পে। চারপাশে জোরালো আলো ছড়িয়ে পড়ছে লণ্ঠন থেকে। মাধানা চেয়ারে ধপ্ করে বসল, টেবিলের একপাশে নামিয়ে রাখল চাবুক। লোকটার সামনে বাদামি বারল্যাপ ব্যাগ, ফ্রেঞ্চ ফিড কোম্পানির মনোগ্রাম আঁকা। উল্টো দিকের চেয়ারে বসল সোহেল, ব্রিফকেস খুলে কী যেন খুঁজতে শুরু করেছে। পাঁচ সেকেণ্ড পর ইলেক্ট্রনিক স্কেল নিল, সঙ্গে ওজন মাপার যন্ত্র ও প্লাস্টিকের সিলিণ্ডারের ভিতর স্বচ্ছ তরল। এবার বেরুল নোটবুক, পেন্সিল ও ছোট্ট ক্যালকুলেটার। মাধানার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল প্রহরীরা, এবার তাদের ক'জন চলে এল সোহেলের পিছনে। পালাতে চাইলে ঠেকাবে। আরও দু-তিন জন প্রহরী দাঁড়াল এসে রানা ও নিশাতের পিছনে, কর্নেল নির্দেশ দিলেই গুলি চলবে। আজ রাতে যেন বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলছে বাতাসে। আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে পরিবেশ।

ব্যাগের উপর বামহাত রাখল মাধানা, চাইল নিশাত সুলতানার দিকে। 'ক্যাপ্টেন, মনে হয় পারস্পরিক বিশ্বাসের সময় এসেছে। এবার দেখান কোন্ কণ্টেইনারে আমাদের অস্ত্র।'

'চুক্তি করবার সময় কিন্তু এমন কথা হয়নি,' বলল নিশাত। কণ্ঠে উদ্বেগ প্রকাশ পেল।

খেঁক-শেয়ালের মত খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসল মাধানার এইড।

'এইমাত্র যা বললাম,' বলল মাধানা, কণ্ঠে স্পষ্ট শয়তানি, 'পরস্পরের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। এ থেকে বোঝা যাবে আপনাদের মন পরিষ্কার।' ব্যাগের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিল সে, তর্জনী তুলে ইশারা করল। ঘুটঘুটে অন্ধকার থেকে ছুটে এল

বিশজন সৈনিক। হাতের ইশারা করল মাধানা, লোকগুলো আবারও চলে গেল জঙ্গলের ভিতর। 'ওরা চাইলে আপনাদের সবাইকে শেষ করে সমস্ত অস্ত্র কেড়ে নিতে পারে। এ থেকেই প্রমাণ হয় আমাদের সদিচ্ছার কথা।'

সামনে দ্বিতীয় কোনও পথ নেই নিশাতের। মুখ ঘুরিয়ে জাহাজের উদ্দেশে গলা ছাড়ল সে। রেলিঙে দাঁড়িয়ে আছে এক নাবিক, ক্যাপ্টেনের কথা শুনে পাল্টা হাত নাড়ল। কয়েক মুহূর্ত পর গর্জে উঠল ছোট ডিজেল ইঞ্জিন। বিশাল ফ্রেইটারের বো সেকশনে ককিয়ে উঠল তিনটে ডেরিক। জং-ধরা পুলির ভিতর দিয়ে সরতে লাগল পুরু কেবল, কার্গো হোল্ডের ভিতর ওজন নিতে শুরু করেছে ভারী কোনও কিছুর। একটু পর উঠে আসতে লাগল স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজের চল্লিশ ফুটি শিপিং কন্টেইনার। যে-কোনও বন্দরে প্রতিদিন এসব দেখা যায়। হ্যাচের ভিতর দিয়ে ক্রেন বের করে আনল কন্টেইনার, ঝুলিয়ে রাখা হলো ডেকের একটু উপরে। কন্টেইনারের দরজা খুলে ভিতরে উঠে পড়ল দুই খালাসী। তাদের চিৎকার শুনে ক্রেন চালক নতুন করে কন্টেইনার উপরে তুলল, নিয়ে এল রেলিঙের বাইরের দিকে। জাহাজের পাশে ঝুলছে প্রকাণ্ড বাক্স। এবার ডকের আট ফুট উপরে এসে স্থির হলো। আর নামানো হচ্ছে না।

কন্টেইনারের দুই খালাসী ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল, ভিতরের অংশে ফেলেছে তেলতেলে আলো। দেয়ালের পাশের র‍্যাকে ঝুলছে অসংখ্য একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল। আলো গিয়ে পড়ল আরেক দিকে, সেখানে দেখা গেল সবুজ রঙের ক্রেট। একটা ক্রেট খোলা হলো, ভিতর থেকে তুলে নেয়া হলো ফাঁপা আরপিজি টিউব। ওটা তুলে ধরা হলো কাঁধে। যেন ডেমনস্ট্রেশন চলছে। হই-হই করে উঠল তরুণ কয়েকজন সৈনিক। এমন কী কর্নেল আদি মাধাভ মাধানার ঠোঁটের দুই কোনা উপরে উঠল। সামনের ওই দৃশ্য

দেখে হাসি এসে গেছে তারও।

কন্টেইনারের দুই খালাসী লাফ দিয়ে ডকে নামল। ওখানে না থেমে এক দৌড়ে গিয়ে উঠল জাহাজে। 'এবার দেখলেন আমার বিশ্বাসযোগ্যতা,' বলল নিশাত সুলতানা।

কোনও মন্তব্য করল না মাধানা, ব্যাগটা তুলে ভেতরের মাল ঢেলে দিল টেবিলের উপর।

কাটা এবং পালিশ দেয়া হীরা পৃথিবীর সবচেয়ে ঝিকমিকে জিনিস। হীরার উপর সাদা আলো পড়লে ঝলসে ওঠে রামধনুর সাত রং। কিন্তু যখন খনি থেকে হীরা পাওয়া যায়, তা দেখে মনেই হয় না কোনও রত্ন, তার ভিতর তেমন কোনও জৌলুষ থাকে না। পাথরের স্তূপ থেকে সামান্যতম আলোর ঝলকানি দেখা গেল না। বড় হীরাগুলো যেন কমদামি কোনও ক্রিস্টালের চৌকো পিরামিড, নীচের দিকে সাদাটে কীসের যেন আভাস। অন্যগুলো সামান্য সব নুড়ি পাথর। হরেকরকম তাদের আকার। লালচে বা সাদা থেকে শুরু করে হলুদও রয়েছে। কিছু দেখা গেল প্রায় সাদা, অন্যগুলো ফাটল ধরা। তবে রানা বা সোহেল খেয়াল করল, কোনও নুড়ি এক ক্যারেটের নীচে নেই। তার মানেই নিউ ইয়র্ক, তেল আভিভ বা আমস্টারডামের ডায়মণ্ড ডিস্ট্রিক্টে লুফে নেয়া হবে এসব পাথর। মাধানা চাইলে আবারও পাথর পাবে, হয়তো বিক্রিও করতে পারবে, কিন্তু চাইলেই অস্ত্র পাবে না।

সবচেয়ে বড় পাথরটা তুলে নিল সোহেল, ওটার ওজন হবে কমপক্ষে দশ ক্যারেট। কাটা ও পালিশ করার পর থাকবে চার বা পাঁচ ক্যারেটের পাথর, কালার গ্রেড ও স্বচ্ছতার উপর নির্ভর করবে দাম, তার মানেই কমপক্ষে চল্লিশ হাজার ডলার। পাথরের উপর মনোযোগ দিল সোহেল, জুয়েলারদের ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখছে। গম্ভীর, তিক্ত চেহারা, চেপে বসেছে ঠোঁটে ঠোঁট। মনে হচ্ছে, এই লোক জীবনে হাসেনি। পাথরটা দেখা শেষ হতে

পাশে রেখে দিল সোহেল। কোনও মন্তব্য করল না। আরেকটা পাথর তুলে নিয়ে দেখতে শুরু করল। তারপর আরেকটা। বার কয়েক জিভ ও টাকরা দিয়ে বিরক্তির আওয়াজ করল। মনে হলো যা দেখছে, তাতে খুবই হতাশ। এবার শার্টের পকেট থেকে রিডিং গ্লাস নিয়ে বসিয়ে নিল নাকের উপর।

ওকে লক্ষ করছে মাধানা। নোটবুকে কী যেন লিখতে শুরু করেছে সোহেল।

'আপনি কী লিখছেন?' জানতে চাইল মাধানা। হঠাৎ অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। এমন করে কী দেখছে হীরক বিশেষজ্ঞ? আবার লেখে কেন?

'আপনাদের উচিত ছিল এসব পাথরকে হীরা না বলে নুড়ি পাথর বলা,' গম্ভীর স্বরে বলল সোহেল। নাক কুঁচকে রেখেছে। অপমানে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল মাধানা, কিন্তু হাতের ইশারা করে তাকে বসতে বলল সোহেল। 'তবে প্রাথমিক পরীক্ষা থেকে মনে হচ্ছে, আমাদের চুক্তি বাতিল করতে হবে না।'

প্যান্টের পকেট থেকে একটা টোপায বের করল সোহেল, ওটার উপর অংশ খাঁজ কাটা। 'আপনি জানেন,' লেকচারের ভঙ্গিতে বলল, 'পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন জিনিস ডায়মণ্ড। মোহ্'র স্কেলে ওটার মাত্রা দশ। কোয়ার্টয মাত্র সাত মাত্রার, অনেকে মনে করে তারা দেখছে সত্যিকারের হীরা।'

ওই একই পকেট থেকে বেরুল অষ্টকোণের একটি ক্রিস্টাল। এবার টোপাযের উপর সজোরে ক্রিস্টাল নামিয়ে আনল সোহেল। ঠং করে ভেঙে পড়ল ক্রিস্টাল। 'দেখলেন টোপায অনেক কঠিন কোয়ার্টযের চেয়ে, কাজেই টোপাযের কিছুই হলো না। মোহ্'র স্কেলে ওটা আট মাত্রার।' এবার ছোট একটা হীরা নিল সোহেল, ওটা ঘষল টোপাযের উপর। শিউরে উঠবার মত খ্যাশ-খ্যাশ আওয়াজ হলো, কয়েক সেকেণ্ড পর বোঝা গেল নীলচে টোপাযের

উপর তৈরি হয়েছে গভীর কাটা চিহ্ন। 'এখন দেখলেন মোহ্'র স্কেলে আট মাত্রার চেয়ে কঠিন একটা পাথর।'

'তার মানেই হীরা,' সন্তুষ্ট হয়ে বলল মাধানা।

মনে হলো অমনোযোগী ছাত্রের কথায় মহাবিরক্ত হয়েছে জেমোলজিস্ট। 'না, কোরানডাম হচ্ছে মোহ্'র স্কেলে নয় নম্বর মাত্রা। সেটা ধাতু।' হাতের পাথরটা তুলে দেখাল সোহেল। 'আর এই পাথর আসলে হীরা তা বুঝবার একমাত্র উপায়, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি টেস্ট।'

হীরা নিয়ে বহুবার ব্যবসা করেছে মাধানা, ভাল করেই জানে তার মূল্য কত। কিছু বুঝে উঠবার আগেই সোহেল তার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। নিচু স্বরে বলল মাধানা, 'স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কী?'

'পাথরের ওজনের বদলে কত পরিমাণ পানি সরবে, তা দেখতে হবে। হীরার বেলায় সেটা হবে তিন পয়েন্ট পাঁচ দুই।' কয়েক সেকেণ্ড স্কেল নিয়ে নাড়াচাড়া করল সোহেল। ভেলভেটের লাইনিং করা এক কেসের ভিতর রয়েছে ব্রাসের ওই মাপকগুলো। এবার স্কেলে শূন্য আসতেই প্যানের উপর সবচেয়ে বড় হীরাখণ্ড রাখল। 'পয়েন্ট টু টু ফাইভ গ্রাম্স্। অর্থাৎ ইলেভেন অ্যাণ্ড হাফ ক্যারেটস্।' মাত্রা লেখা প্লাস্টিকের সিলিণ্ডার নিল সোহেল, ওটার ভিতর ছেড়ে দিল পাথরটা। মনোযোগ দিয়ে দেখল ওই মণি কতখানি পানি সরিয়ে দিয়েছে। টুকে নিল নোটবুকে। সংখ্যা তুলে নিল ক্যালকুলেটারে। সংখ্যাগুলো এবার দেখে নিয়ে কড়া দৃষ্টিতে চাইল কর্নেল মাধানার দিকে।

বিস্ফারিত হয়েছে কর্নেলের চোখ, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। বোম রাগা রেগেছে। তার সৈনিকরা চেপে এল সোহেলের দিকে। একটা পিস্তলের নলের খোঁচা টের পেল রানা নিজের মেরুদণ্ডে। সোহেল শালা মারবে আমাদের, ভাবল রানা, কে ওকে বলেছে

এত অভিনয় করতে?

সোহেলের কঠোর দৃষ্টি হঠাৎ স্বাভাবিক হয়ে উঠল, মিষ্টি করে হাসল কর্নেলের দিকে চেয়ে। 'থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু। তার মানে, ওটা সত্যিকারের হীরা!'

ট্রিগারের উপর তর্জনী চলে গিয়েছিল আদি মাধানার, এবার হোলস্টারে পিস্তল রেখে আবার চেয়ারে বসে পড়ল।

আরও আট-দশটা পাথর পরীক্ষা করে দেখল সোহেল। প্রতিবার একই ফল হলো।

'আমি আমার চুক্তি পূর্ণ করেছি,' বলল মাধানা, 'এক পাউণ্ডের চার ভাগের এক ভাগ হীরা দিয়েছি অস্ত্রের বিনিময়ে।'

হীরাখণ্ড পরখ করছে সোহেল।

খোলা কণ্টেইনারের দিকে কর্নেলকে নিয়ে গেল নিশাত সুলতানা, হাতের ইশারা করল ফ্রেইটারের এক নাবিককে। আদেশ পৌঁছে গেল ক্রেনের চালকের কাছে। নতুন করে নামছে কণ্টেইনার। কয়েক মুহূর্ত পর ডকের উপর নেমে এল। প্রচণ্ড ওজনে মড়মড় আওয়াজ তুলল কাঠের পিয়ার

নিশাতের সঙ্গে এসেছে মাধানার পাঁচ সৈনিক। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় মাধানা ও তার লোকেরা কয়েকটি র‍্যাক থেকে তুলে নিল দশটি একে-৪৭ রাইফেল ও এক শ' রাউণ্ড অ্যামিউনিশনের বাক্স। ম্যাশেটি দিয়ে মোমের কোট করা কাগজের কার্টন খোলা হলো।

মাধানার সৈনিক উল্টোপাল্টা কিছু করতে পারে, কাজেই সোহেলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে নিশাত। খেয়াল করল, অদক্ষ লোকগুলো একে-৪৭-র কলা আকৃতির ম্যাগাযিনের ভিতর ভরছে চকচকে ব্রাস কার্ট্রিজ।

ঢোলা সুয়েটশার্টের নীচে হালকা ফ্ল্যাক জ্যাকেট পরেছে রানা, নিশাতের মত একই কারণে সোহেলের পাশে থাকল।

প্রতিটি রাইফেল থেকে দশটি গুলি ছোঁড়া হলো। দুইবার তিনটের সেট আর চারবার সিঙ্গেল শট। পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউসের পাশে দাঁড় করানো টার্গেটে গুলিবর্ষণ হয়েছে। চওড়া নদীর ওপাশ থেকে ফিরে এল জোরালো প্রতিধ্বনি। ভয় পেয়ে চিৎকার করে আকাশে উঠল ঘুম ভাঙা একদল পাখি। এক সৈনিক চলে গেল টার্গেটের ক্ষতি দেখতে। ওখান থেকে চিৎকার করে জানাল, গুলি লক্ষ্যভেদ করেছে। নিশাতের দিকে চেয়ে হাসল কর্নেল। 'গুড! ভেরি গুড!'

এদিকে পরীক্ষা চলছে সোহেলের। খালি ব্যাগের ওজন নিয়ে ক্যালকুলেটারে হিসাব কষল। কাজ শেষে মাধানার অফিসারদের সামনে লম্বা হাতলওয়ালা চামচ দিয়ে ব্যাগের ভিতর ভরতে লাগল পাথরগুলো। কাজ শেষে নতুন করে আবারও ব্যাগ মেপে দেখল। কাঁধের উপর দিয়ে রানাকে বলল, 'আট ক্যারেট কম পেলাম রে।'

ওই আট ক্যারেট মানেই কমপক্ষে দশ হাজার ডলার। কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'জান নিয়ে বেরুতে পারলেই যথেষ্ট। সঠিক ক্যারেট না পেলেও চলবে তোর।' নিশাতের উদ্দেশে গলা উঁচু করল রানা। সে মাধানার এক লোকের হাতে আরপিজি দেখছে। লোকটাকে পেশাদার মনে হলো, পদবী হতে পারে সার্জেন্ট। 'ক্যাপ্টেন রউফ, চলুন। এখানে দেরি করলে বোমা বন্দরের কর্তৃপক্ষ আমাদের বার্থ ক্যান্সাল করে দেবে।'

ফিরে চাইল নিশাত। 'ঠিক, মিস্টার গণেশ।' মাধানার দিকে ফিরল সে। 'আরও অস্ত্র দিতে পারলে ভাল হতো, কর্নেল, তবে এবারের শিপমেন্ট আচমকা জোগাড় করতে হয়েছে। পরের বার...'

'আবার যদি আচমকা শিপমেন্ট পান, দেরি না করে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।'

টেবিলের কাছে পৌঁছে গেছে নিশাত, এবার জানতে চাইল,

'আপনি সন্তুষ্ট, মিস্টার সোহেলি?'

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন, সবই ঠিক আছে।'

চতুর হাসি দিল কর্নেল আদি মাধাভ মাধানা। ইচ্ছা করেই চুক্তির চেয়ে কম হীরা দিয়েছে সে। তার সঙ্গে রয়েছে একদল সশস্ত্র সৈনিক, কম হীরা দিলেও বাধ্য হয়েই নেবে অস্ত্র চোরাকারবারীরা। ইউনিফর্ম ব্লাউজের ভিতর বাড়তি হীরা রেখেছে সে। সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টকে আরও ফাঁপিয়ে তুলবে ওটা।

'ঠিক আছে, তা হলে সবাই চলুন,' সোহেলের হাত থেকে ব্যাগ নিল নিশাত। দ্রুত পায়ে গ্যাংপ্লাঙ্কের দিকে হাঁটতে শুরু করল। প্রায় ছুটে চলেছে সে, তাল মিলাতে চাইল রানা ও সোহেল। তবে গ্যাংপ্লাঙ্কের কাছে পৌঁছুনোর আগেই ব্যস্ত হয়ে উঠল কর্নেল মাধানার সৈনিকরা। সবচেয়ে কাছের দুই সৈনিক বাধা দিতে চাইল। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে জঙ্গল থেকে ছুটে এল বেশ কয়েকজন, ভূত-পেত্নীর মত চিৎকার ছাড়ছে। কমপক্ষে বারোজন লোক ঘিরে ফেলল অস্ত্রের কন্টেইনার, ডেরিক থেকে খুলে নিতে চাইছে কার্গো।

আগেই সন্দেহ করেছে, নইলে মস্ত বিপদে পড়ত রানা-সোহেল-নিশাত।

এক সেকেণ্ড পর গলা ছাড়ল মাধানা, নির্দেশ দিল হামলার। ততক্ষণে দৌড়াতে শুরু করেছে মার্ভেল টিম। গ্যাংপ্লাঙ্কের মুখে যে দুই সৈনিক, তাদের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। তখনও তারা তাক করতে পারেনি অস্ত্র। পাশ থেকে তরুণ সৈনিকের কাঁধে গুঁতো দিল নিশাত, ছিটকে ফেলে দিল জাহাজ ও পিয়ারের মাঝখানের পানিতে। অন্যজনের কণ্ঠার উপর ঘুষি বসিয়ে দিয়েছে রানা, লোকটা মস্ত হাঁ করতেই কেড়ে নিল একে-৪৭, পরক্ষণে কুঁদোর গুঁতো পড়ল লোকটার পেটে। ডকের উপর পড়ে বলের মত গোল হয়ে গেল সৈনিক।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল রানা, সোহেল ও নিশাতের জন্য কাভার ফায়ার দিল। দু' সেকেণ্ড পর গ্যাংপ্লাঙ্কে উঠল নিশাত ও সোহেল। পিছন থেকে একটা বুলেট উড়িয়ে নিল নিশাতের ক্যাপ। বেরিয়ে এল দীর্ঘ চুলের বেণীদুটো। ঢালু র‍্যাম্পে উঠেই রেলিঙের নীচে একটা সুইচ টিপে দিল রানা। গ্যাংপ্লাঙ্কের শেষ পাঁচ ফুট উপরের দিকে ছিটকে উঠল। দু'পাশে আগে থেকেই রেলিং ছিল, এবার পিছন দিকটা হয়ে উঠল নব্বুই ডিগ্রি দেয়াল। পিছনের ওই দেয়ালে এসে লাগছে একের পর এক গুলি। রানাদের মাথার উপর দিয়ে ছুটছে বেশির ভাগ বুলেট, ফ্রেইটারের গায়ে লেগে ছিটকে পড়ছে। বদ্ধ অংশে আটকা পড়েছে রানারা।

'এ-ই হবে জানতাম,' গুলির আওয়াজের উপর দিয়ে বলল সোহেল। 'আপা, আমাদের মাল ঠিক আছে তো?'

'সব ঠিক, সোহেল ভাই,' জবাব দিল নিশাত। বুকের কাছে ধরে রেখেছে হীরার ব্যাগ।

জাহাজের এক অপারেটার ডক থেকে তুলে নিল গ্যাংপ্লাঙ্ক, নামিয়ে দিল ডেকের উপর। সুপারস্ট্রাকচারের ভিতর দৌড়ে ঢুকল রানা, সোহেল ও নিশাত। ইন্টারকমের সামনে দৌড় থামাল রানা, বাটন দাবিয়ে জানতে চাইল, 'সিচুয়েশন রিপোর্ট, নবী।'

জাহাজের পেটের ভিতর বিশেষ একটি মনিটরে ফুটে উঠেছে ক্যামেরার দৃশ্য, ওদিক থেকে চোখ না সরিয়েই জানাল নবী, 'গ্যাংপ্লাঙ্ক উঠে এসেছে। তবে এখনও কয়েকজন গুলি করছে। হামলার জন্য দল গুছিয়ে নিচ্ছে মাধানা। সঙ্গে কমপক্ষে এক শ' যোদ্ধা।'

'কন্টেইনারের কী অবস্থা?'

'লাইন প্রায় খুলে ফেলেছে। এক মিনিট, মাসুদ ভাই। হ্যাঁ, পেয়ে গেছে কন্টেইনার। এবার আমরা সরে যেতে পারি।'

'গগলকে বলো ডক থেকে সরতে।'

'মাসুদ ভাই, আমরা কিন্তু এখনও ডকের সঙ্গে বাঁধা,' দ্বিধা নিয়ে বলল নবী।

একটা বুলেট সুপারস্ট্রাকচারে লেগেছে, সঙ্গে নিয়েছে রঙের চল্টা। তারই চোখা এক অংশ লেগেছে রানার গালে। খোঁচা খেয়ে কেটে গেছে গাল। জায়গাটা স্পর্শ করল রানা, আঙুলে দেখতে পেল এক ফোঁটা রক্ত। 'বোলার্ড উপড়ে রওনা হোক।'

পরিত্যক্ত ডকে ভিড়েছে অতি পুরনো চেহারার জাহাজ। কিন্তু বেশির ভাগ লোক জানে না, ওটা অত্যন্ত আধুনিক এক রণতরী। কয়েক রঙের পোচ দেয়া খোল, ডেরিক যেন ভেঙে পড়ছে। ডেক একটা জঙের আড়ত। কিন্তু এসবই মানুষের চোখ ফাঁকি দেয়ার জন্য। কেউ ভাববে না সাগরে পাখির মত উড়তে পারে এই জাহাজ।

খোলের ভিতর রয়েছে দুনিয়ার সেরা ওয়েপন্স সিস্টেম। ঘুষখোর এক আমেরিকান অ্যাডমিরালের কাছ থেকে ক্রুজ মিসাইল ও টর্পেডো কিনে দিয়েছে গগল। এ ছাড়াও রয়েছে .৩০ এমএম গ্যাটলিং গান ও ১২০ এমএম ক্যানন। ওটার টার্গেটিং টেকনোলজি নেয়া হয়েছে এম১এ২ অ্যাব্রাম্‌স্ ট্যাঙ্ক থেকে। আরও রয়েছে চারপাশে সার্ভো কন্ট্রোল্ড .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগান। প্রতিটি অস্ত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছে ডেক-প্লেটের ওপাশে। দূর থেকে চালু করা যায় .৩০ ক্যালিবারের অস্ত্রগুলো। লুকিয়ে রাখা হয়েছে জং ধরা সব ড্রামের ভিতর। নির্দেশ দিলেই খুলে যায় ঢাকনি, অস্ত্রের সঙ্গে তৈরি থাকে লো-লাইট ও ইনফ্রারেড ক্যামেরা।

জাহাজের ব্রিজের ক' তলা নীচে সত্যিকারের অপারেশন্স সেন্টার, ওটাই জলযানের মগজ। ওখান থেকে প্রতিটি অপারেশন পরিচালিত হয়। স্থির করা হয় কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে ইঞ্জিন, ডাইন্যামিক পজিশনিং সিস্টেম বা অস্ত্রগুলো। ওই ঘরে রয়েছে

দুনিয়ার সবচেয়ে দামি রেইডার ও সোনার গিয়ার।

কিছুদিন আগে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর বিশজন সদস্য আর বিসিআইয়ের বেশ কিছু নতুন এজেন্ট যোগ দিয়েছে জাহাজে।

এখন অপারেশন্স সেন্টারে কাজ করছে ভিনসেন্ট গগল। বো'র অথওয়ার্টশিপ ও স্টার্নের থ্রাস্টারগুলো দিয়ে এক ঘণ্টা আগে সে-ই ডকে ভিড়িয়ে দিয়েছে জাহাজটাকে। সাহায্য নেয়া হয়েছে গ্লোবাল পজিশনিঙের। এসব কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে একটি সুপার কমপিউটার। মেশিনটি একইসঙ্গে লক্ষ্য রাখে বাতাসের গতি, স্রোতোধারা ও অন্যান্য অন্তত বিশটি বিষয়ের। আপাতত কঙ্গো নদীর স্রোতের বিরুদ্ধে কাজ করছে মার্ভেলের রিভার্স থ্রাস্ট, ওটাই একই জায়গায় আটকে রেখেছে জাহাজকে।

রানা ও সোহেল ঢুকে পড়ল একটি ইউটিলিটি ক্লজিটে। ভিতর অংশে তারপিনের কড়া গন্ধ। রানাদের সঙ্গে আসেনি নিশাত, চলে গেছে সানজিদা স্বর্ণার সঙ্গে যোগ দিতে। ওদের দায়িত্ব কাউকে জাহাজে উঠতে না দেয়া। বেসিনের কল মুচড়ে দিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে পিছন-দেয়াল সরে গেল। দেখা গেল দীর্ঘ হলওয়ে।

একটু আগে সস্তা লিনোলিয়ামের মেঝে ছিল, কিন্তু সামনের গোপন করিডোরে পারস্যের কার্পেট পেতে রাখা। চারপাশে কমনীয় আলো। দু'পাশের দেয়ালে দামি মেহগনি প্যানেল। এক পাশে দেখা গেল সত্যিকারের উইনস্লোর পেইন্টিং: কাঠের একটি জাহাজ থেকে শিকার করা হচ্ছে তিমি। আরেক দিকে গত ছয় শতকের সব বর্ম ও তলোয়ার। এগুলো জোগাড় করেছেন মার্ভেলের মালিক, গ্রিক টাইকুন চ্যাণ্ড্রো পাপাগোপালা।

এক পাশে বেশ কিছু কেবিন পেরিয়ে গেল রানা ও সোহেল, থামল অপারেশন্স সেন্টারের দরজায়। সুইচ টিপতে সরে গেল

কবাট, ঘরে ঢুকে পড়ল ওরা। নিচু সিলিঙের ঘরটা যেন নাসার মিশন কন্ট্রোল রুম। চারদিকে একের পর এক কমপিউটার কন্সোল। ওগুলো থেকে আসছে নীলচে আলো। সামনের দেয়ালে রয়েছে বিশাল একটি ফ্ল্যাট প্যানেল ডিসপ্লে। ওখানে দেখা যাচ্ছে পিয়ার ও চারদিকের দৃশ্য। সামনের দিকে বসেছে হেলমসম্যান ভিনসেন্ট গগল ও ওয়েপন্স কন্ট্রোলের খোরশেদ নবী। একটু পিছনে জাহাজের কমিউনিকেশন অ্যাণ্ড কমপিউটার স্পেশালিস্ট রায়হান রশিদ। পিছন-দেয়ালে ড্যামেজ কন্ট্রোলারদের মনিটর, দুইজন জাহাজের ইনটিগ্রেটেড সেফটি সিস্টেমের উপর নজর রাখছে। ঘরে আপাতত নেই চিফ ইঞ্জিনিয়ার, তার চেয়ার ফাঁকা।

যার যার চেয়ারে বসে পড়ল রানা-সোহেল, কানে পরে নিল পিন মাইক্রোফোন, চোখ ফেলল কমপিউটারের ডিসপ্লের উপর।

'ও-দুটো কী?' রেইডার স্কোপের সবজেটে আলোয় অদ্ভুত দেখাল রায়হানকে। 'বোধহয় হেলিকপ্টার। মাটি ছুঁয়ে আসছে। ইটিএ চার মিনিট।'

'আগে শুনিনি টমাস গাধাধারের কপ্টার আছে,' সিট থেকে বলল গগল। 'তবে রায়হান একটা বুলেটিন শুনেছিল। এক অয়েল এক্সপ্লোরেশন কোম্পানি থেকে দুটো কপ্টার চুরি হয়েছে। হতে পারে ওই কোম্পানির পাইলটদের হাইজ্যাক করেছে এরা।'

মাথা দোলাল রানা, কোনও মন্তব্য করল না। এখনও জানে না কী ভাবা উচিত।

পার্সোনাল ভিউ স্ক্রিনে স্টার্নের উপরের ক্যামেরা দেখছে গগল। 'আমাদের পিছনে মুভমেন্ট,' বলে উঠল।

পিছনের নদী তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে, সেখান থেকে আসছে দুটো বোট। বাতি জ্বলছে পাইলট হাউসের উপর। বোঝা গেল না সশস্ত্র কি না। ওয়েপন্স স্টেশন থেকে বলে উঠল খোরশেদ নবী, 'ডেটাবেস বলছে ওটা কঙ্গোলিজ মিলিটারি ক্রাফ্‌ট্। আমেরিকার

তৈরি সুইফ্‌ট্‌ বোট।'

'নিশ্চয়ই ঠাট্টা, নবী?' জানতে চাইল সোহেল।

যেন শুনতেই পায়নি নবী: 'ওজন বারো টন। বারোজন ক্রু। ছয়টা ফিফটি ক্যালিবারের মেশিনগান। টপ স্পিড পঁচিশ নট। ডেটাবেস থেকে পড়ছি। বোটে মর্টার যোগ করেছে কঙ্গোলিজ ফোর্স। কাঁধ থেকে ফায়ার হয় এমন মিসাইলও থাকতে পারে।'

প্রতি মুহূর্তে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে। সিদ্ধান্ত নিল রানা: 'রায়হান, স্যামুয়েল আবালার সঙ্গে যোগাযোগ করো।' এই অপারেশনে সরকারের সঙ্গে ওদের কন্ট্যাক্ট ওই ডেপুটি ডিফেন্স মিনিস্টার আবালা। 'তাকে বলবে মিলিটারি বোধহয় হামলা করতে আসছে। তাদের ধারণা নেই, আমরা তাদের পক্ষের লোক। আবার এ-ও হতে পারে, তাদের দুটো সুইফট বোট দখল করে নিয়েছে টমাস গাধাধারের লোক। ...গগল, আমাদেরকে সরিয়ে নাও পিয়ার থেকে। ...নবী, চারপাশে নজর রাখো। কিন্তু কিছু না বলা পর্যন্ত কোনও গুলি ছুঁড়বে না। সত্যিই যদি আমাদের ছদ্মবেশ হারিয়ে যায়, মাধানা বুঝে ফেলবে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে অস্ত্র ফেলে সরে পড়বে। ...ভাল কথা, রায়হান, দেখো তো ওগুলো কাজ করছে কি না।'

কি বোর্ড টিপতে শুরু করেছে কম্পিউটার উইযার্ড। 'আরডিএফ ট্যাগ অ্যাক্টিভেট হয়েছে। ফাইভ বাই ফাইভ, সাড়া দিচ্ছে।'

'ঠিক আছে,' সোহেলের দিকে চাইল রানা। 'তোর কী মনে হয়?'

গম্ভীর হয়ে গেছে সোহেল। 'চিফ ইঞ্জিনিয়ারের বক্তব্য অনুযায়ী, আমরা চলছি ব্যাটারি দিয়ে। চাইলেও বিশ নটের বেশি গতি পাবে না মার্ভেল।'

খুবই সফেসটিকেটেড মেরিন প্রপালশন সিস্টেমে চলে দ্য

মার্ভেল অভ গ্রিস জাহাজটি। ওটার ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিনগুলো চলে সুপার কণ্ডাকটিভ কয়েলে। সাগরের পানি থেকে সংগৃহীত ইলেকট্রনকে ঠাণ্ডা করা হয় হিলিয়াম দিয়ে, ফলে পাওয়া যায় ইলেকট্রিসিটি। ওটা আবার চালায় চারটে বিশাল পাম্প জেট ইঞ্জিনকে। দুটো ভেক্টার নযল আছে জাহাজের স্টার্নে, ওগুলো গতিবেগ স্থির করে। ইঞ্জিনগুলো এতই শক্তিশালী, এগারো হাজার টনি জাহাজকে অফশোর রেসিং বোটের মত দেখতে না দেখতে প্রচণ্ড গতি তুলে দেয়। সাগরের পানি থেকে শক্তি পায় বলে মার্ভেলের জ্বালানির অভাব হয় না। কিন্তু গত কয়েক বছর আগে এমনই একটি ক্রুজ শিপে ভয়ঙ্কর আগুন ধরে। এরপর দুনিয়ার সবখানে মেরিটাইম সেফটি বোর্ড নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেঃ যেহেতু ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিন পুরোপুরি নিরাপদ নয়, এ ধরনের ইঞ্জিন ব্যবহার করা চলবে না। বর্তমানে মার্ভেলই একমাত্র জাহাজ যেটা গোপনে এই ইঞ্জিন ব্যবহার করছে।

এই মুহূর্তে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে আশি মাইল ভিতরে কঙ্গো নদীর তীরে রয়েছে মার্ভেল। এখন বড় সমস্যা, চারপাশে আছে শুধুই মিঠা পানি। লবণাক্ত পানি নেই, তাই পূর্ণ শক্তি পাবে না ইঞ্জিন। আপাতত জেট ইঞ্জিনগুলোকে ব্যবহার করতে চাইলে লাগবে সারি সারি সিলভার-জিঙ্ক ব্যাটারি।

ব্যাটারির পুরো শক্তি বড়জোর ষাট মাইল টানতে পারবে মার্ভেলকে। অর্থাৎ, নদীর মোহনায় পৌঁছুতে পারবে না।

'গগল, তিন ঘণ্টা পরের টাইডাল কণ্ডিশন?' জানতে চাইল রানা।

'আড়াই ঘণ্টা পর জোয়ার।' একবারও ডেটাবেস দেখল না গগল। এসব ওর মুখস্থ।

'একেই বলে জীবন-মরণ সমস্যা,' বলল সোহেল। 'ওরা ধাওয়া করবে।'

'ঠিক আছে, গগল, মাধানার লোক আসার আগেই রওনা হও,' বলল রানা।

বাম হাতে পালস্ জেট্ চালু করল গগল। ক্রাইয়োপাম্প ও অ্যানসিলারি ইকুইপমেন্ট কাজ শুরু করতেই নিঃশব্দে চলতে লাগল ম্যাগনোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিনগুলো। টিউবের ভিতর খলখল শব্দে পিছাল পানি। ডায়াল করে বো এবং স্টার্নের থ্রাস্টারকে শক্তি দিল গগল। ডক থেকে সরে যেতে চাইল বিশাল জাহাজ। টানটান হয়ে উঠল বোলার্ডের দড়িগুলো।

শিকার পালাতে চেষ্টা করছে, ব্যস্ত হয়ে উঠল মাধানার লোক। জাহাজের পাশ থেকে গুলিবর্ষণ করছে। বো থেকে শুরু করে স্টার্ন পর্যন্ত গুলির মুখে পড়ল। ব্রিজের জানালাগুলো বিস্ফোরিত হলো। ভেঙে পড়ল কয়েকটা পোর্টহোল। খোলে লেগে ছিটকে আরেক দিকে ছুটছে বুলেট। এ দৃশ্য দেখবার মত, টেরোরিস্টরা যতই চেষ্টা করুক, সামান্য রং চটে যাওয়া ও কয়েকটি কাঁচ ভাঙা ছাড়া কোনও ক্ষতি হলো না বিশালাকার মার্ভেলের।

পিছন থেকে আসা প্যাট্রল বোটগুলো .৫০ ক্যালিবারের মেশিনগান চালু করেছে। তাতেও কিছু হলো না। নদীতে এই রন্দেভুর জন্য দু' পাশের বিশেষ ব্যালাস্ট ত্যাগ করেছে মার্ভেল, ফলে অনেক উঁচু হয়ে উঠেছে জাহাজ। বোটের গানাররা পরিষ্কার দেখতে পেল রাডার। এবং সে কারণেই রাডার পোস্টের উপর গুলিবর্ষণ শুরু হলো। লোকগুলো ভাবতে শুরু করেছে হাল নষ্ট হলেই অসহায় হয়ে উঠবে জাহাজ। মার্ভেল স্বাভাবিক কোনও জাহাজ হলে সত্যিই বেকার হয়ে যেত, স্রোত ওটাকে নিয়ে যেমন খুশি খেলত। কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, রাডার ছাড়াও মার্ভেল চলতে পারে। ড্রাইভ টিউবের কারণে যে-কোনও দিকে নযলগুলো সরাতে পারে মার্ভেলকে, সরিয়ে নিতে পারে জাহাজ। ওই ড্রাইভ

টিউব আছে মার্ভেলের কিল-এর নীচে।

যুদ্ধের দিকে মনোযোগ নেই গগলের, ক্যামেরা দিয়ে দেখছে ডক। ওখানে পিয়ারের উপর গাঁথা লোহার বোলার্ড। মোটা দড়িগুলো বাধা দিতে চাইছে মার্ভেলকে। আড়াআড়ি ভাবে সরে আসতে চাইছে জাহাজ। স্টার্নের দড়ির দিকে ছুটে এল দুই টেরোরিস্ট, কয়েক সেকেণ্ড পর দেখা গেল ইঁদুরের মত দড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে, কাঁধে ঝুলছে একে-৪৭ রাইফেল। স্টার্নের থ্রাস্টার চালু করল গগল। ঠাস্-ঠাস্ আওয়াজ তুলে ফাটছে পচা কাঠ। পরক্ষণে দেখা গেল ডক থেকে ছিটকে উঠেছে ব্যাঙের ছাতার মত বোলার্ড, যেন ডাক্তারের তোলা পোকা ধরা দাঁত। প্রচণ্ড ওজনের কারণে জিনিসটা ছিটকে এসে লাগল মার্ভেলের গায়ে। প্রকাণ্ড ঘণ্টির মত ঢং-ঢং আওয়াজ হলো।

প্রথম টেরোরিস্ট ধড়াস্ করে পানিতে পড়ল। জাহাজ সরিয়ে নেয়ার জন্য স্টার্নের থ্রাস্ট রিভার্সে নিয়েছে গগল, ওটার ব্লেডের ভিতর কুচিকুচি হলো লোকটার দেহ। মুহূর্তের জন্য জাহাজের পাশে লাল রঙের পানি দেখা গেল, পরক্ষণে মিশে গেল স্রোতের ভিতর। দ্বিতীয় লোকটি দু'হাতে দড়ি ধরে ঝুলে রইল। অটোমেটেড নোঙরের সঙ্গে উঠে আসছে। হওসহোলের কাছে পৌঁছেই লাফ দিয়ে ডেকে উঠতে চাইল। কিন্তু ওখানে রয়েছে স্বর্ণা ও নিশাতের টিম। নিজ নিজ কমব্যাট ভেস্টের ট্যাকটিকাল ভিউ স্ক্রিনে প্রত্যেকে দেখেছে লোকটাকে।

ডেকে উঠবার আশায় বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে তার চোখ, কিন্তু স্বর্ণার কাঁধে দেখতে পেল ফ্র্যাঞ্চি স্পাস-১২ কমব্যাট শটগান। লোকটার কানের ভিতর গ্লক পিস্তল গুঁজে দিল জলিল খান।

'তোমার যা খুশি, বন্ধু,' নরম স্বরে বলল স্বর্ণা।

হাত দুটো আস্তে করে সরিয়ে নিল লোকটা, ঝুপ করে নেমে গেল নদীর বুকে। ফেনার ভিতর তাকে আর দেখা গেল না।

অপারেশন্স সেন্টারে দ্বিতীয় বোলার্ডের দিকে চাইল গগল। শত শত টন চাপ পড়ছে, কিন্তু ডক থেকে উপড়ে আসছে না ওটা। বদলে সামনের দিকের তক্তা ফাটতে শুরু করেছে। ডকের পনেরো ফুট লম্বা দুটো তক্তা ছিটকে উঠল, ও-দুটোর বাড়ি খেয়ে পানিতে গিয়ে পড়ল তিন সৈনিক। তক্তা শুধু গেল তা-ই নয়, গোটা ডকের একটা পাশ কাত হয়ে ঝুলে পড়ল।

'ছাড়া পাওয়া গেছে,' বলল গগল।

'তা হলে ভাগো!' তাড়া দিল রানা। ট্যাকটিকাল ডিসপ্লে দেখছে। আর মাত্র দু'মিনিট পর হাজির হবে কপ্টার। ঘণ্টায় এক শ' মাইল ওগুলোর গতি। রানার ধারণা, বিশাল হবে অয়েল কোম্পানির কপ্টারগুলো, তেমনি আধুনিক। মার্ভেলের চারপাশে যে অস্ত্র, তাতে সহজেই ডকের সৈনিক ও কপ্টার দুটোকে ফেলে দিতে পারবে ওরা। বোটগুলো ধ্বংস করতেও সময় লাগবে না। কিন্তু ওদের মিশন এখানে ভিন্ন। একটা কাজ নিখুঁতভাবে শেষ করবার ভার দেয়া হয়েছে ওদেরকে। 'গগল, বিশ নট গতি তোলো,' বলল রানা।

'বিশ নট,' বলল গগল।

মসৃণ ভাবে গতি তুলছে মার্ভেল। স্রোতের তীব্র টানে হুড়মুড় করে নদীর ভিতর পড়ল ডকের অর্ধেক অংশ, সঙ্গে সঙ্গে ভেসে গেল কাঠগুলো। একটু পর তীর থেকে থেমে গেল রাইফেলের গুলি। কিন্তু ধেয়ে আসছে দুই প্যাট্রল বোট, পঞ্চাশ ক্যালিবারের গুলি এসে লাগছে জাহাজের গায়ে।

'আরপিজি লঞ্চ,' তীক্ষ্ণ শোনাল নবীর কণ্ঠ।

জঙ্গলের ভিতর আছে মাধানার ট্রাক, লোকগুলো মার্ভেলের পিছু নিয়েছে। ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে ছিটকে বেরুল খুদে মিসাইল, পানির উপর দিয়ে আসছে। মার্ভেলের বো-র উপর লাগল গ্রেনেড। জাহাজকে রক্ষা করছে আর্মার্ড প্লেট। কিন্তু

বিস্ফোরণটা হলো কান ফাটানো। ডেকের উপর দিয়ে বইল লাল আগুনের হলকা। কয়েক সেকেণ্ড পর একটা সুইফ্‌ট্ বোট থেকে এল আরপিজি। নীচ থেকে ছুঁড়ে দেয়ায় স্টার্নের উপর দিয়ে গেল মিসাইল। রেলিঙের রং পুড়ে গেল, তারপর সোজা গিয়ে চিমনির উপর আছড়ে পড়ল গ্রেনেডটা। চিমনির ভিতর রয়েছে মার্ভেলের সফেসটিকেটেড রেইডার ডোম, ওটা ধ্বংস হলো না, কিন্তু বিস্ফোরণে বিকল হয়ে গেল সিস্টেম।

'আমি দেখছি কী করা যায়,' দ্রুত বলল রায়হান। ফাঁকা হয়ে গেছে ওর মনিটর। অপারেশন্স সেণ্টার থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল সে। একই সময়ে ফায়ার কণ্ট্রোল টিম ও ইলেকট্রনিক্স স্পেশালিস্টদের সংকেত দিল কমপিউটার। সবাই ছুটল উপরে।

রায়হান চলে যেতে না যেতেই ওঅর্ক স্টেশনে এসে বসল সানজিদা স্বর্ণা। ওর কণ্ঠ অতি তীক্ষ্ণ, তার চেয়ে তীক্ষ্ণ কথার খোঁচাগুলো। 'এক মিনিটের ভিতর আসছে কপ্টার, মাসুদ ভাই। শেষবার রেইডার কাজ করার সময় দেখা গেছে নদীর সামনে থেকে আসছে কোনও জলযান।'

সামনের ক্যামেরাগুলোর রেজোলিউশন বাড়াতে বলল রানা। নদীর স্রোত যেন কুচকুচে কালো তেলের তৈরি। দু' পাশে একের পর এক টিলা, চাঁদের আলো পড়ে রুপালি মনে হচ্ছে। দূরের বাঁকে ঘুরছে বড়সড় একটি ফেরি। ওটার তিনটে ডেক, নাক-বোঁচা বো, কিন্তু মার্ভেলের সবার মনোযোগ কেড়ে নিল অন্য কারণে। ইনফ্রারেড ক্যামেরা পরিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছে, সবচেয়ে উঁচু ডেকে অজস্র মানুষ! শুধু তা-ই নয়, নীচের দুই ডেকেও গিজগিজ করছে যাত্রী। সবাই চলেছে মাতাদি নদী-বন্দরে।

'ফেরিতে অন্তত পাঁচ শ' লোক!' চাপা স্বরে বলল গগল।

'নিয়ম মানলে বড়জোর দু' শ' যাত্রী থাকত,' বলল রানা। 'মার্ভেলের পোর্ট সাইডে রাখো ফেরিটাকে। ওই পুরনো বালতি

আর আরপিজির মাঝে রাখতে হবে মার্ভেলকে।'

কাজ শুরু করেছে গগল, একবার দেখে নিল ফ্যাদোমিটার। বড় দ্রুত উঠে আসছে নদীর মেঝে। 'রানা, কিলের নীচে মাত্র বিশ ফুট পানি। আঠারো। পনেরো। দশ। সাত!'

'থেমো না,' বলল রানা। জঙ্গলের ভিতর থেকে এল গুলির আওয়াজ। রোমান মোমবাতির মত জ্বলছে রাইফেলের মাযল-ফ্লাশ। লঞ্চ করা হলো বেশ কয়েকটা আরপিজি, লেজে লাল আগুন নিয়ে আসছে।

ফেরির দিকে চলেছে মার্ভেল, তারই ভিতর একের পর এক রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড এসে পড়ছে জাহাজের উপর। কেঁপে কেঁপে উঠছে মার্ভেল, লালচে হয়ে উঠেছে মাথার উপরের আকাশ। একটা মিসাইল লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, পলকের জন্য থমকে গেল মার্ভেলের সবাই। এবার বোধহয় ফেরির গায়ে গিয়ে পড়বে গ্রেনেড। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ওটার মোটর থেমে গেল। ফেরির খোল থেকে বিশ ফুট দূরে বিস্ফোরিত হলো। ভীষণ ভয় পেয়ে পাগলের মত ছোটাছুটি শুরু করেছে যাত্রীরা, সবার একমাত্র উদ্দেশ্য: গুলি থেকে সরবে।

'লেফটেন্যান্ট আফতাব, এখনই পুরো গতি চাই!' সিংহের মত গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। মাধানার লোকের দায়িত্বহীনতা দেখে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে ওর। 'লোকগুলোকে আড়াল দিতে হবে।'

এক সেকেণ্ড পর ইঞ্জিনরুমে ব্যাটারির সার্কিট থেকে সেফটিগুলো খুলে ফেলল নেভির ইঞ্জিনিয়ার। পাম্প জেটগুলো কয়েক অ্যাম্পিয়ার বাড়তি শক্তি পেল। আরও তিন নট গতি বাড়ল। কিন্তু এর ফলে কমবে ওদের রেঞ্জ, এক মাইল কম এগুতে পারবে মার্ভেল। অথচ, এখন একমাত্র কাজ হওয়া উচিত মোহনার কাছে যাওয়া, ওখানে আছে সাগরের লবণাক্ত পানি।

নদীর মাঝে সরে এল ফেরি, ওটাকে পাশ কাটাতে হলে তীর

ঘেঁষে যেতে হবে মার্ভেলকে। যে-কোনও সময়ে চরে আটকা পড়বে জাহাজ। ক' মুহূর্ত পর দু'পাশে সরে গেল সুইফট বোটদুটো, তীরে গিয়ে আছড়ে পড়ল ফেনায়িত পানি। দুই বোট তেড়ে আসছে মার্ভেলের দিকে। ইঞ্জিনওয়ালা ছোট এক নৌকা আসছিল, ফেরির ঢেউ মাতাল করে দিল ওটাকে। একটা সুইফট বোট ঢেউয়ের ভিতর দিয়ে গুঁতো দিল নৌকার মাঝ বরাবর। সঙ্গে সঙ্গে ফেটে গেল ডিঙির কাঠের খোল। পাঠাতনের উপর দুই লোক ছিল, ছিটকে দশ হাত দূরে পানিতে পড়ল। জায়গাটা পেরিয়ে গেল সুইফট বোট, লোকদুটোকে আর দেখা গেল না।

কন্ট্রোল নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে গগল, ওর দিকে চাইল রানা। এত বড় জাহাজ নদীর ভিতর সরানো কঠিন, তার উপর সামনে থেকে আসছে বড় আকারের জলযান। তবে গগলের উপর বিশ্বাস আছে রানার, বিপদ সামলে মার্ভেল নিয়ে এগিয়ে যাবে আর্মস্ ডিলার। যদি বড় কোনও ভুল হয়ে যায়, রানা ওর চেয়ারে বসেই জাহাজ চালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিতে পারবে।

রানার কানের ভিতর বলে উঠল একটা কণ্ঠ: 'স্যর, আমি নিশাত। এইমাত্র কপ্টার দুটো দেখেছি। এত দূর থেকে বোঝা গেল না কোন্ কোম্পানির। তবে প্রকাণ্ড। একেকটায় অন্তত দশজন আঁটবে। বোধহয় এখনই ফেলে দেয়া উচিত।'

'না। পাইলট দুজন সিভিলিয়ান। গাধাধারের লোক ওদের কিডন্যাপ করেছে। তা ছাড়া, ওদের বুঝতে দেয়া চলবে না আমাদের ক্ষমতা কতটা। আগেই এ নিয়ে কথা হয়েছে। চিন্তা করবেন না, মার্ভেল হয়তো আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাগরে পৌঁছবেই। এখন শুধু খেয়াল রাখুন, কপ্টার থেকে যেন জাহাজে লোক নামাতে না পারে।'

'আমরা তৈরি।'

'ঠিক আছে।'

খরস্রোতা কঙ্গো নদীতে পরবর্তী একটি ঘণ্টা ছুটে চলল মার্ভেল। বারবার ফাঁকি দিতে চাইল সুইফট বোট দুটোকে। ওগুলো থেকে মার্ভেলে এসে লাগছে আরপিজি। কখনও কখনও দু'পাশের জঙ্গল থেকেও এল গুলি। কোথাও কোথাও নদীর পাশ দিয়ে গেছে সড়ক, সেসব জায়গায় মার্ভেলকে অ্যাম্বুশ করতে চাইল মাধানার ফোর্স। সর্বক্ষণ মাথার উপর থাকল কপ্টার দুটো। এখন পর্যন্ত জাহাজে লোক নামাতে চায়নি। রানার ধারণা: ওরা আশা করছে আরপিজির কারণে নদীর তীরে আটকা পড়বে মার্ভেল। সহজে কপ্টার থেকে জাহাজে নামিয়ে দেবে লোক।

ইনগা ড্যাম পেরুতে শুরু করেছে মার্ভেল। ওটা বিশাল এক কংক্রিটের বাঁধ, কঙ্গোয় এসে মেশা ইনগা নদীর পানি আটকে রেখেছে উজানে। ইনগা ও অন্য আরও দুই বাঁধ থেকে মিলছে আফ্রিকার এদিকটার বেশিরভাগ ইলেকট্রিসিটি। দু' নদীর স্রোত মিশে যেতেই ভয়ঙ্কর তাণ্ডব শুরু করল ঢেউগুলো। শক্তিশালী জাহাজ মার্ভেল, কিন্তু তারপরেও টলমল করতে লাগল। বাধ্য হয়ে রিভার্স থ্রাস্ট ব্যবহার করল গগল। পালস জেটগুলো কাজ করছে, নইলে আড়াআড়ি ভাবে মার্ভেলকে তীরের উপর আছড়ে ফেলত প্রকাণ্ড সব ঢেউ।

'মাসুদ ভাই, লাইনে স্যামুয়েল আবালা অপেক্ষা করছেন,' বলল স্বর্ণা। 'আপনার স্টেশনে লাইন দিলাম।'

'ডেপুটি মিনিস্টার আবালা, আমি ক্যাপ্টেন মাসুদ রানা,' বলল রানা। 'আশা করি জানেন এখানে কী ঘটছে?'

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন। কর্নেল আদি মাধাভ মাধানা ওর হীরা ফেরত চাইছে।' ডেপুটি ডিফেন্স মিনিস্টারের ইংরেজি এতই বিকৃত, কষ্ট করে বুঝে নিতে হচ্ছে রানার। 'আর আমাদের দুটো রিভার বোট চুরি করেছে লোকটা। আমাদের দশজন সৈনিক মাতাদি ডকে মারা পড়েছে। ওই বোট দুটো ওখানে থাকার কথা ছিল।'

'একটা অয়েল কোম্পানি থেকে দুটো কপ্টারও পেয়েছে।'

'তা-ই?' আর কোনও মন্তব্য করলেন না আবালা।

'আমাদের সাহায্য দরকার।'

'তাই নাকি? আপনাদের চিফ, মেজর জেনারেল রাহাত খান কিন্তু আমাদের প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছেন: আপনারা নিজেদের দেখভাল করতে জানেন।'

লোকটাকে ধমকে উঠতে মন চাইল রানার। মনে পড়ল কিছুদিন আগের কথা।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভিনসেন্ট গগল যখন ওকে বলল, তার একটা কাজ করে দিতে পারে কি না, কোনও মন্তব্য করেনি রানা। শুধু ভুরু নাচিয়ে বলেছে, 'সত্যি বিয়ে করবে?'

'মরতে?' ঘনঘন মাথা নেড়েছে গগল। 'সুখে থাকতে ভূতে কিলায়? আমি খুবই আনন্দে আছি।'

এরপর খুলে বলেছে কঙ্গোলিজ সরকারের সঙ্গে ওর চুক্তির কথা। ওর কাছ থেকে বেশ কিছু অস্ত্র কিনবে সরকার। তবে সেসব অস্ত্র নিজেরা নেবে না, ওসব তুলে দিতে হবে প্রতিপক্ষ বিদ্রোহীদের হাতে। তাদের গুপ্তচর ঢুকে পড়েছে বিদ্রোহী-নেতা ঠাণ্ডা মাথার জাত খুনি টমাস গাধাধারের দলে। এবং সেই সরকারী এজেন্টই রক্ত-পিশাচটাকে বুঝিয়েছে, কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারলে দখল করে নিতে পারবে তারা দেশের ক্ষমতা। গগলের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা সে-ই জানিয়েছে তাদের। গাধাধার অস্ত্র কিনতে রাজি হতেই গগলের সঙ্গে চুক্তি করেছে তার সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড, কর্নেল আদি মাধাভ মাধানা: তারা সিকি পাউণ্ড আকাটা হীরার বদলে অস্ত্র কিনবে।

এদিকে চুক্তি অনুযায়ী অস্ত্রের জন্য কঙ্গোলিজ সরকার আগাম টাকাও দিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, টমাস গাধাধারের কাছ থেকে সত্যিই যদি কোনও হীরা পাওয়া যায়, তা-ও পাবে গগল।

'রানা, আমি মার্ভেলকে অস্ত্র সরবরাহকারী জাহাজ হিসেবে চাইছি,' খুবই সঙ্কোচের সঙ্গে বলেছে আর্মস ডিলার।

'আমি রাজি,' বলেছে রানা। 'কিন্তু আমার বসের সঙ্গে...'

'তার আগে শোনো,' বাধা দিয়ে বলেছে গগল। 'যতটুকু জানি, কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট তোমার বসের ক্লাসফ্রেণ্ডের ছেলে। শ্বযুদ্ধে ওঁর বাবা ও তোমার বস একই ফ্রন্টে লড়াই করেছেন। ইফ হালালি সে সময় ছিলেন সার্জেন্ট, আর রাহাত খান ছিলেন জর। প্রেসিডেন্টের কাছে শুনেছি, তোমার বস কয়েকবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁর বাবার প্রাণ বাঁচান। অন্য সূত্র থেকে জেনেছি, সাইফ হালালিও একবার প্রাণ বাঁচিয়েছেন মেজর জেনারেলের। পদ উঁচু-নিচু হলেও কখনও বন্ধুত্বে ঘাটতি পড়েনি। মনে করি না তোমার বস্ অরাজি হবেন। তা ছাড়া, আমি রানা এজেন্সির সাহায্য চাইছি টাকার বিনিময়ে। কোনও হীরা পেলে তা দিয়ে দেব রানা এজেন্সিকে। তা যদি পাওয়া না যায়, উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেব।'

'ধরে নাও কাজটা করছি,' বলেছে রানা। গগলের সামনেই বিসিআই চিফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

রানা সংক্ষেপে সব বলবার পর মেজর জেনারেল রাহাত খান বলেছেন, 'শুনেছি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই বিপদের মুখে আছে রাইফ হালালি। খুবই খারাপ লোক ওই টমাস গাধাধার, এরই মধ্যে কয়েক হাজার মানুষ খুন হয়েছে ওর হাতে। ওখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নয়জন অফিসার ও সৈনিক ইউএনও থেকে পিস কিপার ছিল, তাদেরকেও কাফে শহরের কাছে খুন করেছে লোকটা। যদি সম্ভব হয়, আমরা অবশ্যই চরম প্রতিশোধ নেব। যদি হালালির কোনও সাহায্যে আসতে পারো, তো খুবই ভাল। তোমার তো ছুটিও চলছে।'

যা বলবার বলে দিয়েছেন চিফ, তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে

গগলকে জানিয়ে দিয়েছে রানা: রানা এজেন্সির সামুদ্রিক ফ্রন্ট মার্ভেলকে নিয়ে যাবে কঙ্গো নদীতে— তবে গগলকেই চালাতে হবে জাহাজটা।

বাস্তবে ফিরল রানা, মেজাজ বিগড়ে গেছে, কিন্তু স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'মিস্টার আবালা, আমরা যদি মাধানার লোকের লাশ ফেলতে শুরু করি, তা হলে তাদের মনে অস্ত্রের ব্যাপারে সন্দেহ ঢুকবে। আপনাদের কথা মত অস্ত্রের ভিতর লুকানো হয়েছে রেডিও ডিরেকশন ট্যাগ, ভাল করে খুঁজলে সবই ফাঁস হয়ে যেতে পারে। অস্ত্রগুলো থেকে ট্যাগ বের করে তারপর টমাস গাধাধারের আস্তানায় নিলে আপনাদের উদ্দেশ্য পুরোপুরি ব্যর্থ হবে।'

এ চুক্তি হওয়ার পর এই নিয়ে লোকটাকে তৃতীয়বার একই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে রানা। এখন ওর ধারণা হয়েছে: লোকটার মাথায় তাজা গোবরও নেই, আছে শুধু শুকনো ঘুঁটে।

কী যেন বলতে শুরু করেছে স্যামুয়েল আবালা, কিন্তু মর্টারের আওয়াজে প্রথম কথাগুলো শোনা গেল না। সুইফট বোট থেকে মর্টার এসে পড়ছে মার্ভেলের কাছে। জলোচ্ছ্বাসের মত পানি এসে লাগছে জাহাজের পাশে। '...রওনা... বোমা থেকে। পৌঁছুতে কমপক্ষে এক ঘণ্টা।'

'দয়া করে আরেকবার বলুন, মিনিস্টার। আপনি কি আর্মি পাঠাচ্ছেন?'

হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল অপারেশন্স সেন্টার, চেয়ার থেকে ছিটকে পড়ল সবাই। কঙ্গো নদীর মেঝের ভিতর গেঁথে গেছে মার্ভেলের তলা। এত দ্রুত থেমেছে জাহাজ, মেস হলে চুর-চুর হয়েছে দামি সব চায়নিজ ডিশ। মেডিকেল বে-তে পোর্টেবল এক্স-রে মেশিন আলগা ছিল, ডক্টর ফারার অসতর্কতার ফলে, ওটা পড়ে বিকল হয়েছে।

সবার আগে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল রানা। 'গগল, কী

অবস্থা?'

'হঠাৎ উঠে এল নদীর তলা। আগে এ জিনিস কখনও দেখিনি। বুঝতেই পারিনি এমনও হতে পারে।'

'আফতাব, ইঞ্জিনের কী অবস্থা?'

এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকে সুপার কমপিউটার, জাহাজ আটকা পড়তেই ওটা থামিয়ে দিয়েছে ইঞ্জিনগুলোকে। কিছুক্ষণ আগে অপারেশন্স সেন্টারে এসে বসেছে আফতাব, এখন স্ক্রিনে কী যেন দেখছে। ভুরু কুঁচকে গেছে। নাকের ডগা ডলছে হাতের তালু দিয়ে। তারপর কি বোর্ড টিপতে শুরু করল।

'আফতাব?' দ্বিতীয়বার জানতে চাইল রানা।

'পোর্ট টিউব কাদায় ভরে গেছে। স্টারবোর্ডের টিউব বিশ পার্সেন্ট কাজ করবে। পিছাবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। আর যদি এগুতে চাই, ওটাও বুজে যাবে।'

'গগল, হেলম আমি দেখছি,' বলল রানা।

'তোমার হাতে তুলে দিলাম।' মার্ভেলের ক্ষতি হয়েছে ভাবতে গিয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে গগলের। প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসে ও এই জাহাজটিকে।

পালস জেট টিউব খুব মসৃণ হয়, জিনিসটা যেন রাইফেলের ব্যারেলের ভিতর অংশ। বিশেষ এক অ্যালয় দিয়ে তৈরি। ময়লা বা জং ওটার বারোটা বাজাতে পারে। সামান্য ক্ষতি হলেও গতির উপর তা খারাপ প্রভাব ফেলবে। রানা জানে, কাদা-মাটি লেপে ফেলেছে টিউবদুটোকে। এখন যদি ইঞ্জিন দিয়ে চাপ তৈরি করে, একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে টিউব। ঝুঁকি নেয়া মস্ত ভুল হবে।

পোর্ট সাইড টিউব স্ট্যাণ্ডবাই রাখল রানা, একটু একটু করে রিভার্সে গতি দিতে শুরু করেছে স্টারবোর্ড টিউবকে। বাইরের ক্যামেরার উপর চোখ রেখেছে, জাহাজের বো থেকে বলকে বেরুচ্ছে কাদা-পানি। একইসঙ্গে খেয়ালে রাখছে জেট প্রপাল-

শনের ইণ্ডিকেটার। ডায়াল করে আরেকটু গতি বাড়াল রানা। পঁচিশ পার্সেন্ট শক্তি দিতে গিয়ে গাল কুঁচকে গেল ওর। চেয়ে আছে সোহেল। বুঝতে পারছে, হৃৎপিণ্ড মোচড় খাচ্ছে প্রিয় বন্ধুর।

মোটেই নড়ল না মার্ভেল। নিজের বিপুল ওজন নিয়ে কাদার ভিতর ভাল মতই আটকা পড়েছে।

'মাসুদ ভাই,' সতর্ক স্বরে বলল মেরিন ইঞ্জিনিয়ার আফতাব।

তার আগেই পাম্পগুলো বন্ধ করে দিয়েছে রানা। হাতে কোনও উপায়ই নেই ওর। কোনও পরিকল্পনা করতে বড়জোর পনেরো সেকেণ্ড পাবে, এরপর আসবে কপ্টারগুলো, বিদ্রোহী সৈনিকরা নেমে আসবে মার্ভেলের ডেকের উপর। বিশ এমএম গ্যাটলিং গানের পাঁচ সেকেণ্ডের দুটো গুলির স্রোত আকাশ থেকে উড়িয়ে দেবে কপ্টার দুটোকে। কিন্তু তার মানেই, বেসামরিক পাইলটদের মৃত্যু। শুধু তা-ই নয়, প্রমাণ হবে ওদের এই মার্ভেল স্বাভাবিক কোনও জাহাজ নয়। এরপর ধ্বংস করতে হবে সুইফট বোট দুটোকে। তাতেই থামবে না লড়াই, মাধানা যে মুহূর্তে বুঝবে মার্ভেল আটকা পড়েছে, আরও বোট ও সৈনিক পাঠাবে সে। হীরাগুলো হাত ছাড়া করা, বা মিশন বাতিল করবার কথা একবারও ভাবছে না রানা।

'আফতাব, হাওয়া আসছে আমাদের পিছন থেকে, তুমি ঘন ধোঁয়া তৈরি করো। মার্ভেল যেন হারিয়ে যায় ধূম্রজালে। চালু করো ফায়ার সাপ্রেশন ক্যানন।' মার্ভেলের সুপারস্ট্রাকচারে চার কোনায় রয়েছে চারটে জল-কামান। মাত্র এক মিনিটে প্রতিটি পাম্প একহাজার গ্যালন পানি ছুঁড়তে পারে। মার্ভেলের ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিন লাগে না, পাম্পগুলো চলে ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে। 'জল-কামানের রেঞ্জ দু' শ' ফুট, কাজেই ধারণা করছি, এতেই কপ্টারগুলো জাহাজে লোক নামাতে পারবে না।' মাইক্রোফোনে বলল রানা, 'আপা, আমরা ওয়াটার গান চালু

করছি, তৈরি থাকুন। এতে যদি কাজ না হয়, সবাইকে অনুমতি দেয়া হলো, আপনারা শটগান ও পিস্তল ব্যবহার করবেন। মনে করি না ও-দুটো অস্ত্র ব্যবহার করলে মাধানা সন্দেহ করবে।'

'ঠিক আছে, স্যর।'

'আর, আপা, আপনি জলিলকে নিয়ে বোট গ্যারাজে আমার সঙ্গে দেখা করুন। আপনাদের জন্য একটা মিশন আছে। যুদ্ধের জন্যে পুরো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসুন।'

চেয়ার থেকে নেমে পড়েছে রানা, চলেছে এলিভেটরের দিকে। বোট গ্যারাজে যেতে হলে আরও দুটো তলা নামতে হবে ওকে। পাশ থেকে হাতের ইশারা করল সোহেল। 'কীরে? ধোঁয়া আর জল-কামান বুঝলাম, কিন্তু আপা আর জলিলের জন্য কীসের মিশন?'

'কেন, মার্ভেলকে নিয়ে ভাগতে হবে না?'

ওদের বন্ধুত্ব এমনই সুদৃঢ়, একে অপরের ক্ষমতাকে কখনও ছোট করে দেখে না। সোহেল এখনও পূর্ণ-বিশ্বাসই রাখল। নিচু স্বরে বলল, 'কয়েক হাজার টন কীভাবে সরাবি রে, প্রিয় শ্যালক?'

দরজার দিকে রওনা হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমি জাহাজই সরাব না, দশ ফুট উঁচু করে দেব নদী!'

চার

নামিবিয়া, ওয়ালভিস বে-র দক্ষিণে।

মসৃণ পাকা সড়কের উপর হু-হু হাওয়ায় উড়ছে ধুলো। ঠাণ্ডা

বাতাস বইছে মরুভূমিতে, তপ্ত অ্যাসফল্টের উপর এখানে ওখানে তৈরি হচ্ছে বালির খুদে ঢিবি, কোথাও সামান্য গর্ত— সব যেন ধোঁয়া বা ঝুরঝুরে তুষার। বহু আগেই অস্তে গেছে সূর্য, চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে ফ্যাকাসে সাদা ঢিবি।

দীর্ঘ এ পথে চলেছে একটি পিকআপ। জোরালো হাওয়ায় যেন সরে যেতে চাইছে সড়ক, একপাশে সৈকতে মাথা কুটছে বহু পথ অতিক্রম করে আসা পরিশ্রান্ত ঢেউ। এখন সোয়াকোপ্‌মুণ্ড ও বন্দর-শহর ওয়ালভিস বে থেকে বিশ মাইল দক্ষিণে রয়েছে ফোর হুইল পিকআপ। রাতের এই নির্জনতায় যে কেউ ভাবতে পারে, ওই গাড়িই দুনিয়ায় একমাত্র চলন্ত যান।

ড্রাইভিং সিটে হঠাৎ শিউরে উঠল কার্টা অস্টিন। 'হুইলটা ধরবে?' সঙ্গীর দিকে চাইল।

হাত বাড়িয়ে স্টিয়ারিং হুইল নিল ওর সঙ্গী।

মাথার ঢাকনিওয়ালা সুয়েটশার্ট পরতে লাগল কার্টা অস্টিন। কলারের ভিতর থেকে বের করে নিল দীর্ঘ কেশ, সব এলিয়ে পড়ল কাঁধ জুড়ে। সন্ধ্যায় সূর্যের শেষ কিরণে বালির ঢিবি যেমন হয়, তেমনি লালচে রঙা ওর চুল। ভোরে যেমন হয় গম্ভীর-শান্ত সাগর, ঠিক তেমনি গভীর নীল ও নিঃসঙ্গ ওর চোখদুটো।

'আমি এখনও বলব, সকাল তক অপেক্ষা করা উচিত ছিল। পারমিট নিয়েই ঢুকতে পারতাম স্যাণ্ডউইচ বে-তে।' এ নিয়ে তৃতীয়বার অভিযোগ করেছে রন কুবলিকি। ওরা দু'জন ইংরেজ। হোটেল থেকে বেরিয়েছে বহুক্ষণ। 'আপনি ভাল করেই জানেন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ চায় না সংরক্ষিত এলাকায় টুরিস্টরা ঘুরঘুর করুক।'

'কুবলিকি, আমরা ডায়মণ্ড কোম্পানির লিয নেয়া মাইনিং এলাকার দিকে যাচ্ছি না, চলেছি একটা বার্ড স্যাংচুয়ারিতে,' প্রায় ধমক দিল কার্টা।

'সেটাও আইনত দণ্ডনীয়।'

'তা ছাড়া, ভাল লাগেনি লাজরাসের কথাবার্তা। আমার ধারণা ও আমাদেরকে দেখা করতে দিতে চায় না দাদু এবেলের সঙ্গে। মনে হয়েছে, কী যেন লুকাচ্ছে।'

'কে লুকাতে চেয়েছে? দাদু এবেল?'

'না, আমাদের বাচাল গাইড, ব্র্যাড এন লাজরাস।'

'আপনার কেন এমন মনে হলো? আমরা আসার পর থেকে নানান সাহায্য করছে সে।'

মুখ ঘুরিয়ে সঙ্গীর দিকে চাইল কার্টা অস্টিন। ড্যাশ-বোর্ডের সবুজ আলোয় রন কুবলিকিকে জেদি ছেলে মনে হচ্ছে। এখনও যেন পূর্ণাঙ্গ পুরুষ হয়ে ওঠেনি। 'তোমার মনে হয় না একটু বেশি সাহায্য করতে চাইছে? লোকটা নিজে থেকে হোটেলে এসে কাজ নিয়েছে। ওয়ালভিস বে'র সব জেলেকে চেনে। ট্যুর কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করে পাইয়ে দিয়েছে হেলিকপ্টার। বদলে খুব কম পয়সা নিয়েছে। এ থেকে কী মনে হয়?'

'আমাদের কপাল ভাল।'

'সৌভাগ্যের উপর ভরসা করি না আমি।' নতুন করে সড়কের উপর চোখ রাখল কার্টা। 'আমরা যখন বুড়ো জেলে এবেলের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলাম, তখন থেকেই নানাভাবে বাধা দিতে চাইছে লোকটা, বলছে ওখানে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না। প্রথমে বোঝাতে চাইল, বুড়ো এবেল অতি সাধারণ এক জেলে, তীর থেকে কখনও সাগরের এক মাইল ভিতরেও যায় না। তারপর বলল, ওই লোকের মাথা খারাপ। তাতেও যখন যেতে চাইলাম, বলল দাদু এবেল ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক মানুষ— শোনা যায় মানুষও খুন করেছে।

'তুমি তো জানো, জেলেদের কথা শুনেই ধারণা করেছি দাদু এবেলের সঙ্গে দেখা করা উচিত আমার।' মাথা দোলাল কার্টা।

'জেলেরা বলছে, স্কেলিটন কোস্টের আশপাশের পানি ওই বুড়োর চেয়ে বেশি কেউ চেনে না, কখনও চিনবেও না। এ থেকে মনে হতেই পারে, বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলা উচিত। আমাদের প্রজেক্টে সে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। অথচ আমাদের গাইড চাইছে, যেন বুড়োর সঙ্গে দেখা না করি। ...বলতে পারো, কেন? কুবলিকি, আমার ধারণা: আমাদের নয়, অন্য কোনও দলের হয়ে কাজ করছে লোকটা।'

'আমরা আগামীকাল সকালে রওনা হতে পারতাম।'

তখন তখনই মন্তব্য করল না কার্টা। কিছুক্ষণ পর বলল, 'এখন প্রতিটি মুহূর্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেউ না কেউ ঠিকই টের পেয়ে যাবে আমরা কী করছি। এরপর হাজারো লোক হাজির হবে কঙ্কাল উপকূল খুঁজতে। আর তখনই সরকার হুকুম জারি করবে সৈকতের কাছে যাওয়া চলবে না। বন্ধ করে দেয়া হবে সবরকম মাছ ধরা, প্রয়োজনে কারফিউ জারি করবে। সেক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে উঠবে আমাদের এক্সপিডিশন। তুমি আগে কখনও এ ধরনের কাজ করোনি, কিন্তু আমি করেছি।'

'এত ঘুরে কী পেয়েছেন?' প্রচ্ছন্ন টিটকারির সুরে বলল কুবলিকি। জানে, উত্তর কী হবে।

'না, পাইনি কিছুই,' স্বীকার করল কার্টা। 'তবে তার মানে এটা নয় যে আমি আমার কাজ জানি না।'

আফ্রিকার বেশির ভাগ দেশের সড়ক খুবই ভাঙাচোরা, কিন্তু নামিবিয়ার যোগাযোগ মন্ত্রণালয় প্রচুর কাজ করেছে গত কয়েক বছরে। সড়কে সামান্যতম গর্ত নেই। রাত চিরে এগিয়ে চলেছে টয়োটা ফোর-হুইল-ড্রাইভ গাড়িটা। আরও কিছুক্ষণ পর একটা মোড়ে পৌঁছে গেল, এখানে একটু থামল কার্টা। সামনে পিকআপের চাকার চেয়ে উঁচু বালির প্রান্তর। অনেক আগেই ঢাকা পড়েছে অ্যাসফল্ট। ক্লাচ টিপে নিচু গিয়ার ফেলল কার্টা, তারপর

বালির স্তূপ ঠেলে এগুতে শুরু করল। এখানে এলে আটকা পড়ত টু-হুইল-ড্রাইভ গাড়ি। পঁচিশ মিনিট এগুনোর পর একটা পার্কিং এরিয়ায় পৌঁছে গেল পিকআপ। একটু দূরে দেখা গেল সাইক্লোন ফেন্স। ওখানে ঝুলছে সাইনবোর্ড:

গাড়ি আর সামনে যাবে না। এখানেই রাখুন।– কর্তৃপক্ষ।

স্যাণ্ডউইচ বে-তে পৌঁছে গেছে ওরা। সামনে বিস্তৃত লেগুন। মাটির নীচের পাথর থেকে বেরিয়ে আসছে এই মিঠা পানি। প্রতি বছর ভিড় করে এখানে পঞ্চাশ হাজার মৌসুমী পাখি। পার্কিং এরিয়ায় গাড়ি রাখল কার্টা, তবে এখনও চলছে ইঞ্জিন। কুবলিকির জন্য অপেক্ষা না করেই সিট থেকে নেমে পড়ল, নরম বালির নীচে ডুবে গেল বুটের গোড়ালি। টয়োটার পিছনে চলে এল। ওখানে রেখেছে ইনফ্লেটেবল রাফ্‌ট্। সঙ্গে রয়েছে ইলেকট্রিক পাম্প। গাড়ির বারো ভোল্টের সিস্টেম ওটাকে চালাবে।

দেখতে না দেখতে ফুলে উঠল রাফ্‌ট্, ব্যাগ ভরা গিয়ার নামিয়ে নিল কার্টা। পরীক্ষা করে দেখল ফ্ল্যাশলাইটের ব্যাটারি ঠিক আছে কি না। রাফটের উপর ব্যাকপ্যাক ও বৈঠা রাখল দু'জন, তারপর লেগুনের ধারে নিয়ে গেল ভেলা। খোলা সাগর থেকে আড়ালে এই লেগুন, বিশাল সাগরের পাশে যেন সামান্য এক পচা ডোবা।

'জেলেরা বলেছে, লেগুনের দক্ষিণে থাকে দাদু এবেল।' ভেলা ভাসিয়ে দিল কার্টা। উঠে পড়ল ওরা, বৈঠার গুঁতো দিয়ে তীর থেকে গভীর পানিতে সরে গেল। আঁধার রাতে টর্চ জ্বেলে কমপাস দেখে নিল কার্টা, তারপর সব পকেটে রেখে প্রশান্ত জলে বৈঠা বাইতে লাগল।

কার্টা জানে, রন কুবলিকিকে যাই বলুক, আসলে ও স্রেফ জুয়া খেলছে। হয় বিশাল সাফল্য আসবে, নইলে পুরো সময় নষ্ট হবে। শেষেরটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। গত তিন বছর গুজব বা

অর্ধ-সত্য ওকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে নানা দিকে। অবশ্য ওর কাজই তো এ-ই। একবারের জন্যও হাতের মুঠোয় আসেনি বিজয়। একের পর এক জায়গায় খুঁজে চলেছে— একাকী, ক্লান্ত, একটু হতাশ। তবে রন কুবলিকির মত কখনও হাল ছেড়ে দেয়নি।

বৈঠা বেয়ে দক্ষিণে চলেছে ওরা। আঁধার লেগুনের ভিতর ঝপাস্ আওয়াজ তুলে ঘাই দিচ্ছে বড় মাছ। কখনও শোনা যাচ্ছে খসখস ও ঠাসঠাস আওয়াজ, ঝোপঝাড়ের ভিতর পালক ঠিক করছে পাখি। লেগুনের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছুতে দেড় ঘণ্টা লাগল। আর সব লেগুনের মতই দেখতে, সামান্য লবণাক্ত পানিতে চারপাশে শুধু নলখাগড়া। তীরের দিকে আলো ফেলল কার্টা, খুঁজতে শুরু করেছে সঠিক জায়গাটা। উদ্বেগ নিয়ে বিশ মিনিট কাটিয়ে দিল, তারপর দেখল দীর্ঘ ঘাসের মাঝে সরু ফাটল। ওখান দিয়ে লেগুনের ভিতর নেমেছে সরু ঝর্না।

নিঃশব্দে ওদিক দেখাল কার্টা।

ফাটলের দিকে রাফট নিয়ে চলল দু'জন।

এখানে জন্মেছে সাত ফুটি সব নলখাগড়া। মাথার উপর হারিয়ে গেল আকাশ ও রূপালী চাঁদ। ওরা যেন জীবন্ত কোনও সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে চলেছে। অপ্রশস্ত ঝর্নায় স্রোত নেই বললেই চলে, বেশ দ্রুতই এগুতে পারল। নলখাগড়ার ভিতর দিয়ে এক শ' গজ ভিতরে ঢুকে দেখল, সামনেই মাঝারি আকারের এক পুকুর— চারপাশে দেয়াল তৈরি করেছে ঝোপঝাড় ও নলখাগড়া। পুকুরের মাঝে ছোট্ট দ্বীপ, জোয়ারের সময় পানির সামান্য উপরে জেগে থাকে। চাঁদের আলোয় দেখা গেল ওখানে অদক্ষ হাতে গড়া কুটির, জোয়ারে ভেসে আসা কাঠ ও প্যাকিং ক্রেট দিয়ে তৈরি। দরজা নেই, বদলে ঝুলছে কাঁথা। কুটিরের সামনে ছোট্ট এক গর্ত। সেখানে নিভতে শুরু করেছে আগুন। কাঠ-কয়লার

ছাইয়ের ভিতর থেকে আসছে লালচে আলো। ডানদিকে একটা মাচা, ওখানে শুকানো হয় মাছ। পাশেই মিষ্টি পানির জন্য জং ধরা কয়েকটা ব্যারেল। দ্বীপের পাশে ভাসছে কাঠের ছোট্ট নৌকা, সরু দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। মাস্তুলে জড়িয়ে রাখা হয়েছে পাল। সমতল খোলের ভিতর রাখা পাটাতন ও হাল। সাগরে মাছ ধরবার জন্য উপযুক্ত নয় এসব নৌকা। হতাশই হলো কার্টা। ঠিকই বলেছে ব্র্যাড এন লাজরাস, দাদু এবেল বোধহয় তীর থেকে বেশি দূরে যায় না।

চারপাশ দেখে মনে হলো এই ক্যাম্প খুবই সাধারণ। কিন্তু ঝানু লোক এখানে টিকে থাকতে পারবে বহু কাল।

'এবার কী?' ফিসফিস করে জানতে চাইল কুবলিকি। সৈকতে ভিড়েছে ইনফ্লেটেবল।

চাপা হাওয়া ও ঢেউয়ের শব্দ ছাপিয়ে কুটিরের ভিতর থেকে আসছে জোরালো গর্জন। কয়েকজন নয়, মাত্র একজন লোকই, কিন্তু তুমুল ভাবে নাক ডাকছে। দরজা-কাঁথার দিকে পা বাড়াল কার্টা। তবে কয়েক পা গিয়ে সৈকতের দিকে পিঠ দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। ব্যাগ থেকে বের করে নিল ল্যাপটপ, চালু করে টাইপ শুরু করেছে। দুই সারি দাঁতের মাঝে চেপে ধরেছে নীচের ঠোঁট।

'এবার?' একটু তাগাদার সুরে বলল কুবলিকি।

'অপেক্ষা করব। উঠুক ঘুম থেকে।'

'কিন্তু ওই লোক যদি এবেল না হয়? এখানে হয়তো অন্য কেউ থাকে। জলদস্যু বা ডাকাত হলে?'

'তোমাকে তো বলেছি, আমি কপালের উপর নির্ভর করি না। আর কো-ইনসিডেন্সেও বিশ্বাস করি না। আমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে কোথায় আসতে হবে, তার মানে এখানে এই কুটিরেই থাকবে দাদু এবেল। মাঝরাতে তাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না।

সকালে ঘুম থেকে উঠুক, কথা বলব।'

কুটিরের ভিতর এখনও বাজখাঁই নাসিকা গর্জন চলছে, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল নেংটি পরা এক আফ্রিকান বুড়ো বেরিয়ে এসেছে কাঁথা সরিয়ে। সরু সরু দুই পা, পাঁজরের সবক'টা হাড় গোনা যায়। কলার বোনের নীচে বড়সড় গর্ত। চওড়া থ্যাবড়ানো নাক, খরগোশের কানের মত কানদুটো, তাতে হাড়ের দুল। শনের মত পাকা চুল নেমে এসেছে কাঁধে। চোখদুটো হলদেটে। লোকটা নাক ডেকে চলেছে, বোধহয় ঘুমের ভিতর হাঁটছে। কিন্তু খসখস করে পিঠ চুলকে নিল, থুতু ফেলল আগুনের উপর।

উঠে দাঁড়াল কার্টা, নামিবিয়ান জেলের চেয়ে কমপক্ষে এক ফুট উঁচু ও। বৃদ্ধের দেহে বোধহয় বুশম্যানদের রক্ত আছে। 'দাদু এবেল, আপনার সঙ্গে দেখা করতে অনেক দূর থেকে এসেছি। ওয়ালভিস বে-র জেলেরা বলেছে, আপনিই সবার ভিতর সবচেয়ে জ্ঞানী।'

কার্টা ধারণা করেছে জেলে ইংরেজি জানে, কিন্তু তার মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। অবশ্য নাক ডাকা থামিয়ে দিয়েছে। এতে উৎসাহী হলো কার্টা। 'আপনি কোথায় মাছ ধরেন তা জানতে এসেছি। কঠিন সব জায়গা, যেখানে জাল বা সুতো হারিয়েছেন। দাদু এবেল, এ ব্যাপারে জানতে চাইলে আপনি কি জবাব দেবেন?'

কুটিরের দিকে ফিরতি পথ ধরল বৃদ্ধ। কাঁথা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণ পর আবারও বেরিয়ে এল। এখন তার কাঁধের উপর পাতলা কাঁথা। কয়েকটি চাদর ও পাখির পালক দিয়ে তৈরি জিনিস। প্রতি পা ফেললে দুটো একটা করে পালক খসে পড়ছে। একটু দূরে সরে গেল, তারপর ছরছর করে তুমুল বেগে প্রস্রাব করল পানিতে। আরাম করে চুলকে চলেছে পেট।

ফিরে এসে আগুনের গর্তের সামনে বসে পড়ল। পিঠ দিয়েছে

কার্টা ও কুবলিকির দিকে। মেরুদণ্ডের হাড়ের সারি দেখাল কালো মুক্তার মত। নিভন্ত কয়লায় ফুঁ দিয়ে নতুন করে আগুন জ্বেলে নিতে চাইল, ঠুঁসে দিল আরও কয়েকটা ডাল। তারপর আগুন ভাল ভাবে জ্বলে উঠতেই বলল, 'এদিকের পানিতে বহু কঠিন জায়গা আছে। সেসব জায়গায় মাছ ধরা খুব শক্ত।' এত মোটা গলা, চমকে গেল কার্টা। এ যেন চড়ুইয়ের বুক থেকে বেরিয়ে আসছে সিংহের গর্জন! পিঠ ফিরিয়েই রাখল দাদু এবেল। 'প্রতিটা জায়গায় মাছ ধরেছি। বাজি ধরে বলতে পারি, আমার মত করে কেউ ধরতে পারেনি। যে সুতো হারিয়েছি, সেটা মাপলে এখান থেকে ওই কেপ ক্রস বে পেরিয়ে যেত।' ওই এলাকা এখান থেকে উত্তরে, দূরত্ব কমপক্ষে আশি মাইল। 'সেই সুতো আবার ফিরে আসত এখানে।' উদ্ধত কণ্ঠ। 'যে জাল হারিয়েছি, তাতে নামিবিয়ার মরুভূমি ঢেকে দেয়া যেত। সাগরে এমন সব ঝড় দেখেছি, অন্য কেউ হলে ভয়ে মুতে দিত। এমন সব মাছ ধরেছি, সবচেয়ে বড় জাহাজের চেয়ে ওগুলো বড় ছিল। এমন সব জিনিস দেখেছি, অন্য কেউ দেখলে ভয়ে পাগল হয়ে যেত।'

এবার দেহ ফিরিয়ে বসল বুড়ো এবেল। আগুনের কাঁপা কাঁপা লাল আলোয় চোখদুটো পিশাচের চোখের মত জ্বলজ্বল করছে। হঠাৎ হেসে ফেলল, বেরিয়ে এল পাশাপাশি তিনটে দাঁত, যেন জিপগাড়ির তিন গিয়ার। আর কোনও দাঁত নেই। নিঃশব্দে হেসে চলেছে, হাসির আওয়াজ শুরু হলো একটু পর। মাঝ পথে থেমে গেল, খকখক করে কাশতে লাগল। কাশি থামতে বলল, 'দাদু এবেল কখনও নিজের গোপন তথ্য জাহির করে না। আমি এমন সব কথা জানি, যেগুলো তোমরা জানতে চাইবে। কিন্তু কোনওদিন জানবে না। জানবে না, কারণ আমি কখনও বলব না।'

'কেন বলবেন না, দাদু এবেল, মানুষের যদি উপকার হয়?'

কার্টা বুঝেছে, এ বৃদ্ধ জটিল চিন্তা করবার মানুষ। তার পাশে বসে পড়ল ও।

'দাদু এবেল দুনিয়ার সেরা জেলে। সে কেন তোমাদের এসব জানিয়ে নিজের শত্রু তৈরি করবে?'

'আমি এদিকের পানিতে মাছ ধরতে চাই না। এসেছি একটা জাহাজ খুঁজতে। ওটা বহু বছর আগে ডুবে গেছে। আমার বন্ধু আর আমি...' রন কুবলিকির দিকে হাতের ইশারা করল কার্টা। যুবক এগুতে শুরু করেছিল, কিন্তু জেলের গায়ের ভয়াবহ দুর্গন্ধ নাকে যেতেই যেন ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। 'আমরা ওই জাহাজটা খুঁজছি, কারণ...' গল্প বানাতে শুরু করেছে কার্টা। 'কারণ এক লোক আমাদের কাজে নিয়েছে। ওই জাহাজের ভিতর তার একটা জিনিস রয়ে গেছে। খুব দামি। এখন আমরা ভাবছি, আপনি যদি আমাদেরকে সাহায্য করতেন।'

'তা হলে ওই লোক নিশ্চয়ই অনেক ধনী? আমাকে পয়সা দেবে?' দাদু এবেল জ্বলজ্বলে চাহনি নিয়ে চেয়ে রইল মেয়েটির চোখে।

'কিছু টাকা তো দেবেই।'

দাদু এবেল দুই হাত নাচাল, মনে হলো অন্ধকারে উড়ে চলেছে বাদুড়। 'কিন্তু দাদু এবেলের কখনও কোনও টাকা লাগে না।'

'সাহায্য করবার জন্যে তা হলে কী নেবেন আপনি?' হঠাৎ জানতে চাইল রন কুবলিকি।

ঘাবড়ে গেল কার্টা। বুড়ো রেগে যেতে পারে। এক পলক পর বুঝল, তা-ই হয়েছে। জ্বলন্ত চোখে কুবলিকির দিকে চাইল বৃদ্ধ।

'ছোকরা, আমি তোমাকে সাহায্য করব না।' যুবকের দিক থেকে কার্টার দিকে চাইল দাদু এবেল। 'কিন্তু তোমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করব। তুমি মেয়েমানুষ, তার উপর কখনও মাছ ধরবে

না, কাজেই আমার শত্রুও তৈরি হবে না।'

কার্টা জীবনেও দাদু এবেলকে বলবে না, সেই ছোটবেলা থেকে নদীর তীরে মানুষ হয়েছে। গ্রীষ্মের সময়ে বাবার ভাড়া দেয়া নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। তারপর যখন মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে বাবার অ্যালযেইমার্স হলো, তখন থেকে ওই ব্যবসা নিজেই চালিয়েছে। 'সত্যিই অনেক ধন্যবাদ, দাদু এবেল।' ব্যাকপ্যাক থেকে বড় মানচিত্র বের করল কার্টা, ওটা আগুনের পাশে মাটির উপর বিছিয়ে দিল। একটু এগিয়ে এল কুবলিকি, ফ্ল্যাশলাইটের রশ্মি ফেলল মানচিত্রের উপর। দেখা গেল নামিবিয়ার উপকূল। তীর থেকে একটু দূরে আঁকা হয়েছে অন্তত বারোটা নক্ষত্র। বেশির ভাগ ওয়ালভিস বে-র আশপাশের। অন্যগুলো তীর থেকে বেশ দূরে।

'বেশ কয়েকজন জেলের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা জানিয়েছে কোথায় কোথায় সুতো ও জাল হারিয়েছে। ধারণা করছি এসব জায়গায় থাকবে ডুবে যাওয়া জাহাজ। এবার এটা দেখে বলুন কোনও জায়গা বাদ পড়ল কি না।'

চার্টের দিকে চেয়ে রইল দাদু এবেল, একটা একটা করে নক্ষত্র দেখছে। তারপর আঙুল সরতে লাগল উপকূল ভাগ থেকে। কয়েক মুহূর্ত পর মুখ তুলে চাইল।

মানুষটার চোখের তারায় উন্মাদনা, ভাবল কার্টা।

'আমি তো এই এলাকা চিনিই না,' বলল দাদু এবেল।

স্যাণ্ডউইচ বে-র উপর আঙুল রাখল কার্টা। 'এই যে, আমরা এখানে আছি।' এবার আরেক দিক দেখাল। 'আর এই যে কেপ ক্রস।'

'বুঝলাম না,' মাথা নাড়ল দাদু এবেল। আঙুল তাক করল উত্তর দিকে। 'কেপ ক্রস ওদিকে। ওটা আবার কী করে এখানে আসে, মেয়ে?'

কার্টা বুঝল, দাদু এবেল সারাজীবন সাগরে কাটিয়েছে বটে, কিন্তু জীবনে দেখেনি নটিক্যাল চার্ট। মনে মনে নিজের মাথায় চাপড় দিল কার্টা।

পরবর্তী দু' ঘণ্টা বুড়ো জেলের কাছ থেকে জানল, মানুষটা কোথায় কোথায় সুতো বা জাল হারিয়েছে। সাগরের নীচে উপকূল থেকে এক শ' মাইল দূরেও রয়েছে মরুভূমির বালি, ওখানে থাকতেই পারে পাথর ও নিমজ্জিত জাহাজ। এসবই ছিঁড়ে দিতে পারে জাল ও সুতো। দাদু এবেল জানাল, স্যাণ্ডউইচ বে থেকে দুই দিনের পথ দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে একটা জায়গা। বা পাঁচ দিন উত্তর-পশ্চিমে মিলবে আরেকটা খারাপ জায়গা। প্রতিটি এলাকার বর্ণনা দিল বুড়ো, আর সে অনুযায়ী মানচিত্রের নক্ষত্র দেখে নিল কার্টা। ব্যবসায়ী-জেলে বা ওয়ালভিসের ক্যাপ্টেনদের কাছ থেকে আগেই যেসব জেনেছে, সেগুলো নতুন করে টুকল না।

দাদু এবেলের কথা অনুযায়ী, মাত্র একটি জায়গা পাওয়া গেল। ওটার কথা আগে কেউ বলেনি। অন্যান্য চিহ্ন থেকে কমপক্ষে সত্তর মাইল দূরে। দাদু এবেল জানাল, সাগরের ওদিকে মাছ নেই বললেই চলে। কোর্স থেকে সরে যেতে হয়েছিল, ওখানে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় পাগলা হাওয়া।

চার্টে নক্ষত্র এঁকে নিল কার্টা, দেখল ওদিকের সাগর দেড় শ' ফুট গভীর। ওর যা সংক্ষিপ্ত বিদ্যা, দেড় শ' ফুট নীচে স্কুবা ডাইভ করতে হলে ঝুঁকি নিতে হবে। অবশ্য ভয় পাবে না। সমস্যা অন্যখানে, খুব পরিষ্কার পানিতেও অত গভীরে কিছুই বোঝা যায় না। হয়তো বুঝবেই না একটু দূরেই ডুবে যাওয়া জাহাজ পড়ে আছে। হেলিকপ্টারে করে ওই এলাকার উপর চক্কর কেটেও খুব একটা সুবিধা হবে না।

চোখে কল্পনা এঁকে ভবিষ্যৎ দেখছে ও। নিষেধ করল দাদু এবেল, 'ভুলেও ওখানে যেয়ো না।'

বৃদ্ধের উপর মনোযোগ ফিরিয়ে আনল কার্টা। 'কেন, দাদু এবেল?'

'ওই সাগরে আছে ধাতুর তৈরি বিশাল সাপ। আমার মনে হয় ওগুলো তৈরি করেছে কোনও দুষ্ট জাদুকর।'

'ধাতব সাপ?' নাক কুঁচকে ফেলল রন কুবলিকি।

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল বৃদ্ধ জেলে, আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল চেহারা। 'তুমি দাদু এবেলকে মিথ্যুক ভাবছ?' বজ্রের মত গর্জে উঠল। একগাদা ছিটানো থুতু গিয়ে পড়ল রন কুবলিকির মুখের উপর। 'ওরকম বারোটার বেশি সাপ আছে। কয়েক শ' ফুট লম্বা, পানির ভিতর শরীর মুচড়ে চলেছে। তারই একটা আরেকটু হলে আমার নৌকা ডুবিয়ে দিত। হাঁ করে গিলে নিত নৌকা, কিন্তু শেষ সময়ে দুনিয়ার সর্বকালের সেরা নাবিক নিজের জান বাঁচাতে পেরেছে। যদি দেখতে ওই সাপ, তুমি মুতে দিতে, শিশু বাচ্চার মত ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদতে।' পাগলাটে দৃষ্টি ফেলল সে মেয়েটির চোখে। 'পরে আবার বোলো না দাদু এবেল তোমাদেরকে সাবধান করেনি। যাও তা হলে ওখানে, তোমাদেরকে গিলে ফেলবে ওগুলো। এবার বিদায় হও এখান থেকে!' ছোট্ট আগুন ও ধোঁয়ার সামনে বসল সে, দুলে দুলে দুলতে লাগল। কোন্ এক অচেনা ভাষায় বিড়বিড় করে কীসব বলছে।

বৃদ্ধকে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়ল কার্টা, কিন্তু জবাবে কিছু বলল না জেলে। ইনফ্লেটেবল বোটের কাছে ফিরল কার্টা ও কুবলিকি, ফিরতি পথে রওনা হলো। পিছনে পড়ে গেল জেলের খুদে আস্তানা। নলখাগড়ার ভিতর দিয়ে আবারও মূল লেগুনে বেরিয়ে এল ওরা। বড় করে দম ফেলল কুবলিকি। 'ব্যাটা আস্ত পাগল! ...ধাতব সাপ? ...শুনলে হাসবে লোকে!'

'দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ, হোরেশিয়ো, দ্যান আর ড্রেম্ট্ অভ ইন ইয়োর ফিলোসফিয।'

'কী বলতে চাইছেন?'

'হ্যামলেটের ছত্র, তাতে বলা হয়েছে, আমরা যতটা কল্পনা করি, তার চেয়ে অনেক বিস্ময়কর এই দুনিয়া।'

'আপনি নিশ্চয়ই ওই পাগলের কথায় কান দেবেন না?'

'ধাতব সাপের ব্যাপারে? না, বিশ্বাস করিনি। তবে নিশ্চয়ই ওখানে কিছু দেখেছে ও, নইলে এত ভয় পেত না।'

'আমার ধারণা, ওটা কোনও সাবমেরিন। হয়তো দক্ষিণ আফ্রিকান নেভি এদিকের সাগরে টহল দিয়েছে।'

'হতে পারে।' কয়েক মুহূর্ত পর বলল কার্টা, 'আমাদের হাতে এখন অনেক কাজ। অন্তত চোদ্দোটা জায়গায় যেতে হবে। ধাতব সাপ বা সাবমেরিন নিয়ে ভাবার সময় আছে? আজ বিকেলে লাজরাসের সঙ্গে কথা বলব। ঠিক করে নিতে হবে কোন্ পথে এগুব আমরা।'

সূর্য উঠবার একটু আগে বিলাসবহুল সোয়াকোপ্‌মুণ্ড হোটেলে পৌঁছুল ওরা। নিজের রুমে ফিরে দীর্ঘ শাওয়ার নিল কার্টা, দেহ থেকে বিদায় করল কচকচে বালির কণা ও সামুদ্রিক লবণের আঁশটে গন্ধ। স্নান শেষে তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছে উঠল আরামদায়ক বিছানায়। চাদর টেনে নিল বুক পর্যন্ত। কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়ল। ওর স্বপ্নে হাজির হলো সাগরের বিশাল সব সাপ, একটা আরেকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

পাঁচ

জাহাজের সুপারস্ট্রাকচারের পিছনে বেশ নীচে গ্যারাজ, সেদিকে ছুটে চলেছে রানা। কমিউনিকেশন ইউনিট থেকে শুনছে ড্যামেজ রিপোর্ট। খালি করা হয়েছে বিলজ। এরপরও ভেসে ওঠেনি মার্ভেল। অবশ্য নদীর তলার থকথকে কাদা আটকে রাখতে পারবে না জাহাজকে। কিলের দরজার কারণে চিন্তিত হয়ে পড়েছে রানা। জাহাজের নীচে রয়েছে প্রকাণ্ড দুটো কবাট, বাইরের দিকে খোলে, তৈরি হয় মুন পুল। ওখান দিয়ে সাগরে বেরোয় মার্ভেলের সাবমারসিবল দুটো। সেগুলোর একটি পানির এক হাজার ফুট নীচে নামতে পারে, সামনে রয়েছে ম্যানিপুলেটার বাহু, যে-কোনও জিনিস শক্ত করে ধরতেও পারে। দ্বিতীয় সাব-মারসিবলটি অগভীর পানিতে কাজ করে।

রানা জানতে চাওয়ায় মুন পুল থেকে ডিউটিরত টেকনিশিয়ান জানিয়ে দিল, কবাট দুটো ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। নিরাপদে ক্রেডলে ঝুলছে সাবমারসিবল দুটো।

এক মিনিট পেরুনোর আগেই বোট গ্যারাজে পৌঁছে গেল রানা। প্রকাণ্ড গুহার মত কামরায় জ্বলছে ব্যাটল ল্যাম্প, চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে রক্তিম আলো। বাতাসে ভাসছে নোনা পানি ও গ্যাসোলিনের গন্ধ। মার্ভেলের পিছনে, এক পাশে রয়েছে বড়সড় দরজা, আপাতত বন্ধ। ক্রুরা দ্রুত হাতে গুছিয়ে দিচ্ছে কালো

যোডিয়াক ইনফ্লেটেবল। ওটার ট্র্যানসমে প্রকাণ্ড এক আউটবোর্ড ইঞ্জিন, চল্লিশ নটের বেশি গতি তুলতে পারে। রয়েছে ছোট একটি ইলেকট্রিক মোটর, ওটা নিঃশব্দে ঠেলে নিয়ে যায় রাফট। এ ছাড়া গ্যারাজে রয়েছে গভীর খোলওয়ালা সিল অ্যাসল্ট বোট, প্রচণ্ড গতি তুলতে সক্ষম। ওটাতে বসতে পারে দশজন সশস্ত্র যোদ্ধা।

দশ সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল নিশাত ও জলিল। জঙ্গলের ধারে, ডকে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ হেলম্‌স্‌ম্যানের ভঙ্গি করেছে কমাণ্ডো, আর ক্যাপ্টেনের নিখুঁত অভিনয় করেছে নিশাত। এখন ওদের পরনে কালো কমব্যাট ফেটিগ, বেল্ট থেকে ঝুলছে অ্যামিউনিশন পাউচ, ছোরা এবং অন্যান্য গিয়ার। ওদের সঙ্গে রয়েছে এম-৪এ১ অ্যাসল্ট কারবাইন। অস্ত্রটি এম-১৬-এর আধুনিক সংস্করণ। আজকাল আমেরিকান স্পেশাল ফোর্স ওটাই ব্যবহার করছে।

'কী কাজে চলেছি, স্যর?' জানতে চাইল নিশাত।

'আপনি তো জানেন আটকা পড়েছে মার্ভেল। বর্ষা মৌসুম আসতে বহু দেরি, তার আগে ছাড়া পাবে না। কিন্তু আমাদের হাতে সময় মোটেই নেই। ...নিশ্চয়ই মনে পড়ে কয়েক মাইল আগে একটা বাঁধ ফেলে এসেছি?'

'মাসুদ ভাই, আপনি চান আমরা বাঁধ উড়িয়ে দেব?' অবিশ্বাস নিয়ে বলল জলিল।

'না, তা চাই না। তোমরা বাঁধে উঠবে, খুলে দেবে ফ্লাডগেটগুলো। মনে করি না ওখানে গার্ড আছে। যদি থেকেও থাকে, কাউকে গুরুতর আহত করবে না।' নিশাত ও জলিল মাথা দোলাল। এবার বলল রানা, 'ফ্লাডগেট খুলে গেলে হুড়মুড় করে চলে আসবে পানি। একবার মার্ভেলকে ভাসিয়ে তুললেই এগুতে পারব। ফলে তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। তোমরা উপকূলে বোমা শহরে চলে আসবে। ওখান থেকেই তোমাদেরকে

পিক করব।'

'ভাল প্ল্যান,' বলল নিশাত।

রানা জানে, শত বাধা এলেও পিছাবে না দুজনের কেউই।

সুইচ টিপে ওয়াল মাইক চালু করল রানা। 'নবী, কখন গ্যারাজের দরজা খোলা যাবে, জানাও। আপা আর জলিল যোডিয়াক নিয়ে নদীতে নামবে। ...প্যাট্রল বোটগুলো কোথায়?'

'দূরে ভাসছে একটা, মনে হয় আরও মর্টার ফেলবে। অন্যটা এইমাত্র আমাদের স্টার্ন পেরুল। চলে আসছে পোর্ট সাইডে।'

'তীর থেকে কোনও হামলা আসতে পারে?'

'ইনফ্রারেড বলছে আশপাশে কেউ নেই। তবে যে-কোনও সময়ে চলে আসতে পারে কর্নেল মাধানা।'

'ঠিক আছে, নবী।' মার্ভেলের ক্রুদের দিকে চেয়ে ইশারা করল রানা। প্রায় নিঃশব্দে উপরের দিকে উঠে গেল গ্যারাজের দরজা। জাহাজের ভিতর ঝাঁপিয়ে এল জঙ্গলের পচে যাওয়া গাছ ও ঝোপঝাড়ের বদ গন্ধ, সঙ্গে হাজির হয়েছে বাইরের প্রচণ্ড গরম। বাতাস এতই ভেজা, ওদের মনে হলো দম আটকে পানির নীচে সাঁতরে চলেছে। জাহাজ ঘিরে তৈরি করা হয়েছে ধোঁয়ার স্ক্রিন, তা থেকে আসছে কেমিক্যালের কড়া ঘ্রাণ। নদীর তীর কুচকুচে কালো, প্রকাণ্ড সব গাছ মিলে তৈরি করেছে ঘন অরণ্য। নবী বলেছে আপাতত দু' তীরে কেউ নেই, কিন্তু রানার অন্তর বলছে, অসংখ্য সৈনিক নিয়ে ছুটে আসছে মাধানা।

কাদার ভিতর মার্ভেল আটকা পড়ায় অনেক উঁচুতে রয়েছে ওটার ডেক। নদী থেকে পাঁচ ফুট উপরে বোট গ্যারাজের লঞ্চ র‍্যাম্প। পিছন থেকে ইনফ্লেটেবল বোটে ধাক্কা দিল নিশাত ও জলিল। পিছলা র‍্যাম্প বেয়ে নেমে গেল কালো বোট, ঝপাস্ করে গিয়ে পড়ল নদীতে। এবার স্রোতে ভাসতে ভাসতে হারিয়ে যাবে। দেরি না করে ডাইভ দিল নিশাত ও জলিল, পাঁচ সেকেণ্ড পর

ভেসে উঠল ইনফ্লেটেবল বোটের পাশে। ওটার নরম দেহ খপ্ করে ধরল, তারপর গড়িয়ে উঠে গেল উপরে। অস্ত্রগুলো ঠিক ভাবে রাখবার কাজে ব্যস্ত জলিল, ওদিকে ইলেকট্রিক মোটর চালু করেছে নিশাত। ঘুটঘুটে আঁধারে মন্থর গতি তুলে রওনা হলো যোডিয়াক, সহজে কারও চোখে পড়বে না।

আকাশ থেকে বোমার মত নামছে পানির গোলা, নিশাতকে এঁকেবেঁকে এগুতে হলো। মার্ভেলের ওয়াটার ক্যানন দূরে সরিয়ে রেখেছে দুই কপ্টারকে। দূরে মৌমাছির মত গুঞ্জন তুলছে যান্ত্রিক ফড়িংদুটো, তবে তাদের অনেক সরে থাকতে হচ্ছে। এগুতে গিয়ে দুই পাইলট বুঝেছে, পানির ভয়ঙ্কর গোলা লাগলে বিধ্বস্ত হবে কপ্টার।

আকাশযানের ভিতর কী পরিস্থিতি, বুঝতে পারছে নিশাত। অয়েল কোম্পানির পাইলটদেরকে হুমকির পর হুমকি দিয়ে চলেছে গাধাধারের সৈনিকরা। তবে এটাও জানে, জল-কামানের পানি সরাসরি লাগলে থেমে যাবে কপ্টারের টারবাইন, ফলে অনেক উপর থেকে ছিটকে পড়বে নীচের নদীতে। ফলাফল: আকস্মিক মৃত্যু!

ধূম্রজাল থেকে বেরিয়ে এসেছে নিশাত ও জলিল, চারপাশ দেখে নিল। অনেক দূরে দুই প্যাট্রল বোট। নিশ্চিন্ত হয়ে আউটবোর্ড ইঞ্জিন চালু করল নিশাত। চার স্ট্রোকের ইঞ্জিন ভাল ভাবে মাফ্‌ল্‌ড্ করা, তারপরও নিচু গম্ভীর আওয়াজ ছাড়ছে। পানির উপর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভেসে গেল আওয়াজটা। তীব্র গতি তুলে হরিণীর মত ছুটছে ওয়াটার ক্রাফট।

চল্লিশ নট গতিবেগে কোনও কথা বলা অসম্ভব। কাজেই যে যার চিন্তা নিজ মনেই রাখল। শিরার ভিতর দৌড়াচ্ছে অ্যাড্রেনালিন। যে-কোনও বিপদের জন্য তৈরি। উজানের দিকে চলেছে যোডিয়াক। ওরা শুনতে পেল না উঁচু, তীক্ষ্ণ আওয়াজটা।

জানেই না সামনে থেকে ছুটে আসছে বড়সড় একটা বোট। তীর ঘেঁষা এক ছোট দ্বীপের পাশ থেকে বেরুল ওটা।

মনে হলো বুঝি দুই জলযানের ভিতর মুখোমুখি সংঘর্ষ হবে। তীরের মত ডানদিকে বাঁক নিল নিশাত, পলকের জন্য দেখল ভীত-বিস্মিত একটা চেহারা— কর্নেল আদি মাধাভ মাধানা! মুহূর্তের জন্য নিশাতকে দেখতে পেয়েছে সে, চিনেও ফেলেছে!

পুরো থ্রটল খুলে দিল নিশাত, মনে মনে বলল, ছোট্, বাবা, জলদি ভাগি!

ততক্ষণে ঘুরতে শুরু করেছে কর্নেলের বোট, ধাওয়া করবে ইনফ্লেটেবলকে। লোকটার বোট একদম নতুন ও চুরুট আকৃতির, দীর্ঘ। প্রচণ্ড গতি তুলবার জন্য নিচু করে তৈরি খোল, রয়েছে শক্তিশালী দুটি আউটবোর্ড ইঞ্জিন। মাধানা ছাড়াও বোটে রয়েছে চারজন লোক, হাতে একে-৪৭ রাইফেল।

'আপনি ওকে চেনেন, আপা?' গলা ফাটিয়ে জানতে চাইল জলিল।

'হ্যাঁ। জেনারেল টমাস গাধাধারের ডানহাত, কর্নেল মাধানা!'

ঘুরেই তেড়ে এল বোট। যোডিয়াকের সঙ্গে তফাত কমিয়ে আনছে। দূরে দেখা গেল, বোটের স্টার্নে মোরগের লেজের মত পানির ধারা তৈরি হয়েছে।

'জলিল, যদি ব্যাটার সঙ্গে রেডিও থাকে, আমাদের খেলা শেষ।'

'হায় আল্লা, আমি এ কথা ভাবিইনি। আমরা এখন কী করব, আপা?'

'ওরা আসুক,' খপ্ করে রাইফেল তুলে নিল নিশাত, বাড়িয়ে দিল জলিলের দিকে। 'ওদের চোখের সাদা অংশ না দেখা পর্যন্ত গুলি করবে না।'

'ততক্ষণে আমরা মরে ভূত, আপা। রেঞ্জে এলেই গুলি

করব।'

'ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে এক মিনিট অপেক্ষা করো।' থ্রটল নিউট্রাল করল নিশাত। তীক্ষ্ণ বাঁক নিতে শুরু করেছে। রাফটের খোল একেবারেই সমতল, মাটির পাতিলের ভাঙা টুকরো যেভাবে পানির উপর দিয়ে ছিটকে যায়, তেমনি করে ছুটে চলেছে। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে হঠাৎ করেই থেমে গেল, নিজের তৈরি ঢেউয়ের ভিতর দুলতে লাগল। এবার যথেষ্ট ভারসাম্য পাবে, কাঁধে অস্ত্র তুলে তৈরি হয়ে গেল নিশাত ও জলিল।

কমপক্ষে পঞ্চাশ মাইল গতি তুলে আসছে মাধানার বোট। দু' শ' গজ দূরে থাকতে গুলি শুরু করল নিশাত ও জলিল। বদলে বোট থেকে দেখা গেল লাল আগুনের ঝলকানি। পাল্টা জবাব দিচ্ছে একে-৪৭। তবে অনেক বেশি গতি নিয়ে আসছে বোট, ওখান থেকে লক্ষ্যভেদ প্রায় অসম্ভব। যোডিয়াক থেকে অনেক বামে ও দূরে গিয়ে পানিতে পড়ছে বুলেট। মাধানার লোকের মত সমস্যা নিশাত ও জলিলের নেই। দ্রুত কাছিয়ে আসছে বোট, ফলে ওদের লক্ষ্যভেদ আগের চেয়ে ভাল হচ্ছে।

তিন রাউণ্ডের গুলিবর্ষণ করল নিশাত, গুঁড়িয়ে দিল বোটের খুদে উইণ্ডস্ক্রিন। একটা গুলি খুবলে নিল বো-র ফাইবারগ্লাস। ড্রাইভারের উপর মনোযোগ দিয়েছে জলিল, খুব শান্ত ভঙ্গিতে সাবধানে একটা একটা করে গুলি করছে। চতুর্থ গুলিতে লোকটা কাত হয়ে পড়ে গেল ডেকে। কেউ হুইল না ধরায় বাঁক নিয়ে অন্যদিকে রওনা হলো বোট। অবশ্য অন্য এক লোক এসে ধরল হুইল। বাকি তিনজন ম্যাগাযিনের পর ম্যাগাযিন খালি করছে। জলিল ও নিশাতের খুব কাছ দিয়ে গেল এক পশলা গুলি। গায়ে লাগল তপ্ত হলকা। কেউ ওরা বসে পড়ল না, বা চোখের পাতাও ফেলল না। অগ্রসরমান বোটের দিকে হিসাব কষে গুলি করছে ওরা। একজন একজন করে কমছে শত্রু। পরবর্তী ষোলো

সেকেণ্ডে হুইলের পিছনে রইল মাত্র একজন, গুটিসুটি মেরে বসে আছে। দীর্ঘ বো-র কারণে তাকে দেখা যাচ্ছে না।

একই সঙ্গে গুলি করছে নিশাত ও জলিল। হাতের ইশারা করল নিশাত, গুলি করতে থাকুক জলিল। নিজে ও চলে এল ইঞ্জিনের কাছে। শত্রুর বোট মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। সরাসরি যোডিয়াকের দিকেই আসছে। যেন ক্ষিপ্ত হাঙর, ছিঁড়েখুঁড়ে দেবে অসহায় শিকারকে। ওটার ড্রাইভার চাইছে ইনফ্লেটেবলের উপর চড়িয়ে দেবে বোট। লোকটাকে কাছে আসতে দিল নিশাত।

আর মাত্র বিশ ফুট দূরে স্পিডবোট!

এবার থ্রটল খুলে দিল নিশাত, স্পিডবোটের উঁচু বো-র নীচ থেকে সরে যেতে লাগল। আগেই গ্রেনেড বের করেছে জলিল, দু' সেকেণ্ড আগে খুলে ফেলেছে স্পুন, তুলে নিয়েছে পিনও। এবার গ্রেনেড ফেলে দিল ককপিটের ভিতর। পাশ দিয়ে তীরের মত বেরুল বোট। এক এক করে আঙুল গুনতে শুরু করেছে জলিল। ঝপ্ করে বসে পড়ল ওরা। শেষ আঙুল খুলতেই ফাটল গ্রেনেড, পরক্ষণে দেখা গেল স্পিডবোটের ফিউয়েল ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হয়েছে। চারপাশে ছিটকে উঠল কমলা আগুনের শিখা। বোটের খোল চরকির মত পানির উপর দিয়ে আরেক দিকে চলেছে। জ্বলন্ত গ্যাসোলিনের সঙ্গে বৃষ্টির মত নেমে আসছে ফাইবারগ্লাসের অজস্র টুকরো ও ক্রুদের দেহাবশিষ্ট।

'ঠিক জায়গায় ফেলেছ,' সন্তুষ্ট স্বরে বলল নিশাত।

'আপনার দোয়া, আপা।' খুশি হয়ে হাসল জলিল।

পাঁচ মিনিট পর ইনগা ড্যামের কাঠের জেটিতে ভিড়ল যোডিয়াক। মুখ তুলে উঁচু বাঁধের দিকে চাইল ওরা। বিশাল আকৃতির বাঁধ, ফেরো-কংক্রিট ও রড দিয়ে তৈরি। নদীর উজানে আটকে রেখেছে বিপুল পরিমাণের পানি। দিনের বেলায় প্রকাণ্ড ওই রিযারভয়েরের হাইড্রো-ড্যাম থেকে মেলে প্রচুর

ইলেকট্রিসিটি। প্রাক্তন কাটাঙ্গা প্রভিন্সের সাবা'র খনিগুলো তাতেই চলে। আপাতত গাই-গরুর প্রস্রাবের মত সামান্য পানি বেরুচ্ছে ফ্লাডগেট দিয়ে। নদী থেকে টেনে হিঁচড়ে যোডিয়াক তুলল ওরা, শক্ত করে বাঁধল এক গাছের সঙ্গে। কে জানে, কত উঁচু হয়ে ছুটে আসবে প্লাবন!

বাঁধের বুকে রয়েছে সিঁড়ি, অনেক উপরে উঠতে হবে; যে যার অস্ত্র কাঁধে ঝুলিয়ে নিল নিশাত-জলিল, তারপর দৌড়ে উঠতে শুরু করল।

ওরা মাত্র সিঁড়ির আধাআধি উঠেছে, এমন সময় নীচ থেকে শুরু হলো প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ। মুহূর্তে ছিঁড়েখুঁড়ে গেল নীরবতা। ওদের চারপাশে এসে ছিটকে লাগছে শ্র্যাপনেল ও ভাঙা কংক্রিট। সিঁড়ির মাঝে একদম খোলা জায়গায় আটকা পড়েছে ওরা। দেরি না করে ধাপের উপর শুয়ে পড়ল, পাল্টা জবাব দিল রাইফেল কাঁধে তুলে। বহু নীচে জেটিতে এসে ভিড়েছে স্থানীয় দুটো ডিঙি নৌকা। ডক থেকে আসছে অজস্র গুলি। ওই দলের ক'জন দৌড়ে উঠে আসছে বাঁধের সিঁড়ি বেয়ে।

'এখন বুঝলাম মাধানার সঙ্গে রেডিও ছিল,' তিক্ত স্বরে বলল জলিল। কাঁধ থেকে এম-৪ নামিয়ে পাশে রাখল, ওটার গুলি শেষ। হোলস্টার থেকে বের করে নিল গ্লক পিস্তল। নতুন উদ্যম নিয়ে নীচের সিঁড়ির দিকে গুলি শুরু করল। পাশেই নিশাত, ডক লক্ষ্য করে অ্যাসল্ট রাইফেলের ৫.৫৬ এমএম রাউণ্ড ছুঁড়ছে।

প্রায় দৌড়ের ভঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে তিনজন লোক। খেঁকিয়ে উঠল জলিলের পিস্তল। বুকে দুটো গুলি নিয়ে পড়ে গেল প্রথম লোকটা। রক্তাক্ত লাশ ওখানেই থামল না, জড়িয়ে পেঁচিয়ে সবাইকে নিয়ে নেমে গেল নীচে। পিস্তল রেখে এম-৪-এর ম্যাগাযিন বদলে নিল জলিল। তত্ক্ষণে ডক থেকে গুলি আসা প্রায় থেমে গেছে। একটি মাত্র একে-৪৭ এখনও

জবাব দিচ্ছে। তারপর সেটাও থেমে গেল। নিশাতের এক পশলা গুলি ডক থেকে ছিটকে নদীতে ফেলল লোকটাকে। জোরালো স্রোত টেনে নিল মৃতদেহকে, তবে কয়েক ফুট গিয়েই ডুবে গেল ওটা।

নিশাত ও জলিল থমকে গেছে। বাঁধের উপর থেকে ভেসে আসছে কান ফাটানো ঘণ্টি, সবাইকে সতর্ক করা হচ্ছে।

'জলদি চলো!' তাড়া দিল নিশাত। এক শ' মিটার স্প্রিন্টের ভঙ্গিতে ছুটতে শুরু করেছে ওরা। একেকবারে দুই থেকে তিন ধাপ টপকে উঠছে।

দেখতে না দেখতে বাঁধের উপর পৌঁছে গেল। ওপাশে রয়েছে প্রকাণ্ড রিযারভয়ের। একপাশে চৌকো আকৃতির দালান। ওটার জানালা থেকে আসছে উজ্জ্বল আলো।

'কন্ট্রোল রুম, আপা?' বলল জলিল।

'তাই তো মনে হয়, জলিল,' থুতনির পাশে থ্রোট মাইক নিল নিশাত, বলে উঠল, 'স্যর, আমি নিশাত। আমরা বাঁধের উপর। কন্ট্রোল সেন্টারের দিকে চলেছি।' বাড়তি কিছু বলবার দরকার নেই, আওয়াজ শুনেই মাসুদ স্যর বুঝবে ওদের বিনা অনুমতির প্রবেশ ধরা পড়েছে।

'গুড, আপা। গেটগুলো খোলার ব্যবস্থা করুন।'

'ঠিক আছে।'

কুঁজো হয়ে ছুটতে শুরু করেছে ওরা। নক্ষত্র জ্বলা আকাশের পটভূমিতে ওদেরকে চট করে কেউ দেখবে না। বাঁধের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। বামদিকে ছড়িয়ে রয়েছে বিশাল রিযারভয়ের। অতি শান্ত লেক, চকচক করছে চাঁদের আলো পড়ে। ডানে এক শ' ফুট নীচে বোল্ডারে ছাওয়া জমিন। ওখান থেকেই উঠে এসেছে প্রকাণ্ড বাঁধ।

চৌকো সাদা দালানের সামনে পৌঁছে গেল ওরা। বাড়িতে

একটি মাত্র দরজা, দু' দিকে দুটো জানালা। দালানের পিছনে, বাঁধের নীচের দিকে দীর্ঘ এক দালান, ওখানে টারবাইনকে পানি ভাগ করে দেয় স্লুইস গেট ও পেনস্টক। আপাতত কয়েকটি চ্যানেলে ছুটছে পানি, ওই কারেন্টের কারণে তৈরি হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি, সেটা দেয়া হচ্ছে মাবাতি শহরকে।

চৌকো দালানের দরজার সামনে থামল নিশাত। পাশেই জলিল, বাগিয়ে ধরেছে পিস্তল। নব ধরে মোচড় দিল নিশাত, কিন্তু ওটা খুলল না। তালার ফুটোর দিকে ইশারা করল জলিল, ভাব দেখে মনে হলো ওর কাছে চাবি আছে। নিশাতের দিকে চেয়ে বার কয়েক ভুরু নাচাল। আতাসি ও রানার কাছ থেকে তালা খুলবার সব কৌশলই শিখেছে ওরা। কিন্তু সে সব যন্ত্র সঙ্গে আনেনি।

চোখ পাকিয়ে জলিলের দিকে চাইল নিশাত। নিজেও আনেনি পিকলক। বেল্টে হাত চলে গেল ওর, পাউচ থেকে বের করে নিল সামান্য সেমটেক্স প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। দরজার হাতলে পেঁচিয়ে দিল প্লাস্টিক, তার ভিতর গেঁথে দিল ইলেকট্রনিক ডেটোনেটার।

একটু দূরে গিয়ে থামল ওরা। ডেটোনেট করবে, তার আগেই ব্লক-হাউসের কোনা ঘুরে বেরুল এক প্রহরী। লোকটার পরনে কালো ইউনিফর্ম, ডানহাতে পিস্তল, বামহাতে ফ্ল্যাশলাইট। অভ্যাস বসে তার বুকে পিস্তল তাক করল জলিল, ট্রিগারে চেপে বসছে তর্জনী। তবে শেষ মুহূর্তে নিশানা বদলে নিল, গুলি করল প্রহরীর পিস্তলে। ঝটাং করে ছিটকে বেরিয়ে গেল অস্ত্রটা। শিয়ালের ডাকের মত চিৎকার শুরু করেছে লোকটা। ধপ্ করে বসে পড়েই বামহাতে চেপে ধরেছে ডান পাঞ্জা। কয়েক পা গিয়ে তার সামনে থামল জলিল, আগেই বের করে ফেলেছে ফ্লেক্স কাফ, দেরি না করে প্রহরীর দুই হাত আটকে দিল। চট্ করে দেখে নিল সে কতটা আহত। প্রায় কিছুই হয়নি, শুধু মচকে গেছে

কব্জি। লোকটার দুই গোড়ালি শক্ত করে বেঁধে দিল জলিল, মুখে গুঁজে দিল রুমাল। চিত করে শুইয়ে দিল তাকে। চোখ বড় বড় করে ওর দিকে চেয়ে রইল লোকটা। কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এল, 'কঁকঁক্!'

'কিছু মনে নিয়ো না, সোনাভাই মোরগ,' কানের কাছে বলেই নিশাতের পাশে ফিরল জলিল।

এবার চার্জ ফাটিয়ে দিল নিশাত। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে বেরিয়ে গেল হাতল। দেরি না করে এক লাথিতে দরজা খুলল নিশাত, এম-৪ হাতে সামনের দিক কাভার করল। প্রায় দৌড়ে ঢুকে পড়ল ওরা ঘরে।

কন্ট্রোল রুমে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। এক দেয়াল জুড়ে অসংখ্য ডায়াল ও লিভার, পাশের দেয়ালে তাক ভরা প্রাচীন কমপিউটার। নিশাত ও জলিল অস্ত্র হাতে ঢুকতেই চমকে গেছে রাতের তিন অপারেটার। মুখ শুকিয়ে গেল তাদের।

'সোজা মেঝেতে শুয়ে পড়ো!' হুমকির সুরে বলল নিশাত। 'মেঝেতে! জলদি!'

লোকগুলো বোধহয় ইংরেজি জানে না।

তারপর একজন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, মাথার উপর তুলে ধরেছে হাত। ধুলোভরা মেঝের উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। ভীষণ ভয়ে বিস্ফারিত চোখ।

তাকে অনুকরণ করল অন্য দু'জন।

'যা বলব, ঠিক ভাবে মানলে আপনারা মরবেন না,' বলল জলিল। বুঝতে পারছে, আতঙ্কিত লোকগুলোর কাছে কেমন লাগছে ওর কথা।

দালান বলতে বড় এই ঘর, কবুতরের খুপরির মত টয়লেট ও একটি কনফারেন্স রুম। টয়লেটে তিন ইঞ্চি লম্বা একদল তেলাপোকার রাজত্ব। এক চক্কর চারপাশ ঘুরে এল নিশাত।

তিন অপারেটারকে বসিয়ে তাদের হাত কোমরের পিছনে নিয়ে গেল জলিল, আটকে দিল হাতকড়া।

'আমাদেরকে মেরে ফেলবেন?' করুণ স্বরে জানতে চাইল একজন। পরনে তার নীল জাম্পসুট, ইংরেজি সে-ই বলছে। বুকের আইডি কার্ডে লেখা: অদ্রে মাকাবো। টেকনিশিয়ান, ইনগা ড্যাম।

'মাকাবো, আগেই বলেছি, আমরা আপনাদের ক্ষতি করব না। তবে আপনাদেরকে বলতে হবে কীভাবে খোলা যায় ইমার্জেন্সি ফ্লাডগেটগুলো।'

'আপনারা রিযারভয়ের খালি করে দেবেন?'

এক পাশে টেবিলের উপর বেশ কয়েকটা টেলিফোন। একটা ছাড়া অন্যগুলোর লিস্ট কল জ্বলজ্বল করছে। 'আপনারা এরই ভিতর উর্ধ্বতন কমকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন,' বলল নিশাত। 'নিশ্চয়ই লোক পাঠাবে তারা। আমরা মাত্র এক ঘণ্টার জন্য গেট খুলে দেব। ...এবার দেখান কীভাবে অপারেট করতে হয়।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল অদ্রে মাকাবো। জলিল হোলস্টার থেকে বের করে ফেলেছে পিস্তল। অবশ্য কারও দিকেই তাক করেনি। ভয়ঙ্কর চেহারা করে বলল, 'আপনাকে পাঁচ সেকেণ্ড সময় দিলাম। এরপর গুলি করব।'

'ওই যে ওই প্যানেল,' দূরের দেয়াল দেখিয়ে দিল মাকাবো। 'উপরের পাঁচটা সুইচ সেফটি প্রটোকল ডিযএনগেজ করবে। পরের পাঁচটা গেটের মোটরগুলোর সার্কিট থামিয়ে দেবে। শেষের পাঁচটা খুলে দেবে গেটগুলোকে।'

'এসব গেট ম্যানিউয়ালি বন্ধ করা যায়?'

'হ্যাঁ। বাঁধের উপর বড় একটা হুইল আছে। ওটা ঘোরাতে হলে কমপক্ষে দু'জনকে লাগে।'

দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে নিশাত, কোনও গার্ড এলে ঠেকাবে। প্যানেলের সুইচগুলো অফ করছে জলিল। খেয়াল করল লাল জ্বলজ্বলে বাতি নিভছে, বদলে জ্বলে উঠছে সবুজ বাতি। তৃতীয় সারির সুইচ অফ করবার আগে থ্রোট মাইকে বলল, 'মাসুদ ভাই, তৈরি হোন। আমরা গেট খুলে দিচ্ছি।'

'ঠিক সময়ে যোগাযোগ করেছ,' বলল রানা। 'সুইফট বোট থেকে মর্টার সরিয়ে তীরে বসিয়ে নিয়েছে মাধানা। কয়েক রাউণ্ড ফেললেই বুঝবে কোথায় তাক করতে হবে।'

'কঙ্গোলিজ সরকারের কমোডের ফ্লাশ টেনে দিলাম,' বলেই শেষ সুইচগুলো নামিয়ে দিল জলিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিচু আওয়াজ শুরু হলো। কয়েক সেকেণ্ড পর আওয়াজ হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর, কান ফাটিয়ে দিতে চাইল। থরথর করে কাঁপছে দালান। উপরের দিকে উঠে আসছে ফ্লাডগেটগুলো। শুরু হয়েছে বজ্রের মত গর্জন। লক্ষ লক্ষ গ্যালন পানি নিরেট দেয়ালের মত গিয়ে পড়ছে নদীর খাদে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ এলো। নদীতে শুরু হয়েছে আট ফুট উঁচু প্লাবন। ভেসে গেল দুই তীর। গাছ ও ঝোপঝাড় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। ক্রমেই বাড়ছে পানির প্রাচীরের গতি ও উচ্চতা।

'বোধহয় এতেই চলবে,' বলল জলিল। প্যানেলের উপর কারবাইন তাক করেছে, গুলি শুরু হতেই পাতলা ধাতুর তৈরি প্যানেল ও পুরনো ইলেকট্রনিক্স নানা দিকে ছিটকে গেল। ছেঁড়া তার থেকে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎশিখা।

'চলো এবার,' তাড়া দিল নিশাত। 'তার আগে এদের আটকে নাও।'

একে একে টেকনিশিয়ানদের বামহাতের কাফ খুলল জলিল। নিশাত অস্ত্র তাক করে রাখল, সে সুযোগে ভারী টেবিলের পায়ার সঙ্গে লোকগুলোর হাত আটকে দিল জলিল।

এরপর আর অপেক্ষা করল না, বাড়িটা থেকে বেরুল ওরা, দৌড়াতে শুরু করে কয়েক মুহূর্ত পর পৌঁছে গেল সিঁড়ির চাতালে। চারপাশে পানির প্রচণ্ড গর্জন। উড়ছে কোটি জলকণা। একটু দূরেও দেখা যায় না। মুহূর্তে ভিজে গেল ওদের পোশাক।

সিঁড়ি বেয়ে ছুটে নামতে শুরু করল ওরা। একবার মৃতদেহের রক্তে পা পিছলে গেল নিশাতের। কোনওমতে সামলে নিল। নীচে নেমে এল ওরা, দু'জন মিলে যোডিয়াক নিয়ে গেল নদীর তীরে। আগের চেয়ে একটু শান্ত হয়েছে প্লাবনের তোড়, সাবধানে ইনফ্লেটেবল ভাসাল ওরা, তারপর চট্ করে উঠে পড়ল।

ওদের যেতে হবে অনেক ভাটিতে, বোমা শহরে।

এদিকে, দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসে পূর্ণ সতর্কাবস্থায় অপেক্ষা করছে মাসুদ রানা। কর্নেল মাধানা বুঝে গেছে, সুইফট বোট বড় বেশি অস্থির, ওখান থেকে মর্টার ফেলে সুবিধা হবে না। জঙ্গল ও নদীর তীরে মর্টার বসিয়েছে সে, তার গোলন্দাজরা এখন ডায়াল করে ঠিক করছে রেঞ্জ। শেষ গোলা পড়েছে মার্ভেলের স্টারবোর্ডের রেলিঙের বিশ ফুট দূরে।

সমস্যা শুধু সেটাই নয়, উজান থেকে হাজির হচ্ছে একের পর এক স্থানীয় নৌকা। তাতে গিজ গিজ করছে গাধাধারের সৈনিক। এখন পর্যন্ত মার্ভেলের জল-কামান ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে: ওই কামান রয়েছে মাত্র চারটে। সবসময় দুটো লাগছে দুই হেলিকপ্টারতে সরিয়ে রাখতে। একটু সুযোগ পেলেই জাহাজে নেমে আসবে বিদ্রোহী সেনারা।

রেইডার ডোম থেকে রায়হানকে ফিরিয়ে এনেছে রানা। প্রতিরক্ষা বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে স্বর্ণার উপর। ডেকের উপর উঠে গেছে সে। ওরা শুধু পিস্তল ব্যবহার করবে, বলে দিয়েছে রানা। একটু আগে নবী জানিয়েছে, খুব কাছে ভিড়ে

এসেছে একটা নৌকা। স্বর্ণারা উপর থেকে গুলি করছে ওটার দিকে। জঙ্গল থেকে ওদের দিকে আসছে অজস্র গুলি।

'ঠিক আছে,' কমিউনিকেশন স্টেশন থেকে বলে উঠল রায়হান। 'টেকনিশিয়ানরা রেইডার ঠিক করেছে।'

'দূর থেকে প্লাবন দেখতে পাবে?' জানতে চাইল রানা।

'না, নদীতে বাঁক অনেক বেশি। একেবারে শেষ সময় ছাড়া কিছুই দেখব না।'

'তাই বা কম কোথায়।'

জাহাজের পাশে এসে পড়ল আরেকটা মর্টার শেল, এক ইঞ্চির ফারাকে পোর্ট রেইলে লাগল না। মাধানার গোলন্দাজরা লক্ষ্যস্থির করেছে। পরের রাউণ্ড ভয়ঙ্কর ক্ষতি করবে। মার্ভেলের সামনে-পিছনে এবং দু'পাশ আর্মার্ড স্টিল দিয়ে তৈরি, কিন্তু সে তুলনায় ডেক অনেক দুর্বল।

'তৈরি হয়ে নাও ড্যামেজ কন্ট্রোল টিম,' শিপবোর্ড নেটে বলল রানা। 'এবার গোলা পড়বে।'

'আরি আল্লাহ্,' চেঁচিয়ে উঠল রায়হান।

'কী?'

'শক্ত করে কিছু ধরুন!'

কলিশন অ্যালার্ম বাজিয়ে দিল রানা। এইমাত্র রেইডার স্ক্রিন ও বিশাল মনিটরে দেখেছে, পিছন থেকে আসছে প্রকাণ্ড জল-প্রাচীর— এক তীর থেকে আরেক তীর জুড়ে। উচ্চতা হবে অন্তত দশ ফুট। কমপক্ষে বিশ নট গতি তুলে গড়িয়ে আসছে অ্যানাকোণ্ডার মত। একটা সুইফট বোট বাঁক নিয়ে প্লাবনের আগে ছুটতে চাইল। কিন্তু পুরো বাঁক নেয়ার আগেই হাজির হলো জলোচ্ছ্বাস। বোটকে পাশ থেকে ধাক্কা দিল জল-প্রাচীর। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে ছিটকে পড়ল আরোহীরা। এবং ঠিক তখনই মানুষগুলোর উপর কাত হয়ে পড়ল ভারী বোট। মুহূর্তে সলিল

সমাধি হলো মানুষ ও বোটের।

আরোহী নিয়ে এক পলকে তলিয়ে গেল স্থানীয় নৌকাগুলো, কোথাও কোনও চিহ্ন থাকল না। যারা জঙ্গলের ধারে রাইফেল ও মর্টার নিয়ে ব্যস্ত, সব ফেলে ঠেলাঠেলি করে পালাতে লাগল তারা— উঁচু জমিতে পৌঁছুতে না পারলে নিশ্চিত মৃত্যু! জল-প্রাচীরের গতিপথে যাই পড়ল, সবই ভাসিয়ে নিয়ে গেল ওটা।

মার্ভেলের কন্ট্রোল নিজ হাতে নিয়েছে রানা, তবে জল-প্রাচীর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। প্লাবনও এল, ওর আঙুলগুলো পিয়ানো-বাদকের আঙুলের মত নাচতে লাগল কন্ট্রোলের উপর। থমথম করছে মুখ। ও যেন এমন এক বাদক, ভাল করেই জানে ওই সুর কেউ কখনও তুলতে পারবে না। কি বোর্ডের উপর স্থির হলো ওর আঙুল। ডানহাতে ধরেছে জয়স্টিক।

আংশিক খোলা ড্রাইভ টিউবকে বিশ পার্সেন্ট শক্তি দিল রানা। জলোচ্ছাস আসতেই কাদা থেকে উঠে এসেছে মার্ভেলের স্টার্ন। মনে হলো সুনামির ভিতর পড়েছে জাহাজ। একদম স্থির অবস্থা থেকে এক মুহূর্তে বিশ নট গতি পেল। পিছনের নদীতে বিস্ফোরিত হলো দুটো মর্টারের শেল। মার্ভেল আগের জায়গায় থাকলে ওটার রিয়ার কার্গো হ্যাচ বিধ্বস্ত হতো, রিট্র্যাকটেবল এলিভেটরের উপর ধ্বংস হতো এমডি-৫২০এন হেলিকপ্টার।

ইঞ্জিন রিডআউট, পাম্প টেম্পারেচার, বটম স্পিড, ওয়াটার স্পিড, ওদের পজিশন ও কোর্স— বারবার সব দেখছে রানা, চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে একের পর এক স্ক্রিনে। আসলে পানির ভিতর মাত্র তিন নট গতি তুলছে মার্ভেল। কিন্তু বাঁধ ভাঙা নদীর জলোচ্ছ্বাস কমপক্ষে পঁচিশ নট গতি তুলে নিয়ে চলেছে জাহাজকে। পিছন থেকে তাড়া দিচ্ছে ইনগা ড্যামের বিপুল পরিমাণের পানি।

আফতাব চলে গেছে ইঞ্জিন রুমে। মুখ না তুলেই প্রিয় বন্ধুকে

বলল রানা, 'সোহেল, অন্য টিউব পরিষ্কার হলেই জানাবি। আমি যথেষ্ট স্টিয়ারেজ স্পিড পাচ্ছি না।'

গ্রটল সামনে বাড়িয়ে দিল ও। স্রোতের বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করেছে। উথাল-পাতাল ঢেউ সামনের এক দ্বীপের উপর আছড়ে ফেলতে চাইল মার্ভেলকে। কি বোর্ডের উপর নাচছে রানার আঙুলগুলো। জাহাজ সোজা রাখতে বো এবং স্টার্ন থ্রাস্টারগুলো কাজে লাগাল। একই সঙ্গে সোজা করে নিচ্ছে জাহাজ। দু'পাশে বিদ্যুদ্বেগে পিছিয়ে চলেছে গহীন অরণ্য।

ওরা পেরিয়ে এল দ্বীপ, সামনে পড়ল তীক্ষ্ণ এক বাঁক। মার্ভেলকে পাশ থেকে ঠেলছে প্লাবনের তোড়, যেন আছড়ে ফেলবে ওদিকের তীরে। ভাটি থেকে আসছিল এক ছোট কার্গো জাহাজ, ওটার বো গেঁথে গেছে তীরে। তবে কঙ্গো নদীর কিছু অংশ দখল করে রেখেছে ওটার স্টার্ন। থ্রাস্টারগুলোর পুরো ক্ষমতা ব্যবহার করল রানা, যেন পানি থেকে তুলে সরিয়ে নিতে চাইল মার্ভেলকে। দ্রুত গতিতে স্টারবোর্ডে সরছে জাহাজ, তবে শেষ রক্ষা হলো না। উপকূলীয় ফ্রেইটার ঘেষটে এগোলো ওরা। প্রচণ্ড আওয়াজ শুরু হলো। কানে তালা ধরে গেল। দু' সেকেণ্ড পর সরে গেল দুই জাহাজ। পানির প্রবল তোড়ে তীব্র গতি তুলে এগিয়ে চলেছে মার্ভেল।

'খোলের প্লেটে গভীর একটা দাগ থাকবে,' বলল কট্টর গগল। অবাক হয়ে দেখছে রানার অকল্পনীয় জাহাজ চালনা। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, নিজে ও কখনও এতটা দক্ষতার সঙ্গে ওই বাঁক পেরুতে পারত না।

মার্ভেলের চারপাশের নদী ফুটন্ত পানির মত বলকে উঠছে। প্রচণ্ড গতি তুলে ভাটির দিকে ছুটে চলেছে জাহাজ। কেউ দেখলে ভাববে, যেন নর্দমার ভিতর গিয়ে ভেসে চলেছে শুকনো পাতা। কোর্স পরিবর্তনের সুযোগ খুবই কম, ইঞ্জিন থেকে বাড়তি ক্ষমতা

ব্যবহার করতে শুরু করেছে রানা। বারবার নদীর স্রোতের বিরুদ্ধে লড়ছে, নইলে পাশের তীরে আটকা পড়বে মার্ভেল। অথবা, আবারও অগভীর পানিতে গেঁথে যাবে মাটির ভিতর। কিছুক্ষণ আগে একটা কাদার চর ঘেঁষে বেরিয়ে এসেছে জাহাজ, তখন প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়েছে সবাই। নদীর কাদায় তৈরি হয়েছে গভীর খাত। রানা ধারণা করেছিল এবার আটকা পড়বে মার্ভেল। সুপার কমপিউটার বন্ধ করে দেয় পালস জেট। কিন্তু প্রচণ্ড স্রোত ওদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে। জাহাজের কিল ছাড়া পেতেই আবারও গতি পেয়েছে ওরা।

ছুটন্ত তীরের গতি পেয়েছে মার্ভেল। এবং বোধহয় সে কারণেই চ্যালেঞ্জটা উপভোগ করছে রানা। তীব্র প্লাবনের বিরুদ্ধে সামান্য একজন মানুষ ও, নিজের দক্ষতার সাহায্যে সবাইকে নিয়ে বিপদ থেকে সরে যেতে চাইছে। তা প্রকৃতির বিরুদ্ধে হোক বা শক্তিশালী কোনও লোক বা দলের বিরুদ্ধে, কখনও পিছিয়ে যায়নি ও। ওর জানা আছে নিজ ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, কিন্তু আজও এমন পরিস্থিতি দেখেনি যা সামলে উঠতে পারেনি। অন্য কেউ ভাবতে পারে, মাসুদ রানা বড় বেশি গোঁয়ারগোবিন্দ, কিন্তু আসলে নিজের উপর আস্থা ওকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে।

'এইমাত্র আফতাব জানাল বারবার ইঞ্জিন ব্যবহার করায় খুলে গেছে দ্বিতীয় টিউবের মুখ,' ঘোষণার সুরে বলল সোহেল। 'তবে বলে দিয়েছে, আপাতত বেশি ব্যবহার না করাই ভাল। পরে টিম নিয়ে গিয়ে দেখবে কী ধরনের কতটা ড্যামেজ হয়েছে।'

ডায়াল করে দ্বিতীয় টিউব চালু করল রানা, টের পেল সাড়া দিচ্ছে জাহাজ। আর মন্থর গতিতে নড়ছে না। এবার থ্রাস্টারগুলো কম ব্যবহার করলেও চলবে। গতি দেখে নিল রানা। তলদেশের বেগ আটাশ নট। পানির ভিতর আট নট গতি তুলছে জাহাজ। যথেষ্ট গতি পেয়েছে মার্ভেল, এবার সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে

পারবে। তা ছাড়া, কয়েক মাইল পেরুবার পর এখন ক্ষিপ্ত প্লাবন হয়ে উঠেছে প্রায় সাধারণ ঢেউ। বোধহয় নদীর তীরে মারা পড়েছে কর্নেল মাধানার সেনাবাহিনী, নইলে অনেক পিছনে পড়ে গেছে। জলোচ্ছ্বাস হওয়ার পর অয়েল কোম্পানির কন্টারদুটো চলে গেছে।

কিছুক্ষণ পর বলল রানা, 'গগল, তোমার মাল বুঝে নাও। আমরা সরাসরি বোমা বন্দরে যাব।'

হেলম্‌স্ নিল গগল। বসে পড়েছে সিটে।

নিজ সিটে ফিরল রানা। ওর কাঁধের উপর হাত রাখল সোহেল। 'দারুণ শিপ ড্রাইভিং দেখালি!'

'আর কখনও এ কাজ করতে চাই না,' মৃদু হাসল রানা।

'আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল,' সামনে থেকে বলল গগল। 'এমন বিপদ দেখলে এখন থেকে তোমার হাতে গছিয়ে দেব মার্ভেলকে।' গগল নিজে অত্যন্ত দক্ষ ক্যাপ্টেন, কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাসুদ রানাকে অন্তর থেকে প্রশংসা জানাতে কার্পণ্য করল না।

চুপ করে থাকল রানা।

'ভাল লাগত জঙ্গল আর নদী থেকে বেরুতে পারলে,' বলল সোহেল। 'আফতাব জানাচ্ছে, ব্যাটারির চার্জ অবশিষ্ট আছে আর মাত্র ত্রিশ পার্সেন্ট। নদীতে স্রোত থাকলেও সাগরের দশ মাইল আগেই আটকা পড়ব।'

'রানার উপর বিশ্বাস রাখতে পারো,' বলল গগল। 'ও কোনও বুদ্ধি বের করবে।' মৃদু হাসছে। কী যেন জানে।

'কী করবি এবার?' বন্ধুর দিকে চাইল সোহেল।

'গগল তো আগেই জবাব দিয়ে দিয়েছে,' বলল রানা। হাত ঘড়ি দেখল। 'জোয়ার আসছে, আর বড়জোর দেড় ঘণ্টা। কঙ্গো নদীর পনেরো থেকে বিশ মাইল ভেতরে চলে আসবে সাগরের জোয়ার। তখন নোনা পানিতে ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক

ইঞ্জিন চালু করব, রেসের গাড়ির মত গতি তুলে বেরিয়ে যাব সাগরে।'

'আমি এটা ভাবিইনি,' আফসোস করে বলল রায়হান। 'আগে জানলে এত চিন্তা করতাম না।'

'আফতাব বলেছে, বোমা বন্দরে থামলে ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে টিউবগুলো দেখবে,' বলল সোহেল। 'তবে এটাও বলেছে, কমপিউটার থেকেই বুঝতে পারছে, তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি।'

টিউব রি-লাইন করতে হলে লাগবে কয়েক মিলিয়ন ডলার।

'সেক্ষেত্রে আমরা বোমা শহরে বেশিক্ষণ থাকব না,' বলল রানা। 'আপা ও জলিলকে তুলে নিয়েই আন্তর্জাতিক জলসীমায় চলে যাব।'

'ঠিকই বলেছিস,' বলল সোহেল। 'ইনগা ড্যামে অপারেশনের কারণে মিনিস্টার স্যামুয়েল আবালা বা প্রেসিডেন্ট হালালি খেপে যেতে পারে। নেতাদের মাথা খাওয়ার লোকের অভাব হয় না।'

'তা ছাড়া, ডকে থেমে টিউব দেখতে হবে, তা-ও নয়,' বলল গগল। 'আমরা খোলা সাগরেও টিউব দেখে নিতে পারব।'

'ড্যামেজ রিপোর্ট থেকে নতুন কোনও ক্ষতির কথা জানা গেল?' জানতে চাইল রানা।

'মেডিকেল বে-তে একটা এক্স-রে মেশিন নষ্ট হয়েছে,' বলল সোহেল। 'মোস্তাফা আবুলের অসংখ্য কাঁচের গ্লাস ও ডিশ ভেঙেছে।' এই চিফ স্টুয়ার্ড নেভি থেকে অবসর নেওয়ার পর মার্ভেলে বাবুর্চির কাজ নিয়েছে। জাহাজে সে-ই সবচেয়ে বয়স্ক। সর্বক্ষণ পরনে থাকে কড়া ইস্তিরি দেয়া দামি জামা-কাপড়। চৌকস লোক। নেভির আইন মেনে চলে। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন সবাইকে দারুণ সব ডিশ রেঁধে খাওয়ায়। এবং কীভাবে যেন সবার হাঁড়ির খবর থাকে তার কাছে। তার চেয়ে খারাপ কথা: বেমক্কা সময়ে সেগুলো বলেও দেয় অন্যকে। তার সঙ্গে

কথা বলবার সময় সতর্ক থাকে মার্ভেলের অফিসাররা।

'মোস্তাফা আবুলকে বলবি, বেশি দামি ডিশ যেন না চায়।'

'মানবে সে?' আপন মনে বলল সোহেল।

ফ্ল্যাটস্ক্রিন ক্লিপবোর্ড নিয়ে রানার দিকে এগিয়ে এল রায়হান, কুঁচকে গেছে ভুরু। 'মাসুদ ভাই, কয়েক মিনিট আগে এটা ধরেছে ছোঁক-ছোঁক কুকুর।' জাহাজের চারপাশের সারভেইল্যান্স অ্যারে-র নাম দিয়েছে ওরা ছোঁক-ছোঁক কুকুর। ওটার ইলেকট্রনিক স্পেকট্রাম কয়েক মাইল দূরের সবই গ্রহণ করে। সাধারণ রেডিও ব্রডকাস্ট থেকে শুরু করে এনক্রিপ্টেড সেল ফোনও রক্ষা পায় না। মাত্র আধ সেকেণ্ড সময় পেলেই সব তথ্য সংগ্রহ করে মার্ভেলের সুপার কমপিউটার। 'কমপিউটার এইমাত্র কোড ভেঙেছে। আমি ওটাকে বলব উচ্চ-বিত্ত মানুষের তথ্য আদান-প্রদান বা মধ্যম লেভেলের মিলিটারি এনক্রিপশন।'

'ওটার সোর্স?' রেডিও ও কমপিউটার এক্সপার্ট রায়হান রশিদ। তার হাত থেকে জ্বলজ্বলে ক্লিপবোর্ড নিল রানা, তবে ওটার দিকে চাইল না।

'স্যাটালাইট ফোন ব্রডকাস্ট, মাসুদ ভাই। লোকটা ছিল আকাশে, চল্লিশ হাজার ফুট উপরে।'

'তার মানে মিলিটারি এয়ারক্রাফট, বা কোনও এগযিকিউটিভ প্লেন। সাধারণত কমার্শিয়াল জেটলাইনার আটত্রিশ হাজার ফুটের বেশি ওপরে ওঠে না।'

'আমিও তাই জানি। সরি, মাসুদ ভাই, সেই লোক মাত্র যোগাযোগ করেছে, এমন সময় ওটা ধরল ছোঁক-ছোঁক কুকুর। আর ঠিক তখনই ঘুরতে শুরু করেছে রেইডার ডোম। আবার যখন খুঁজতে শুরু করল, তার আগেই রেঞ্জের বাইরে চলে গেছে বিমান।'

মাত্র দুটো লাইন, উচ্চারণ করে পড়ল রানা: '...এত দ্রুত

নয়। ভোর চারটের সময় ডেভিল্‌স্ ওয়েসিসে আসিফ হায়দার চৌধুরিকে পাবে।' এবার নীরবে আর একবার পড়ল রানা, তারপর রায়হানের দিকে চাইল। 'কিছুই তো বোঝা গেল না।'

'জানি না শয়তানের মরূদ্যান কী, তবে আমরা যখন ডকে অস্ত্র খালাস করছি, ঠিক তখন স্কাই নিউজে একটা খবর শুনেছি। বাঙালি বিজ্ঞানী আসিফ হায়দার চৌধুরি ও তার এক অ্যাসোশিয়েটকে জেনেভা থেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। এমনও হতে পারে খবরটা অনেক পরে শুনেছি, আর এর একটু পর আমাদের মাথার উপর দিয়ে তাঁকে নিয়ে গেছে। তখনই কলটা ইন্টারসেপ্ট করেছে ছোঁক-ছোঁক।'

'যদি ধরে নিই ইনি-ই আসিফ হায়দার চৌধুরি-নিকোলাস ক্রিস্টোফার ল্যাবোরেটরিজের সেই একই বিজ্ঞানী, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু খোঁজ-খবর নিতেই হবে,' বলল রানা।

'ভদ্রলোক বিলিয়নেয়ার, আবিষ্কার করেন কীভাবে কয়লাকে পরিশোধন করে ইণ্ডাস্ট্রিতে কাজে লাগানো যায়,' বলল সোহেল। 'এর ফলে তাঁর উপর খেপে ওঠে পরিবেশবাদী দলগুলো। তাদের বক্তব্য: পরিবেশের জন্য কয়লা এখনও অনেক বেশি ক্ষতিকর।'

'কেউ কোনও মুক্তিপণ দাবি করেছে?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল রায়হান। 'এখনও নয়।'

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল রানা। 'ঠিক আছে, নবীকে নিয়ে ইন্টারনেট ঘাঁটতে শুরু করো। কিছু পেলে আমাকে জানাবে। তোমাদেরকে জানতে হবে আসিফ হায়দার চৌধুরিকে কে বা কারা কিডন্যাপ করতে পারে, তদন্তের দায়িত্ব কে পেয়েছে, কী এবং কোথায় ডেভিল্‌স্ ওয়েসিস। ভদ্রলোক কী ধরনের কাজ করছিলেন, তাও জানবে। আসিফ হায়দার চৌধুরি ও নিকোলাস ক্রিস্টোফারের পুরো ব্যাকগ্রাউণ্ড জানতে চাই।'

'আমরা এসবের সঙ্গে জড়াব, কারণ ভদ্রলোক বাঙালি?'

জানতে চাইল রায়হান।

'ওটা বড় একটা কারণ,' বলল রানা। 'তবে সবচেয়ে বড় কারণ, ভদ্রলোক বাংলাদেশকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়েছেন। প্রতিটি বন্যা, ঝড় বা জলোচ্ছ্বাসে।'

এক সেকেণ্ড পর মন্তব্য করল সোহেল, 'শুনেছি উনি চান বাংলাদেশের ফ্যাক্টরিগুলোর পরিবেশ ভাল হোক, এবং সেজন্য বিনা পয়সায় নিজের প্রডাক্ট দেবেন।'

'তার মানে উনি শুধু বিশাল বড়লোক বলে আগ্রহী হয়ে উঠিনি আমরা, তা-ই না?' জানতে চাইল রায়হান।

'ঠিক তা-ই,' বলল রানা।

গম্ভীর স্বরে বলল সোহেল, 'তাঁর কয়েক শ' হাজার কোটি টাকার কথা তো আমার মনেই নেই! ...বাপরে!'

ছয়

আরামদায়ক সুইভেল চেয়ারে বসে ডেস্কের উপর দুই পা তুলে দিয়েছে মাসুদ রানা, কোলের উপর বারো বাই ছয় ইঞ্চির কাঠের বোর্ড, তার উপর রেখেছে ট্যাবলেট পিসি। নিশাত সুলতানা ও জলিল খানের কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্ট পড়ছে। একের পর এক ঝুঁকি নিয়েছে ওরা, তবে লেখা পড়ে মনেই হয় না কোনও বিপদের ভিতর ছিল। ছোট ছোট বাক্যে সবই লিখেছে, সংক্ষেপে। গম্ভীর মুখে কয়েক জায়গায় লাইট পেন দিয়ে নোট

লিখল রানা। তার ভিতর থাকল: নিশাত ও জলিল প্রথমেই টেবিলের পায়ার সঙ্গে লোকগুলোর হাত আটকে দিতে পারত। তাতে সময় বাঁচত।

কাজ শেষে কমপিউটার আর্কাইভে ইলেকট্রনিক রিপোর্ট রেখে দিল রানা। এবার পড়তে লাগল ওয়েদার সার্ভিসগুলোর রিপোর্ট। এ বছর আটলান্টিক সাগরে বড় আকারের ন'টা ঝড় হয়েছে। উত্তর দিকে তৈরি হচ্ছে নতুন একটা। অবশ্য ওটা মার্ভেলের জন্য বিপজ্জনক নয়। এক মাস যায়নি মৌসুম শুরু হয়েছে, তারই ভিতর তিনটি সামুদ্রিক ঝড় হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর হারিকেন। ফোরকাস্টাররা ধারণা করছেন, দু' হাজার পাঁচ সালের মতই এ বছরও একের পর এক হারিকেন আঘাত হানবে আমেরিকার উপর। তাঁরা জানিয়েছেন, এটা খুবই স্বাভাবিক, এমন হতেই পারে। অবশ্য পরিবেশবাদীরা গলা ফাটিয়ে বলছে: ভয়ঙ্কর সব হারিকেন তৈরি হচ্ছে শুধু গ্লোবাল ওয়ার্মিঙের কারণে।

আপাতত আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল পরিষ্কার। পাঁচ দিন জ্বলজ্বলে সূর্য দেখা দেবে।

ফোরকাস্টারদের ওয়েব সাইট বন্ধ করে দিল রানা, হাত পিছনে নিয়ে আড়মোড়া ভাঙল। মনে পড়ল, গত রাতে ধচাপচা জাহাজের লোভী এক অফিসারের অভিনয় করেছে। তারপর কাকডাকা ভোরে বেরিয়ে এসেছে ওরা সাগরে। কেবিনে ফিরে শেভ শেষে দীর্ঘ শাওয়ার নিয়েছে, ঝরঝরে অনুভূতি নিয়ে পরে নিয়েছে ইংলিশ-কাট নীল জিন্স, টার্নবুল ও গলা খোলা অ্যাসার শার্ট। ডেকে চলবার উপযোগী জুতো পায়ে।

সরিয়ে দিয়েছে কেবিনের আর্মার্ড পোর্টহোল কাভার। ঝলমলে আলো এসেছে ভিতরে। একটু বিশ্রাম নিয়েছে। তারপর নাস্তার জন্য ডাক পড়েছে মেস হলে। ওখান থেকে ফিরে এসেই রিপোর্টগুলো পড়তে শুরু করেছে।

সিগারেট ধরিয়ে ডেস্কের পাশে লাইটার রেখে দিল রানা। মনের ভিতর কথাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে। বিসিআইয়ের চিফ, মেজর জেনারেল রাহাত খানকে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। কি-বোর্ডে আঙুল ঠেকিয়েছে, এমন সময় দরজার উপর টোকার আওয়াজ হলো।

'খোলা,' জানিয়ে দিল রানা। ডেস্কের উপর সরিয়ে রাখল পিসি ও বোর্ড।

রায়হান রশিদ ও খোরশেদ নবী এসেছে। ওরা বিসিআইয়ে যোগ দেয়ার পর কিছু দিনের ভিতর পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেছে। আগে বাংলাদেশ আর্মিতে ক্যাপ্টেন ছিল নবী, ওয়েপন্স এক্সপার্ট। পরে যোগ দেয় রানা এজেন্সিতে। এদিকে রায়হান ছিল পাক্কা হ্যাকার। সিআইএ-র কবল থেকে রানা ওকে উদ্ধার করার পর বাঁধা পড়েছে ও বিসিআই-এর মায়াডোরে। কিছু দিন আগে পশ্চিমা বিশ্বের ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে। এরপর রানা এবং ওর দল মিশনে যায় ইজরায়েলে, ধ্বংস করে দেয় আমেরিকান পারমাণবিক মিসাইল।

পিছনে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল নবী।

ডেস্কে রাখা অ্যান্টিক ক্রোনোগ্রাফ চট্ করে দেখল রানা। 'এত জলদি?'

'জী,' মৃদু হাসল রায়হান। হাতে এক তোড়া কাগজ।

রানার পাশের চেয়ারে বসল দুই বন্ধু।

'আমরা কী দিয়ে শুরু করব, মাসুদ ভাই? কিডন্যাপিং, না কোম্পানি?'

'ব্যাকগ্রাউণ্ড দিয়েই শুরু করা যাক,' অ্যাশট্রের ভিতর ছাই ফেলল রানা।

গলা খাঁকারি দিল রায়হান। 'আসিফ হায়দার চৌধুরি, বয়স উনচল্লিশ। অবিবাহিত। ভদ্রলোক এমআইটি থেকে কেমিস্ট্রিতে পি.এইচ.ডি. করেছেন। এরপর প্রিয় এক সতীর্থ বন্ধুকে নিয়ে

গড়ে তুলেছেন আসিফ হায়দার চৌধুরি-নিকোলাস ক্রিস্টোফার ল্যাবোরেটরিজ। ওটা মেটেরিয়াল রিসার্চ কোম্পানি। ব্যবসা শুরু করেন বস্টনের এক ঘুপচি গ্যারাজে। পরবর্তী ছয় বছরে তাঁরা একাশিটা আবিষ্কারের পেটেন্ট করেন। ততদিনে তাঁদের কোম্পানি কোটি কোটি ডলার আয় করেছে, সদর-দপ্তর সরিয়ে নেয়া হয়েছে সুইটযারল্যাণ্ডের জেনেভায়। ...এখন কমকর্তা ও কর্মচারী মিলে দুই শ' পাঁচ জন কাজ করছে। বেশিরভাগ কর্মচারীর বেতন বছরে এক লাখ ডলারের বেশি।'

'তাঁদের সেরা পেটেন্ট একটা অর্গানিক-বেযড সিস্টেম,' বলল নবী। 'কয়লা চালিত প্লাণ্টের ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর ধোঁয়া থেকে শতকরা নব্বুই ভাগ গন্ধক শুষে নেয় ওই ফিল্টার। আবিষ্কার করার পরের এক বছরে দুই বন্ধু হয়ে ওঠেন বিলিয়নেয়ার। সে সময় কেউ ওই আবিষ্কার নিয়ে কথা তোলেনি। কিন্তু দু' বছর যেতে না যেতেই চিৎকার শুরু করল পরিবেশবাদী দলগুলো। বলতে লাগল, স্ক্রাবার থাকুক বা না থাকুক, কয়লা চালিত প্লান্ট অনেক বেশি নোংরা, কাজেই সেগুলো বন্ধ করা উচিত। এরপর কয়েক শ' মামলা হয়েছে আসিফ হায়দার চৌধুরি-নিকোলাস ক্রিস্টোফার ল্যাবোরেটরিজের বিরুদ্ধে। এখনও ঝুলছে অন্তত পনেরোটা মামলা। কিছুদিন পর পর একটা দুটো করে কেস ফাইল হচ্ছেই।'

নবী থেমে যেতেই বলল রানা, 'এমন কি হতে পারে আসিফ হায়দার চৌধুরিকে ইকোটেরোরিস্টরা কিডন্যাপ করেছে?'

'এ নিয়ে ভাবছে সুইস পুলিশ,' বলল রায়হান। 'তবে অমন হওয়ার সম্ভাবনা কম। ধরলাম কিডন্যাপ করল, কিন্তু তা থেকে কী পাবে?' মাথা নাড়ল সে। 'আগের প্রসঙ্গে ফিরি: এরপর বছর তিনেক আগে দুই বন্ধুর ভিতর তৈরি হলো ফাটল। তার আগে পর্যন্ত আপন ভাইয়ের মতই ছিলেন তাঁরা। একসঙ্গে প্রেস

কনফারেন্স করতেন, একসঙ্গে ছুটিতে দেশ-বিদেশ ঘুরতে বেরুতেন। প্রথম বিরোধ তৈরি হয় এক আমেরিকান মডেল-কন্যাকে নিয়ে। আসিফ হায়দার চৌধুরি কখনও এ বিষয়ে কিছুই বলেননি। তবে নানা রিপোর্ট থেকে বুঝেছি, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে একদম বদলে যান নিকোলাস ক্রিস্টোফার। পরিবেশবাদীদের সঙ্গে মিশতে শুরু করেন। নিজ কোম্পানির বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত বাধ্য করেন মিস্টার চৌধুরিকে তাঁর সব শেয়ার কিনে নিতে। ক্রিস্টোফারের শেয়ারের মূল্য ছিল ছয় বিলিয়ন ডলার। তাঁকে নগদ টাকা বুঝিয়ে দিতে হয়। এর ফলে প্রায় ব্যাঙ্করাপ্ট হয়ে যান চৌধুরি।'

'সুন্দরী মডেল-কন্যার প্রেমে পড়ে মাঝখান থেকে ভেঙে গেল দুই বন্ধুর সুন্দর সম্পর্ক,' আস্তে করে মাথা নাড়ল নবী।

'তারপর থেকে কী করছেন তাঁরা?'

'মিস্টার চৌধুরির সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয় ওই মেয়ের, হঠাৎ করেই সে বিয়ে করে বসে এক টেনিস স্টারকে,' বলল নবী। 'বিয়ের পিড়িতে বসেননি চৌধুরি। এদিকে নিকোলাস ক্রিস্টোফার আমেরিকার মেইন-এ বাড়ি করেন। সেই থেকে ওখানেই আছেন। গত ক' বছর হলো পরিবেশবাদীদের পিছনে বিপুল টাকা খরচ করছেন। সন্দেহ করা হয়, উনি পরিবেশবাদী চরমপন্থী কিছু দলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। তবে কিছুদিন আগে কয়েকটা পরিবেশবাদী গ্রুপের বিরুদ্ধে মামলাও করেছেন। তারা নাকি পরিবেশ রক্ষার কোনও কাজ না করেই সবার কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা তুলছে, খুশিমত টাকা খরচ করছে নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে। দুই মাস পর মামলার শুনানি শুরু হবে। মোটকথা, মানুষের চোখের অন্তরালে চলে গেছেন নিকোলাস ক্রিস্টোফার।'

'তার মানে এখন একাই থাকে?' সিগারেট ফুরিয়ে এসেছে,

ওটা অ্যাশট্রের ভিতর ফেলে আগুন নিভিয়ে দিল রানা।

'ঠিক তা নয়,' বলল রায়হান। 'আসলে কোনও আলোচনার ভিতর নিজেকে জড়ান না।' একটা কাগজ থেকে লেখা পড়ে নিল সে, তারপর বলল, 'রিসার্চ করার সময় আমাদের মনে হয়েছে, কোম্পানির দুই মালিকের ভিতর আসল হিরো ছিলেন আসিফ হায়দার চৌধুরি। চমৎকার বক্তা ছিলেন, প্রেস কনফারেন্সে সবসময়ে প্রাধান্য পেতেন। পরনে থাকত একহাজার ডলারের সুট। এদিকে আড়ালে থাকতেন মুখচোরা ক্রিস্টোফার, পরনে থাকত কমদামি জিন্স ও কোঁচকানো টাই। যদিও তাঁর মগজ থেকেই বেরিয়েছে বেশিরভাগ আবিষ্কার। লাইমলাইটে থাকতেন চৌধুরি সাহেব, আর ছায়ার ভিতর আড়ালে থাকতেন ক্রিস্টোফার। আমাদের ধারণা হয়েছে, ভদ্রলোক ওই কোম্পানি থেকে সরে যাওয়ার পর নিজেকে আরও গুটিয়ে নিয়েছেন।'

'ক্রিমিনাল মাস্টার মাইণ্ড মনে হয় না তাকে,' মন্তব্য করল রানা।

'আমাদেরও তা-ই মনে হয়েছে,' বলল নবী। 'উনি সত্যিকারের একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, যার পিছন-পকেটে রয়েছে পেটমোটা মানিব্যাগ।'

'আবার ফেরা যাক কিডন্যাপিঙের বিষয়ে,' বলল রানা। 'এখনও কেউ কোনও মুক্তিপণ দাবি করেনি... কিছু কি আমাদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে?'

'ক্রিস্টোফারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর আরও বেশি মনোযোগী হয়েছেন চৌধুরি, ভাল ভাবেই চলছে কোম্পানি,' বলল নবী।

'ওখানে কী ধরনের কাজ হয়?'

'ওটা প্রাইভেট কোম্পানি, মিস্টার চৌধুরির নির্দেশ মত রিসার্চ করে একদল বিজ্ঞানী,' বলল রায়হান। 'প্রতি বছর কয়েকটা

গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের পেটেন্ট করে। ভালই ব্যবসা হচ্ছে।'

'নতুন কোনও আবিষ্কার কেড়ে নেয়ার জন্য তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে?' বলল রানা, 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এসপিয়োনাজের কথাও মাথায় রাখতে হবে।'

'আমরা এ ধরনের কোনও খবর জানি না, মাসুদ ভাই,' বলল রায়হান। 'গোপনে কোনও রিসার্চ করে থাকতে পারেন।'

'ঠিক আছে, কিডন্যাপিঙের ব্যাপারটা খুলে বলো।'

চেয়ারে সোজা হয়ে বসল রায়হান। 'আসিফ হায়দার চৌধুরি এবং ক্যারেন কুম্বস নামের এক রিসার্চারকে দেখতে পায় সিকিউরিটি গার্ড। তাঁরা মেইন বিল্ডিং থেকে ক্যাম্পাসে বেরিয়ে আসেন। তখন সন্ধে সাতটা। গেটের দিকে যাওয়ার সময় আলাপ করছিলেন। রাত আটটার সময় ডিনার পার্টিতে যাওয়ার কথা চৌধুরি সাহেবের। কুম্বস একা থাকে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। দু'জন আলাদা দুটো গাড়ি নিয়ে রওনা হন। আগে ছিল চৌধুরি সাহেবের মার্সিডিজ, পিছনে কুম্বসের ফোক্সভাগেন। এরপর ফ্যাসিলিটি থেকে আধ মাইল দূরে দু'জনের গাড়ি পাওয়া যায়। চাকার দাগ থেকে পুলিশ ধারণা করছে, ওখানে তৃতীয় কোনও গাড়িও ছিল। চাকার দূরত্ব থেকে বোঝা গেছে, ওটা কোনও ভ্যান। ওই গাড়ি দ্রুত চলছিল, রাস্তা থেকে ঠেলে সরিয়ে দেয় সামনের গাড়িকে। চৌধুরি সাহেবের মার্সিডিজের এয়ারব্যাগ খুলে যায়। তবে ফোক্সভাগেনেরটার ব্যাগ খোলেনি। বোধহয় চৌধুরি সাহেবের গাড়ি দুর্ঘটনার ভিতর পড়েছে দেখে গতি কমিয়ে আনে মেয়েটা। মার্সিডিজের পাশের দরজা তুবড়ে যায়, এ থেকে ধারণা করা হচ্ছে সহজেই তালা খুলতে কোনও অসুবিধে হয়নি। ফোক্সভাগেনে অটোমেটিক লক ছিল না। মেয়েটিকে কিডন্যাপ করতেও ঝামেলা হয়নি।'

'ওটা যে কিডন্যাপিং, কীভাবে জানা গেল?' জানতে চাইল

রানা। 'সাধারণ দুর্ঘটনাও হতে পারে। হয়তো কোনও লোক গাড়ি থামিয়ে তাদেরকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেছে।'

'তা হয়নি। স্থানীয় হাসপাতাল খুঁজেছে পুলিশ। আশপাশের সব বেযমেন্টও।'

'বলে যাও।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রায়হান। 'এখন বড় কথা: কেউ এখনও মুক্তিপণ দাবি করেনি। পুলিশ ভ্যানটা খুঁজেছে, পায়নি। অবশ্য বেশ পরে ওটাকে পাওয়া গেছে এয়ারপোর্টে। পুলিশ ধারণা করছে, চৌধুরি সাহেব এবং ক্যারেন কুম্বসকে বিমানে করে দেশ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'গত রাতে জেনেভা থেকে কোন্ কোন্ চার্টার ফ্লাইট গেছে, খোঁজ নিয়েছ?'

'এখানে আসার আগে নবী ওই কাজই করছিল,' বলল রায়হান। 'পঞ্চাশটার বেশি গেছে। ইকোনমিক সামিট শেষে বড় বড় মাথাওয়ালা লোকগুলো বাড়ি ফিরেছে।'

চুপচাপ অপেক্ষা করছে রানা।

'সুইস পুলিশ এখনও বুঝতে পারছে না এ পরিস্থিতিতে কী ভাববে,' বলল নবী। 'অপেক্ষা করে দেখতে চাইছে। এমনও হতে পারে, একটু দেরিতে মুক্তিপণ দাবি করবে কিডন্যাপাররা।'

'হয়তো ক্যারেন কুম্বসের জন্য মোটেও চাইল না, চাইল শুধু আসিফ হায়দার চৌধুরির জন্য,' মন্তব্য করল রানা।

মাথা নাড়ল রায়হান। বুঝতে পেরেছে মাসুদ ভাই কী বলতে চেয়েছেন। 'তেমন মনে হয় না। কোম্পানির ডেটাবেস ঘেঁটে দেখেছি। ওখানে দু'বছর ধরে আছে ক্যারেন কুম্বস। অর্গানিক কেমিস্ট্রির উপর ডক্টরেট চাইছে। আগেই বলেছি, মেয়েটা একা থাকে। অবিবাহিতা। ওই কোম্পানির কর্মচারীদের বিষয়ে খুবই কম তথ্য দেয়া হয়েছে ডেটাবেসে। কী ভালবাসে, হবি কী—

প্রায় কিছুই বলা হয়নি। ওই মেয়ের ক্রেডেনশিয়াল ছাড়া ব্যক্তিগত কোনও তথ্য নেই। ...আরেকটা কথা, আমার মনে হয় না কেউ কিডন্যাপ করার জন্য প্রাইভেট জেট ব্যবহার করবে।'

'তারপরও খতিয়ে দেখতে হবে,' বলল নবী। 'এটা নিশ্চিত যে আসিফ হায়দার চৌধুরি ছিলেন মূল টার্গেট। ক্যারেন কুম্বস হয়ে ওঠে সাক্ষী, কাজেই তাকেও কিডন্যাপ করতে হয়েছে।'

'ডেভিল্‌স্ ওয়েসিসের ব্যাপারে কিছু জানলে?' বলল রানা।

'ইন্টারনেটে কিছু নেই,' বলল রায়হান। 'ওটা বোধহয় কোনও কোড নেম। যে-কোনও জায়গার কথা বলে থাকতে পারে। আমরা যখন ফোন কল ইন্টারসেপ্ট করলাম, শুনেছি তারা পৌঁছবে ভোর চারটেয়। তার মানে, ওই সময়ে পৌঁছতে পারবে দক্ষিণ আমেরিকার পুব দিকে। আবার উত্তর দিকে গেলে ফিরতে পারবে ইউরোপে।'

'এমন হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম,' বলল রানা। 'যদি ধরি সুইটযারল্যাণ্ড থেকে সোজা দক্ষিণে সরল রেখায় এসেছে, সেক্ষেত্রে মাঝরাতের পর আমাদের মাথার উপর দিয়ে গেছে। কাজেই আমাদের জানতে হবে কোন্‌টা ল্যাণ্ডিং সাইট।'

'নামিবিয়া, বতসোয়ানা, জিম্বাবুইয়ে বা দক্ষিণ আফ্রিকা হতে পারে,' বলল রায়হান।'

'আমার যে মন্দ কপাল, ঠিক গিয়ে পড়ব যিম্বাবুইয়েতে,' বিড়বিড় করে বলল নবী।

ওই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর মন্দ। বছরের পর বছর চরম দুর্নীতি ও ব্যর্থ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা একদম শেষ করে দিয়েছে এক সময়ের ধনী দেশটিকে। এখন ওটা আফ্রিকার অন্যতম দরিদ্র অঞ্চল। অত্যাচারী সরকারের উপর খেপে উঠেছে জনগণ, যে-কোনও দিন বিদ্রোহ করবে। এবং বিপ্লব যদি শুরু হয়, সেই গৃহযুদ্ধ চলবে মাসের পর মাস।

'কিডন্যাপার যদি যিম্বাবুইয়েতে গিয়ে থাকে, ভাল করেই জানে যা খুশি করতে পারবে,' বলল রায়হান, 'যুদ্ধের ময়দানে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকে খুঁজবে কে! তা ছাড়া, মোটা অঙ্কের ঘুষ দিলেই চোখ অন্য দিকে সরিয়ে রাখবে সরকার।'

'যিম্বাবুইয়ের ভিতর ডেভিলস ওয়েসিস খোঁজো, তবে অন্যদিকেও চোখ খোলা রেখো। ওই জায়গা অন্য কোথাও হতে পারে। আমরা আপাতত দক্ষিণ দিকে যাব। আশা করি ট্রপিক অভ ক্যাপ্রিকর্ন পৌঁছবার আগেই কিছু পাবে। এদিকে আসিফ হায়দার চৌধুরি-নিকোলাস ক্রিস্টোফার ল্যাবোরেটরিজের সঙ্গেও যোগাযোগ করব। ডিরেক্টরদের জানা থাকুক, ইচ্ছা করলে তারা আমাদের সহায়তা নিতে পারে।'

'আমরা কিডন্যাপিঙের কেস নিই না, বিশেষ করে সাগরে,' বলল নবী। 'ওটা তো কোস্টগার্ড বা পুলিশের কাজ।'

'কথা ঠিক, কিন্তু আমরা আছি সঠিক জায়গায়। কাজেই সম্ভব হলে বাঙালি বিজ্ঞানীকে উদ্ধার করব।'

রায়হান বলল, 'হয়তো লাগবেই না, আজই কিডন্যাপাররা দাবি জানাবে। আর তারপর ওই কোম্পানি থেকে মুক্তিপণ দিয়ে দেবে। হাসতে হাসতে নিজ বাড়িতে ফিরবেন বিজ্ঞানী।'

'একটা কথা তুমি ভুলে গেছ,' বলল গম্ভীর রানা। 'ওরা যদি মুক্তিপণই চাইবে, তো বন্দিকে সুইটযারল্যাণ্ডেই লুকিয়ে রাখত; এত ঝুঁকি নিয়ে বিমানে করে দেশ থেকে তাকে সরিয়ে নিত না। না, রায়হান, কোনও মুক্তিপণের জন্য নয়, অন্য কোনও পরিকল্পনা আছে ওদের।'

'তা কী হতে পারে?' ভুরু কুঁচকে ফেলল রায়হান। ভাব দেখে মনে হলো মুহূর্তে সব বুঝে ফেলবে।

'আগে ডেভিলস ওয়েসিস পাও, আমরা সবই জানব।' হাসল রানা। 'আর আমিও চিফের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।'

সাত

ভারী হেডফোন চেপে ধরেছে কান দুটোকে, ভিজে সেঁটে গেছে আশপাশের চুল, ঘেমে-নেয়ে অস্বস্তি বোধ করছে কার্টা অস্টিন। হেডফোন যে একটু খুলবে, তা-ও পারবে না, বিকট আওয়াজ তুলে ছুটছে কপ্টার। আজ নিয়ে পুরো দু'দিন এই অত্যাচার সইছে কার্টা।

ভিজে সপসপ করছে পিঠের কাছে। যতবার সরে বসতে চাইছে, প্লাস্টিকের সিটের সঙ্গে আটকা পড়ছে শার্ট। তারচেয়ে খারাপ লাগছে অন্য কারণে। যেই নড়ছে, শার্টের বুকের দিকটা টানটান হয়ে উঠছে। তখন নির্লজ্জ চওড়া হাসি দিচ্ছে ব্র্যাড এন লাজরাস। গাইড লোকটা পাশ থেকে সরলে ভাল হতো! বা ভাল হতো ও নিজে পাইলটের পাশে গিয়ে বসলে। কিন্তু তা হবে না। পাইলট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, রন কুবলিকির ওজন ককপিটে দরকার। নইলে ঠিক ভাবে চলবে না খুদে কপ্টার।

শেষবারের মত সোয়াকোপমুণ্ড ফিরছে ওরা। সেজন্য যথেষ্ট খুশি কার্টা। আবার হতাশও। বিরক্তি চেপে ধরছে ওকে। সব মিলে অস্থির লাগছে মন। এই নিয়ে সাতবার সাগরের গভীরে গেছে, ম্যাপে এঁকে নেয়া প্রায় সব জায়গা খুঁজে দেখেছে। প্রতিবার ফিরেছে রি-ফিউয়েলিঙের জন্য। আবার ফিরে গিয়ে দেখেছে সাগরের নতুন জায়গা। কিন্তু সেখানে সাধারণ পাথরের

ফর্মেশন ছাড়া কিছুই মেলেনি। দড়িতে ঝুলিয়ে সাগরের গভীরে নামিয়ে দিয়েছে মেটাল ডিটেক্টর। কিন্তু গোটা জাহাজ পাওয়া তো দূরের কথা, বড়জোর পেয়েছে জাহাজ থেকে খসে পড়া কোনও নোঙর।

খুদে কপ্টারের ভিতর নড়াচড়া প্রায় অসম্ভব। দু'দিন হলো সারা দেহে টনটনে ব্যথা নিয়ে কাজ করছে কার্টা। নীরবে সইছে আরেকটা অত্যাচার। লাজরাসের গায়ে বোটকা গন্ধ! ওর মনে হচ্ছে ঢুকে পড়েছে সজারুর খাঁচার ভিতর। প্রায় চলে এসেছে ওরা সোয়াকোপমুণ্ডের কাছে। একটু পর পিছনে পড়বে সাগর, শুরু হবে একের পর এক বালির ঢিবি। সানগ্লাসের ভিতর দিয়ে চেয়ে রইল কার্টা, মাথা-ব্যথা শুরু হয়েছে। স্থানীয় জেলেদের উপর খুব ভরসা করেছিল, ভেবেছিল তাদের জ্ঞান অনেক কাজে লাগবে। কিন্তু কই, কিছুই পেল না! এখন ফিরছে বুকে ব্যর্থতা বয়ে নিয়ে।

সামনের সিট থেকে ঘুরে চাইল কুবলিকি, হাতের ইশারা করল। কপ্টারের ইন্টারনাল কমিউনিকেশন নেটে আটকে নিতে বলছে হেডফোনের জ্যাক। কার্টা ওটা আনপ্লাগ করেছিল সবাইকে প্রাইভেসি দিতে।

'পাইলট বলছে কপ্টারের রেঞ্জ নেই, ম্যাপের শেষ স্পটে যেতে পারবে না। ওটার কথা বেশি করে বলেছিল দাদু এবেল। ওই যে, ধাতুর সাপ।'

'দাদু এবেল কী বলেছে?' ঝুঁকে জানতে চাইল লাজরাস।

ভীষণ ভাবে শিউরে উঠল কার্টা। চট্ করে ঢোক গিলল, পণ করেছে, কিছুতে বমি করবে না। উহ্, এত দুর্গন্ধ থাকতে পারে কারও মুখে? পারে, পারে, এই লোকের মুখেই আছে!

গত রাতে স্যাণ্ডউইচ বে-তে গেছে, কাউকে বলেনি কার্টা। তার মূল কারণ, বোধহয় ঠিকই বলেছে গাইড লাজরাস। বুড়ো জলে আসলেই অর্ধউন্মাদ।

কুবলিকি বলে ফেলায় এখন লজ্জার ভিতর পড়তে হচ্ছে। লোকটা মুখ বন্ধ রাখলে ভাল হতো। কাঁধ ঝাঁকাল কার্টা। 'বলার মত কিছুই নয়। লোকটা একদম পাগল। ...সব জায়গা খুঁজতে গিয়ে এরইমধ্যে বেরিয়ে গেছে দু'হাজার ডলার। তা-ও শুধু ফিউয়েলের জন্য। নির্ভরযোগ্য কোনও তথ্য নেই। মনে করি না দাদু এবেলের কথায় পয়সা নষ্ট করা উচিত। সে থাকুক তার বিশাল সাপ নিয়ে।'

'বিশাল... কী বললেন?' হাসি-হাসি মুখে জানতে চাইল পাইলট। দক্ষিণ আফ্রিকান লোক সে, বিদঘুটে উচ্চারণে ইংরেজি বলে।

'প্রকাণ্ড সাপ, অনেকগুলো,' বলল কার্টা। নিজেকে বোকা লাগছে ওর। 'বলেছে একটা সাপ তার উপর হামলা করে।'

'পেটে বেশি মদ পড়েছিল,' মন্তব্য করল পাইলট। 'সবাই জানে দাদু এবেল সবসময় নেশা করে। নিজের চোখে দেখেছি, একবার দুই অস্ট্রেলিয়ানের সঙ্গে বাজি ধরল। মদ গিলতে শুরু করার পর তিন ঘণ্টা পেরুল, তারপর অস্ট্রেলিয়ানরা টেবিলের নীচে ঘুমিয়ে পড়ল। আকারে গণ্ডারের মত ছিল তারা। তখনও গিলে চলেছে দাদু এবেল। নেশা থেকে উঠবার সময় অনেক কথাই বলে। শুধু সাপ কেন, যে-কোনও কিছুই দেখে। আগেও বলেছে, একদিন তাকে তাড়া করে ভয়ঙ্কর এক দৈত্য।'

'বিশাল সাপ,' খিঁকখিঁক করে হাসল লাজরাস। 'আমি না বলেছি ওই বুড়ো বদ্ধ পাগল? ওখানে গিয়ে সময় নষ্ট করেছেন। ব্র্যাড এন লাজরাসের উপর বিশ্বাস রাখুন, সে সঠিক জায়গা চিনিয়ে দেবে। নিজ চোখে দেখবেন সেই জাহাজ। এদিকে এমন সব জায়গা আছে, সেখানে ঠিকই জাহাজ পাবেন। না পেলে আমার নাম পাল্টে কুকুরের নামে রাখবেন।'

'আমি আর এসবের ভিতর নেই,' জানিয়ে দিল কুবলিকি।

'আগামী পরশু দিন বাড়ি ফিরছি। তার আগে হোটেলের সুইমিং পুলে সময় কাটাব।'

'আপনাকে দোষ দিতে পারছি না,' চট্ করে যুবতীর পেলব উরু দেখে নিল লাজরাস। আফসোস করল, ওই হাফপ্যান্ট না থাকলে... 'একাই আমি বোটে করে মিস অস্টিনকে নিয়ে যাব। তাতে কপ্টারের চেয়ে অনেক দূরে যেতে পারব।'

'তার কোনও দরকার পড়বে না,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল কার্টা। খেয়াল করেছে গাইডের লোভী চোখ। ওকে একবার কাছে পেলেই হামলে পড়বে লোকটা।

'আগামীকাল সকালে ঠিক করব কোথায় যাব,' বলল কুবলিকি। 'হয়তো বোট নিয়ে বেরিয়ে পড়া মন্দ হবে না।'

'সেক্ষেত্রে সময়ই শুধু নষ্ট করবেন,' বলল পাইলট।

লোকটা বোধহয় ঠিকই বলেছে, ভাবল কার্টা।

বিশ মিনিট পর ধুলোভরা হেলিপোর্টের উপর স্থির হলো খুদে কপ্টার। রোটরের প্রচণ্ড হাওয়া আকাশে তুলছে কাঁকরের মত গোলাপী বালি। আঁধার হয়ে আসছে চারপাশ। ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এল কপ্টার, দেরি না করে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল পাইলট। কমছে ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ। কমে এল রোটরের গতি। কিন্তু পুরো থেমে যাওয়ার আগেই দরজা খুলে দিয়েছে পাইলট। সঙ্গে সঙ্গে ঘামে ভেজা হাওয়া ছিটকে বেরুল, বদলে ভিতরে ঢুকল উষ্ণ বালি ভরা হাওয়া। তা-ও ঢের ভাল, ভাবল কার্টা।

মাথার উপর এখনও ঘুরছে রোটর, মাথা নিচু করে নেমে পড়ল ও। সিটের পাশ থেকে তুলে নিল ডাফল ব্যাগ, কপ্টারের নাকের সামনে দিয়ে চলে গেল আরেক দিকে। মেটাল টিটেইবর সরাতে সঙ্গীকে সাহায্য করবে। বামদিকের কিড থেকে কেবল খুলল ও। এক মিনিট পেরুনোর আগেই দু'জন মিলে নামিয়ে ফেলল এক শ' পাউণ্ড ওজনের ইকুইপমেন্ট, নিয়ে রাখল পিকআপ

ট্রাকে। লাজরাস কোনও সাহায্য করল না, সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। দু' ঘণ্টা পর ধূমপানের সুযোগ পেয়েছে।

পাইলটের পাওনা মিটিয়ে দিল রন কুবলিকি। একবার হতাশ হয়ে দেখল, মাত্র দুটো ট্র্যাভেলার্স চেক বাকি থাকল। তখনই ঠিক করল, আর বাজে কাজে চেক ব্যবহার করবে না। হোটেলের ক্যাসিনো ডাকছে তাকে।

কার্টা ও কুবলিকির সঙ্গে করমর্দন করল পাইলট, চলে যাওয়ার আগে বলল, 'আপনারা বোধহয় বুঝেছেন, ব্র্যাড এন লাজরাস আসলে পাকা চোর, কথার কোনও দামও নেই; কিন্তু দাদু এবেল সম্পর্কে ঠিকই বলেছে— বুড়োর মাথা খারাপ। ...নিমজ্জিত জাহাজ খুঁজতে চেয়েছেন, হয়তো মিটল না শখ, কিন্তু বাকি ক'দিন আরাম করে ছুটি কাটান। মিস্টার কুবলিকি ভালই ভেবেছেন। শহর ঘুরে দেখুন, সুইমিংপুলে বিশ্রাম নিন।'

লাজরাস বেশ দূরে, কার্টা বলল, 'একটা কাজ নিয়ে এসেছি, কাজেই সময় নষ্ট করব না।'

মৃদু হাসল পাইলট। 'শ্বেতাঙ্গদের এ জন্যই ভাল লাগে। হাল ছাড়ি না আমরা।'

আরেকবার করমর্দন করল ওরা। ফোর-হুইল পিকআপের পিছনে উঠে বসেছে লাজরাস। তাকে ওয়ালভিস বে-র সস্তা এক বারে নামিয়ে দিল কার্টা, জানিয়ে দিল তাকে আর লাগবে না।

বার কয়েক মাথা নাড়ল লাজরাস, বলল আগামীকাল সকাল নয়টার সময় হাজির হবে।

'লোকটাকে সহ্য করা কঠিন,' রওনা হওয়ার পর বলল কার্টা।

'কেন যে তাকে ভাল লাগে না আপনার,' বলল কুবলিকি। 'হ্যাঁ, কখনও গোসল করে না, মুখেও মিণ্ট রাখা দরকার, কিন্তু আসলে খারাপ লোক নয়। সর্বক্ষণ সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে রেখেছে।'

'কোনও মেয়ে হলে ওর গায়ের দুর্গন্ধ পেতে।'

আফ্রিকার অন্য যে-কোনও শহরের সঙ্গে মিল নেই সোয়াকোপমুণ্ডের। নামিবিয়া ছিল জার্মান কলোনি। ব্যাভেরিয়ার আর্কিটেকচার অনুযায়ী তৈরি শহর। বাড়িগুলো প্রাচীন চেহারার। একটু পর পর লুথেরান চার্চ। রাস্তার পাশে পাম গাছের সারি। মরুভূমি থেকে আসছে কোটি বালিকণা, তারপরও সবকিছুর ভিতর পশ একটা ভাব। ওয়ালভিস বে সুন্দর বন্দর, প্রতিদিন আসছে অভিযাত্রীরা। কেউ যাবে সাগরে, কেউ মরুভূমিতে, আবার কেউ পাহাড়ে।

কুবলিকি জানাল হোটেলে বুফে ডিনার খাওয়াবে। লোভ দেখাল ক্যাসিনোয় বসে দু'জন মজা করে জুয়া খেলবে। কিন্তু মানা করে দিল কার্টা। 'না-হোটেল, না-ক্যাসিনো,' বলল, 'আমি বন্দরের কোনও রেস্টুরেন্টে যাব। ওখানে বাতি-ঘর আছে। ওখান থেকে সূর্যাস্ত দেখব।'

'আপনার যা ইচ্ছা,' বিরক্ত হয়ে নিজ রুমের দিকে পা বাড়াল কুবলিকি।

ঘরে ফিরে শাওয়ার সারল কার্টা, তারপর গা মুছে পরে নিল ফুলেলা সানড্রেস, কাঁধে সোয়েটার। পায়ে চটি স্যাণ্ডেল। পিঠে এলিয়ে রইল লালচে চুল। হালকা মেকআপ নিল। আয়নায় নিজেকে দেখে নিয়ে ভাবল, গত ক'দিন ভদ্রলোকের মত থেকেছে কুবলিকি, কিন্তু ক' ঘণ্টা ক্যাসিনোয় কাটাবার পর ঠিকই জেমস বণ্ডের মত হাত বাড়াবে ওর দিকে। তার আগেই হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়া উচিত। যুবক আবার ওর চেয়ে কয়েক বছরের ছোট!

হোটেল থেকে বেরিয়ে ব্যাহনহফ স্ট্রিটের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে শুরু করল কার্টা। একটু পর পর স্থানীয়দের কুটিরশিল্পের দোকান। টুরিস্টদের জন্য সাজিয়ে রেখেছে কাঠে খোদাই করা

মূর্তি ও অস্ট্রিচ পাখির রঙচঙে ডিম। আটলান্টিক থেকে ভেসে আসছে শীতল হাওয়া, যেন ঝাঁট দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে ধুলোবালি। সমাহিত হয়ে এসেছে শহর। রাস্তার শেষে ডানদিকে পাম বিচ। সরাসরি সামনে মোল। শেষ প্রান্তে অনেক উঁচু বাতি-ঘর। ক' মিনিট হাঁটবার পর পৌঁছে গেল কার্টা। লুটিয়ে পড়া ঢেউয়ের উপর তৈরি করা হয়েছে অপূর্ব সুন্দর রেস্টুরেন্ট। কার্টা ভাবল, দূর-সাগরে চাইলে কেমন উদাস হয়ে ওঠে সবাই। ওর মত করেই ভেবেছে ক'জন টুরিস্ট, টেবিল দখল করে দেখছে সুনীল সাগর।

বার কাউন্টার থেকে জার্মান বিয়ার নিল কার্টা, একটু দূরে চেয়ার দেখে ওখানে বসল। ধীরে ধীরে সাগরের বুকে নেমে আসছে রাত। ওর বুকের ভিতর ঠিক অমনই আঁধার। সবই যেন ফাঁকা লাগছে। ব্যর্থতা মেনে নেয়া কষ্টের। অনেক আশা নিয়ে এসেছিল। শুরু থেকেই জানত, সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তারপরও ভেবেছে, হয়তো সত্যি পাবে এইচএমএস চ্যালেঞ্জারকে।

শতবার নিজেকে জিজ্ঞেস করেছে: জাহাজ পেলে তারপর কী? ওই গুজব সত্য হওয়ার সম্ভাবনা কোটিতে এক ভাগও ছিল না। এরপরও যদি পেয়েই যেত, ওর কোম্পানি মোটা বোনাস দিত। সেটাই কি সব? রন কুবলিকির গা জ্বলা কথা, লাজরাসের নারী-দেহের লোভ বা দাদু এবেলের পাগলামি— পয়সা পেলেই ব্যস্, সব সহ্য করতে হবে?

নিজের উপর রেগে গেছে কার্টা, তিন চুমুকে বিয়ার শেষ করল। আরেকটা বিয়ারের অর্ডার দিল, এবার সঙ্গে থাকল মাছের ডিশ। আগেই ঠিক করেছে, এখানে ডিনার সেরে নেবে।

সাগরে ডুবতে শুরু করেছে সূর্য, সেদিকে চেয়ে রইল কার্টা। খাবার দিয়ে গেল বয়। হাতে কাঁটাচামচ তুলে নিল কার্টা। ভাবছে: ওই ডুবন্ত সূর্যের মতই ওর জীবন, অর্থহীন ভাবে ফুরিয়ে চলেছে।

ওর বড়বোন বিয়ে করেছে ক' বছর আগে। স্বামী আছে, তিনটে ছেলেমেয়ে, নিজের সুন্দর একটা ক্যারিয়ার— আর ও নিজে কী করছে? লণ্ডনে ছোট্ট এক অ্যাপার্টমেণ্টে একা থাকে। জীবনে আসতে চেয়েছে অনেক পুরুষ, কিন্তু তাদের দোষ না থাকলেও নিজেই ফিরিয়ে দিয়েছে। ও যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠে নেমেছে— জকি। ঘোড়া নিয়ে অদক্ষ জকি ছুটছে এক দেশ থেকে আরেক দেশে। কারও দিকে চাওয়ার সময় নেই। কলাম্বিয়া থেকে বিজনেসের উপর ডিগ্রি করেছে। অথচ কোথাও থিতু না হয়ে, ভাল কোনও চাকরি না নিয়ে ছুটে চলেছে তৃতীয় বিশ্বের জেলেদের পিছনে; এর ওর কাছে জানতে চাইছে— আচ্ছা ভাই, আপনি কোন্ জায়গাটায় বেশি জাল খুইয়ে থাকেন!

খাবার প্রায় শেষ করে এনেছে কার্টা, ঠিক করে ফেলল বাড়ি ফিরে জীবন নিয়ে নতুন করে ভাববে। এটা কম নয় যে ছাব্বিশটি বসন্ত এল। এখন পিছন ফিরে চাইলে মনে হয় বহু বছর পার করে এসেছে। বেশিরভাগ বান্ধবী সংসার করছে। বাচ্চাগুলো ওকে আণ্টি বলে ডাকে! কিছু দিন আগেও ভেবেছে, ভাগ্য ও পরিশ্রম ওকে কর্পোরেট মইয়ের অনেক উপরে তুলে দেবে। কিন্তু এখন পরিষ্কার বুঝছে, গত ক' বছর শুধু জুয়াই খেলেছে।

এই যে নামিবিয়ায় আসা, এ-ও ছিল জুয়া খেলা। এ দেশে এসে কী পেল? ...কই, কিছুই না! নিজের উপর রাগ হচ্ছে— কী করে এতগুলো দিন ভুলের ভিতর পড়ে থাকল!

নিঝুম নির্জন সাগর থেকে ভেসে আসছে শীতল হাওয়া, শিউরে উঠল কার্টা। দেরি না করে সোয়েটার পরে নিয়ে বিল মিটিয়ে দিল, সঙ্গে মোটা টিপ্‌স্। গাইড বুকে পড়েছে নামিবিয়ায় ওয়েটাররা বকশিশ আশা করে না।

অন্য এক পথে হোটেলের দিকে পা বাড়াল কার্টা। ফিরবার পথে পুরনো শহরের একাংশ দেখবে। পেরুল দু' একটা

রেস্টুরেন্ট, ওখানে কাস্টমার নেই। রাস্তা ও ফুটপাথ ফাঁকা। আফ্রিকা মহাদেশের মান অনুযায়ী নামিবিয়া ধনী দেশ, কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বের তুলনায় কিছুই নয়। বেশিরভাগ লোক কাজ শেষে বাড়ি ফিরেছে। রাত আটটার আগেই ঘুমিয়ে পড়ে তারা। দু' একটা বাড়িতে বাতি জ্বলতে দেখল কার্টা।

হঠাৎ করেই থেমে গেছে ঠাণ্ডা হাওয়া, সচেতন হয়ে উঠল ও। পিছনে ওটা পায়ের শব্দ না? চট্ করে ঘুরে চাইল। পিছন বাঁকে ছায়ার মধ্যে সরে গেল কে যেন! যদি স্বাভাবিক ভাবে হাঁটত, ভয় পেত না কার্টা। কিন্তু সে গোপনে আসতে চাইছে! একবার চারপাশ দেখে নিল, ধড়ফড় করছে ওর বুক। আগে কখনও শহরের এ অংশে আসেনি।

সব অচেনা, কিন্তু চার বা পাঁচটা রাস্তা পেরুলে বামদিকে থাকবে হোটেল। ওটা ঝলমল করবে ব্যাহনহফ স্ট্রিটে। একবার ওই স্ট্রিটে পৌঁছতে পারলে আর কোনও ভয় নেই। দৌড়াতে শুরু করল কার্টা। কয়েক পা যেতে না যেতেই খুলে গেল ডান পায়ের স্যাণ্ডেল। থামল না, বাম পায়েরটাও ফেলে দিয়ে গতি বাড়াল। পিছন থেকে শোনা গেল ঘোঁৎ জাতীয় শব্দ। শিকার টের পেয়েছে অনুসরণ করা হচ্ছে। এবার মেইল ট্রেনের মত ছুটে এল লোকটা। পরিষ্কার পাওয়া গেল বুট জুতোর আওয়াজ।

প্রাণপণে ছুটতে চাইছে কার্টা, ফুটপাথের উপর থ্যাপ-থ্যাপ আওয়াজে পড়ছে পায়ের নরম পাতা। পৌঁছে গেল সামনের বাঁকে, নতুন করে ছুটবার আগে একবার পিছনে চাইল। একজন নয়, তেড়ে আসছে দু'জন! ওর ধারণা ছিল এরা জেলে, এদের কাছেই নানা কথা জানতে চেয়েছে; কিন্তু পিছনের ওরা শ্বেতাঙ্গ! একজনের হাতে মনে হলো পিস্তল!

বাঁক ঘুরেই ছুটবার গতি বাড়াল কার্টা। দৌড়ে হারাতে পারবে না অনুসরণকারীদেরকে, কিন্তু একবার হোটেলে পৌঁছলে কোনও

চিন্তা নেই। এরা নিশ্চয়ই হোটেলে ঢুকবে না? এখন আফসোস লাগছে স্পোর্টস ব্রা পরেনি বলে। বেসামাল হয়ে উঠছে দুই স্তন। পাশে রাস্তা দেখে সে-পথে চলল। আপাতত ওকে দেখতে পাবে না লোকগুলো। সরু এক গলি পেয়ে সেখানেই ঢুকে পড়ল। এই আঁধারে ওকে দেখবে না কেউ।

গলি শেষে সামনে অন্য রাস্তা। আঁধারে অ্যালিউমিনিয়ামের ক্যান দেখতে পেল না কার্টা। পায়ে লেগে ঠং-ঠনাৎ আওয়াজে ছিটকে সরে গেল ওটা। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের ব্যথায় ওর মনে হলো ওখানেই বসে পড়বে। রেগে গেল, কেন দেখতে পেল না! ঘণ্টির মত আওয়াজ করেছে ওটা। পরের রাস্তায় বেরিয়েই বামে মোড় নিল কার্টা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলেছে। লোকদুটো নিশ্চয়ই আওয়াজ পেয়েছে, এখন ধেয়ে আসবে! সামনে থেকে আসছে একটা গাড়ি। ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে পড়ল কার্টা, পাগলের মত নাড়ছে দু'হাত। গতি কমিয়ে এনেছে গাড়ি। ভিতরে এক দম্পতি, পিছন সিটে তাদের বাচ্চা।

স্বামীর কানের কাছে কী যেন বলল মহিলা।

অপরাধীর মত মুখ অন্যদিকে সরিয়ে নিল লোকটা, তারপর গতি বাড়িয়ে চলে গেল। মনে মনে মহিলাকে অভিশাপ দিল কার্টা। সাহায্য পাবে ভেবে মূল্যবান সময় নষ্ট করেছে। আবারও ছুটতে শুরু করল। শ্বাস নিতে গিয়ে জ্বলছে ফুসফুস, যেন ফেটেই যাবে বুক।

পাশের বাড়ি থেকে ছিটকে উঠল সিমেন্ট ও ইঁট। গর্জে উঠেছে পিস্তল। পিছন ফিরে চাইল না কার্টা, ওর মাথা থেকে মাত্র একফুট দূরের দেয়ালে লেগেছে বুলেট। বসে পড়তে ইচ্ছা হলো, কিন্তু না-থেমেই ছুটল ক্ষিপ্র গ্যাযেলের মত। এঁকেবেঁকে দৌড়াতে শুরু করে আশা করল, ওরা নিশানা ঠিক রাখতে পারবে না।

একটু দূরে সাইনবোর্ড দেখতে পেল: ওয়্যাসেরফল স্ট্রিট। তার মানে, মাত্র অর্ধেক ব্লক পেরুলেই হোটেল। কার্টা জানত না এত দ্রুত ছুটতে পারে, ও যেন ছুটন্ত কোনও রকেট— আধ মিনিট পেরুনোর আগেই ব্যাহনহফ স্ট্রিটে উঠে এল। সামনেই হোটেল, চওড়া লেন ধরে মন্থর গতিতে চলেছে গাড়িগুলো। প্রাক্তন রেলস্টেশন এখন বিলাসবহুল হোটেল। জ্বলজ্বল করছে অসংখ্য বাতি। ছুটন্ত গাড়িগুলোর ভিতর দিয়ে রাস্তা পেরুতে শুরু করল কার্টা, জোরালো হর্ন বাজিয়ে আপত্তি তুলছে ড্রাইভাররা। পাত্তাই দিল না কার্টা, এক দৌড়ে ঢুকে পড়ল হোটেলের এন্ট্র্যান্সে। ওখানে থেমে পিছনে চাইল। রাস্তার ওদিকে থেমেছে লোকদুটো, কড়া চোখে দেখছে ওকে। বামপাশের লোকটা জ্যাকেটের পকেটে রেখেছে পিস্তল। দুই হাত দিয়ে চোঙ তৈরি করল সে, গলা উঁচিয়ে বলল, 'এবার শুধু সাবধান করলাম! নামিবিয়া থেকে বিদায় হও, নইলে পরেরবার গুলি ফস্কাবে না।'

প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কাঁপছে শরীর, পাল্টা চিৎকার করল না, ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল কার্টা। দুই চোখ ফেটে নামল অশ্রু। হাপরের মত হাঁপিয়ে চলেছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর ওর দিকে এগিয়ে এল এক ডোরম্যান। 'আপনার কোনও সাহায্যে আসতে পারি, ম্যাম?'

'না, ধন্যবাদ, আমি ঠিক আছি,' উঠে দাঁড়িয়ে চোখ মুছে নিল কার্টা। ঘুরে চাইল রাস্তার দিকে। লোকদুটো চলে গেছে। টের পেল, কাঁপছে দুই হাঁটু। ঘুরে দাঁড়িয়ে রুমের দিকে চলল কার্টা, ঠিক করে ফেলেছে, কিছুতেই নামিবিয়া ছেড়ে যাবে না।

আট

পাথরের পুরু দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মেয়েটির প্রলম্বিত আর্তচিৎকার। সূর্যের ভয়ঙ্কর খর তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দেয়ালগুলো, কিন্তু আওয়াজ ঠেকাবার সাধ্য নেই। মেয়েটি এখন গুঙিয়ে চলেছে। শুনলে মনে হয় পাশের সেল থেকেই আসছে। প্রথম থেকেই মনোযোগ দিয়ে শুনেছে আসিফ হায়দার চৌধুরি, মেয়েটির ভীষণ যন্ত্রণার সাক্ষী। বারবার মনে মনে বলেছেঃ যদি পারতাম, তোমাকে রক্ষা করতাম!

গত এক ঘণ্টা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়েছে মেয়েটি। ধীরে ধীরে কমে এসেছে চিৎকার। পুরো সময় মাথা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থেকেছে আসিফ, ওর মনে হয়েছে বিস্ফোরিত হবে করোটি। সেলের কাঁচা মেঝের উপর বসেছে এখন, দুই হাতে ঢেকে রেখেছে কান। আর শুনতে চায় না মেয়েটির করুণ গোঙানি।

ভোর হতে না হতেই মেয়েটিকে নিয়ে গেছে তারা। তখনও এত উষ্ণ হয়ে ওঠেনি কারাগারের পরিবেশ। সেলের পুবের দেয়ালে অনেক উপরে কাঁচের জানালা দিয়ে এসেছে লালচে রোদ। তখন মনে হয়েছে, এই বন্দিত্ব বেশিক্ষণের জন্য নয়, এখনও বাঁচবার আশা আছে। যে সেল ব্লকে ওকে আটকে রেখেছে, ওটা পঞ্চাশ বর্গ ফুট আকারের, কমপক্ষে তিরিশ ফুট উঁচু ছাত। এখানে বেশ কয়েকটা সেল আছে। এক পাশে লোহার

শিক দিয়ে তৈরি দরজা। অন্য তিন দিক পাথরের। ছাতও পাথরের। উপরে রয়েছে দোতলা ও তৃতীয় তলা। রটআয়ার্নের প্যাঁচানো সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। বহু বছর ধরেই ব্যবহার করা হয়েছে এই কারাগার। কিন্তু লোহার শিকে মোটেই জং ধরেনি। বর্তমান বিশ্বের সুপার-ম্যাক্স প্রিযনের মতই দুর্ভেদ্য এ কারাগার।

যারা ওকে বন্দি করেছে, তাদের চেহারা দেখেনি আসিফ হায়দার চৌধুরি। ওদের মুখে স্কি মাস্ক ছিল। একটা ভ্যান পাশ থেকে ওর গাড়িকে গুঁতো দিয়ে রাস্তা থেকে নামিয়ে দিয়েছে। এরপর গাড়ি থেকে বের করে ওকে ঘিরে ধরল কমপক্ষে তিনজন লোক। দুজন ধরল দুই হাত, অপরজন একটা রুমাল চেপে ধরল নাক-মুখের উপর। একটু ছটফট করেই জ্ঞান হারাল সে। চেতনা ফিরল বিমানে। দৈহিক আকৃতি দেখে ওই তিনজনের কথা মনে রেখেছে। একজন শ্বেত ভালুকের মত প্রকাণ্ড। হেলেদুলে হাঁটে। পরনে ছিল স্লিভলেস অ্যাথলেটিক টি-শার্ট। দ্বিতীয়জন হালকা-পাতলা, উজ্জ্বল নীল রঙের চোখ। তৃতীয়জনের হাঁটা দেখে বুঝেছে, একটা পায়ে ডিফেক্ট আছে।

তিনদিন হলো ওদেরকে বন্দি করেছে, এর ভিতর একটা কথাও বলেনি লোকগুলো। প্লেন থেকে নামিয়ে ভ্যানে তোলে, জোর করে খুলে নেয় পোশাক। দেয়া হয় জাম্পসুট। তার আগেই কেড়ে নিয়েছে কলম, আঙটি, ঘড়ি— সবই। জুতোর বদলে দেয়া হয়েছে রাবারের ফ্লিপ-ফ্লপ। এখানে আসবার পর থেকে দিনে দু'বার করে খাবার দেয়া হচ্ছে। আসিফের সেলের মেঝেতে একটা গর্ত, ওটাই টয়লেটের সুব্যবস্থা। বাইরে যখন ঝাড়তে থাকে দামাল হাওয়া, ওই গর্ত দিয়ে আসে উষ্ণ বাতাস, সঙ্গে বালি-কণা। খাবার দেয়ার সময় ছাড়া কখনও আসে না প্রহরীরা।

তারপর আজ এল তারা, নিয়ে গেল ক্যারেন ফুম্বসকে। অন্য এক ব্লকে আটকে রেখেছিল বেচারিকে; ওর সঙ্গে কোনও কথাও

হয়নি তার। ভোরে শুনল তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। আসিফ তখন আন্দাজ করেছে, ক্যারেনের চুলের গোছা ধরে টেনে দাঁড় করানো হয়েছে। তারপর ওর সেলের সামনে দিয়ে ছেঁচড়ে নিয়ে গেল। তখন শিকের গরাদে গাল চেপে দেখতে চেয়েছে আসিফ। ওদিকে রয়েছে একটা লোহার দরজা, তাতে পিপহোল।

মড়ার মত ফ্যাকাসে ছিল ক্যারেন, ভেজা চোখে ছিল ভীষণ আতঙ্ক। ওর নাম ধরে ডেকেছে আসিফ, দৌড়ে চলে গেছে শিকের গরাদের পাশে, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সহানুভূতি দেখাবার জন্য। তখন প্রহরীদের ভিতর যে সবচেয়ে বেঁটে, সে শিকের গরাদের উপর ধাঁই করে চালিয়েছে খাটো লাঠি। ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসেছে আসিফ। ওর চোখের সামনে টেনে নিয়ে গেছে ওরা ক্যারেনকে। তারপর ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়ে উঠেছে সেলের আবহাওয়া। আসিফ ধারণা করেছে, ক্যারেনকে নিয়ে যাওয়ার পর চার ঘণ্টা পেরিয়েছে। প্রথমে কোনও আর্তচিৎকার বা আহাজারি ছিল না, তারপর শুরু হলো। সেটা এক বা দু' ঘণ্টা আগের কথা। ভাবতে গিয়ে চমকে গেল আসিফ— দুই ঘণ্টা, ওরা বেচারিকে দুই ঘণ্টা ধরে অত্যাচার করছে! হায় আল্লাহ্!

কিডন্যাপ্‌ড্ হওয়ার এক ঘণ্টা পর পর্যন্ত আসিফ ভেবেছে, এরা টাকার জন্য এ কাজ করেছে, মুক্তিপণ পেলেই ওদেরকে ছেড়ে দেবে। সুইস কর্তৃপক্ষ কখনও কিডন্যাপারদের সঙ্গে রফা করে না, তবে ওই দেশে বিশেষ কয়েকটি কোম্পানির কাজই শুধু কিডন্যাপারদের সঙ্গে আপোষ করা। ইদানীং ইতালিতে একের পর এক নামী লোক কিডন্যাপ্‌ড্ হয়েছেন, এটা মাথায় রেখে বোর্ড অভ ডিরেক্টর্সকে আগেই জানিয়ে রেখেছে আসিফ, ওকে কখনও কিডন্যাপ করা হলে যত টাকাই চাওয়া হোক, মুক্তিপণ দিতে যেন দেরি না হয়।

ওকে চোখ বেঁধে বিমানে তুলেছে। এরপর অন্তত ছয় ঘণ্টা

আকাশে ছিল ওরা। এই ছয় ঘণ্টা নরকে থেকেছে আসিফ। কিছুই বুঝতে পারেনি কী করতে চলেছে এরা। একজনও একটা কথা বলেনি। আসিফের পাশেই ছিল ক্যারেন, ভোরে ফিসফিস করে আলাপ করেছে ওরা। কেউ নিশ্চিত নয় কী ঘটতে চলেছে। ক্যারেন বলেছে, এরা টাকার জন্য কিডন্যাপ করেছে। বাধ্য হয়ে ওকে ধরেছে, নইলে সাক্ষী রয়ে যেত। এ কথাগুলো শুনে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি আসিফ। আসিফ হায়দার চৌধুরি-নিকোলাস ক্রিস্টোফার ল্যাবোরেটরিজের কোনও ডিরেক্টরের সঙ্গে ওকে যোগাযোগ করতে বলেনি কিডন্যাপাররা। এখনও চাওয়া হয়নি মুক্তিপণ। ওর কোম্পানির কেউ জানে না এখনও বেঁচে আছে ক্যারেন এবং ও। কয়েক বছর আগে রুডিমেণ্টারি এগযেকিউটিভ সিকিউরিটি কোর্স করেছে আসিফ, ফলে কিডন্যাপিঙের বিষয়ে যেটুকু বুঝেছে, ওর মনে হয়েছে, এটা সাধারণ কোনও মুক্তিপণের কেস নয়।

আর এখন শুরু করেছে অত্যাচার।

বেচারি ক্যারেন কুম্বস! অতি বিশ্বস্ত, কাজে মন ঢেলে দেয়া এক সুযোগ্য কর্মী; টেস্ট টিউব ও বিকার ছাড়া কী-ই বা বোঝে সে! কয়েক সপ্তাহ আগের সেই আলাপ মনে পড়ল আসিফের। ক্যারেন চেয়েছে, ওর প্ল্যাঙ্কটন থামিয়ে দেবে ভয়ঙ্কর সব অয়েল স্পিল। আসিফ ওকে বলেনি, ওর ওই অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তা-ও ওকে প্রশংসা করে উৎসাহিত করেছে। অন্তত এক শ'বার অন্য কর্মীদের এভাবে সাহস দিয়েছে— মন দিয়ে কাজ করো, একদিন না একদিন কপাল খুলবে। ক্যারেনের ভাগ্য ভাল সাইকিয়াট্রিস্ট লাগেনি, ছোটবেলার ভয়ঙ্কর সব দৃশ্য ভুলতে পেরেছে, নিজের মনে কাজ করেছে ল্যাবোরেটরিতে।

মেয়েটির প্রজেক্টের কথা ভাবতে গিয়ে অন্য প্রজেক্ট মনে

আসছে। জেলে বন্দি হওয়ার পর থেকেই বারবার ওসব নিয়ে ভাবছে সে। এমন কোনও প্রজেক্ট নেই যেটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ওরা কোনও পেটেন্ট করছে না, দারুণ কোনও আবিষ্কারও হয়নি। কাজেই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এসপিয়োনাজ হওয়ার কথা নয়। সত্যি বলতে, নিকোলাস ও সে সালফার স্ক্রাবার আবিষ্কার করবার পর, ওদের ল্যাবোরেটরিতে অতটা বৈপ্লবিক কিছু আবিষ্কার হয়নি, তবে যা হয়েছে, আগের মত তেমন হুড়মুড় করে টাকা না এলেও এখনও যথেষ্ট ভাল টাকা আসছে। নিকোলাস চলে যাওয়ার পরে আসিফ নিজেও নতুন নতুন আবিষ্কারের আগ্রহ হারিয়েছে। তবে এখনও কেমিস্ট্রি রিসার্চের পিছনে প্রচুর পয়সা খরচ করছে ও। আসলে ও এই জগৎ থেকে একেবারে বিদায় নিতে চায় না।

তীক্ষ্ণ একটানা আর্তনাদ শোনা গেল, তারপর হঠাৎ করেই সব থেমে গেল। গোঙানি শুনতে খারাপ লাগছিল, কিন্তু চারপাশ নীরব হয়ে যেতেই শুকিয়ে গেল আসিফের বুক।

মেরেই ফেলল মেয়েটিকে?

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল আসিফ, দৌড়ে গিয়ে গরাদে গাল ঠেকিয়ে দেখতে চাইল ওদিকের সেল ব্লক। দু' মিনিট পেরুল, তারপর বোল্ট টেনে খুলবার খট-খটাং আওয়াজ হলো। ক্যাচকোঁচ শব্দে খুলে গেল লোহার দরজা, ক্যারেনকে দেখতে পেল আসিফ।

মেয়েটির শিথিল দুই হাত কাঁধে তুলে নিয়েছে দুই গার্ড, অন্য হাতে জড়িয়ে ধরেছে কোমর। এদের পর বেরিয়ে এল তৃতীয় গার্ড, হাতে বড় চাবির গোছা। লোকদুটো প্রায় ঝুলিয়ে আনছে ক্যারেনকে, ছেঁচড়ে চলেছে দুই পা। চুলে রক্ত ও ধুলোর কালচে কাদা। হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে দেয়া হয়েছে জাম্পসুটের গলা। বুকের উপর অংশ বেগুনী ও লাল, দগদগ করছে ঘায়ের মত।

আসিফের সেল পেরুতে শুরু করেছে গার্ডরা। এর ভিতর

একবার কোনওমতে মুখ তুলে বসকে দেখল ক্যারেন। হতবাক হয়ে গেছে আসিফ। লাল-বেগুনি-কালো রঙে বদলে গেছে মেয়েটির মুখ। বেচারিকে প্রচণ্ড ভাবে পেটানো হয়েছে। ডান চোখ ফুলে বুজে গেছে। বাম চোখ এখনও খুলছে, তবে ভারী হয়ে উঠেছে পাতা। ফাটা দুই ঠোঁট থেকে গড়িয়ে নামছে রক্ত ও লালা। আসিফের দিকে চাওয়ার সময় সামান্য প্রাণ পেল ক্যারেনের চোখ।

'হায় আল্লাহ্, ক্যারেন!' আর কিছু বলতে পারল না আসিফ হায়দার। ঠেকাতে পারল না অশ্রু, গাল বেয়ে দরদর করে নামল লোনা জল। ক্যারেন যদি অচেনা কেউ হোত, তাও কাঁদত আসিফ। বুক ভেঙে যাচ্ছে, মেয়েটি ওরই কর্মচারী, ওরই উপর ভরসা রেখে রিসার্চের কাজ করছিল, কিন্তু তাকে রক্ষা করতে পারেনি সে।

রক্তের একটা দলা থুহ্ করে মেঝেতে ফেলল ক্যারেন, ফুঁপিয়ে উঠল, 'স্যর... ওরা... আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি... স্যর...'

'কুকুরের বাচ্চারা!' গর্জে উঠল আসিফ। 'কত টাকা চাই তোদের! এই মেয়ে তো কোনও দোষ করেনি!'

লোকগুলো যেন বধির, কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না। ছেঁচড়ে নিয়ে গেল ক্যারেনকে, পাঁচ সেকেণ্ড পর তাদের আর দেখা গেল না। একটু পর ঘটাং করে খোলা হলো দূরের এক সেলের দরজা। বোধহয় ক্যারেনকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলেছে, কারণ পরক্ষণে দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ এল।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল আসিফ, লোকগুলো ওকে নিতে এলে প্রাণপণ লড়বে। যদি গায়ে হাত তোলে, পাল্টা মারবে ও। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল আসিফ। দুই হাত মুঠো পাকিয়ে গেছে। আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে কাঁধ। আয়, কুকুরের বাচ্চারা, এমনি এমনি

ওদের ছেড়ে দেব না।

একটু পর উজ্জ্বল নীল চোখের গার্ড ফিরে এল, হাতে কী যেন। জিনিসটা কী বুঝবার আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেল গার্ডের হাতে। তাক করেই ট্রিগার টিপে দিল। টেযার ওটা, এক পলকের জন্য পঞ্চাশ হাজার ভোল্ট বিদ্যুৎ বয়ে গেল আসিফের দেহে। সঙ্গে সঙ্গে বিকল হলো নার্ভাস সিস্টেম, তীব্র ব্যথা শুরু হয়েই থেমে গেল। আড়ষ্ট হয়ে এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল আসিফ, তারপর ধড়াস্ করে পড়ল মেঝের উপর। বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরতে লাগল চেতনা। ততক্ষণে ওকে বের করে আনা হয়েছে সেল থেকে, টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রধান দরজার কাছে। তখনও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ব্যথা দূর হয়নি, বুঝল এই অবস্থায় মোটেই লড়তে পারবে না।

নয়

চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কার্টা অস্টিন, বেসবল ক্যাপ না থাকলে দামাল হাওয়ায় উড়াল দিত দীর্ঘ, লালচে চুলগুলো। চোখে র‍্যাপঅ্যারাউণ্ড ওকলে সানগ্লাস, দুই ডাঁটি থেকে মাথার পিছনে চলে গেছে রঙিন কর্ড, টানটান হয়ে আছে। মুখের অন্য অংশে পুরু করে মেখেছে এসপিএফ ৩০ মলম। পরনে ওর খাকি হাফপ্যাণ্ট ও বড় পকেটওয়ালা বুশ শার্ট। পায়ে ক্যানভাসের বোট শু। সোনালী রোদে দু-পায়ের ফর্সা গোড়ালিতে চকচক্ করছে

সোনার নূপুর। সাগরে বিশ নট গতি তুলে ছুটছে ওদের ফিশিং বোট।

সাগর বা নদীতে এলেই নিজেকে কিশোরী মনে হয় ওর। মনে পড়েঃ বাবার চার্টার বোট নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। উনি অসুস্থ হওয়ার পর ব্যবসা বুঝে নিল, তখন বাজে কিছু অভিজ্ঞতা হয়। যারা বোট ভাড়া নিত, তাদের কেউ কেউ মাতাল হয়ে আসত, এবং মাছ পাওয়ার বদলে ওকে নিজেদের জালে তোলবার জন্য পাগল হয়ে উঠত। সেসব বাজে পরিস্থিতি বাদ দিলে বাকি সময় ভালই কেটেছে। সাগরের এই নোনা গন্ধে ওর মন শান্ত হয়, অসীম দিগন্তের দিকে ছুটতে ছুটতে গুছিয়ে নিতে পারে নিজের ভাবনাগুলোকে।

এখন সাগরে যে চার্টার বোট নিয়ে চলেছে ওরা, ওটার মালিক এক নামিবিয়ান ক্যাপ্টেন। হাসিখুশি, বয়স্ক মানুষ, কী করে যেন বুঝে ফেলেছেন এই মেয়ে ভালবাসে সাগরকে। যতবার দু'জনের চোখে চোখ পড়েছে, খুশি হয়ে হেসেছেন ভদ্রলোক। হেসেছে কার্টাও, ওর মনে পড়েছে বাবার কথা, তিনিও ঠিক এভাবেই ওর দিকে চেয়ে হাসতেন, মাথাটা এপাশ-ওপাশ দুলিয়ে বলতেনঃ পাগলি।

ট্র্যানসমের নীচে গর্জে চলেছে টুইন কামিন্স ডিজেল ইঞ্জিন, অসম্ভব হয়ে উঠেছে কথা বলা। চেয়ার ছাড়লেন ক্যাপ্টেন, হাতের ইশারায় কার্টাকে কন্ট্রোল বুঝে নিতে বললেন। খুশি হয়ে হেসে ফেলল কার্টা। কমপাসের উপর টোকা দিলেন ভদ্রলোক, দেখিয়ে দিলেন ওরা কোনদিকে চলেছে, তারপর সরে গেলেন হুইল থেকে। তাঁর চেয়ারে এসে বসল কার্টা, আস্তে করে হাত রাখল মসৃণ হুইলের উপর।

কয়েক মিনিট চুপ করে দেখলেন ক্যাপ্টেন। পানি চিরে ছুটে চলেছে ছেচল্লিশ ফুটি বোট। পিছনে ফেলে আসছে সাদা রঙের

সরল রেখার ঢেউ। পুরো সন্তুষ্ট হয়ে সরলেন তিনি, কয়েক ধাপ নেমে চলে এলেন ডেকে। কাছেই একটা ফাইটিং চেয়ারে কুঁজো হয়ে বসে আছে কুবলিকি, এক হাতে টিপছে কপাল। গতকাল ক্যাসিনোয় অনেক বেশি গিলে ফেলেছে। ভাবতেও পারেনি আজ বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে। সকালে দরজায় টোকার আওয়াজে উঠতেই হলো। তারপর কার্টা অস্টিনের কথায় আসতে হলো সাগরে।

যদি গতকাল ওই দুই বদমাস ধাওয়া না করত, জেদ ধরত না কার্টা। ওর মনে হয়েছে সঠিক পথেই চলেছে, এখন এইচএমএস চ্যালেঞ্জারকে খুঁজে পাওয়া শুধু সময়ের ব্যাপার। নইলে ওকে সরিয়ে দিতে চাইত না লোকগুলো। কুবলিকিকে হামলার কথা বলেনি কার্টা, সকালে প্রথমে ফোন করেছে বসের কাছে, খুলে বলেছে কী ঘটেছে। ভদ্রলোক চিন্তিত হয়ে পড়েন ওর জন্য, তবে এ দেশে আরও একটি দিন থাকার অনুমতি দেন । কার্টা চাইলে দাদু এবেলের বলা সাগরের ওই অংশে যেতে পারে, তদন্ত করে দেখতে পারে সত্যি আছে কি না ধাতুর সাপ।

অন্তরের গভীরে জানে কার্টা, মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে। বুদ্ধিমান কেউ এ ধরনের হুমকি শুনলে ফিরে যেত নিজ দেশে। কিন্তু ওর ধাত অমন নয়, কোনও কিছুর শেষ না দেখে ছাড়ে না। কখনও অনাকর্ষণীয় কোনও বই কিনে মাঝপথে বাদ দেয়নি, শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখেছে। যতই জটিল হোক ক্রসওয়ার্ড, প্রতিটি সূত্র খুঁজে বের করেছে। কাজ যতই কঠিন হোক, পিছু-পা হয়নি। ওর এই জেদ আছে বলেই ঠিক করেছে যতই বাধা আসুক, ঠিকই খুঁজে বের করবে জাহাজটাকে।

বোট চার্টার করবার সময় সতর্ক থেকেছে কার্টা, আগে ম্যাপ তৈরি করবার সময় যেসব ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলেছে, তাদেরকে এড়িয়ে গেছে। হোটেল থেকে বেরিয়ে মিশে গেছে বড়

একদল টুরিস্টের সঙ্গে। চলে এসেছে সাগর-তীরে, বাসে উঠে নিশ্চিত হয়েছে কেউ পিছু নেয়নি। সন্দেহজনক কেউ থাকলে বোট নিয়ে সাগরে বেরুত না ও।

এরপর বোট নিয়ে তীর থেকে কয়েক মাইল সাগরে চলে আসবার পর ক্যাপ্টেনকে বলেছে, আসলে কোথায় যেতে চায়। ক্যাপ্টেন বলেছেন কার্টা সাগরের যে অংশে যেতে চাইছে, সেখানে মাছ বা মেরিন লাইফ নেই। তবে পয়সা যখন কার্টা দেবে, ওদিকে যেতে আপত্তি তুলবেন না তিনি।

এসব ছয় ঘণ্টা আগের কথা। এরপর এক এক করে বহু মাইল পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। ধীরে ধীরে শান্ত হয়েছে ওর স্নায়ু। যে লোকদুটো হোটেল পর্যন্ত ধাওয়া করেছে, তারা হয়তো ভেবেছে ভয় পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে ও।

কিছুক্ষণ হলো ফুলে উঠেছে আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণ থেকে বাড়ছে হাওয়ার বেগ। মন্থর গতিতে আসছে একের পর এক বিশাল ঢেউ, যেন দোলনায় তুলে দুলিয়ে চলেছে বোটটাকে। স্টারবোর্ডের তলা দিয়ে পেরুচ্ছে ঢেউগুলো। প্রতিবার ভারসাম্য রেখে এগিয়ে চলেছে বোট। নীচের ডেক থেকে উঠে এলেন ক্যাপ্টেন, একটু পিছনে এসে দাঁড়ালেন। মেয়েটির হাত থেকে নিলেন না হেলম। একটা বেঞ্চ সিটের নীচ থেকে বের করলেন বিনকিউলার, চোখে লাগিয়ে দিগন্তের দিকে চাইলেন। কয়েক মুহূর্ত পর ওটা মেয়েটির হাতে ধরিয়ে দিলেন, হাতের ইশারায় দক্ষিণ-পশ্চিম দেখালেন।

বিনকিউলার অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে চোখে লাগাল কার্টা। ওই যে দূর দিগন্তে দেখা যাচ্ছে জাহাজটা। মালবাহী, একটি মাত্র চিমনি, চলেছে ওয়ালভিস বে-র দিকে। এতই দূরে, বিনকিউলার দিয়েও পরিষ্কার কিছু দেখা গেল না। জাহাজটার খোল কালচে, ডেকের উপর বুম ও ডেরিকের ঘন জঙ্গল।

'আগে কখনও এদিকের সাগরে জাহাজ দেখিনি,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'ওয়ালভিস বে-তে থামে শুধু কোস্টার, নইলে ক্রুজ শিপ। এত গভীর সাগরে আসে না জেলেরা। ওদিকে কেপ ঘুরে চার বা পাঁচ শ' মাইল দূর দিয়ে যায় ট্যাঙ্কারগুলো।'

মহাসাগরে রয়েছে অসংখ্য শিপিং লেন, প্রতিটি ইন্টারস্টেট হাইওয়ের মত চিহ্নিত। এসব লেনে কঠোর ভাবে দিক ও সময় মেনে চলে জাহাজগুলো। সুপারট্যাঙ্কার সাগরে চলতে হলে তাদের খরচ হয় দিনে কমপক্ষে এক লাখ ডলার। প্রতিটি জাহাজ সরাসরি গন্তব্য লক্ষ্য করে চলে। সরলেও বড়জোর এক বা দুই মাইল সরে। প্রতিটি লেনে থাকে প্রচুর জাহাজ, কিন্তু ওখান থেকে বছরে একটা জাহাজও সত্যিকারের নির্জন সাগরে যায় না। কার্টা অস্টিনের চার্টার বোট এখন ঠিক তেমনি একটি ডেড জোনে। কখনও এদিকে আসে না উপকূলীয় ফ্রেইটার, তীরের পাশ ঘেঁষে যাওয়া-আসা তাদের।

'আরও একটা ব্যাপার অস্বাভাবিক,' বলল কার্টা। 'জাহাজের চিমনি দিয়ে কোনও ধোঁয়া উঠছে না। আপনার কি মনে হয়, ক্যাপ্টেন, ওটা পরিত্যক্ত? হতে পারে কোনও বড় ঝড়ে পড়েছিল, বাধ্য হয়ে ওটাকে ত্যাগ করেছে ক্রুরা।'

মই বেয়ে উঠে এসেছে কুবলিকি।

রহস্যময় জাহাজ নিয়ে ভাবছে কার্টা। কী ঘটেছে জাহাজের ক্রুদের? আনমনে চেয়ে রইল জাহাজের দিকে, খেয়াল করেনি পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে কুবলিকি। লোকটা ওর কাঁধে হাত রাখতে চমকে গেল কার্টা।

'সরি,' বলল কুবলিকি। 'আমাদের পিছনে দেখুন। ওদিক থেকে আসছে একটা বোট।'

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল কার্টা। ওর হাত ছিল হুইলের উপর, নড়ে গেল ওটা। ভীষণ ভাবে পোর্টসাইডে দুলে উঠল বোট।

খোলা সাগরে দূরত্ব বোঝা খুবই কঠিন, তবে ওই বোট বড়জোর কয়েক মাইল পিছনে আসছে। চার্টার বোটের চেয়ে ওটার গতি অনেক বেশি। ক্যাপ্টেনের হাতে বিনকিউলার তুলে দিল কার্টা, সহজ ভঙ্গিতে ঠেলে দিল ক্রোম থ্রটলের হ্যাণ্ডেল। দেখতে না দেখতে পূর্ণ গতি পেল বোট।

'কী করছেন?' চেঁচিয়ে উঠল কুবলিকি। গতি বেড়ে যেতেই একটু কুঁজো হয়ে গেছে সে।

মেয়েটির উদ্বেগ টের পেয়েছেন ক্যাপ্টেন, তবে তখনই কিছু বললেন না। বিনকিউলার তুলে দেখছেন পিছনের বোট।

'আপনি চিনতে পেরেছেন ওটা?' জানতে চাইল কার্টা। 'মালিক কে?'

'ঠিকই চিনেছি। মাসে একবার আসে ওয়ালভিস বে-তে। খুব দ্রুতগামী ইয়ট। লম্বায় পঞ্চাশ ফুট মত। ওটার নাম বা মালিকের নাম জানি না।'

'ওখানে চেনা কাউকে দেখছেন?'

'আপার ব্রিজে কয়েকজন, সবাই শ্বেতাঙ্গ।'

'আমি জানতে চাই এখানে কী ঘটছে!' জেদি বাচ্চার মত চেঁচিয়ে উঠল কুবলিকি, করমচার মত লাল হয়ে গেছে মুখ।

তাকে পাত্তা দিল না কার্টা, বুঝে গেছে ওই ইয়টে কারা থাকতে পারে। হুইল ঘুরিয়ে দিক বদলে নিল, সোজা চলল দূরের ওই ফ্রেইটারের দিকে। প্রার্থনা করছে, ওই জাহাজে মানুষ থাকুক, সেক্ষেত্রে সাক্ষীর সামনে কিছুই করবে না পিছনের লোকগুলো। ওরা যদি খোলা সাগরে ছুটতে থাকে, সহজেই ওদের ধরে ফেলবে, এবং মেরেও ফেলতে পারে। সাগরে লাশ ফেলে দেবে, ডুবিয়ে দেবে ফিশিং বোট— কে ঠেকাবে তাদের? থ্রটল শেষ প্রান্তে ঠেলে দিল কার্টা, দুই ইঞ্জিনের কাছ থেকে আরও শক্তি চাইছে। কিন্তু আগেই পূর্ণ গতি তুলেছে ইঞ্জিন, নতুন কিছু দেয়ার

নেই। নীরবে প্রার্থনা করছে কার্টা: ঈশ্বর, যেন পরিত্যক্ত না হয় ওই ফ্রেইটার। নইলে সহজেই হাজির হবে লোকগুলো এবং মেরে ফেলবে ওদেরকে।

খপ্ করে ওর বাহু ধরল কুবলিকি, জ্বলছে দুই চোখ। 'মিস অস্টিন, খুব বাড়াবাড়ি করছ, খুলে বলো কী হয়েছে। কারা ওরা?'

'গতরাতে যারা হোটেল পর্যন্ত ধাওয়া করেছে, তারাই।'

'ধাওয়া করেছে? তোমাকে?'

'একবার তো বললামই,' ধমকের সুরে বলল কার্টা। 'দুই লোক হোটেল পর্যন্ত এসেছে। তাদের একজনের হাতে পিস্তল ছিল। আমাকে হুমকি দিয়েছে যেন এই দেশ ছেড়ে চলে যাই।'

ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছেন ক্যাপ্টেন। বোঝা গেল না কী ভাবছেন।

রন কুবলিকির সাধারণ রাগ এখন ভয়ঙ্কর ক্রোধে পরিণত হয়েছে। 'তুমি আমাকে একবারও বলোনি! তুমি পাগল নাকি, মিস অস্টিন? সশস্ত্র লোকের ধাওয়া খেয়েছ, এরপরও আমাদের নিয়ে এসেছ সাগরে মরতে! হায় ঈশ্বর! বোকা মেয়েলোক!'

'খবরদার, মুখ খারাপ করবে না!' ধমক মারল কার্টা। তারপর বলল, 'আমি ভেবেছি ওরা পিছু নেবে না। মস্ত ভুল হয়েছে। এখন যদি ফ্রেইটারের কাছে যেতে পারি, লোকগুলো আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।'

কুবলিকির মুখ থেকে ছিটকাল থুতু। 'জাহাজটা যদি ওখানে না থাকত?'

'ভেবে কী হবে? ওটা ওখানে আছে।'

ক্যাপ্টেনের দিকে চাইল কুবলিকি। 'আপনার সঙ্গে কোনও অস্ত্র আছে?'

আস্তে করে মাথা দোলালেন নামিবিয়ান ক্যাপ্টেন। 'হাঙর এলে ব্যবহার করি।'

'ঈশ্বরের শপথ, ওটা নিয়ে আসুন। যে-কোনও সময়ে লাগবে।'

একটু আগে ঢেউয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে বোট, কিন্তু এখন বদলে গেছে গতিপথ। সরাসরি সামনে পড়ছে একের পর এক ঢেউ। বিপুল পানি চিরে ছুটছে বোটের বো। লাফ দিয়ে ঢেউয়ের উপর উঠছে, আবার ধড়াস্ করে নামছে। চারপাশে ছিটকাচ্ছে সাদা ফেনা। রুক্ষ সাগরে লাফ দিতে দিতে চলেছে বোট। ঝাঁকি সামলে নিতে দুই হাঁটু একটু ভাঁজ করে দাঁড়িয়েছে কার্টা। নীচ থেকে ঘুরে এলেন ক্যাপ্টেন, নীরবে ওর হাতে তুলে দিলেন পুরনো বারো বোরের বন্দুক ও কয়েকটি শেল। কী করে যেন বুঝে গেছেন, কুবলিকিকে দিয়ে কিছু হবে না। কার্টা সরে যেতেই হেলম ধরলেন ক্যাপ্টেন। মৃদু কিছু পরিবর্তন আনলেন, এবার পূর্ণ গতিতে ছুটবে বোট। এরই ভিতর কমপক্ষে এক মাইল এগিয়ে এসেছে বিলাসবহুল ইয়ট। মনে হলো না ফ্রেইটার একটু কাছেও এসেছে।

বিনকিউলার দিয়ে বিশাল কার্গো শিপ দেখল কার্টা, দমে গেল ওর মন। জাহাজ অতি পুরনো, ঠিক ভাবে রিপেয়ার করা হয়নি কোনদিন। খোলে কয়েক রকমের রং। কোথাও কোথাও স্টিলের প্লেট লাগানো। ডেকে কেউ নেই। ব্রিজও খালি। বো থেকে সরছে সাদা ফেনা, দেখলে মনে হয় জাহাজ চলছে, কিন্তু তা হতে পারে না, চিমনি থেকে কোনও ধোঁয়া উঠছে না।

'আপনার কোনও রেডিও আছে?' ক্যাপ্টেনের কাছে জানতে চাইল কার্টা।

'কেবিনে,' বললেন ভদ্রলোক। 'তবে ওয়ালভিস বে পর্যন্ত ওটার রেঞ্জ নেই।'

ফ্রেইটারের বো-র দিকে আঙুল তুলল কার্টা। 'আমি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই। বোর্ডিং ল্যাডার নামিয়ে দিলে

উঠতে পারব।'

কাঁধের উপর দিয়ে ইয়ট দেখলেন ক্যাপ্টেন। 'প্রায় একই সময়ে পৌঁছুব আমরা।'

সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে গেল না কার্টা, দু'দিকের রেলিং ধরে পিছলে নামল ডেকে। এক দৌড়ে পৌঁছে গেল কেবিনে। নিচু সিলিঙের ঘরে এক দেয়ালে ঝুলছে পুরনো ট্র্যান্সিভার। ওটা চালু করল কার্টা, নব ঘুরিয়ে ষোলো নম্বর চ্যানেলে নিল। ওটাই ইন্টারন্যাশনাল ডিসট্রেস ব্যাণ্ড।

'ওয়ালভিস বে-র দিকে যাওয়া ফ্রেইটার, মেডে, মেডে, মেডে, এটা ফিশিং ভেসেল হিল্ডা। আমাদের দিকে ছুটে আসছে জলদস্যুরা। দয়া করে জবাব দিন।'

কেবিন ভরে উঠল স্ট্যাটিকের শব্দে।

রেডিওর ডায়াল অ্যাডজাস্ট করল কার্টা, নব টিপে চালু করল মাইক্রোফোন। 'এটা ফিশিং বোট হিল্ডা, ওয়ালভিস বে-র দিকে যাওয়া অচেনা ফ্রেইটার, দয়া করে সাড়া দিন। আমাদের সাহায্য দরকার... দয়া করে সাড়া দিন।'

আবারও স্ট্যাটিক শুরু হলো। তার ভিতর দিয়ে ভেসে এল ভুতুড়ে এক কণ্ঠ। বোটের ঝাঁকির ভিতর দক্ষ সার্জেনের আঙুলের মত নড়ছে কার্টার আঙুল, সামান্য ঘোরাল ডায়াল, তারপর স্পিকার থেকে ভেসে এল জোরালো কণ্ঠ।

'গতকাল সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, নামিবিয়া ছাড়লে আজ মরতে হতো না তোমাকে।'

নানা আওয়াজের ভিতর ওই কণ্ঠ চিনল কার্টা। গতরাতে ওকে হুমকি দিয়েছে এই লোক। ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চাইল ওর দেহের রক্ত।

মাইক্রোফোন চালু করল কার্টা। অনুনয়ের সুরে বলল, 'আমাদের পিছু ছাড়ুন, আমরা তীরে ফিরব। ঈশ্বরের শপথ, প্রথম

বিমানে চেপে এ দেশ ছাড়ব!'

'তোমাদের সে সুযোগ আর নেই।'

ট্র্যানসমের উপর দিয়ে চাইল কার্টা। অনেক কাছে চলে এসেছে ইয়ট। এখন বড়জোর কয়েক শ' গজ দূরে। ব্রিজে দু'জন লোককে দেখল, হাতে রাইফেল। ওদিকে কমপক্ষে এক মাইল দূরে ফ্রেইটার।

না, ওরা কোনও ভাবেই অত দূর পৌঁছুতে পারবে না।

'মাসুদ ভাই, কী মনে হয়?' কমিউনিকেশন্স স্টেশন থেকে জানতে চাইল রায়হান রশিদ।

সিট থেকে ঝুঁকে এসেছে মাসুদ রানা, আর্ম রেস্টে রেখেছে বাম কনুই, ডান হাতে হাতড়ে নিল খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাস্তুলের ক্যামেরা থেকে আসা যায়রো-স্ট্যাবিলাইযড্ ভিডিও সব নিখুঁত ভাবে দেখিয়ে চলেছে মস্ত স্ক্রিনে। দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস লক্ষ্য করে আসছে দুটো জলযান। বিশ নট গতি তুলেছে ফিশিং বোট। মোটর ইয়ট আসছে কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ নট গতিতে।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে রেইডারে ওই দুই জলযান দেখেছে ওরা। কোনও গুরুত্ব দেয়া হয়নি। ফিশিং গ্রাউণ্ড হিসাবে নামিবিয়ার উপকূল বিখ্যাত, এদিক দিয়ে যেতেই পারে জেলে-নৌকা বা ট্রলার। আগে খেয়াল দেয়া হয়নি, কিন্তু এখন ফিশিং বোট হিল্ডা আসছে ঠিক মার্ভেল লক্ষ্য করে। রানা ছিল নিজ কেবিনে, এক ঘণ্টা ব্যায়াম শেষে শাওয়ার নেবে, এমন সময় যোগাযোগ করল সোহেল।

'জানি না কী ভাবা উচিত,' একটু পর বলল রানা। 'মিলিয়ন ডলারের ইয়ট নিয়ে পুরনো ফিশিং বোট ধাওয়া করছে একদল জলদস্যু? তাও উপকূল থেকে দেড় শ' মাইল দূরে? অস্বাভাবিক নয়? ওয়েপন্স, ইয়টের উপর জুম করো। দেখতে চাই ওই ইয়টে

কারা।'

খোরশেদ নবী ডিউটিতে নেই, ওয়েপন্স স্টেশনে যে অফিসার সে জয়স্টিক ও ট্র্যাকবল নেড়ে স্ক্রিনে ইমেজ আনল। দৃশ্যটা এতই দূরে যে কমপিউটারের সাহায্য পেয়েও ছবি ফুটাতে গিয়ে হিমশিম খেল যায়রোস্কোপ। তবে মোটামুটি সব দেখা গেল। দারুণ চকচকে সুন্দর এক সাদা ইয়ট, ব্রিজের ঢালু কাঁচের ভিতর দিয়ে চোখে পড়ল চারজন লোক। দু'জনের সঙ্গে অ্যাসল্ট রাইফেল। চেয়ে রইল রানা, হঠাৎ সশস্ত্র দুই জনের একজন কাঁধে তুলে নিল অস্ত্র, এক পশলা গুলি করল।

মাসুদ ভাই এবার কী চাইবে, বুঝে নিয়েছে ওয়েপন্স অফিসার, ঘুরে গেল ক্যামেরা, দেখা গেল পালিয়ে আসছে ফিশিং বোট হিল্ডা। মনে হলো না গুলি লেগেছে, অপারেশন্স সেন্টার থেকে পরিষ্কার দেখা গেল লালচে চুলের এক মেয়েকে। চ্যাপ্টা ট্র্যানসমের উপর ঝুঁকে বসেছে সে, হাতে শটগান।

'ওয়েপন্স,' নির্দেশ দিল রানা, 'স্পুল করো গ্যাটলিং গান, কিন্তু সামনের প্লেট সরিয়ে দেবে না। স্টারবোর্ডের থার্টি ক্যালিবারের মেশিনগান তাক করো ইয়টের উপর। দরকার পড়তে পারে।'

'চারজন লোক, সঙ্গে অটোমেটিক রাইফেল, প্রতিপক্ষ শটগান হাতে এক মেয়ে,' বলল সোহেল। 'বেটি স্রেফ মরবে। আমাদের বোধহয় নাক গলাতেই হবে।'

'আমিও একই কথা ভাবছি,' বলল রানা। কমিউনিকেশন্স স্পেশালিস্টের দিকে চাইল। 'রায়হান, ওই মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করো।'

তিন কিবোর্ডের একটার বাটন টিপল রায়হান। 'এখন আপনি কথা বলতে পারেন।'

লিপ মাইকে বলে উঠল রানা, 'হিল্ডা, হিল্ডা, আমরা মোটর

শিপ মার্ভেল।' স্ক্রিনে মেয়েটিকে দেখতে পেল। চট্ করে কেবিনের দিকে ঘুরে চেয়েছে।

ট্র্যানসমের উপর ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি, তারপর এক দৌড়ে গিয়ে ঢুকল কেবিনের ভিতর। কয়েক সেকেণ্ড পর কথা বলতে লাগল। হাঁপানির আওয়াজে ভরে উঠল অপারেশন্স সেন্টার। 'মার্ভেল, ওহ্, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ভেবেছি আপনাদের জাহাজ পরিত্যক্ত!'

'খুব ভুল বলেননি,' মন্তব্য করল সানজিদা স্বর্ণা। ডিউটিতে নেই, তবে ওকে ডাকিয়ে এনেছে রানা। ক'দিন আগে ইন্টেলিজেন্সের উপর একটা ট্রেনিং নিয়েছে মেয়েটি, সিনিয়রদের বলে রেখেছে, ওর জ্ঞান কোথাও প্রয়োগ করতে পারলে খুশি হবে।

'আমাদের খুলে বলুন আপনাদের কী ধরনের ইমার্জেন্সি,' বলল রানা। যেন ভুলেই গেছে ক্যামেরা দিয়ে সবই দেখছে। 'আপনি বলেছেন জলদস্যুর দল হামলা করেছে।'

'হ্যাঁ, জলদস্যু। আমার নাম কার্টা অস্টিন। একটা ভাড়া করা বোট নিয়ে সাগরে এসেছি, তারপর হঠাৎ আমাদের উপর গুলি শুরু করেছে তারা।'

'কথাটা মিথ্যা,' নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল স্বর্ণা। 'ইয়টের ওই লোক আগেই বলেছে, সাবধান করেছে ওই মেয়েকে।'

'অসত্য বলছে,' স্বর্ণার কথায় সায় দিল রানা। 'ওর দিকে গুলি করেছে, কিন্তু মিথ্যা বলছে। ইন্টারেস্টিং। তোমার কী মনে হয়, স্বর্ণা?'

'কিছু লুকোছাপা আছে।'

'মার্ভেল,' উদ্বেগ প্রকাশ পেল মেয়েটির কণ্ঠে। 'আপনারা শুনছেন? মার্ভেল? মার্ভেল?'

মাইকে সাড়া দিল রানা। 'হ্যাঁ, আছি। শুনছি আমরা।' চট্

করে দেখে নিল স্ক্রিন। আন্দাজ করল এক মিনিট পর সাগরের কোন্ বিন্দুতে থাকবে দুই জলযান। ওর জানা হয়ে গেল ওই একই সময়ে ওরা নিজেরা কোথায় পৌঁছুবে। ট্যাকটিকাল পরিস্থিতি ভাল লাগল না। নিজেকে ওর অন্ধ মনে হচ্ছে। কার্টার অস্টিনের নাম বহুবার শুনেছে, সে দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে বড় ড্রাগ ডিলার। তাকে মেরে ফেলতে চাইছে তার প্রতিপক্ষ। এমনও হতে পারে, ওই বোটে কার্টা অস্টিন ও অন্য যারা রয়েছে, তাদের প্রাপ্য ভয়ঙ্কর কষ্টকর মৃত্যু। আবার এমনও হতে পারে, মেয়েটি আসলে নিরপরাধ।

'তা হলে মিথ্যা বলছে কেন?' নিজেকে জিজ্ঞেস করল রানা।

মার্ভেলের গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। কয়েক সেকেণ্ড ভাবল রানা, তারপর সিদ্ধান্তে এল।

'গগল, পোর্টসাইডে বাঁক নিতে শুরু করো, হিল্ডা আর আমাদের মাঝের দূরত্ব কমিয়ে আনো। গতি তোলো বিশ নটে। ইঞ্জিনিয়ার আফতাব, চালু করো ধোঁয়ার বয়লার।' ফাঁকা সাগরে কখনও পলিউশন তৈরি করে না মার্ভেল, তবে আশপাশে কোনও জাহাজ থাকলে তখন চিমনি দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করে। কারও বুঝবার উপায় থাকে না এই জাহাজ অত্যাধুনিক, ব্যবহার করা হয় না সাধারণ ডিজেল ইঞ্জিন।

'কয়েক মিনিট আগে জেনারেটার স্টার্ট দিয়েছি,' অপারেশন্স সেন্টারের পিছন থেকে বলে উঠল আফতাব। 'জাহাজ চোখে পড়বার আগেই চালু করা উচিত ছিল, ভুলে গেছি।'

'বড় বিপদ হওয়ার কথা নয়, হয়তো খেয়ালই করেনি কেউ,' বলল সোহেল।

নতুন করে মাইক অ্যাক্টিভেট করল রানা। 'মিস অস্টিন, মার্ভেলের ক্যাপ্টেন বলছি।'

'বলুন।'

এই মেয়ে কি সবদিক ভেবে দেখছে? ইংরেজ মেয়ে জুডি স্টিভেনসনের কথা মনে পড়ল রানার। জাপান সাগরে ওর সঙ্গে দেখা হয় এক নিমজ্জিত জাহাজে। খুব ঠাণ্ডা ছিল ওর মগজ। এই মেয়ে বোধহয় একই পথের পথিক। 'আমরা জাহাজ ঘোরাতে শুরু করেছি, আপনাদের দিকেই আসছি। হিল্ডার ক্যাপ্টেনকে বলুন, উনি যেন আমাদের পোর্টসাইডে থাকেন। তবে এখনই কিছু করতে মানা করবেন। আমাদের স্টারবোর্ডে রাখতে চাই ইয়ট। আপনি বুঝতে পেরেছেন?'

'একেবারে শেষ সময়ে বাঁক নিয়ে আপনাদের পোর্টসাইড ধরে চলব আমরা।'

'ঠিক ধরেছেন। তবে বড় বেশি কাছে আসবেন না। যে গতিতে আসছে ইয়ট, ওটা শেষ সময়ে বাঁক নিতে পারবে না। আপনারা আমাদের বো-র ঢেউ থেকে দূরে থাকবেন। এরপর বোর্ডিং স্টেয়ার নামিয়ে দেয়া হবে। তবে, না বলা পর্যন্ত ওটার দিকে আসবেন না। বুঝতে পেরেছেন?'

'আপনি সিগনাল না দেয়া পর্যন্ত ওদিকে যাব না,' জবাবে বলল কার্টা।

'আপনাদের কোনও বিপদ হবে না।' খড়খড় করা রেডিওর ভিতর প্রকাশ পেল রানার আত্মবিশ্বাস। 'এই প্রথম জলদস্যুদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে, তা নয়।'

স্ক্রিনে চাইল রানা। নতুন উৎসাহ নিয়ে ফিশিং বোট হিল্ডার উপর গুলি শুরু করেছে এক আততায়ী। তবে এত বেশি নড়ছে ইয়ট, লক্ষ্যভেদ অসম্ভব। রেঞ্জ এখনও অনেক বেশি। বোটের অনেক দূর দিয়ে গেল গুলি। রানার মনে হলো ও ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে। কার্টা অস্টিন ও তার সঙ্গীদের সাহায্য করা উচিত।

'রায়হান, কয়েকজন ক্রু নিয়ে ডেকে চলে যাও, নামিয়ে দাও বোর্ডিং স্টেয়ার। ওয়েপন্স, বো-র পয়েন্ট থার্টি ক্যালিবারের

মেশিনগান তৈরি রাখো।'

'তৈরি। টার্গেটের উপর স্থির করেছি।'

লাফাতে লাফাতে আসছে পেটমোটা পোয়াতি হিল্ডা। প্রকাণ্ড মার্ভেল থেকে বড়জোর তিন শ' গজ দূরে। আরও এক শ' গজ পিছনে ইয়ট। রানার ইচ্ছে ছিল না মেশিনগান ব্যবহার করবে, কিন্তু পরিষ্কার বুঝল, এ ছাড়া কোনও উপায়ও নেই। দুই বোটের মাঝে মার্ভেল হাজির হওয়ার আগেই ফিশিং বোট হিল্ডাকে রেঞ্জে পেয়ে যাবে আততায়ীরা। ওয়েপন্স অফিসারকে ইয়ট লক্ষ্য করে সংক্ষিপ্ত এক পশলা গুলি পাঠাতে বলবে, এমন সময় সিদ্ধান্ত পাল্টাল রানা। হিল্ডার স্টার্নে এসে দাঁড়িয়েছে কার্টা অস্টিন, ট্র্যানসমের উপর দিয়ে দেখা গেল মেয়েটির মাথা ও কাঁধ। পরক্ষণে গর্জে উঠল শটগান। এক সেকেণ্ড পর খালি হলো দ্বিতীয় নল।

ইয়টে গুলি লাগা ছিল অসম্ভব, তবে পাল্টা গুলি আসছে বুঝতে পেরে চমকে গেছে লোকগুলো। গতি কমিয়ে একটু পিছিয়ে গেল ইয়ট। চালক বোধহয় ভাবতে শুরু করেছে এবার কী করবে। মেয়েটির কারণে বাড়তি যে সময় মিলল, এর ফলে রানার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সহজ হলো।

পিছিয়ে পড়েছে ইয়ট। তবে তা বিশ সেকেণ্ডের জন্য, তারপর নতুন করে তীব্র গতি তুলল ইয়ট, একটানা বিশ্রী আওয়াজ শুরু করেছে অটোমেটিক রাইফেল। হিল্ডার স্টার্নে গিয়ে লাগছে অজস্র বুলেট। ছিটকে উঠছে কাঠের কুঁচি। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল কেবিনের কাঁচের দরজা। ট্র্যানসমের আড়ালে রয়েছে কার্টা, কিছুই হলো না ওর। অবশ্য, ব্রিজে একদম খোলা জায়গায় পড়ে গেলেন ক্যাপ্টেন ও সাথের অন্য লোকটা।

গতি কমালেন না ফিশিং বোটের ক্যাপ্টেন, দুলে উঠল তাঁর জলযান, এঁকেবেঁকে চলেছে ফ্রেইটার লক্ষ্য করে। হামলাকারীদের

তাক নষ্ট করতে চাইছে। এমন সময় গর্জে উঠল মেয়েটির বন্দুক। একই সঙ্গে দুই নল খালি করেছে। গুলি এতই দূর দিয়ে গেল, কয়েক শ' ফুট দূরে সাগরের বুকে ছিটকে উঠল গেইযার।

নতুন উদ্যমে ইয়ট থেকে এল গুলি, এবার বাধ্য হয়ে বসে পড়ল কার্টা। ও রয়েছে বোটের পিছনে রুক্ষ তক্তার ডেকে, দেখতে পেল না সামনে থেকে আসছে বিশাল ফ্রেইটার। অবশ্য টের পেল বদলে গেছে বোটের আচরণ। উথাল-পাতাল ঢেউ আসছে বড় জাহাজের খোল থেকে। বন্দুক ছুঁড়তে গিয়ে কাঁধে ব্যথা পেয়েছে কার্টা, তিক্ত মনে ভাবল, এখন আর কিছুই করবার নেই ওর। যা করবার করতে হবে হিল্ডার ক্যাপ্টেন এবং মার্ভেলের ক্যাপ্টেনকে। ট্র্যানসমের সঙ্গে সেঁটে শুয়ে রইল ও, ভয়ের চোটে হাঁপিয়ে উঠেছে। গতকাল ঠিক এমনই ভয় পেয়েছিল, কিন্তু পরে ভীষণ জেদ চেপে গেল মাথায়। নইলে হয়তো আজ এই বিপদে পড়তে হতো না।

মার্ভেলে অপারেশন্স সেন্টারে স্ক্রিনের দিকে চেয়ে রয়েছে রানা ও সোহেল। অনেক কাছে চলে এসেছে খুদে দুই জলযান। ফিশিং বোটের স্টারবোর্ডের দিকে ছুটে আসছে ইয়ট। এখনও নব্বুই গজ দূরে। একটু পর রেঞ্জে সবাইকে পাবে আততায়ীরা। মার্ভেল থেকে মাত্র তিরিশ গজ দূরে হিল্ডা। এতই কাছে, মাস্তুলের ক্যামেরাকে ট্র্যাক করতে হচ্ছে না। বো-র পয়েন্ট থ্রিটু ক্যালিবার গানের ক্যামেরা চালু করল ওয়েপন্স অফিসার।

ইয়ট থেকে আরও এক পশলা গুলি লাগল ফিশিং বোটে। যদি বিলাসবহুল ইয়ট আরও দূরে থাকত, নিজের পরিকল্পনা বাদ দিত রানা, ওয়েপন্স অফিসারকে বলত মেশিনগান বা গ্যাটলিং গান দিয়ে ঝাঁঝরা করে দিক শত্রুযানকে। এখনও স্টিলের প্লেটের ওপাশ থেকে ইয়টকে ট্র্যাক করছে গ্যাটলিং গান।

'এবার,' বিড়বিড় করে বলল রানা।

মাইক্রোফোন চালু করেনি, কিন্তু মনে হলো ওর কথা শুনতে পেয়েছেন হিল্ডার ক্যাপ্টেন, মার্ভেলের খাড়া প্রাউ থেকে পনেরো গজ দূরে ডানে বাঁক নিতে শুরু করল বোট। মার্ভেলের খোল থেকে বড় ঢেউ গেল ওটার দিকে, দুলতে দুলতে সরে চলেছে হিল্ডা, মনে হলো জোরালো ঢেউ পেয়ে রওনা হয়েছে কোনও সার্ফার।

ইয়টের হেলম্‌স্‌ম্যান বন-বন করে হুইল ঘোরাল, ভাব দেখে মনে হলো পিছু নেবে মোটা বোটের। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বুঝল অনেক বেশি গতি তুলে ছুটছে। বাধ্য হয়ে ফ্রেইটারের স্টারবোর্ডে চলে এল সে। ইয়টের দ্রুত গতি কাজে লাগিয়ে পিছনে ফেলবে জাহাজ, তারপর স্টার্ন পেরিয়ে আবারও ধাওয়া করবে ফিশিং বোটকে।

'গগল,' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'তৈরি থাকো। আমি যে মুহূর্তে স্টারবোর্ডের বো থ্রাস্টারগুলো পুরো চালু করতে বলব, একইসঙ্গে পুরো ডানদিকে ঘুরিয়ে দেবে রাডার। গতি তোলো চল্লিশ নটে।' ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল বদলে নিল রানা। দুই সেকেণ্ডের জন্য দেখা গেল দুলতে দুলতে চলেছে হিল্ডা। রানার মনের ভিতর খেলা করছে কয়েক ধরনের চিন্তা। ভাল করেই জানে ওর হাতে নির্ভর করছে মানুষের প্রাণ, একই সঙ্গে গোপন রাখতে হবে জাহাজের রহস্য। প্রায় ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছে ইয়ট। আরেক দিকে সরে গেছে ফিশিং বোট। এখন যদি ও দেরি করে, আবারও বিপদে পড়বে ওটা।

'গগল।'

কিবোর্ডে কয়েকটা টোকা দিল আর্মস্ ডিলার, পরক্ষণে একটু নাড়ল জয়স্টিক। এগারো হাজার টনি অন্য কোনও জাহাজ যা পারে না, ঠিক সেটাই করল মার্ভেল। আথওয়ার্টশিপ থ্রাস্টারগুলো দ্রুত কাজ শুরু করতেই দেখতে না দেখতে অবিশ্বাস্যভাবে পানির

ভিতর তীরের মত সরে গেল বো। নিজের ভয়ঙ্কর বেগ যেন কিছুই নয়, এখনও গতি তুলছে ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিনগুলো।

মাত্র এক সেকেণ্ড আগে মার্ভেলের বো পেরুতে শুরু করেছে ইয়ট, পরক্ষণে দেখা গেল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বাঁক নিতে শুরু করেছে জাহাজ। এইমাত্র সামনে ছিল খোলা সাগর, তা এখন আটকে দিতে চলেছে ভুতুড়ে জাহাজ। পঁয়ত্রিশ নট গতি তুলে সরাসরি জাহাজের পেটের দিকে চলেছে ইয়ট। দুই জলযানের সম্মিলিত গতিবেগ সত্তর নটের বেশি। যেভাবে নিজ শিশু আগলে রাখে তিমি মা, ঠিক সেভাবে ফিশিং বোটকে আড়াল দিয়েছে মার্ভেল। রানা চট্ করে স্ক্রিনে দেখে নিল ওই বোট থেকে একটু এগিয়ে ঘুরছে মার্ভেল। দুই জলযানের ঢেউগুলো পাল্টাপাল্টি ধাক্কা খেয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে পানি। একটু দূরে নাচতে নাচতে চলেছে জার্মান মহিলা।

পাগল হয়ে উঠেছে ইয়টের চালক। যেন দ্রুতগামী ট্রেন চলে আসবার আগেই রেললাইন পেরুতে হবে। জাহাজের বিশাল উঁচু বো ঘুরছে। নিজের পোর্টসাইডে বাঁক নিতে চাইল ইয়ট-চালক। তার ধারণা ছিল, খুব ধীরে চলছে জাহাজটা। কিন্তু তারপর দেখল ফ্যানটেইলের নীচে বলকে উঠছে বিপুল পানি। সে যদি স্বাভাবিক মানুষ হতো, ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে প্রার্থনা শুরু করত: খোলের সঙ্গে বাড়ি খাওয়ার পরও যেন বাঁচি।

গতিবেগ ও অবস্থান বুঝতে কঠিন অঙ্ক কষতে হয় না, এখনও ঘুরছে প্রকাণ্ড মার্ভেল, তবে ওটার চেয়ে অনেক বেশি ছোট একটা বৃত্ত তৈরি করতে চাইছে ইয়টের চালক।

একেবারে শেষ সময়ে লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল এক গানম্যান, পিছিয়ে নিতে চাইল থ্রটল। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে, হাতে কোনও সময়ও নেই তাদের।

মার্ভেলের বো থেকে এক শ' ফুট দূরে গিয়ে খরখরে খোলে নাক গুঁজল ইয়টের চকচকে প্রাউ। জাহাজের পুরু ধাতব দেহের কাছে ফাইবারগ্লাস ও অ্যালিউমিনিয়াম কিছুই নয়। মনে হলো একটা বিয়ারের ক্যানের উপর নেমে এসেছে দুরমুজ। মাউন্ট থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল দুই ইঞ্জিন, ছিন্নভিন্ন করে দিল খোল। পাঁজরের মত আড়াগুলো পুরো ইয়ট ধরে রেখেছিল, সেগুলো মড়মড় করে ভাঙল। বোটের উপরের অংশে কাঁচ ও প্লাস্টিকের তৈরি সবকিছু বিস্ফোরিত হলো। দুই সেকেণ্ড আগে চারজন লোক নিশ্চিত ছিল মিশন শেষ করতে পারবে, কিন্তু পরক্ষণে মারা পড়ল বেঘোরে। দুই জলযানের ভয়ঙ্কর সংঘর্ষে ছাতু হলো লোকগুলোর হাড়-মাংস।

একটা ফিউয়েল ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হলো, নোংরা কমলা রঙের আগুনের একটা গোলক আকাশে উঠল, এক পলক মার্ভেলের রেলিংটা চেটে নিয়ে হারিয়ে গেল চিরতরে। মনে হলো যেন একটা গোল্ড ফিশ এসে গুঁতো দিয়েছে হাঙরকে, তখনও ঘুরছে জাহাজ, বড় কোনও ঝাঁকিও খেল না। নীচে পানির ভিতর ছড়িয়ে পড়েছে জ্বলন্ত ডিজেলের পাতলা পর্দা। অবশিষ্ট ইয়টের ভিতর থেকে উঠছে তেলতেলে ধোঁয়া, কিন্তু পাঁচ সেকেণ্ড পর মাঝারি একটা ঢেউ এসে সবই তলিয়ে দিল।

'এবার থামো, গগল,' বলল রানা। এক মুহূর্ত পর টের পেল ডিযএংগেজ করা হয়েছে পাম্প জেটগুলো।

'মাছি মারার মত, কী বলিস?' বলল সোহেল।

'দেখা যাক মাছি থেকে যাদের রক্ষা করলাম, তারা আবার হুলওয়ালা বোলতা কি না।' মাইক্রোফোনের সুইচ টিপল রানা। 'মার্ভেল থেকে বলছি... হিল্ডা, শুনছেন?'

'হিল্ডা থেকে বলছি, মার্ভেল,' মেয়েটির স্বস্তির হাসি শুনতে পেল ওরা। 'জানি না কীভাবে কাজটা করলেন, তবে আমরা

তিনজন কৃতজ্ঞ রইলাম আপনাদের কাছে।'

'আপনারা লেট লাঞ্চে আমাদের সঙ্গে বসলে খুশি হব,' বলল রানা। 'যা ঘটল সেটা নিয়েও একটু আলাপ করতে চাই।'

'প্লিয, এক মিনিট অপেক্ষা করুন, মার্ভেল।'

রানার জানতে হবে, কেন কী ঘটল। মেয়েটি জাহাজে উঠবার আগে বাড়তি সময় নেবে, তা দেবে না ও, নইলে হয়তো মিথ্যা কাহিনি সাজাবে কার্টা অস্টিন। 'আপনারা যদি দাওয়াত এড়িয়ে যেতে চান, বাধ্য হয়েই ওয়ালভিস বে-র মেরিটাইম কর্তৃপক্ষের কাছে আনুষ্ঠানিক ভাবে রিপোর্ট করতে বাধ্য হব।'

এ ধরনের চিন্তা নেই রানার মনে, তবে সেটা জানে না কার্টা অস্টিন।

'আ... ঠিক আছে, খুশি মনে আপনার দাওয়াত গ্রহণ করছি আমরা।'

'খুব ভাল। আমাদের বোর্ডিং ল্যাডার নামিয়ে দেয়া হয়েছে পোর্ট সাইডে। আমার এক ক্রু আপনাদের নিয়ে আসবে ব্রিজে।' সোহেলের দিকে চাইল রানা। 'দেখা যাক কোন্ ঝামেলার ভিতর পড়লাম।'

দশ

অচেতনতা যেন উষ্ণ কোনও আরামদায়ক চাদর, তবে ওই রেশমি চাদর সরিয়ে জেদ নিয়ে জেগে উঠতে চাইছে আসিফ

হায়দার চৌধুরি। অবশ লাগছে সারা দেহ। কাটতে শুরু করেছে টেযারের শক। আঙুল, গোড়ালি ও বুকে যেখানে লেগেছে ইলেকট্রোড, সেসব জায়গায় মনে হচ্ছে অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে ত্বক।

'ওর ঘুম ভাঙছে,' একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল। যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এসেছে। কিন্তু কেন যেন আসিফের মনে হলো ওই লোককে ভাল করেই চেনে সে। আসলে ওর মগজ চলছে না, মনে হচ্ছে অনেক দূরের আকাশে উঠে কোথায় যেন ভেসে চলেছে।

কিছুটা চেতনা ফিরল ওর, টের পেল বেকায়দা ভাবে রয়েছে দেহ। নড়ে উঠল আসিফ, কিন্তু তাতে কোনও সুবিধা হলো না। দুই কবজি আটকে দেয়া হয়েছে হ্যাণ্ডকাফে, একেবারে মাংসে গেঁথে গেছে বেড়ি। এক ইঞ্চির বেশি নড়ল না হাত। তাতে খুব ব্যথা লাগছে না। হাত-পায়ে তেমন সাড়া নেই। কিন্তু বোঝা গেল এরা দুই গোড়ালিও বেঁধেছে।

অনিশ্চয়তা নিয়ে চোখ মেলল আসিফ। পরক্ষণে বুজে ফেলল পাতা। আগে কখনও এত উজ্জ্বল আলোকিত ঘর দেখেনি। ওর মনে হয়েছে দাঁড়িয়ে আছে জ্বলন্ত সূর্যের সামনে। কয়েক মুহূর্ত চোখ মুদে থাকল আসিফ, তারপর আবারও খুলল পাতা, ঝলমলে আলোয় কুঁচকে গেল ভুরু। চারপাশ বুঝতে কয়েক সেকেণ্ড লাগল। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ঘরটা পনেরো ফুটের মত। ওকে যে কয়েদখানায় রাখা হয়, ওটার মতই চারদিকে পাথরের দেয়াল। বুঝতে দেরি হলো না কারাগার থেকে বের করা হয়নি ওকে। এক দেয়ালে বড় একটা পিকচার উইণ্ডো, লোহার গরাদ দিয়ে আটকানো। অল্প কিছুদিন আগে বসানো হয়েছে কাঁচ। ওপাশের দৃশ্য দেখে মন দমে গেল আসিফের। এত বিরান অনুর্বর জমি আগে দেখেনি কোনদিন। একের পর এক বালির ঢিবি, সব

পুড়ছে লেলিহান সূর্যের নীচে।

ঘরে উপস্থিত সবার উপর দিয়ে ঘুরে এল আসিফের চোখ।

আটজন নারী-পুরুষ, বসেছে কাঠের টেবিলের ওপাশে। এরা গার্ডদের মত মুখোশ পরেনি। অবশ্য কাউকে চিনল না আসিফ। আন্দাজ করল প্রহরীদের ভিতর রয়েছে বিশালদেহী ও উজ্জ্বল নীল চোখের গার্ড। টেবিলের ওপাশে প্রত্যেকে শ্বেতাঙ্গ, বেশির ভাগের বয়স বড়জোর তিরিশ। অনেক দিন সুইটযারল্যাণ্ডে থেকেছে আসিফ, সহজেই চিনল ইউরোপিয়ান কাট পোশাক। এ দলে সবচেয়ে বেশি যার বয়স, তার সামনে একটা ল্যাপটপ কমপিউটার। মহিলা পঞ্চাশ মত, মাথা ভরা সোনালী চুলের ভিতর জায়গায় জায়গায় দেখা দিয়েছে রুপালি রং। কম-পিউটারের সঙ্গে যুক্ত একটা ওয়েব ক্যামেরা, ওটা ফোকাস করেছে আসিফের মুখের উপর।

'আসিফ হায়দার চৌধুরি,' কমপিউটারের স্পিকারে ভেসে এল ইলেকট্রনিক্যালি ফিল্টার্ড কণ্ঠ। 'এই বিশেষ কোর্ট তোমার অনুপস্থিতিতেই তোমার বিচারের কাজ সমাপ্ত করেছে, এবং এই বিশ্বের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর সব অপরাধ সংগঠিত করায় দোষী হিসাবে প্রমাণিত হওয়ায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছ তুমি।' কথাগুলো শুনে মাথা দোলাল ক'জন। 'তোমার কোম্পানি যেসব পণ্যের পেটেন্ট করেছে, যেমন সালফার স্ক্রাবার, এসবের কারণে বিভিন্ন দেশের সরকার এবং ব্যক্তি এখনও অন্যায় ভাবে ব্যবহার করছে ফসিল ফিউয়েল। তুমি নিজ প্রোডাক্ট বিক্রির হীন উদ্দেশে প্রচারণা চালিয়েছঃ জ্বালানী হিসাবে কয়লা ব্যবহারে পরিবেশের উপর বড় কোনও প্রভাব পড়ে না। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছেঃ জ্বালানী হিসাবে কয়লা ব্যবহৃত হলে তা পরিবেশের উপর ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এই কারণে এই আদালত সমস্ত তথ্য-প্রমাণ পর্যালোচনার শেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছেঃ যেসব পাওয়ার প্লান্টে তোমার ডিভাইস

ব্যবহৃত হয়, সেখানে সামান্য গন্ধকের দূষণ সত্যিই কিছুটা হ্রাস পায়। কিন্তু সেজন্য তোমার অপরাধের গুরুত্ব একটুও হ্রাস পেতে পারে না। তোমার কারণে এখনও বিলিয়ন বিলিয়ন টন ক্ষতিকর কেমিক্যাল ও গ্যাস ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বের পরিবেশে।

'তুমি তোমার প্রোডাক্ট বিক্রি করে, আমরা যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দর সুস্থ একটি সবুজ পৃথিবী রেখে যেতে চাই, তাদের প্রতি চরম অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করেছ। পরিবেশবাদীদের সংগঠনগুলোকে এভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তোমরা— তুমি বা তোমার মত অনেকে, বা এনার্জি কোম্পানিগুলো মুখে মুখে বলছ, তোমরা তৈরি করতে চাও একটি সবুজ বিশ্ব; কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছেঃ তোমরা ছড়িয়ে চলেছ বিষ। পৃথিবীর জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত যত ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছে, তার ভিতর সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং। কিন্তু আজও তোমার মত মানুষ তা মেনে নিতে পারছে না। তোমরা ভাবছ সামান্য কম ক্ষতিকর টেকনোলজি ব্যবহার করলেই উৎরে যাবে বিপদ। তোমরা কোটি কোটি মানুষকে ভুল বুঝিয়ে প্রচার করে চলেছঃ আর কোনও বিপদ হবে না। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছেঃ প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত হচ্ছে বিশ্বের পরিবেশ।

'একই কাজ করছে হাইব্রিড গাড়ির কোম্পানিগুলো। এটা ঠিক, এসব গাড়ি অনেক কম গ্যাসোলিন খরচ করে। কিন্তু এসব আবিষ্কার করবার আগে কত হাজার কোটি টন দূষণ ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর পরিবেশে? কতজন কিনতে পারে এসব মহামূল্যবান গাড়ি? কাজেই লক্ষ লক্ষ মানুষ কিনছে সাধারণ গাড়ি। এই যে ক্ষতি, তা হচ্ছে কয়েকজন বিজ্ঞানীর কারণে। তাদের হাতে জিম্মি হয়েছে গোটা মানবজাতি। বিবেক বলতে কিছুই নেই তাদের। পরিবেশকে রক্ষা করতে কোনও ভূমিকা তো রাখছেই না, বরং উল্টো পকেট ভরবার জন্য ব্যবহার করছে উন্নত

টেকনোলজি। তুমি এবং তাদের বিশাল এক ভুল ধারণা: কোনও ভাবে টেকনোলজি রক্ষা করবে এই গ্রহকে। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে: তোমাদের টেকনোলজি আজ ধ্বংস করতে চলেছে পৃথিবী।'

কথাগুলো মন দিয়ে শুনেছে আসিফ হায়দার চৌধুরি, এখন বুঝতে চাইছে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কী বলল ওই কণ্ঠ। কয়েক মুহূর্ত পর মুখ খুলল সে, কিন্তু অবশ হয়ে যাওয়া কণ্ঠনালী শুকিয়ে মরুভূমি, গলা দিয়ে ব্যাঙের মত 'ক্রোক্' শব্দ বেরুল। গলা পরিষ্কার করে আবার বলতে চাইল। 'কারা... আপনারা কারা?'

'আমরা সেই দল যারা তোমার নোংরা মনের গলি-ঘুঁচি বুঝতে পেরেছি। আমরা জানি তোমাদের ষড়যন্ত্র কী। তোমরা টাকার জন্য পারো না এমন কিছুই নেই।'

'ষড়যন্ত্র?' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল আসিফ হায়দার। গুছিয়ে নিতে চাইছে কথাগুলো। পরবর্তী ক' মিনিট ওর জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওর কথার উপর নির্ভর করবে পায়ে হেঁটে এখান থেকে বেরুতে পারবে, না বেচারি ক্যারেনের মত ভয়ঙ্কর ভাবে আহত অবস্থায়। 'আমার টেকনোলজি বারবার প্রমাণ করেছে ওটাই বর্তমানের সেরা পদ্ধতি। কপাল ভাল যে ওটার কারণে অনেক কমে এসেছে গন্ধকের বিষক্রিয়া। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বিপ্লবের সময় যে পরিবেশ বিপর্যয় হয়েছে, তার চেয়ে এখন অনেক কম দূষণ ছড়িয়ে পড়ছে।'

'তোমার আবার টেকনোলজি...' কমপিউটারের ইলেকট্রনিক ফিল্টারের ভিতর দিয়ে আসছে ওই টিটকারির কণ্ঠ, তাতে স্পষ্ট তাচ্ছিল্য। 'কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মোনোক্সাইড, পার্টিকুলেট অ্যাশ, মারকারি বা অন্য ভারী ধাতু আগে কখনও এত বেশি ছড়িয়ে পড়েনি পৃথিবীর আবহাওয়ায়। আগে কখনও এত উঠে আসেনি সাগরের পানি। পাওয়ার কোম্পানিগুলো বলে চলেছে

তোমার স্ক্রাবারগুলোর কারণে কমে গেছে দূষণ। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে, সালফার বিপুল পরিমাণ বিষের সামান্য একটু অংশ। আসল কথা, পৃথিবীর মানুষকে ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে চারপাশ থেকে কতবড় হুমকির মুখে পড়ছে পরিবেশ।'

'তাই সবাইকে পরিস্থিতি বোঝাতে আমাকে কিডন্যাপ করেছেন, পিটিয়ে গুরুতর আহত করেছেন এক নিরীহ মেয়েকে?' মুখ ফস্কে কথাটা বলে ফেলেছে আসিফ। তবে নিজ কথা ঘুরিয়ে নিতে চাইল না। কমপক্ষে এক শ'বার এ নিয়ে আলোচনা করেছে পরিবেশবাদীদের সঙ্গে। হ্যাঁ, তার আবিষ্কারের কারণে সত্যিই পরিবেশে কমেছে গন্ধকের মাত্রা, এবং সে কারণেই অনেক উদ্যোক্তা উৎসাহী হয়েছে, নব উদ্যমে চালু করা হয়েছে নতুন সব পাওয়ার প্লান্ট। এর ফলে পরিবেশে যোগ হয়েছে প্রচুর বিষাক্ত দ্রব্য। এ এক ভয়ঙ্কর জটিল দুষ্টচক্র। এই নিয়ে পরিবেশবাদীদের সঙ্গে অনেক আলাপও হয়েছে। সে কারণেই ওর আত্মবিশ্বাসী মন বলছে, এই বিপদ থেকে বেরুতে পারবে।

'সেই মেয়েলোক তোমার হয়ে কাজ করে। সে নির্দোষ নয়।'

'কোন্ যুক্তিতে এ কথা বলছেন আপনি? আপনারা তো তার নামও জানতে চাননি। জানার প্রয়োজন বোধ করেননি সে কী কাজ করে।'

'সে কী কাজ করে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটাই যথেষ্ট যে সে তোমার হয়ে কাজ করে। সে যে দোষী তা পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত। তোমরা দু'জন একই পথের পথিক, একই অপরাধে দুষ্ট।'

বড় করে শ্বাস ফেলল আসিফ, এই লোকগুলোকে যে করে হোক বোঝাতে হবে, ও আসলে এদের শত্রু নয়। তা যদি না পারে, প্রাণ নিয়ে বেরুতে পারবে না। পাঁচ সেকেণ্ড ভাবল সে, তারপর বলল, 'শুনুন, আপনারা পৃথিবীর বিপুল জ্বালানীর চাহিদার

কারণে আমাকে দায়ী করতে পারেন না। আপনারা চাইছেন পরিবেশ সুন্দর থাকুক, সেক্ষেত্রে মানুষকে বোঝাতে শুরু করুন, তারা যেন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করে। কখনও একটির বেশি সন্তান যেন ভুলেও গ্রহণ না করে। কিছুদিনের ভিতর ইউনাইটেড স্টেটস-এর চেয়ে অনেক বেশি দূষণকারী দেশ হয়ে উঠবে চিন। তাদের জনসংখ্যার এক দশমিক দুই বিলিয়ন মানুষের কারণে ঢের বেশি বিপর্যয় ঘটছে পরিবেশে। একই অবস্থা ভারতে। তাদের জনসংখ্যা পুরো এক বিলিয়ন। মূলত অতিরিক্ত জনসংখ্যা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যা। ইউরোপ বা আমেরিকা যতই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুক, বেশি দিন নেই, প্রতিটি দেশ ফিরবে ঘোড়াটানা গাড়ির যুগে। আবার নতুন করে লাঙলের চাষ দিতে হবে মাঠে। আমরা চাইলেই এশিয়ার দূষণ ঠেকাতে পারব না। আমি স্বীকার করি গোটা পৃথিবীর এটা মস্ত সমস্যা, এবং সেজন্যে এই সমস্যা মোকাবিলা করতে আমাদেরকে একযোগে কাজ করতে হবে।'

টেবিলের ওপাশে কঠোর মুখ করে বসে আছে মানুষগুলো। মনে হলো না আসিফ হায়দার চৌধুরির বক্তৃতা তাদের মন ছুঁয়েছে। নীরব হয়ে গেছে কমপিউটার, থমথমে পরিবেশ ঘরে। মন শক্ত করছে আসিফ, মেরুদণ্ড বেয়ে নামছে হিমশীতল বরফ স্রোত। দশ সেকেণ্ড পর নিজেকে আর সামলাতে পারল না সে, স্বাভাবিকের চেয়ে একটু জোরে বলে উঠল, 'প্লিয, আপনারা আমার কথা শুনুন। আমাদেরকে মেরে ফেলেই বা কী পাবেন? আপনারা বলুন আসলে কী চান... টাকা? আমি আপনাদের সংগঠনের জন্য যত টাকা লাগে, সবই দেব। আমাদেরকে ছেড়ে দিন।'

'বড় দেরি করে ফেলেছ, পয়সা দিয়ে পার পাবে না এখন,' কমপিউটারের কণ্ঠ বলে উঠল, এবার ইলেকট্রনিক ফিল্টার বন্ধ

করে দেয়া হলো। নিজ কণ্ঠে বলল মানুষটা, 'তোমার বিচার শেষ, চৌধুরি, এবং তুমি দোষী প্রমাণিত হয়েছ।'

ওই কণ্ঠ ভাল করেই চেনে আসিফ হায়দার চৌধুরি, কিন্তু গত দুই বছর শোনেনি। অন্তরের গভীরে টের পেল, এ লোক ছাড়বে না, তাকে বাঁচতে দেবে না কিছুতেই!

এগারো

স্নানের সুযোগ হয়নি মাসুদ রানার, কেবিনে ফিরে চট্ করে পাল্টে নিয়েছে ব্যায়ামের পোশাক, তারপর ছুটে এসেছে মার্ভেলের নকল ব্রিজে। যে-কোনও সময়ে কার্টা অস্টিন ও তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে হাজির হবে নিশাত সুলতানা।

কিছুক্ষণ পর শুনতে পেল বাইরের দিকের সিঁড়ির ধাপে পায়ের আওয়াজ শুরু হয়েছে। বরাবরের মতই পুরোপুরি নোংরা এই ব্রিজ। আধুনিক সমস্ত হাই-টেক যন্ত্র থেকে মুক্ত। সব অস্ত্র রেখে এসেছে ওরা। আবার হেলমসম্যানের অভিনয় করছে জলিল খান। পরনে ময়লা শার্ট-প্যান্ট, মাথায় ছেঁড়া ক্যাপ। পুরনো হুইলের সামনে দাঁড়িয়েছে। এইমাত্র নকল টেলিগ্রাফের হ্যাণ্ডেল ধরে টান দিল, ভাব দেখে মনে হলো ইঞ্জিন রুমকে জানিয়ে দিল এবার জাহাজ থামাতে হবে। পাশের টেবিলের উপর অতি পুরনো একটি দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার মানচিত্র।

'এটা এনে ভাল করেছ,' চায়ের খয়েরি দাগ পড়া মানচিত্রে

টোকা দিল রানা।

'ভাবলাম আপনার পছন্দ হবে।' খুশি হয়ে উঠল জলিল।

রানার জানা নেই দেখতে কেমন হবে কার্টা অস্টিন, তবে মেয়েটি ঘরে ঢুকতেই ধক্ করে উঠল ওর হৃৎপিণ্ড। লালচে চুলগুলো এলিয়ে পড়েছে কাঁধের উপর, সেখান থেকে নেমে গেছে কোমর ছাড়িয়ে। হাওয়া ও রোদে ব্রোঞ্জের মত রং ধরেছে মেয়েটির সুন্দর মুখ, না-চেনা কোনও বন্য ফুলের মতই। সাগর-নীল দুই চোখে কীসের এক অমোঘ রহস্য। টসটস করছে লোভনীয় দুই ঠোঁট। খাড়া কিন্তু মানানসই নাক। ওই বুক-কোমর ও নিতম্বের ঢেউ যে-কাউকে পাগল-কবি করতে পারে। সব মিলে তাকে পুরাণের কোনও গ্রিক দেবী মনে হলো রানার।

কার্টা অস্টিনের পিছন নিয়ে ভিতরে ঢুকল দুই লোক। একজন বয়স্ক, কুচকুচে কালো চেহারা, বোধহয় নামিবিয়ান ফিশিং বোটের ক্যাপ্টেন। অন্য লোকটি শ্বেতাঙ্গ, দেখতে ভাল নয়, অতিরিক্ত বেরিয়ে আছে কণ্ঠা, বারবার ঢোক গিলে চলেছে। তিক্ত চেহারা নিয়ে চারপাশ দেখছে সে। এই লোকের সঙ্গে কোনও ভাবেই মানায় না সুন্দরী কার্টা অস্টিনকে। বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে মনে হলো কর্তৃত্ব করছে ওই মেয়েই। এবং সেজন্য ওর উপর ভীষণ রেগে আছে লোকটা।

এক পা সামনে বাড়ল রানা, বাড়িয়ে দিল হাত। 'মাসুদ রানা, মার্ভেলের ক্যাপ্টেন। ওয়েলকাম।'

'কার্টা অস্টিন,' শক্ত করেই ধরেছে রানার হাত, মেয়েটির চোখে কোনও ভয় বা দুশ্চিন্তার ছাপ নেই। 'এঁরা রন কুবলিকি ও বোটের ক্যাপ্টেন বেঞ্জামিন ইশাকা।'

'ভাল আছেন নিশ্চয়ই?' আড়ষ্ট খাস ব্রিটিশ সুরে বলল রন কুবলিকি।

'বোধহয় আপনাদের কোনও চিকিৎসা লাগবে না?' জানতে

চাইল রানা।

'না, তা লাগবে না,' বলল কার্টা। 'আমরা সুস্থ আছি। সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

'গুড। নিশ্চিন্ত হলাম।' মৃদু হাসল রানা। 'আপনাদেরকে আমার অগোছালো কেবিনে নিয়ে যেতাম, কিন্তু ওখানে অতিথি বসাতে চাই না। বরং চলুন গ্যালিতে গিয়ে বসি। বাবুর্চি দেখুক কী দিতে পারে।' নিশাতের দিকে চাইল রানা, বিশালদেহী আর্মি ক্যাপ্টেন বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

সত্যি বলতে, ক্যাপ্টেনের কেবিন রাখা হয়েছে শুধু ইন্সপেক্টর ও বন্দরের অফিশিয়ালদের ভাগিয়ে দেয়ার জন্য। বিপর্যস্ত এলাকা বলা যায় ওদিকটা। একবার ওই কেবিনে ঢুকলে সবাই চট্ করে বুঝে ফেলবে গোটা জাহাজের পরিবেশ আরও কত খারাপ। ছাল উঠে গেছে কম দামি কার্পেটের। বিশেষ কিছু কেমিকেলে চুবিয়ে নেয়া হয়েছে ওটাকে। ফলে সর্বক্ষণ ঘরের ভিতর ভাসছে সস্তা সিগারেটের কটু গন্ধ। চেইন স্মোকারও বেশিক্ষণ থাকতে চাইবে না ওখানে। দেয়ালে ঝুলছে প্রায়-অশ্লীল পুরনো পোস্টার। ওদিকে চাইলে বিরক্ত হয়ে উঠবে যে কেউ। ওই কেবিন মোটেই কারও ইন্টারভিউ নেয়ার উপযুক্ত জায়গা নয়। নকল গ্যালি ও পাশের মেস হল যে ফাইভ স্টার হোটেলের মত এমনও নয়, তবে কিছুটা অন্তত পরিষ্কার।

এদেরকে নিয়ে ভিতরের এক সিঁড়ি বেয়ে কয়েক তলা নেমে এল রানা। মেঝের লিনোলিয়ামের চল্টা উঠে গেছে। একটা রেলিং ধরবার আগেই সাবধান করল রানা, ওটা প্রায় খুলে এসেছে। মেস হলে ঢুকতেই পাশের সুইচ টিপল রানা, কয়েক মুহূর্ত টিপটিপ করল কিছু ফ্লুরেসেন্ট টিউব লাইট। সেগুলোর ভিতর গোটা তিনেক সত্যিসত্যিই জ্বলে উঠল। দপদপ করছে তিনটি, তার দুটো ঝিঁঝি পোকার মত আওয়াজ ছাড়ছে। বেশির

ভাগ কাস্টম্‌স্ ইন্সপেক্টর মনে মনে বলে, এখানে বসবার চেয়ে ব্রিজের মেঝেতে বসে ম্যানিফেস্ট পড়া অনেক আনন্দের। বড়সড় মেস হলঘরে রয়েছে কয়েক আকারের মোট চারটে টেবিল। ষোলোটা চেয়ারের ভিতর দুটো একই রকম, অন্যগুলো নানা সময়ে কেনা হয়েছে। দেয়ালে কালচে সবুজ রং, সঙ্গে মেশানো হয়েছে লাল, ফলে এখানে বেশিক্ষণ থাকলে মনে হয়: বেঁচে থেকে কী লাভ?

দুই ডেক নীচে রয়েছে মার্ভেলের সত্যিকারের মেস হল, ওটা অভিজাত, যে-কোনও ফাইভ স্টার রেস্টুরেন্টকে হার মানাতে পারে।

নিজের পছন্দের টেবিলে এদেরকে বসতে বলল রানা। মুখোমুখি চেয়ারে বসল নিজে। ওর পিছনে এক পাশের দেয়ালে ঝুলছে একটি ছবি, তার আড়ালে গোপন পিনহোল ক্যামেরা। অপারেশন্স সেন্টারে সোহেল ও স্বর্ণা মনোযোগ দিয়েছে, খেয়াল করে শুনবে এবং দেখবে ইন্টারভিউ। যদি তাদের মনে কোনও প্রশ্ন থাকে, বাবুর্চি মোস্তাফা আবুলের মাধ্যমে তা পাঠিয়ে দেবে রানার কাছে।

টেবিলের উপর দু'হাত রাখল রানা, কয়েক মুহূর্ত অতিথিদের দেখে নিয়ে ওর চোখ স্থির হলো কার্টা অস্টিনের চোখে। মেয়েটি নিষ্পলক চাইল ওর দিকে। ঠোঁটে আবছা হাসি। সাগরে গুলি চলবার পর ওর মনে ভয় বা রাগ থাকবার কথা, ভাবল রানা। কিন্তু এখন মজা লাগছে তার। কেন? খেপে বোম হয়ে আছে রন কুবলিকি, ভয় পেয়েছে সে, মরণের ঝুঁকি নিতে কারই বা ভাল লাগে? গভীর চিন্তার ভিতর ডুবে আছেন নামিবিয়ান ক্যাপ্টেন, বোধহয় মনে মনে প্রার্থনা করছেন রানা যেন কর্তৃপক্ষকে কিছু না জানায়।

'তারপর, মিস কার্টা? আমাকে খুলে বলুন ওরা কারা ছিল,

এবং কেনই বা আপনাদেরকে মেরে ফেলতে চাইল?' একটু সামনে ঝুঁকে এল মেয়েটি, ঝলমল করছে মুখ, কী যেন বলতে চলেছে, কিন্তু তার আগেই রানা আবারও বলল, 'ভুলবেন না রেডিওতে আমরা কী শুনেছি। গতকাল আপনাকে সাবধান করা হয়েছে।'

আবারও চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসল কার্টা, নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে।

'ফর গডস্ সেইক, সব জানিয়ে দিন,' দশ সেকেণ্ড পর বলল কুবলিকি। 'এখন কিছু লুকিয়ে কী লাভ!'

লোকটার দিকে বিষাক্ত চাহনি দিল কার্টা। তবে বুঝে গেছে নিজে যদি না বলে, সবই জানিয়ে দেবে রন কুবলিকি। বড় করে শ্বাস ফেলল কার্টা, তারপর বলল, 'ঊনবিংশ শতাব্দির একটা জাহাজ খুঁজছি আমরা। ওটা সোয়া শ' বছর আগে এদিকের সাগরে ডুবে যায়।'

'এবং আপনার মনে হয়েছে ওই জাহাজে আছে বিপুল ধন-সম্পদ,' মন্তব্য করল রানা। ঠাট্টার একটা ভাব রয়েছে ওর কণ্ঠে।

গলা খাঁকারি দিল কার্টা। 'আমি এতই নিশ্চিত ছিলাম যে সবাইকে বিপদে ফেলতেও দ্বিধা করিনি। খেয়াল করিনি কেউ আমাদেরকে মেরেও ফেলতে চাইতে পারে। ওহ্, ভাল কথা, ওই ইয়টটার কী হলো? ওটাকে তো আশপাশে কোথাও দেখতে পেলাম না?'

'দুঃখজনক একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে,' বলল রানা, 'এই জাহাজের পেটে জোর একটা গুঁতো মেরে নিজেই তলিয়ে গেছে সাগরে।' মেয়েটির দিক থেকে কুবলিকির দিকে চাইল রানা। এদেরকে ট্রেজার হাণ্টার মনে হচ্ছে না ওর। তবে যে-কোনও মানুষ ওই ভয়ঙ্কর জ্বরে পড়তে পারে, এবং বেশির ভাগ সময় ওই রোগেই মৃত্যুবরণ করে। 'আপনাদের দু'জনের পরিচয় হলো

কীভাবে?'

'হারিয়ে যাওয়া ট্রেজার নিয়ে আলাপ করে এমন এক ইন্টারনেট চ্যাট রুমে আমাদের পরিচয়,' বলল কার্টা। 'গত এক বছর ধরে আমরা আলাপ করেছি, তারপর স্থির করলাম এবারের ছুটিতে এখানে আসব।'

'খুলে বলুন, এরপর গতকাল রাতে কী ঘটল?'

'একা হোটেল থেকে বেরিয়ে ডিনার করতে যাই, ফিরবার সময় পিছু নিল লোকদুটো। দৌড়াতে শুরু করলাম। এক পর্যায়ে আমার দিকে গুলি ছুঁড়ল একজন। ছুটতে ছুটতে হোটেলে পৌঁছলাম, ওখানে বেশ ভিড় ছিল, কাজেই রাস্তার ওদিকে রয়ে গেল ওরা। একজন গলা চড়িয়ে সতর্ক করল, নামিবিয়া ছেড়ে চলে না গেলে মেরে ফেলবে।'

'এরপর তাদের দু'জনকে দেখলেন ইয়টে।'

'হ্যাঁ। তাদের হাতে মেশিনগান ছিল।'

'আর কারা জানে আপনারা নামিবিয়ায় এসেছেন?'

'ঠিক বুঝলাম না আপনার কথা। বন্ধু-বান্ধবী, আত্মীয়-স্বজন, অফিসের সহকারী— এসব?'

'ঠিক তা জানতে চাইনি। জানতে চাইছি, আপনারা এখানে কী করছিলেন। আপনাদের প্রোজেক্ট নিয়ে কারও সঙ্গে আলাপ করেছেন?'

'আমরা একদল জেলের সাক্ষাৎকার নিয়েছি,' বলল কুবলিকি।

কথাটা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বলল কার্টা, 'আমরা জানতে চেয়েছি এসব জেলেদের জাল কোথায় বেশি হারিয়েছে। এদিকের সাগরতল আসলে মরুভূমির বাড়তি অংশ। কাজেই মনে হয়েছে উঁচু কিছুর সঙ্গে জাল আটকে গেলেই বুঝতে হবে, ওটা ওখানে এসেছে মানুষের কারণে। সুতরাং, সহজেই পাব পুরনো জাহাজ।'

'বাস্তবে তা না-ও হতে পারে,' মন্তব্য করল রানা।

'এখন তা স্পষ্ট বুঝছি।' হতাশা নিয়ে বলল কার্টা। 'কপ্টারে করে একের পর এক সাইটে গেছি, সঙ্গে ছিল মেটাল ডিটেক্টর, কিন্তু কিছুই পাইনি।'

'এতে অবাক হওয়ার কোনও কারণ নেই,' বলল রানা। 'কয়েক মিলিয়ন বছরে বেরিয়ে আসে বেডরক, সাগরের বুকে উঁচু হয়ে থাকে, তখন সহজেই জাল হারাতে হয়।' মাথা দোলাল কার্টা। 'তার মানে বহু জেলের সঙ্গে কথা বলেছেন। এ ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথা হয়নি?'

'আর বলেছি ব্র্যাড এন লাজরাস নামের এক বেলাজ লোককে।' নীচের ঠোঁট বেঁকে গেল মেয়েটির। 'সে ছিল আমাদের গাইড। কখনও পাত্তা দিইনি। মনে হয়েছে বাজে লোক। এ ছাড়া রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকান কপ্টার পাইলট, ওয়ারিলি আইবল। অন্য কেউ জানত না, জেলেদের কাছে আমরা জানতে চেয়েছি তারা জাল কোথায় হারায়। তবে লাজরাস ও আইবলকে আমরা বলিনি কোথায় পেতে পারি ওই জাহাজ।'

'আপনি দাদু এবেলের কথা ভুলে গেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলেই জানতে পারেন বিশাল সব ধাতব সাপ দেখেছে সে,' তিক্ত মনে বলল কুবলিকি। বিব্রত করতে চাইছে মেয়েটিকে।

ভুরু উঁচু করল রানা। 'বিশাল ধাতব সাপ?'

'ওসব কিছু নয়,' বলল কার্টা। 'ওটা একটা গল্প। শুনেছি পাগল এক জেলের কাছ থেকে।'

দরজায় কে যেন ঠুকঠুক করে টোকা দিল। পরক্ষণে দরজা খুলে গেল, ভিতরে ঢুকল বাবুর্চি মোস্তাফা আবুল। হাতে প্লাস্টিকের ট্রে। হাসি চাপতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল রানা। অসহায় চেহারা করে ঘরে ঢুকেছে চিফ স্টুয়ার্ড। প্রাণপণ অভিনয় করবার চেষ্টা করছে। এবং ভালও হচ্ছে।

কঠোর নিয়ম মেনে চলে সে, দিনে দুই বার নিজ বুটজুতো পালিশ করে। কখনও শার্টে ভাঁজ পড়লে দেরি না করে নতুন শার্ট পরে নেয়। বাংলাদেশ নেভি থেকে রিটায়ার করে পুরোপুরি মানিয়ে নিয়েছে সে মার্ভেল জাহাজে, অন্য কোথাও স্বস্তি নেই তার। এখন এমন এক চেহারা করেছে, মনে হলো পাক্কা মুসলিম, হাঁটতে গিয়ে হাজির হয়েছে শুয়োরের খোঁয়াড়ের ভিতর।

প্রায় জোর করে ধরে আনা অতিথিদের বোকা বানাতে খুলে ফেলতে হয়েছে তাকে কোট। শার্টের আস্তিন গুটিয়ে নিয়েছে। গলার বোতাম খোলা। 'গ্রিন টি, স্যর,' কুবলিকির দিকে চেয়ে বলল মোস্তাফা আবুল। 'ডিম সাম, পট স্টিকার্স ও লো মিন নুডল— সঙ্গে মুরগি।' অ্যাপ্রনের ভাঁজ থেকে একটা কাগজ নিয়ে রানার হাতে দিল। 'মিস্টার আহমেদ এটা আপনাকে দিতে বলেছেন।'

ট্রে নামিয়ে রাখল সে, সবার সামনে পেতে দিল প্লেট, পাশে ন্যাপকিন ও আরেক দিকে রুপালি কাঁটা-চামচ। একটা চামচ বা ন্যাপকিনও এক সেটের জিনিস নয়। তবে ন্যাপকিন বা চামচ পরিষ্কার।

এই ফাঁকে সোহেলের দেয়া কাগজ খুলে চোখ বোলাল রানা।

'একের পর এক মিথ্যা বলছে মেয়েটা।'

চট্ করে একবার গোপন ক্যামেরার দিকে দেখে নিল রানা। মৃদু গলায় বলল, 'তা তো বটেই।'

'কী যেন বললেন?' চায়ে চুমুক দিল কার্টা অস্টিন।

'হুম? হ্যাঁ। আমার ফার্স্ট অফিসার জানিয়ে দিল এখানে যত দেরি করব, পরের বন্দরে পৌঁছুতে ততই দেরি হবে। আসুন, খেয়ে নেয়া যাক।'

নিঃশব্দে খেয়ে নিল ওরা।

'অসুবিধে না হলে বলবেন আপনাদের পরের বন্দর কোন্‌টা?'

'ধন্যবাদ, আবুল, আর কিছু লাগবে না।' একবার মাথা দুলিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল বাবুর্চি। এবার বলল রানা, 'আমাদের পরের বন্দর কেপ টাউন। ব্রাজিল থেকে কাঠ নিয়ে এসেছি, যাবে জাপানে। তবে কেপ টাউন থেকে তুলতে হবে কয়েকটা কন্টেইনার, ওগুলো যাবে মুম্বাইয়ে।'

'এটা সত্যিই একটা পুরনো ফ্রেইটার, তা-ই না?' আনমনে বলল কার্টা অস্টিন। পরের কথায় মনে হলো নিজেকে বিশ্বাস করাতে চাইছে, 'জানতাম না এমন মালবোঝাই জাহাজ এখনও আছে।'

'খুব বেশি নেই। কন্টেইনারে ভরে মাল পাঠানো শুরু হওয়ার পর থেকে এখন আর এসব জাহাজ তৈরি করা হয় না। কন্টেইনার শিপ অনেক বেশি সুবিধাজনক। আমরা পাই পাউরুটির গুঁড়ো।' হাত দিয়ে ময়লা ডাইনিং রুম দেখাল রানা। 'ক্রমেই কমে আসছে ক্লায়েন্টের সংখ্যা, এত টাকাও নেই যে জাহাজ মেরামত করব। চোখের সামনে দেখছি শেষ হয়ে যাচ্ছে খুবই ভাল একটা জাহাজ।'

'তারপরও, সুন্দর রোমান্টিক একটা জীবন কাটিয়েছে ও,' বলল কার্টা।

ব্রোঞ্জ মূর্তির মত অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটির কণ্ঠে ওই হাহাকার কীসের? একটু চমকেই গেল রানা। নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হলো।

নানা মিশনে এই জাহাজ নিয়ে ঘুরছে ওরা বন্দর থেকে অন্য বন্দরে, ভান করছে পান্তা আনতে নুন ফুরিয়ে যায়। কথাটা যে খুব অবাস্তব, তা-ও নয়। আসলে গোটা বাংলাদেশের বাস্তবতাই এখন এমন। যা রোজগার, সব ফুরিয়ে যায় প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে। ওদের সঙ্গে কোথায় যেন বড় মিল ওই মেয়েটির, উদাস হয়ে উঠতে চাইল রানার অন্তর। আস্তে করে চায়ের কাপে চুমুক দিল,

কাপটা পিরিচে নামিয়ে মৃদু স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, একসময় ওর রোমান্টিক জীবন ছিল। আমাদের ভালবাসাও পেয়েছে অনেক।'

মিষ্টি হাসি ফিরল কার্টা অস্টিনের ঠোঁটে, কিন্তু চোখে একরাশ ক্লান্তি ও ব্যর্থতা। মনে হলো রানার মন পড়ছে। যেন মানুষটার জীবনের সমস্ত কষ্টের সঙ্গে ওর নিজ ব্যর্থতা মিলিয়ে নিতে চাইছে।

বাস্তবে ফিরতে চাইল রানা। 'ক্যাপ্টেন ইশাকা, আপনি ধাতব সাপ সম্পর্কে কী জেনেছেন?'

'কিছুই না, ক্যাপ্টেন,' বলল নামিবিয়ান বোট ক্যাপ্টেন। 'দাদু এবেলের মাথা খারাপ। মদের বোতল পেলেই অতিরিক্ত গিলে বেহেড মাতাল হয়ে যায়। তখন তার কথার কোনও আগামাথা কিচ্ছু থাকে না।'

কার্টা অস্টিনের উপর মনোযোগ ফেরাল রানা। 'আপনি কোন্ জাহাজ খুঁজছেন?' মেয়েটি দ্বিধার ভিতর পড়েছে, এ বিষয়ে কিছু বলতে চাইছে না; কাজেই প্রশ্নটা ফিরিয়ে নিল রানা। 'থাক্, না বললেও চলবে। ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে রত্নরাজি তোলবার সাধ্য নেই আমাদের।' মৃদু হাসল রানা। 'মারতেও পারব না ধাতুর সাপ। আজ তা হলে আপনি দাদু এবেলের ওই সাপের এলাকার দিকেই চলেছিলেন?'

কার্টা বুঝতে চাইল লোকটা ওকে পাগল ভাবছে কি না। একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল দুই গাল। 'ওটাই ছিল আমাদের পাওয়া শেষ সূত্র। ভাবলাম এত দূর এলাম, তো দেখেই যাই। এখন ভাবতে গিয়ে লজ্জাই লাগছে।'

'লজ্জা কেন?' একটু ঝুঁকল রানা।

মেস হলের দরজায় টোকা দিল নিশাত সুলতানা, ভিতরে এক পা রেখে বলল, 'ওটার ভিতর বেআইনী কিছুই নেই, ক্যাপ্টেন।'

'ধন্যবাদ, সেকেণ্ড মেট।' ড্রাগ বা অস্ত্রের জন্য ফিশিং বোট

হিল্ডাকে সার্চ করতে বলেছিল রানা। নামিবিয়ান ক্যাপ্টেনের দিকে চাইল। 'ক্যাপ্টেন ইশাকা, যারা আপনাদের উপর হামলা করল, তাদের ব্যাপারে কিছু জানাতে পারেন?'

'ওয়ালভিস বে-তে ওই ইয়ট দেখেছি। গত এক বছর ধরে মাসে একবার করে এসেছে। মনে হয় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেই। আফ্রিকায় ওরা ছাড়া কেউ অত দামি ইয়ট পাবে কোথায়!'

'ইয়টের ক্রুদের সঙ্গে কখনও কথা হয়নি, বা চেনেন না তাদের কাউকে?'

'না, স্যর। ওরা আসত, ফিউয়েল নিয়ে আবারও চলে যেত।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল রানা, মনের ভিতর গুছিয়ে নিতে চাইল সব তথ্য। কিন্তু কিছুই যেন একটার সঙ্গে অন্যটা মিলছে না। এটা বোঝা যাচ্ছে মূল কাহিনি থেকে অনেক সরে এসেছে কার্টা অস্টিন। ওই পাযলের টুকরো মেলাতে চাইলে আরও অনেক প্রশ্ন তুলতে হবে। সেক্ষেত্রে হয়তো জড়িয়েও পড়তে হবে অন্য কিছুর সাথে। কিন্তু এই মুহূর্তে তা সম্ভব নয়। নিজেকে বলল রানা, এখন আমাদের টপ প্রায়োরিটি বিজ্ঞানী আসিফ হায়দার চৌধুরিকে উদ্ধার করা। তারপরও মনের ভিতর কেমন যেন কাঁটার মত বিঁধছে।

হঠাৎ বলে উঠল রন কুবলিকি, 'ক্যাপ্টেন রানা, আপনি যা জানতে চেয়েছেন তার সবই বলেছি আমরা। এখন আপনার জাহাজ থেকে নেমে যেতে চাই। বন্দরে পৌঁছুতে অনেক সময় লাগবে আমাদের।'

'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করে বলল রানা। নতুন করে মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে চাইল। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, মিস্টার কুবলিকি। অবশ্য বোঝা গেল না কেন আপনাদের উপর হামলা হলো। এমন হতেই পারে এদিকে সত্যি রয়েছে ট্রেজার ভরা ডোবা জাহাজ। তারা হয়তো সোনাদানা তুলছে। সরকারের অনুমতি না নিয়ে এ

ধরনের অপারেশন চালালে সবার উপরই হামলা করতে পারে।' পালা করে কার্টা ও কুবলিকির দিকে চাইল রানা। 'তাই যদি হয়, আপনাদের বলব যত দ্রুত সম্ভব এ দেশ ছেড়ে চলে যান। এ ধরনের লোক ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক হয়।'

মাথা দোলাল রন কুবলিকি, কিন্তু মনে হলো না কথাটা মেয়েটি মেনে নেবে। এ বিষয়ে দ্বিতীয়বার কিছু বলল না রানা।

'মিস সুলতানা, আপনি অতিথিদের ফিরিয়ে নিয়ে যান তাঁদের বোটে, যদি ফিউয়েল দরকার হয়, সেটা দেবেন।'

'জী, ক্যাপ্টেন।'

প্রায় একইসঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠল সবাই। টেবিলের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল রানা। ক্যাপ্টেন ইশাকা ও রন কুবলিকির সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল। মেয়েটির হাত ধরতেই সামান্য ঝুঁকে এল সে। নিচু স্বরে বলল, 'আমি একটু আলাদা ভাবে আপনার সঙ্গে দুয়েকটা কথা বলতে চাই, ক্যাপ্টেন।'

'নিশ্চয়ই,' নিশাতের দিকে চাইল রানা। 'এঁদের নিয়ে যান বোটে। একটু পর মিস অস্টিনকে নিজে পৌঁছে দেব আমি।'

অন্যরা চলে যেতেই আবারও যে যার চেয়ারে বসল ওরা। রানা টের পেল, দক্ষ রত্নবণিক যেভাবে আকাটা হীরা যাচাই করে, ঠিক সেভাবে ওকে দেখছে মেয়েটি। কয়েক মুহূর্ত এভাবে পেরিয়ে গেল, তারপর কিছু একটা সিদ্ধান্তে এল কার্টা। টেবিলের উপর কনুই নামিয়ে রাখল।

'আমার মনে হয়েছে, আপনি একজন প্রতারক।'

হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে গেল রানা। কয়েক মুহূর্ত মেয়েটির চোখে চোখ রেখে বলল, 'এক্সকিউজ মি, ম্যাম?'

'কেন তা বলতে পারি না, তবে আপনি আমাদের সঙ্গে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। এই জাহাজটা ভুয়া। ক্রুরাও সবাই ভান করছে। আপনারা যা নন, তাই দেখাচ্ছেন।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল রানা। সাগরে ওর গোয়েন্দা এজেন্সি নতুন ফ্রন্ট খুলবার পর থেকে বহু বন্দর ঘুরেছে ওরা মার্ভেল জাহাজ নিয়ে, কখনও কেউ খুঁজে পায়নি কোনও ত্রুটি। হার্বার অফিশিয়াল, যত রকমের ইন্সপেক্টর, এমন কী পানামা ক্যানেলের পাইলটও কখনও কোনও অস্বাভাবিকতা দেখেনি। তা জাহাজেরই হোক বা ক্রুদের ভিতরই থাক।

এ মেয়ে জানে না মার্ভেল আসলে কী ধরনের জাহাজ, ভাবল রানা। ওরা বন্দরে ইন্সপেকশনের সময় যত কৌশল ব্যবহার করে, এখানে খোলা সাগরে তা করা হয়নি, কিন্তু অপ্রশিক্ষিত চোখে কোনও মানুষ মাত্র পনেরো মিনিট ডাইনিং রুমে বসে থেকে সব বুঝে ফেলবে, তা হতে পারে না। মন্থর হয়ে এল রানার হৃৎপিণ্ডের গতি।

'ধরে নিচ্ছি এসব কথা আমাকে অপমান করার জন্য নয়,' বলল রানা। 'আসলে কী বলতে চান, একটু খুলে বলুন তো?'

'যেমন একটা ব্যাপার, আপনার হেলমসম্যানের গলায় একটা সোনার চেইন ও লকেট দেখলাম। ওই কোম্পানির লকেট ছিল আমার বাবার। দাম কমপক্ষে এক হাজার ডলার। আপনারা যদি এতই গরীব, তো ওই জিনিস কোথা থেকে পেল ওই লোক?'

'সন্দেহ নেই ওটা নকল।'

'তা হলে মাত্র পাঁচ দিনেই নোনা হাওয়ায় রং জ্বলে যাওয়ার কথা। আমি জানি, কারণ কিশোরী বয়সে নকল একটা কিনে দিয়েছিলেন আমার বাবা। তিনি মার্চেন্ট মেরিনে কাজ করতেন। ওটা গলায় পরে বাবার বোট নিয়ে বেরুতাম।'

আচ্ছা, এই মেয়ে একেবারে জাহাজ দেখেনি তা নয়, ভাবল রানা। 'হয়তো নকল নয়, আসলই, কোনও চোরের কাছ থেকে কিনেছে। ওর কাছে জানতে চাইতে পারেন। আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'হতে পারে চোরের কাছ থেকেই কিনেছে,' বলল কার্টা। 'কিন্তু আপনার স্টুয়ার্ডের ব্যাপারে কী বলবেন? গত কয়েক বছর হলো লণ্ডনে, দেখলেই চিনি ইংলিশ বুটজুতো। ওটার দাম কমপক্ষে দুই শ' পাউণ্ড। ওটাকে কী বলবেন আপনি, ওই লোকও চোরের কাছ থেকে কিনেছে?'

'আসলে খুব বড়লোক পরিবার থেকে এসেছে ও, পাগলাটে মানুষ বলে আঠারো বছর বয়সে সাগরে ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে। দেশের বাড়িতে ওদের জমিদারী। গত বছর মোমবাসায় ওর সঙ্গে পরিচয়। বলল জাহাজে স্টুয়ার্ডের কাজ করতে চায়। তাকে বেতনও দিতে হবে না। এরপর তাকে ফেরাতে পারি?'

'আ...আ...চ্ছা?' সুর করে বলল কার্টা।

'বিশ্বাস না হলে ওর কাছ থেকেই জেনে নিন। ডাকব?'

'বাদ দিন। আপনি একের পর এক আলটপকা যুক্তি তৈরি করবেন। কিন্তু এবার বলুন, আমি যখন প্রথম আপনার জাহাজ দেখলাম, চিমনি দিয়ে কোনও ধোঁয়া বেরুচ্ছিল না।'

ওটা ইঞ্জিনিয়ার আফতাবের নিন্দনীয় কাজ, ভাবল রানা। আগেই ধোঁয়ার জেনারেটার চালু রাখা উচিত ছিল। পরে মনে হয়েছে বড় কোনও ভুল করেনি ওরা। এখন জবাব দিতে গিয়ে মুশকিলের ভিতর পড়তে হচ্ছে।

'আমি প্রথমে ভেবেছি এই জাহাজ পরিত্যক্ত, তারপর দেখলাম বো থেকে উঠছে সাদা ফেনা, সামনে বাড়ছে জাহাজ। এর কয়েক মিনিট পর দেখলাম চিমনি দিয়ে উঠতে শুরু করেছে ধোঁয়া। বলা যায় ভকভক করে বেরুতে লাগল। আপনারা আমাদের দিকে বিশ নট গতি তুলে আসতে লাগলেন। তারপর আমরা পৌঁছে গেলাম আপনাদের জাহাজে, ব্রিজে এসে কী দেখলাম? ...হ্যাঁ, টেলিগ্রাফ লক্ষ্য করে বুঝলাম ওটা অল স্টপে রাখা। এসব যদি বাদই দিই, তারপরও তো কথা থাকে—

আপনার জাহাজ যে আকারের, তেমন বড় কোনও জাহাজ অত দ্রুত ঘুরে যেতে পারে না। ধরে নিতে পারি, আপনাদের রয়েছে ইসোপড ডিরেকশনাল থ্রাস্টার। কিন্তু তাই বা কী করে হয়? এই জাহাজ সাগরে নামার অনেক পর এসেছে ওই টেকনোলজি। ...এবার একটু খুলে বলুন সব, ক্যাপ্টেন রানা।'

'এসবে আপনার কী-ই বা যায় আসে?' আত্মরক্ষা করতে চাইল রানা।

'আজ একদল লোক আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে, কাজেই আমি জানতে চাই তারা কারা। আমার মনে হয়েছে আপনি একবার যখন ওদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, ইচ্ছে করলেই আমাকে আরেকটু সাহায্য করতে পারেন।'

'আপনি আসলে ভুল ভাবছেন, কার্টা। আমি আসলেই জং ধরা একটা বালতির ক্যাপ্টেন, বেশি দিন নেই এই জাহাজ ভাঙতে ব্রেকার্সদের হাতে তুলে দেয়া হবে। আপনাকে সাহায্য করবার কোনও উপায় নেই আমার।'

'তা হলে আমি যা দেখেছি তা অস্বীকার করছেন না?'

'জানি না আপনি কী দেখেছেন, তবে মার্ভেলের কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। আমরা জাহাজের ক্রুরা বড় সাধারণ।'

উঠে দাঁড়াল কার্টা অস্টিন, ধীর পায়ে চলে গেল খুদে ক্যামেরার কাছে, আস্তে করে সরিয়ে নিল সামনের ছবিটা। একটু মুখ থুবড়ে বেরিয়ে এল ক্যামেরা, পিছনে তার। 'কোনও বৈশিষ্ট্য নেই?'

একটু কালচে হয়ে গেল রানার মুখ।

'প্রথম যখন মোস্তাফা আবুল এসে আপনার হাতে কাগজ দিল, আপনি পড়েই বললেন *তা তো বটেই*, ঠিক তখনই বুঝলাম কেউ আমাদের উপর চোখ রেখেছে।' রানা কিছু বলবার আগেই আবারও বলল কার্টা, 'সেজন্যই বলছি, আসুন, আমরা একটা চুক্তি

করি, ক্যাপ্টেন রানা। অসত্য বন্ধ করুন, আমিও মিথ্যা থামিয়ে দেব।' আবার রানার মুখোমুখি বসল সে। 'ইন্টারনেটের চ্যাট রুমের মাধ্যমে কুবলিকির সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি আমার। আমরা ডিবিয়ার্সের সিকিউরিটি ডিভিশনে কাজ করি। আমাদের কাজ নিমজ্জিত জাহাজের ভিতর বিলিয়ন ডলারের হীরা থাকলে তা খুঁজে বের করা। হীরা সম্পর্কে কিছু জানেন আপনি?'

'শুধু শুনেছি প্রায় পাওয়াই যায় না, খুবই দামি, তা ছাড়া কোনও মেয়েকে পটাতে হলে ওটার তুলনা নেই।'

মৃদু হেসে ফেলল কার্টা। 'প্রথম দুটো ঠিক। পরেরটা ঠিক নয়।'

'তাই? বেশির ভাগ পুরুষ তো মেয়েদের খুশি করতে একের পর এক হীরা কেনে। নিশ্চয়ই আপনিও অনেক পেয়েছেন? মিথ্যা বলব না, আপনি সত্যিই অদ্ভুত সুন্দর।'

'আমাকে পটাতে চাইছেন?' হেসে ফেলল কার্টা। 'না, কারও দেয়া হীরা নেয়ার সময় হয়নি আমার। আর যা বললেন: হীরা সত্যিই দুর্মূল্য, কিন্তু মোটেও দুর্লভ নয়। বলতে পারেন সাধারণ পাথরের মত অত বেশি পাওয়া যায় না। অনেকে ভাবে হীরা পাওয়াই যায় না, এ একদম ঠিক কথা নয়। কৃত্রিম ভাবে দাম বাড়িয়ে রাখা হয় হীরার, এর মূল কারণ পৃথিবীর পঁচানব্বুই ভাগ হীরার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে একটি মাত্র কোম্পানি। তারাই বেশির ভাগ খনির মালিক, তারাই ইচ্ছামত দাম বাড়ায় বা কমায়। যখনই নতুন কোনও হীরা-ক্ষেত্র আবিষ্কার হয়, এরা গিয়ে অনেক বেশি দামে সব কিনে নেয়। ফলে প্রতিযোগিতার সুযোগ থাকে না। এদের কাছে ওপেককে শিশু মনে হতে পারে। এই কোম্পানির কয়েকজন এগযেকিউটিভ আছে যারা ইউনাইটেড স্টেটসে পা রাখলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের অ্যান্টিট্রাস্ট ভায়োলেশন্সের কারণে গ্রেফতার করা হবে।

'এই মানুষগুলো তাদের সিন্দুক থেকে এক মুঠো এক মুঠো করে বাজারে বিক্রি করে হীরা, নিজেদের খুশি মত দাম হাঁকায়। চাহিদার সঙ্গে তুলনা করে সর্বক্ষণ বাড়িয়ে রাখা হয় দাম। প্রয়োজনীয় হীরার মজুদ কমে এলে বাড়ানো হয় উৎপাদন। আবার একটু বেশি হয়ে গেলে সমস্ত পাথর চলে যায় লণ্ডনের ভল্টে। ...এবার চিন্তা করুন, হঠাৎ যদি বাজার-দামে বিলিয়ন ডলারের হীরা জোগান দেয়া হয়, কী হতে পারে?'

'দাম অনেক পড়ে যাবে।'

'তার মানেই আমাদের মনোপোলি শেষ, পুরো বাজার ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবে। কোটি কোটি মহিলা বুঝবে খামোকা তারা আসলে কিছু সাধারণ পাথর আঙুল বা গলায় পরে। এর ফলে পুরো পৃথিবীর অর্থনীতি মস্ত ঝাঁকির ভিতর পড়বে। তার মানেই হুমড়ি খেয়ে পড়বে সোনার দাম বা দেশগুলোর মুদ্রা।'

পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা। গত কয়েক বছর আগে ওই পরিস্থিতির দিকে ঝুঁকে পড়ে বিশ্ব অর্থনীতি, বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে সোনার বাজার।

'এখন যদি সত্যিই ট্রেজার ভরা কোনও নিমজ্জিত জাহাজ থাকে, মাত্র দুটো পথে পরিস্থিতি সামলে নিতে পারে আমাদের কোম্পানি। প্রথম কাজ, অপেক্ষা করা। কেউ যদি সত্যিই হীরার বড় চালান পেয়ে যায়, তার কাছ থেকে যত দামেই হোক কিনে নিতে পারে। এবং সেটা আমাদের কোম্পানি কখনও চায় না, কাজেই দ্বিতীয় পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়।'

'আপনারা নিজেরাই নিমজ্জিত রত্নরাজি খুঁজে বের করেন।'

খাড়া নাকের ডগায় তর্জনী রাখল কার্টা। 'ঠিকই ধরেছেন। এই প্রথম আমি সূত্র সংগ্রহ করে বুঝতে পারি কোথায় থাকতে পারে হীরার বড় একটা চালান। কাজেই আমাকেই দেয়া হয় দায়িত্ব। সঙ্গে দেয়া হলো প্রায়-অবিশ্বাসী রন কুবলিকিকে। সে

আমার কোনও কাজেই আসেনি। যে দায়িত্ব পেয়েছি তা আমার পাওয়া সবচেয়ে বড় অ্যাসাইনমেন্ট। এর ফলে আমার ক্যারিয়ার বড় একটা মোড় নিতে পারে। সত্যি যদি পাথরগুলো পাই, আমাকে বোধহয় কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট করে দেয়া হবে।'

'কোত্থেকে এল এত হীরা?' জানতে চাইল রানা। খুব একটা আগ্রহী নয়, কিন্তু মেয়েটির মুখের কথাগুলো শুনতে ভাল লাগছে।

'এই গল্পের শুরুতে রয়েছে অদ্ভুত একটা কাহিনি,' বলল কার্টা। 'এসব হীরা তোলা হয় কিম্বারলি খনি থেকে। সে সময় মজুর হিসাবে ওখানে নিয়োগ দেয়া হতো হারেরো উপজাতির কিছু লোককে। তাদের রাজা জানতেন আগে হোক বা পরে দখলদার জার্মানদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে দেশ, তা-তে অনেক টাকার প্রয়োজন। তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তাঁদের হাতে প্রচুর হীরা থাকতে হবে। আর ওই হীরা দিয়েই কিনে নেবেন ইংরেজদের দেয়া নিরাপত্তা। এরপর দশ বছরের বেশি ধরে কিম্বারলির খনিতে কাজ করল তাঁর বিশ্বস্ত অনুচররা, নিজেদের দেশে সরিয়ে আনতে লাগল প্রচুর হীরা। রিসার্চ করার সময় জানতে পেরেছি, ওই মজুররা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি ফুরিয়ে যাওয়ার দুই বা তিন মাস আগে নিজ হাত বা পা কেটে মাংসের ভিতর রেখে দিত হীরা। শুকিয়ে যেত ঘা। দেশ থেকে আসার সময় পুরনো ক্ষতচিহ্ন নিয়েই আসত তারা। খনি এলাকায় কাজ শুরু করার পর যখন ভাল হীরা পেত, পুরনো ক্ষতচিহ্ন নতুন করে খুলে তার ভিতর লুকিয়ে রাখত হীরা। এক বছর পর যখন চুক্তি শেষ হতো, প্রহরীরা তাদের ভাল করে পরীক্ষা করে দেখত। প্রায়ই দেখা যেত ছুরি দিয়ে নতুন ক্ষতচিহ্ন কেটে হীরার আছে কি না দেখা হতো। গলার ভিতরও ঝুলিয়ে রাখা হতো হীরা। কিন্তু কখনও বহু পুরনো ক্ষতচিহ্ন খুলে দেখা হতো না।'

'মানুষগুলো সাহসী ও চালাক ছিল,' মন্তব্য করল রানা।

'আমার রিসার্চে দেখেছি এই লোকগুলো সবচেয়ে ভাল এবং বড় হীরা সরিয়ে নিত। কিন্তু এভাবে পাওয়া হীরার সম্ভার এক দিন ডাকাতি হয়ে গেল।'

'ডাকাতি?'

'পাঁচ ইংরেজ ওই কাজটা করল। তাদের একজন ছিল এক তরুণ, তার বাবা ছিল হারেরো ল্যাণ্ডের মিশনারি। ওই লোকের জার্নাল পড়ে এক এক করে কাহিনির টুকরোগুলো একত্র করেছি। ডাকাতি হয়ে যাওয়ার পর ওই লোক ছেলেকে খুঁজতে বেরুল। সে জার্নালে লিখেছে কী ভয়ঙ্কর ভাবে শাস্তি দেবে ছেলেকে।

'সে বর্ণনায় গেলাম না, বিরক্ত হয়ে উঠবেন। ওই কিশোর বয়সী ছেলেটা ভিড়ে গেল জিম উফোর্ড নামের এক অভিযাত্রীর সঙ্গে। তাদের সঙ্গে ছিল আরও তিনজন লোক। পরিকল্পনা মত তারা কেপ টাউনে বাষ্পচালিত এইচএমএস চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে যোগাযোগ করল, জানিয়ে দিল তারা সে সময়ের জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় জাহাজের জন্য অপেক্ষা করবে। এই অভিযাত্রীরা ঠিক করল ঘোড়ার পিঠে কালাহারি ও নামিব মরুভূমি পেরিয়ে পৌঁছবে জাহাজের কাছে।'

'আন্দাজ করছি এরপর আর কখনও এইচএমএস চ্যালেঞ্জার ফিরে আসেনি।'

'বার্তা পাওয়ার পর কেপ টাউন ত্যাগ করে, এবং ধারণা করা হয় সাগরে হারিয়ে গেছে।'

'আপনি ভাবছেন রাজা সলোমনের খনির মত গল্প নয় ওটা। কেন ভাবলেন এদিকের সাগরে থাকবে জাহাজটা?'

'যেখান থেকে হীরা ডাকাতি হয়েছে, সেখান থেকে মানচিত্রে সোজা একটা রেখা পশ্চিমে টেনেছি আমি। সবচেয়ে কঠিন মরুভূমি পেরুতে হয়েছে লোকগুলোকে। কাজেই ধরে নিতে পারি সরাসরি চলেছে। তারা ওয়ালভিস বে থেকে উত্তর দিকে সত্তর

মাইল দূরে হাজির হয়।'

মেয়েটির যুক্তির ভিতর আরও খুঁত পেল রানা। 'কে বলবে কেপ টাউন থেকে রওনা হয়েই ডুবে যায়নি চ্যালেঞ্জার? হয়তো এক সপ্তাহ পর ডুবেছে। আরেকটা ব্যাপার, ওই অভিযাত্রীরা যদি গন্তব্যে পৌঁছুতেই না পারে? হয়তো এখনও মরুভূমির ভিতর পড়ে আছে হীরাসহ তাদের দেহাবশিষ্ট।'

'প্রথম যখন রিসার্চ শেষ করলাম, এই একই কথা বলেছেন আমার বস্। তখন তাঁকে বলি: আমি যদি এসব বের করতে পারি, অন্য কেউ-ও পারবে। এমনও হতে পারে উপকূল থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে পানির নীচে পড়ে আছে দশ বিলিয়ন ডলারের হীরা। ওসব পেতে হলে লাগবে মাত্র একটা স্কুবা ট্যাঙ্ক ও ফ্ল্যাশলাইট।'

'উনি কী বললেন?'

'"তোমাকে এক সপ্তাহ দিলাম, সঙ্গে রন কুবলিকিকে। যাই ঘটুক, যত প্রমাণ জোগাড় করেছ, সব নষ্ট করে ফেলবে।"'

'কয়েক শ' বর্গ মাইল এলাকার জন্য দিল এত কম সময়,' মন্তব্য করল রানা। 'আপনার সঙ্গে লাগবে জাহাজ। সাইড-স্ক্যান সোনার থাকতে হবে, সঙ্গে মেটাল ডিটেক্টর। তার মানেই এই নয় যে আপনি আবিষ্কার করবেন হীরাগুলো।'

কাঁধ ঝাঁকাল কার্টা। 'আমার কথা খুব গুরুত্ব দেননি বস্। আমাকে দিয়েছেন এক সপ্তা, সামান্য টাকা আর ঘাড়ে সিন্দবাদের জিনের মত ভারী কুবলিকিকে। বাধ্য হয়ে স্থানীয় জেলেদের কাছ থেকে তথ্য জোগাড় করতে শুরু করেছি।'

'সাধারণ কৌতূহল, জানতে ইচ্ছে হচ্ছে আপনার বসের কাছে প্রস্তাব দিলেন কেন। আপনি নিজেই তো জাহাজটা খুঁজতে পারতেন। হয়তো তা হলে পেয়ে যেতেন অত হীরা।'

ঠোঁট বাঁকিয়ে ফেলল কার্টা অস্টিন, মনে হলো ওকে ভয়ঙ্কর

অপমান করা হয়েছে। একটু বেশিই বলে ফেলেছে, টের পেল রানা।

'ক্যাপ্টেন, এ ধরনের চিন্তা একবারের জন্যেও আমার মনে আসেনি। ওই হীরাগুলো তোলা হয় ডিবিয়ার্সের খনি থেকে। ওগুলোর মালিক ওই কোম্পানি। ওই হীরা আমি নেব কেন? সেটা তো চুরি। অন্যের ভল্টে ঢুকে পকেটে হীরা পুরতে থাকার মত হয়ে যেত ব্যাপারটা।'

'কথাটা বলেছি সেজন্য দুঃখিত,' মেয়েটির সততা দেখে খুশি হয়েছে রানা। 'ওই কাজ করা সত্যিই খুব অন্যায় হতো।'

'আন্তরিক ভাবে দুঃখ প্রকাশ করলেন বলে ধন্যবাদ,' বলল কার্টা। একটু ঝুঁকে বসল। 'এবার বলুন, আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন? আমি আপনাকে বড় কোনও আশা দিতে পারব না, কিন্তু আপনি চ্যালেঞ্জার খুঁজবার কাজে সময় দিলে সেজন্য আমার কোম্পানি নিশ্চয়ই উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা দিলেই আপনি পৌঁছে যাবেন দাদু এবেলের সেই জায়গায়।'

চুপ করে কী যেন ভাবছে রানা। তখনই কিছু বলল না। চেয়ে আছে সিলিঙের দিকে। ভাবছে এরপর কী করবে। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, হাঁটতে শুরু করল দরজার দিকে। না ফিরেই বলল, 'কিছুক্ষণের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।' এবার খাস বাংলায় মাইক্রোফোনে বলল, 'সোহেল, আমার কেবিনে চলে আয়।' ক্যাপ্টেনের নকল কেবিনের কথা বলেছে রানা। মেস হল ও অপারেশন্স সেন্টারের মাঝে রয়েছে ওই কেবিন।

কয়েক বার বাঁক ঘুরে নোংরা কেবিনের বাইরে সোহেলকে দেখতে পেল রানা। বিসিআই অ্যাডমিনিস্ট্রেটার হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে একটা বালকহেডে, ঠোঁটে ঝুলছে সিগারেট। কী যেন ভাবছে। রানা কাছে পৌঁছে যেতেই সোজা হয়ে দাঁড়াল সোহেল। দরজা পেরিয়ে কেবিনে ঢুকে পড়ল ওরা। নাক কুঁচকে গেল

সিগারেটের বাসি ধোঁয়ার গন্ধে।

'তোর কী মনে হয়?' সরাসরি জানতে চাইল রানা।

'এসবের ভিতর জড়িয়ে না পড়াই বোধহয় ভাল। সোজা কেপ টাউনে গিয়ে তুলে নেব আমাদের ইকুইপমেন্ট। আসিফ হায়দার চৌধুরি বুড়ো হয়ে মরে যাওয়ার আগেই তাকে উদ্ধার করতে হবে।'

'সেটা তো বুঝলাম। কিন্তু মেয়েটার কথা থেকে কী বুঝলি?'

'সব মিলে মনে হয়েছে গাঁজাখুরি কাহিনি।'

'আমিও তাই ভাবতাম, কিন্তু নিজ চোখে দেখেছি ওদের উপর হামলা হয়েছে।'

'তুই কোনও বড় ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছিস?'

'কোনও বড় কারণ ছাড়া মিলিয়ন ডলারের ইয়ট নিয়ে কারও উপর কেউ হামলে পড়ে না। আমার ধারণা কিছু লুকাতে চাইছে তারা। কার্টা অস্টিন বলেছে, ওরা জাহাজ খুঁজতে এসেছে কেউ জানে না। আমার মনে হচ্ছে ওই লোকগুলো ওই ডুবে যাওয়া জাহাজ পাহারা দিচ্ছে না, অন্য কিছু লুকাতে চাইছে।'

'তুই কি দাদু এবেলের ধাতব সাপের কথা ভাবছিস?'

'বড় কোনও ঘটনা ঘটছে এখানে, দোস্ত।' সরাসরি বন্ধুর চোখে চাইল রানা।

পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে রইল দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল সোহেল, 'এসব ব্যাপারে তোর ভুল হয় না। এবার কী করতে চাস?'

'মার্ভেলকে আর এখানে আটকে রাখতে চাই না। আমি চলে গেলেই সোজা কেপ টাউনে যাবি। ইকুইপমেন্টগুলো তুলে নিয়ে ফিরতি পথ ধরবি। তার আগে ক্যাপ্টেন আলম সিরাজকে বলবি কপ্টার নিয়ে যেন চলে যায় সাপের এলাকায়।'

ভদ্রলোক এয়ার ফোর্স থেকে অবসর নিয়ে যোগ দিয়েছেন

মার্ভেল জাহাজে। তাঁর দায়িত্বে রয়েছে এমডি-৫২০এন কপ্টার। জিনিসটা রাখা হয় পিছনের গোপন এক হোল্ডে। 'কার্টা অস্টিনের কাছ থেকে কোঅর্ডিনেট্স নিয়ে তোকে জানিয়ে দেব কোথায় যেতে হবে।'

'এদিকে তুই যাবি ওয়ালভিস বে-তে?'

'নিজ কানে দাদু এবেলের কথা শুনতে চাই। তা ছাড়া, মেয়েটির চপার জকির সঙ্গে আলাপ করব। উপরের একটা ডেভিট থেকে একটা বোট নেব, বোট গ্যারাজের খবর পাবে না কার্টা।' মার্ভেলের বাইরের অন্য সব কিছুর মতই অতি পুরনো চেহারা দুই লাইফ বোটের। কিন্তু বাস্তবে ওগুলো জাহাজের মতই হাই-টেক। যদি রেঞ্জ থাকত, ওগুলোর একটা নিয়ে অনায়াসে হারিকেন সিযনে আটলান্টিক পাড়ি দিতে পারত রানা।

'এক বা দুই দিন লাগবে আমার,' বলল রানা। 'তারপর মার্ভেল নামিবিয়া ফিরলেই যোগাযোগ করব।'

'বেশ,' রাজি হয়ে গেল সোহেল।

'গত এক ঘণ্টা ছিলাম যিম আর মেস হলে, নতুন কোনও খবর আছে?'

'হ্যাঁ, আমাদের জন্য উপযোগী একটা বিমান ভাড়া করেছে ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসান। এটিভি অপেক্ষা করছে কেপ টাউনের ডানকান ডকে। এদিকে রায়হান ও স্বর্ণা ডেভিল্স্ ওয়েসিস নিয়ে কাজ করছে।'

স্বর্ণা কমপিউটার নিয়ে কাজ করতে গিয়ে জেনেছে, ডেভিল্স্ ওয়েসিস নামের এক কারাগারে থাকতে পারে আসিফ হায়দার চৌধুরি। ওই জায়গা নামিবিয়ায়। কাজেই জার্মান নামের উপর বেশি মনোযোগ দিয়েছে। প্রথম বেশ কিছু ডেটাও মিলেছে, তারপর প্রায় ফুরিয়ে গেছে তথ্য। মনে হয়েছে খামোকা কষ্ট করছে ও।

বিংশ শতাব্দিতে এসে ফ্রেঞ্চদেরকে নকল করল ইমপেরিয়াল জার্মান সরকার। ফ্রেঞ্চরা গর্বিত ছিল গায়ানা কারাগারের কারণে, নাম দেয়া হয়েছিল ডেভিলস ওয়েসিস। ওই দ্বীপে রাখা হতো সবচেয়ে খারাপ কয়েদি। জার্মান সরকার ওই কারাগারের মত করেই মরুভূমির ভিতর গড়ে তুলল ম্যাক্সিমাম-সিকিউরিটি প্রিযন। ওই এলাকার এক শ' মাইলের ভিতর কোনও লোকালয় ছিল না। স্থানীয় পাথর দিয়ে তৈরি কারাগার। চারপাশে শুধু মাইলের পর মাইল বালির ঢিবি। কোথাও পালাবার উপায় নেই। উপকূলে পৌঁছবার অনেক আগেই মরতে হবে। স্যানফ্রান্সিসকোর কুখ্যাত আলকাট্রাযের মতই জার্মানদের ওই কারাগার ছিল দুর্ভেদ্য। কখনও শোনা যায়নি মুক্তি পেয়েছে কোনও বন্দি। এরপর যুদ্ধে জড়িয়ে গেল জার্মানি, অর্থনীতি দুর্বল হয়ে যাওয়ায় উনিশ শ' ষোলো সালে বন্ধ করে দেয়া হলো বহু দূরের ওই কারাগার।

একসময় ওখানে ছিল একটা রেল লাইন, কিন্তু পরে সরিয়ে নেয়া হলো। একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওই কারাগার। পৌঁছুতে হলে যেতে হবে বিমান, কপ্টার বা অল টেরেইন ভেহিকেল নিয়ে। যে পথেই যাওয়া হোক, ভীষণ ঝুঁকি নিতে হবে। ওখানে অল্প কয়েকজন কিডন্যাপার আসিফ হায়দার চৌধুরিকে আটকে রেখে থাকতে পারে, তবে তারা অনেক আগেই টের পাবে কপ্টার বা ট্রাকের আওয়াজ। রানা ওর দলবল নিয়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছবার আগেই তাদের হামলা আসতে পারে।

দীর্ঘ ডেটাবেস ঘেঁটেছে স্বর্ণা, জোগাড় করেছে কমার্শিয়াল স্যাটালাইট ইমেজ। এসব কাজ শেষে ওরা জুনিয়াররা ওদের প্রিয় সোহেল ভাইকে ছেঁকে ধরেছে। আলোচনা করতে বসেছে সবাই। মোটামুটি ভাবে দাঁড় করানো হয়েছে একটা খসড়া পরিকল্পনা।

'কিডন্যাপারদের কাছ থেকে কিছু জানা গেল, বা ভদ্রলোকের কোম্পানি থেকে, সোহেল?'

'না, কিছুই না। তবে ওই কোম্পানির সঙ্গে কিছু এইচআরটি-র আলাপ চলছে।' সাধারণত এ কাজ করে মিলিটারি বা পুলিশ, কিন্তু নতুন কিছু কোম্পানি কিডন্যাপিং কেস ডিল করছে। রানা এজেন্সি এমনিতে এসব কাজ নেয় না, কিন্তু সোহেল আসিফ হায়দার চৌধুরী-নিকোলাস ক্রিস্টোফার ল্যাবোরেটরির সঙ্গে যোগাযোগ করে জানিয়েছে ওরা হোস্টেজ রেসকিউয়ার টিম।

'বস্ জানেন?'

'বলেছি। মোটেই অখুশি মনে হলো না। বললেন, ভদ্রলোক বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের জন্য অনেক করেছেন।'

'খবরের কাগজে পড়েছি। ...এবার একটা কাজ কর, কার্টা অস্টিনকে ফিশিং বোট পর্যন্ত পৌঁছে দে। ওর সঙ্গের লোকটাকে ও বলুক, জাহাজেই থাকবে। আরেকটা কাজ, ক্রুদের বলবি পোর্টসাইডের লাইফবোট নামিয়ে দিতে। আমি শাওয়ারে গেলাম। গুছিয়েও নিতে হবে ব্যাগ।'

'আমার কিছুই বলার নেই,' হলওয়ে ধরে রওনা হয়ে গেল সোহেল। 'উল্টো বাতাসেও তোর যে বদবু পাচ্ছি... বাপরে!'

গম্ভীর চেহারায় সোজা কেবিনে ফিরল রানা, দরজা বন্ধ করেই জুতো খুলে ফেলল, তারপর পোশাক ছেড়ে ঢুকে পড়ল বাথরুমে। চালু করল শীতল ঝর্না প্রবাহ, চুপচাপ ভিজতে লাগল। ভাবছে কীভাবে সাহায্য করবে মেয়েটিকে। ওর ধারণা, এদিকের সাগরে কোনও রত্নতরী নেই। ধাতব সাপ তো একেবারেই অবাস্তব ব্যাপার। কিন্তু এটা উড়িয়ে দিতে পারছে না, সত্যিই কার্টা অস্টিন খুন হতে চলেছিল লোকগুলোর হাতে। বিষয়টা জানতে হবে। লোকগুলো কারা ছিল? কী লুকাতে চেয়েছে?

শাওয়ার শেষে বেরিয়ে এসে লেদার ব্যাগে কিছু টয়েলেট্রিজ রাখল রানা, ওয়ারড্রোব থেকে নিল কয়েকটি পোশাক, একটা গায়ে চাপিয়ে নিয়ে পরে নিল শক্ত সোলের বুট। এবার চলে এল

ছোট্ট অফিস রুমে, ডেস্কে বসে ডায়াল করল অ্যান্টিক সেফের তালা। অভ্যস্ত হাতে দশ সেকেণ্ড লাগল শেষ পিন পড়তে। হ্যাণ্ডেল ধরে টান দিতেই খুলে গেল ভারী দরজা। এক শ' ডলারের বেশ কয়েকটা বাণ্ডিলের পাশে বিশ পাউণ্ডের তোড়া। এক পাশে ওর প্রিয় অস্ত্রগুলো। সবগুলো একসঙ্গে ব্যবহার করলে ছোটখাটো একটা যুদ্ধ শুরু করা যাবে। একসঙ্গে রাখা তিনটে মেশিন পিস্তল, দুটো অ্যাসল্ট রাইফেল, একটা কমব্যাট শটগান, রেমিংটন ৭০০ স্নাইপার রাইফেল, এক দিকের ড্রয়ারে স্মোক, ফ্র্যাগমেণ্টারি ও ফ্লাশব্যাং গ্রেনেড। পাশে শুইয়ে রাখা এক ডজন পিস্তল। রানা এক সেকেণ্ড ভাবল কী ধরনের পরিস্থিতির মুখে পড়তে পারে, পরের সেকেণ্ডে তুলে নিল মাইক্রো উজি সাবমেশিনগান ও গ্লক ১৯। ইদানীং নাম করেছে এফএন ফাইভ-সেভেনএন পিস্তল, ওটাই নিত, কিন্তু একই অ্যামিনিউশন দিয়ে দুই ধরনের অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ রাখল। গ্লক ও উজি দুটোই নাইন এমএম রাউণ্ড ব্যবহার করে।

স্প্রিং ঠিক রাখবার জন্য এক পাশে খুলে রাখা হয়েছে গুলি ছাড়া চারটে ম্যাগাযিন, ওগুলোর ভিতর বুলেট ভরল রানা, ব্যাগের কাপড়ের নীচে রেখে দিল অস্ত্র, ম্যাগাযিন ও এক বাক্স বুলেট। একবার নিজেকে দেখে নিল আয়নায়। হালকা ডাক ট্রাউজার্স ও বুক খোলা শার্টে কোনও পাগল প্রেমিক মনে হচ্ছে ওকে। নিজেকে বলল, আমি কার্টা অস্টিনের কাছে কোনভাবে ঋণী নই। একই রকম, ঋণগ্রস্ত নই আসিফ হায়দার চৌধুরির কাছেও। কিন্তু কোনও কাজ হাতে নিলে তা শেষ করাই উচিত।

ডেস্কের উপর থেকে ব্যাগ তুলে নিল রানা, কেবিন থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল ডেক লক্ষ করে। শিরার ভিতর টের পেল, দৌড়াতে শুরু করেছে অ্যাড্রেনালিন।

বারো

পরিত্যক্ত কারাগারে আবারও নতুন করে লোক বাস শুরু হতেই হাজির হয়েছে হাজারে হাজারে স্যাণ্ড ফ্লি। খোলা মরুভূমি থেকে গরম দেহের ঘ্রাণ পেয়েছে ওরা। কারাগারে এসে শুরু করেছে নিয়ত জ্বালাতন। কোনও মানুষ এত অত্যাচার করতে পারে না। খুদে পোকাগুলো দিনে ষাটটি ডিম পাড়ে, এখন কারাগার জুড়ে ঘুরছে তাদের বিশাল বাহিনী। আগেই কেমিক্যাল স্প্রে নিয়ে তৈরি ছিল প্রহরীরা, শত্রুদলকে দূরে সরিয়ে রেখেছে তারা। কিন্তু বন্দিদের ভাগ্য অতটা ভাল নয় ।

পাথুরে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে মেঝেতে শুয়ে আছে আসিফ হায়দার চৌধুরি, প্রাণপণে এখানে-ওখানে চুলকে চলেছে। নিজেকে পাগল-পাগল লাগছে তার। পোকাগুলোর কামড় খেয়ে দেহে এক ইঞ্চি জায়গা নেই যেখানে জ্বালা করছে না। কিন্তু এটাও ঠিক, এসব কষ্ট ওকে রক্ষা করছে অনেক ভয়ঙ্কর এক ভয় থেকে। মনের গভীরে ডুব দিতে পারছে না। এখন পর্যন্ত যা দেখেছে বা শুনেছে তাতেই জীবনের মায়া ছেড়ে দিয়েছে।

ডান কানের লতিতে একটা পোকা কামড় দিতেই কাকে যেন অভিশাপ দিল বিজ্ঞানী। দুই আঙুলে চট্ করে ধরে ফেলল পোকাটাকে, দুই বুড়ো আঙুলের নখের মাঝে রেখে পিষে দিল। নিজেও জানে না কখন থেকে যেন পোকাগুলোর শক্ত দেহ ভাঙতে

পারলেই সন্তুষ্ট হয়ে হুম্ বলছে। মস্ত এক যুদ্ধে হেরে গেছে আসিফ, এখন সামান্য কোনও লড়াইয়ে জিতলে তাতেই সন্তুষ্ট হতে হবে।

আকাশে বোধহয় চাঁদ নেই। সেল ব্লকের ভিতর ঘুটঘুটে অন্ধকার। চোখ খুললে মনে হয় এক দোয়াত আঁধার তুলে নিয়ে কলমের কালি হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে। কোথাও এক ফোঁটা বাতাস নেই। থমথম করছে চারপাশ, অথচ বাইরে মরুভূমিতে হু-হু হাওয়া চলবার কথা। বদ্ধ ঘরে থাকতে গিয়ে ভোঁতা হয়ে গেছে মগজ। ও যেন হয়ে উঠছে অসহায় কোনও বোবা প্রাণী। মরুভূমির বালি এসে ওর ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিকল করে দিয়েছে। এখন আর কোনও গন্ধ পাচ্ছে না। কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে জিভ, খাবারে কোনও স্বাদ নেই। গতকাল থেকে ওর মনে হচ্ছে ওকে আসলে ধুলো ছাড়া কিছুই খেতে দিচ্ছে না। এখনও কানে শুনছে, কোনও কিছু স্পর্শ করে বুঝতে পারছে জিনিসটা কী। সারাশরীরে টনটনে ব্যথা। দিনের পর দিন পাথরের মেঝেতে শুয়ে এমন হয়েছে। তার উপর রয়েছে পোকার কামড়।

'ক্যারেন?' নিচু স্বরে ডাকল আসিফ। সেলে ফিরবার পর থেকেই কয়েক মিনিট পর পর মেয়েটির সাড়া পেতে চাইছে। একবারও জবাব দেয়নি মেয়েটা। আসিফের মন বলছে ক্যারেন বোধহয় মরেই গেছে। আসলে ওর নাম ধরে ডাকছে শুধু নিজেকে স্থির রাখতে, নইলে হয়তো সত্যিই ভয়ে চিৎকার শুরু করবে।

হঠাৎ নীরবতার ভিতর মনে হলো সামান্য সাড়া দিল মেয়েটি। ওই আওয়াজ যেন সদ্য প্রসবজাত বিড়ালের বাচ্চার কান্না। দেয়ালের পাশে খসখস আওয়াজ হলো। পাথরের ওপাশে পোশাক নাড়ল কে যেন।

'ক্যারেন?' আগের চেয়ে একটু জোরে ডাকল আসিফ।

'ক্যারেন, আমার কথা শুনছ?'

দূরে গোঙানি শুনতে পেল ও।

'ক্যারেন, আমি আসিফ।' আমি ছাড়া কে থাকবে, মনে মনে বলল বিজ্ঞানী। 'তুমি কি কথা বলতে পারো?'

'ডক্টর চৌধুরি?'

ভাঙা কণ্ঠ, দুর্বল স্বর, তারপরও আসিফের মনে হলো পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি কণ্ঠ শুনেছে। 'হায় আল্লা, তুমি ভাল আছ, ক্যারেন? আমি ভেবেছি তোমাকে মেরে ফেলেছে ওরা।'

'প্রায় মেরেই ফেলেছে, স্যর,' থেমে গেল কণ্ঠ। তারপর শুরু হলো কাশি। কয়েক সেকেণ্ড পর এল গোঙানির আওয়াজ। 'কী হয়েছিল, স্যর? আমার মুখ ফুলে গেছে। শরীরও। মনে হয় পাঁজরের কয়েকটা হাড় ভেঙে গেছে।'

'তোমার মনে নেই কী হয়েছে? তোমাকে পেটানো হয়েছে। তুমি বলেছিলে ওরা কেউ তোমাকে একটাও প্রশ্ন করেনি।'

'ওরা আপনাকেও মেরেছে, স্যর? আপনি ঠিক আছেন তো?'

আরও ছোট হয়ে গেল আসিফের মন। লোকগুলো কী ভয়ঙ্কর ভাবেই না পিটিয়েছে বেচারিকে, তারপরও সে ওর খোঁজ নিচ্ছে। বেশির ভাগ মানুষ অন্যের বিষয়ে সামান্য খোঁজ নিয়েই নিজের গল্পের ঝাঁপি খুলে বসে, তারপর আর থামতে পারে না। সেখানে এই মেয়ে ওর সুস্থতা কামনা করছে! আসিফ মনে মনে বলল, খুব ভাল হতো ওকে এসবের সঙ্গে না জড়িয়ে পারলে। 'না, ক্যারেন,' নিচু স্বরে বলল সে। 'ওরা আমাকে মার-ধর করেনি।'

'সেজন্য ভাল লাগছে।'

'আমি বুঝতে পেরেছি কে আমাদের কিডন্যাপ করেছে। সে কী চায় তাও বোধহয় জানি এখন। প্রতিশোধ নিতে চায় সে।'

'সে কে, স্যর?' আশা নিয়ে জানতে চাইল ক্যারেন। বোধহয় ভাবছে এবার উদ্ধার পাবে।

'আমার প্রাক্তন ক্লাসফ্রেণ্ড ও বিজনেস পার্টনার।'

'ডক্টর ক্রিস্টোফার?'

'হ্যাঁ, নিকোলাস ক্রিস্টোফার।'

'কিন্তু কেন? কেন এ কাজ করলেন তিনি?'

'কারণ মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে ওর, ক্যারেন। তেতো মনের এক লোক হয়ে গেছে। পৃথিবীকে ভিন্ন চোখে দেখছে।'

'আপনার কথা আমি বুঝলাম না, স্যর।'

'কাউকে বোঝাতে পারব না, কিন্তু এটাই বাস্তব, ক্রিস্টোফার মানসিক ভাবে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।' চুপ হয়ে গেল আসিফ। ভাবতে শুরু করেছে এ পর্যন্ত কী করেছে ওর বন্ধু। কিন্তু কীসের জন্যে এসব করছে সে? প্রতিশোধ? প্রতিশোধ নেবে সে ইউনাইটেড স্টেটসের এক সুন্দরী মেয়ের উপর? বিশ্বের পরিবেশ নষ্ট করছে বলে ওই দেশকে শিক্ষা দেবে?

না।

ভাল করেই বন্ধুকে চেনে আসিফ, আসলে এসব করবে সে নিজের খেয়াল মেটাতে।

ওকে কিডন্যাপ করেছে বোঝাতেঃ আসলে তুমি কিছুই নও, আমিই ছিলাম সমস্ত সাফল্যের মূল চালিকা শক্তি।

ব্যবসা শুরু করবার সময় থেকেই ওরা ছিল দুই যমজ ভাইয়ের মত। আসিফের কাজই ছিল সবাইকে মুগ্ধ করা, ভাল কথায় নিজেদের ব্যবসা গুছিয়ে তোলা, ব্যখ্যা দেওয়া। কিন্তু এর ফলে মিডিয়া ধরে নিল আসিফই কোম্পানির মূল নায়ক। মিডিয়ার কাছে উপেক্ষিত হলো নিকোলাস ক্রিস্টোফার, স্টেজ মাতিয়ে তুলল আসিফ, আর সে থাকল উইংসের আড়ালে, আঁধারে। আসিফ কখনও ভাবেনি ওর প্রিয় বন্ধু এবং ভাই এভাবে খেপে উঠবে। এমআইটিতে নিকোলাস সবসময়ই ছিল মুখচোরা ছাত্র। আসিফ ধরেই নিয়েছিল, ও এমনই। তারপর আমেরিকান মডেল

মেয়েটা যখন ওদের দু'জনের ভিতর নানান বিবাদ তৈরি করল, তখনও আসিফ বলেছে, 'তুই ওকে বিয়ে কর্, আমি কিছুই মনে করব না।'

একটা কথাও বলেনি ক্রিস্টোফার, শুধু তিক্ত হেসেছে। কখন যে সে খেপে উন্মাদ হয়ে উঠেছে, বিন্দুমাত্র টের পায়নি আসিফ। তারপর ওই মেয়ে এক টেনিস তারকাকে বিয়ে করে বসল। কিন্তু ততক্ষণে ক্রিস্টোফার ঠিক করে ফেলেছে, আসিফ কখনও তার বন্ধু ছিল না। তখন থেকেই নিজেকে পুরো গুটিয়ে নিয়েছে সে, ঠিক করেছে আসিফ হায়দার চৌধুরিকে চরম শাস্তি দিতে হবে।

সম্পূর্ণ বদলে গেল নিকোলাস ক্রিস্টোফার, জেদাজেদি করে কোম্পানির সব শেয়ার বিক্রি করল আসিফের কাছে। মিশতে লাগল উচ্ছৃঙ্খল একদল পরিবেশবাদীর সঙ্গে। সাবেক বন্ধুর ক্ষতি করতে লেগে গেল বিপুল সম্পদ নিয়ে। তা-ও যখন পারল না, পুরোপুরি যোগ দিল পরিবেশবাদী টেরোরিস্টদের সংগঠনে। নিজ বাড়িতে বন্দি জীবন কাটাতে লাগল।

মনে মনে আফসোস করল আসিফ, সত্যি যদি চুপ করে বাড়িতে বসে থাকত! তা করেনি নিকোলাস, ক্রমেই আরও রেগে উঠেছে। আর এখন তো ভয়ঙ্কর কোনও পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছে। আর থামবে না সে, অনেক গভীরে ডুবে গেছে। বিশ্বের পরিবেশ সুন্দর করবার যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল, তা-ও বোধহয় বদলে গেছে।

'এখান থেকে যে করে হোক বেরিয়ে যেতে হবে, ক্যারেন।'

'ওরা আমাদের নিয়ে কি করতে চায়, স্যর?'

'নিকোলাসকে থামাতে হবে। পুরো পাগল হয়ে গেছে। একদল উন্মাদ পরিবেশবাদীকে জড় করেছে, বাস্তবে এরা সন্ত্রাসী, মানবতার ম-ও বোঝে না কেউ।' দুই হাতের ভিতর মুখ গুঁজে দিল আসিফ হায়দার চৌধুরি।

নিজের দায় ও দোষ কাঁধ পেতে নিয়েছে। ওর অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল রেগে উঠছে নিকোলাস। তখনই যদি লাইমলাইটে আনা যেত ওকে, কখনও এভাবে বিগড়ে যেত না। আসিফ খেয়ালই করেনি নিকোলাসের ভঙ্গুর ব্যক্তিত্ব খানখান হয়ে গেছে। একটু মনোযোগ দেয়ার অভাবে দানব হয়ে উঠেছে সে। নিজের উপর রেগে গিয়ে কখন যেন কাঁদতে শুরু করেছে আসিফ। নিজ কষ্টের জন্য ভাবছে না, মাথা ভারী হয়ে উঠছে ভবিষ্যতের বিপদের কথা ভাবতে গিয়ে। 'আমি দুঃখিত... আমি দুঃখিত,' বিড়বিড় করে বলে চলেছে। কার কাছে ক্ষমা চাইছে তা নিজেও জানে না। নিকোলাস ক্রিস্টোফারের কাছে? নাকি যাদের ক্ষতি হতে পারে, তাদের কাছে?

আঁধারে ভেসে এল দুর্বল কণ্ঠ: 'ডক্টর চৌধুরি? ...ডক্টর চৌধুরি, প্লিয, বলতে পারেন ডক্টর ক্রিস্টোফার কেন এমন করছেন?'

বেচারির গলা থেকে ঝরছে ভীষণ কষ্ট, কিন্তু কোনও জবাব দিতে পারল না আসিফ হায়দার চৌধুরি। হু-হু করে কাঁদছে, ছিঁড়ে পড়ছে ওর অন্তর। পরের বিশ মিনিট একটানা ফুঁপিয়ে গেল। তারপর শুকিয়ে গেল অশ্রুনালী।

আরও একটু পর নিজেকে সামলে নিতে চাইল, ভাঙা স্বরে বলল, 'আমি দুঃখিত, ক্যারেন। আসলে...' কোনও শব্দ এল না ওর মাথায়। কিছুক্ষণ পর বলল, 'আমার দোষেই বদলে গেল নিকোলাস। সবার সামনে আমি ছিলাম উজ্জ্বল তারকার মত। লাইমলাইট থেকে অনেক দূরে ছিল নিকোলাস। হিংসা করতে করতে এমন হয়ে গেল... আমার কথা বিশ্বাস করবে, ক্যারেন? এই আমারই জন্য বদলে গেল ও! হায় আল্লা, নিকোলাস পাগল হয়ে গেছে, কারণ আমি ছিলাম ওর চেয়ে জনপ্রিয়।'

কোনও জবাব দিল না ক্যারেন কুম্বস।

'ক্যারেন?' ডাক দিল আসিফ। কোনও সাড়া নেই। 'ক্যারেন? ...ক্যারেন! ...ক্যারেন!'

বদ্ধ পাথুরে ঘরে গুমরে মরছে আসিফের কণ্ঠ। মিলিয়ে গেল প্রতিধ্বনি। আবারও নেমে এল নীরবতা। অন্তরের ভিতর আসিফ অনুভব করল, নিকোলাস ক্রিস্টোফার একটা জীবন কেড়ে নিয়েছে।

তেরো

'ডেকের নীচে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারেন,' কার্টা অস্টিন হাই তুলতেই বলল রানা।

'না, ঠিক আছি।' আবারও হাই তুলল মেয়েটি। 'তবে আরেকটু কফি নেব।'

হাঁটুর কাছে রাখা রুপালি থার্মোস মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। লাইফবোটের ড্যাশবোর্ডের উপর পড়ে রইল ওর চোখ। চমৎকার ভাবে চলছে ইঞ্জিন। চার ভাগের তিন ভাগ ফিউয়েল এখনও রয়ে গেছে ট্যাঙ্কে। আর মাত্র এক ঘণ্টা পর ওয়ালভিস বে-তে পৌঁছবে ওরা।

মার্ভেল থেকে রওনা হওয়ার এক ঘণ্টা পর যোগাযোগ করেছে সোহেল। কপ্টার নিয়ে দাদু এবেলের সাপের এলাকার উপর দিয়ে ঘুরে গেছেন ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ। ওখানে নীল সাগর ছাড়া কিছুই ছিল না। তখন একবার ভেবেছে রানা, কার্টাকে পৌঁছে

দেবে ওর হোটেলে, তারপর বিমান ধরে চলে যাবে কেপ টাউনে, ওখান থেকে উঠবে মার্ভেলে। বিমানে করে চলে যাওয়া যৌক্তিক হলেও মেয়েটিকে কষ্ট দিতে চায়নি রানা।

কার্টা অস্টিনের সঙ্গে নিজের মনের বেশ মিল পেয়েছে। ওরা দু'জন কোনও কাজ আধাআধি রেখে থেমে যেতে শেখেনি। যত বড় চ্যালেঞ্জই আসুক, মোকাবিলা করতেই হবে। এদিকের সাগরে রহস্যজনক কিছু ঘটছে। কাজেই এর শেষ না দেখে থামবে না ওরা।

থার্মোসের কাপে কালো কফি ঢালল কার্টা, একটু একটু দুলছে ওর দেহ। সাগরের উপর দিয়ে ছন্দ তুলে এগিয়ে চলেছে লাইফবোট। কিন্তু এক ফোঁটা কফি পড়ছে না হাত থেকে। এখনও ওর পরনে হাফ প্যান্ট। রানা ওকে স্টোরেজ বিন থেকে একটা কমলা উইণ্ডব্রেকার দিয়েছে। নিজেও একটা বেঁধেছে কোমরে।

এই লাইফবোটে চল্লিশজনের এক সপ্তাহ চলবার মত খাবার রাখা থাকে। পানির জন্য রয়েছে খুদে ডিস্যালিনেটর। একটু লবণাক্ত থাকে পানি, তবে খারাপ লাগে না খেতে। কেবিনের বেঞ্চসিটগুলো দেখলে মনে হয় ফাটা, আসলে ওটা কিড লেদার দিয়ে তৈরি। বোটের চেহারা এমনই করা হয়েছে, যে-কেউ দ্বিতীয়বার এটার দিকে ঘুরে চাইবে না। সিলিঙে একটা প্যানেল থেকে নামিয়ে নেয়া যায় তিরিশ ইঞ্চির প্লাজমা টিভি। সঙ্গে রয়েছে বিশাল ডিভিডি লাইব্রেরি ও সাউণ্ড সিস্টেম।

বোটের প্রতিটি ভাঁজ ও কোনা ব্যবহার করে বাড়ানো হয়েছে যাত্রীদের আরাম-আয়েশ। কেউ সাগরে চললে খুশি হয়ে উঠবে এই বোট পেয়ে। এটা আসলে সাধারণ কোনও বোট নয়, বলা চলে লাকযারি মোটর ইয়ট। নিরাপত্তার জন্য বিশেষ যত্ন নেয়া হয়েছে। হ্যাচগুলো সিল করে দিলে পুরো এক গড়ান দিয়ে

আবারও ভেসে উঠবে বোট। প্রতিটি সিটের জন্য রয়েছে থ্রি-পয়েন্ট হার্নেস। যাত্রীদের ছিটকে পড়তে হবে না। লাইফবোটে আরও কিছু কৌশল ও যন্ত্রপাতি যোগ করেছে রানা। কার্টা অস্টিনকে ওসব দেখানোর ইচ্ছা ওর নেই।

দুই ভাবে এই বোট চালানো যায়। নীচে কেবিনের ভিতর বো-র কাছে রয়েছে এক সেট ডায়াল ও লিভার। ওগুলো ব্যবহার না করলে বোটের স্টার্নে রয়েছে সামান্য উঁচু একটা প্ল্যাটফর্ম, ওখান থেকেও বোট নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এখন ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা ও কার্টা। চুপ করে আছে ওরা। একটু আগে সাগরের বুকে ডুবে গেছে ঝলমলে সূর্য। কালো আকাশে দেখা দিয়েছে লক্ষ-কোটি নক্ষত্র। রানা ও মেয়েটির সামনে ছোট উইণ্ডস্ক্রিন, ওটাই ওদেরকে রক্ষা করছে লবণাক্ত পানির ঝাপটা থেকে। অ্যাণ্টার্কটিকার উত্তর থেকে ভেসে আসা শীতল বেঙ্গুয়েলা স্রোত দেখতে না দেখতে তাপমাত্রা নামিয়ে দিয়েছে ষাট ডিগ্রির নীচে।

উষ্ণতা পাওয়ার জন্য দুই হাতে কাপ ধরেছে কার্টা, ড্যাশবোর্ডের আবছা আলোয় মনোযোগ দিয়ে দেখছে রানার মুখ। মানুষটাকে অদ্ভুত আকর্ষণীয় লাগছে ওর। ঠোঁটের কোণে একইসঙ্গে খেলছে নিষ্ঠুরতা ও কোমলতা। দুটো একইসঙ্গে থাকে কী করে, ব্যাখ্যা করতে পারবে না কার্টা। মানুষটার আয়ত চোখের কুচকুচে কালো মণিদুটোর ভিতর সবসময় অথৈ সাগর খেলছে। সত্যিকারের নেতা, সহজেই সবার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেয়। মানুষটার অন্তর পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কার্টা নিজেকে সাবধান করল: এই পুরুষ চিরকালের একাকী, শীঘ্রিই হারিয়ে যাবে নিজ চলার পথে। কেউ ঠেকাতে পারবে না তাকে।

আরও মনোযোগী হলো কার্টা। মাসুদ রানা চট্ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, কখনও আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে না। কেন যেন

মনে হলো মানুষটার মিলিটারি ট্রেনিং আছে। তাই যদি হয়, তা হলে বোধহয় নেভিতে ছিল। অযোগ্য উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে বনেনি, ছেড়ে দিয়েছে চাকরি, বেরিয়ে পড়েছে সাগরে। নিজ দিগন্ত সে নিজেই স্থির করবে। আরও দুই শ' বছর আগেই তোমার আসা উচিত ছিল, মনে মনে বলল কার্টা। কল্পনায় দেখতে পেল, প্রশান্ত মহাসাগর চিরে চলেছে মাসুদ রানার বাণিজ্য তরী, ডেকের উপর স্তূপ করে রাখা মশলা ও সিল্ক।

'কী নিয়ে হাসছেন আপনি?' জানতে চাইল রানা।

'ভাবছিলাম ভুল সময়ে চলে এসেছেন।'

'তাই? কেন মনে হলো?'

'আপনি শুধু যে মেয়েদের উদ্ধার করেন তা-ই নয়, তাদের জন্য জীবনের ঝুঁকিও নেন।'

বড় দম নিয়ে কার্টুনের নায়কের মত করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল রানা। 'হ্যাঁ, সুন্দরী নারী, এবার সরে যাও, সাগরের ধাতুর সাপের সঙ্গে লড়ব আমি!'

হেসে ফেলল কার্টা। 'আপনাকে একটা প্রশ্ন করব?'

'বলুন।'

'আপনি যদি মার্ভেলের ক্যাপ্টেন না হতেন, কী হতে চাইতেন?'

প্রেমের জটিল স্রোতের দিকে মোড় নেবে না এই মেয়ে, বলল রানা, 'আমি নাবিক হতাম।'

'তাই? ক্যাপ্টেন হতে চাইতেন না?'

'না। ছোট একটা নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম দিগন্ত পাড়ি দিতে। দেখতে চাইতাম বহু দূরের ওপারে কী আছে।'

'নিজেকে সবসময় খুঁজতেন আপনি, চাইতেন কোনও মেয়ের গভীর ভালবাসা, কিন্তু বেশি দিন আপনাকে আটকে রাখতে পারত না তার মোহ।'

বিপজ্জনক মোড়ের দিকে চলেছে মেয়ে। চট্ করে জানতে চাইল রানা, 'আপনি কি হতেন?'

মিষ্টি হাসল কার্টা। 'কেন, আমি হতাম মার্ভেলের ক্যাপ্টেন!'

'সোহেল খুব খুশি হতো।'

'সোহেল? সে কে?'

'আমার বন্ধু, মার্ভেলের ফার্স্ট অফিসার।'

'খুব ঘনিষ্ঠ আপনারা?'

'ভাইয়ের মত। আপনাকে ফিশিং বোট হিল্ডার কাছে নিয়ে গিয়েছিল ও।'

'চিনেছি। খুব হাসিখুশি মানুষ।'

'ওর মত বিশ্বস্ত কাউকে দেখিনি। আর কেউ অমন বন্ধু হতে পারে কি না, আমার সন্দেহ আছে। আমি জানি, ওর মত করে পারিনি আমি।'

কফি শেষ করে রানার হাতে কাপ ধরিয়ে দিল কার্টা। প্যাঁচ মেরে থার্মোসের মুখ বন্ধ করল রানা। চট্ করে দেখে নিল কয়টা বাজে। প্রায় মাঝরাত।

'ভাবছি, আঁধারে সোয়াকোপমুণ্ডের ডকে না থেমে দক্ষিণে গিয়ে দেখা করি দাদু এবেলের সঙ্গে, তাতে কেউ সন্দেহ করবে না,' বলল রানা। 'ভোরে মাছ ধরতে বেরুনোর আগেই তার সঙ্গে কথা বলতে পারব। আপনার কি মনে হয়, আঁধারে তার ক্যাম্প খুঁজে পাবেন?'

'কোনও সমস্যা হবে না। সোয়াকোপমুণ্ড থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে স্যাণ্ডউইচ বে।'

জিপিএস চেক করে দেখল রানা। হিসাব কষে বের করল নতুন কোঅর্ডিনেটস কী হবে। কাজ শেষে সংখ্যাগুলো তুলে দিল অটোমেটিক ন্যাভিগেটরে। হুইলটাকে পোর্টে কয়েক ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিল সার্ভো।

চল্লিশ মিনিট পেরুনোর পর আঁধারে দেখা দিল আফ্রিকার উপকূল— চাঁদের উজ্জ্বল কিন্তু রহস্যময় আলোয় চকচক করছে বালির ঢিবি। কোথাও কোথাও ঝলমলে সাদা, ঢেউ গিয়ে আছড়ে পড়ছে সৈকতের উপর। স্যাণ্ডউইচ বে-কে আড়াল দিয়েছে যে পেনিনসুলা, সেটা সিকি মাইল দূরে, দক্ষিণে।

'ভাল ন্যাভিগেটিং,' মন্তব্য করল কার্টা।

জিপিএস রিসিভারের উপর টোকা দিল রানা। 'কৃতিত্ব এর। আমাদের মত ন্যাভিগেটরদের অলস করে দিয়েছে জিপিএস। এখন বোধহয় আর সেক্সট্যান্ট দিয়ে নিজের পজিশন কমপিউট করতে পারব না। পথ হারিয়ে মরেও যেতে পারি।'

'বিশ্বাস করলাম না।'

সামনে পড়বে ভঙ্গুর ইকো-সিস্টেম, থ্রটল নেড়ে গতি কমিয়ে আনছে রানা। বড় ঢেউ তৈরি করতে চাইছে না। প্রায় বিশ মিনিট পর ওরা পৌঁছে গেল বে-র দক্ষিণ প্রান্তে। ঘন নলখাগড়ার দেয়ালে আলো ফেলল কার্টা, খুঁজতে শুরু করল বিশেষ ঘাসের পর্দা। ওদিক দিয়েই দাদু এবেলের ছোট্ট লেগুনে ঢুকেছিল ওরা।

মিনিট পাঁচেক পর হঠাৎ বলে উঠল, 'ওই যে!'

শামুকের গতি তুলে সামনে বাড়ছে লাইফবোট, আস্তে করে ঢুকে পড়ল নলখাগড়ার প্রাচীরের ভিতর। ডেপথ গজের উপর চোখ রেখেছে রানা, বারবার দেখছে ভাসমান কোনও আর্বজনা যেন আটকে না দেয় প্রপেলার। নলখাগড়া থেকেই শুরু হয়েছে দীর্ঘ ঘাসের বন। উপরের অংশ বাতাসে শিসের মত আওয়াজ তুলছে। আদর করে বোটের দু' পাশের গা চুলকে দিচ্ছে ঘাস।

সত্তর গজ যাওয়ার পর হঠাৎ ধোঁয়ার গন্ধ পেল রানা। মুখ তুলে সামনে চাইল। কাঠ পুড়বার ঘ্রাণটা আর নেই। কয়েক সেকেণ্ড পর আগের চেয়ে অনেক জোরালো ভাবে এল। খপ্ করে মেয়েটার কবজি ধরল রানা, আড়াল করল ফ্ল্যাশলাইটের লেন্স।

সরাসরি সামনে উজ্জ্বল কমলা আগুন। কিন্তু ওটা কার্টা অস্টিনের বলে দেয়া কোনও গর্তের জিনিস নয়। দাউদাউ করে জ্বলছে লেলিহান শিখা।

একটানে থ্রটল খুলল রানা, সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল লাইফবোট। মনে মনে প্রার্থনা করছে রানা, যেন সামনে পানির গভীরতা থাকে। তাল হারিয়ে ওর বুকে এসে পড়েছে মেয়েটি। চট্ করে ওকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল রানা, ঘাসের বনের ভিতর দিয়ে দেখতে চাইছে।

দু'পাশের ঘাসের বন চিরে ছিটকে বেরুল বোট, সামনেই পড়ল দাদু এবেলের খুদে দ্বীপ। একবার ডেপথ গজ দেখে নিল রানা। কিলের নীচে মাত্র এক ফুট পানি! হ্যাঁচকা টান দিয়ে থ্রটল বন্ধ করল ও, পুরো রিভার্সে চলতে শুরু করেছে ইঞ্জিন। স্টার্নের নীচ থেকে বলকে উঠছে ফেনায়িত পানি। নোঙর নামিয়ে দিল রানা। গতি বেশি নয়, ঘ্যাঁচ করে তীরে আটকে যাওয়ার আগেই থেমে গেল বোট।

ইঞ্জিনদুটো নিউট্রাল করল রানা, মুখ তুলে চারপাশ দেখল। ছোট্ট দ্বীপের মাঝে জ্বলন্ত চিতা হয়ে উঠেছে কুঁড়েঘর। ওটার ছাত থেকে বিশ ফুট উপরে লাফ দিয়ে উঠছে কমলা শিখা ও তপ্ত ছাই। এক পাশে পড়ে আছে দাদু এবেলের জেলে-নৌকা, জ্বলছে। ভেজা জায়গাগুলো থেকে ঘন সাদা ধোঁয়া উঠছে।

জ্বলন্ত কুঁড়ের ভিতর থেকে এল করুণ আর্তচিৎকার। চমকে গেল রানা। আগুনে পুড়ে মরছে কেউ!

'হায় ঈশ্বর!' বিড়বিড় করল কার্টা।

দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখাল রানা, লাফ দিয়ে উঠে গেল বোটের ছাতে, দৌড়াতে শুরু করেছে। কেবিনের ছাত থেকে আরও পাঁচ ফুট দূরে বোটের বো, দৌড়ের বেগ বাড়ল রানার, পাখির মত উড়াল দিল— ওর ডান পা গিয়ে পড়ল অ্যালিউমিনিয়াম রেলিঙের

উপর, পরক্ষণে লম্বা ডাইভ দিল। ছুরির মত পানির ভিতর গেঁথে গেল, পাঁচ সেকেণ্ড পর ভেসে উঠল, তার আগেই সাঁতরাতে শুরু করেছে।

তীরে পা ঠেকে যেতেই দৌড়ে উঠে এল সৈকতে, তখনই প্রথম শুনল আওয়াজটা। বড় কোনও বোট। গম্ভীর আওয়াজ ছাড়ছে।

দ্বীপের আরেক দিকে দেখা দিল দীর্ঘ সাদা বো। খোলা ককপিটে দু'জন লোক, ডান দিকের জন অটোমেটিক অস্ত্র দিয়ে গুলি শুরু করেছে। রানার চারপাশে ছিটকে উঠছে বালি। অন্ধের মত ডাইভ দিল রানা, মাটি স্পর্শ করবার আগেই কোমরের কাছে চলে গেছে হাত। দু'বার গড়ান দিয়েই উঠে বসল, দুই হাতে ধরেছে গ্লক পিস্তল। কোমরে উইণ্ডব্রেকার বাঁধবার আগে ওটা ওখানেই রেখেছিল। ওর থেকে তিরিশ গজ দূরে সাদা বোট, আরও সরছে। রানাকে আঁধারে গুলি করতে হবে, কিন্তু ওর পিছনে লেলিহান আগুন। ওকে সহজেই ফুটো করবে লোকটা।

একটা গুলিও করেনি রানা, তার আগেই এক পশলা গুলি এসে লাগল সৈকতে। বাধ্য হয়ে গড়িয়ে লেগুনে নেমে গেল রানা। আগেই বড় করে দম নিয়েছে, ওর নাকের কাছে কাদায় বিঁধল বুলেট। চমকে গেছে, ভুল করে ছেড়ে দিল দম, শ্বাস নিতেই নাক-মুখে ঢুকল কিচকিচে বালি।

পানির নীচে ডুব দিল রানা, কাশতে শুরু করেছে বেদম। নিজেকে বলল, এখানে থাকলে মরবি, ভাগ! তারই ফাঁকে সরতে শুরু করেছে। তিরিশ ফুট সরে এল, খেয়াল রেখেছে তীরের মাটি যেন হাতের নীচেই থাকে, পিঠ ভাসলে চলবে না। পানির ভিতর কম্পন টের পেল, ঘুরে আসছে পাওয়ার বোট। মজা পেয়ে গেছে লোকটা, নিশ্চিন্তে শিকার করবার আনন্দই আলাদা! বোট কোথায় থাকতে পারে আঁচ করে নিয়েছে রানা, পানির নীচ দিয়ে হেঁটে

এগুতে শুরু করেছে। দমের অভাবে ফেটে যেতে চাইছে বুক। কয়েক সেকেণ্ড পর পা দুটো সোজা করল, আস্তে করে চোখ তুলল পানির উপর। আরও বিশ সেকেণ্ড শ্বাস না নিয়ে থাকতে পারবে।

সাদা বোট দশ গজ দূরে, লোকদুটো ভুল দিকে চেয়ে ওকে খুঁজছে। রানার কপাল বেয়ে দরদর করে ঝরছে পানি, ফেটে যেতে চাইছে ফুসফুস। নিঃশব্দে গ্লক তুলল ও, তাক ঠিক করেই টিপে দিল ট্রিগার। গুলি বেরুতেই নাক উঁচু করে শ্বাস নিল, নতুন করে ওকে পেয়ে বসল বিচ্ছিরি কাশি। ওর জানা নেই লোকটার গায়ে গুলি লেগেছে কি না, না লেগে থাকলেও খুব কাছ দিয়েই গেছে। কারণ দেখা গেল গর্জে উঠল ইঞ্জিন, খোলা বে-র দিকে রওনা হয়ে গেল বোট, পিছনে ছিটাচ্ছে মোরগের লেজের মত পানি।

কাশতে কাশতে উবু হয়ে গেল রানা, দুই হাঁটুর উপর রেখেছে দুই হাত। বিশ সেকেণ্ড পর সামলে নিয়ে চাইল লাইফবোটের দিকে। 'কার্টা,' ব্যাঙের ডাকের মত শোনাল ওর কণ্ঠ, 'তুমি ঠিক আছ তো?'

ককপিটের আড়াল থেকে বেরুল মেয়েটি। গভীর নীল চোখে পড়ছে আগুনের আভা, জ্বলজ্বল করছে মণি। কাঁচা সোনার মত লাগছে মুখের ত্বক। 'হ্যাঁ।' কয়েক সেকেণ্ড বিরতি নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক আছি। তুমি?'

'ঠিক আছি।' কুঁড়ের দিকে ঘুরে চাইল রানা। এখন আর আর্তনাদ করছে না দাদু এবেল। সৈকতে উঠে কুঁড়েঘরের সামনে চলে এল রানা। যে-কোনও সময়ে ধসে পড়বে ছাত। তাপ এত বেশি যে আর এগুনো কঠিন। ধোঁয়ার কারণে জ্বলতে শুরু করেছে চোখ। ওকে আবারও ধরল বেদম কাশি। মনে হলো ফুসফুসের ভিতর ধোঁয়ার সঙ্গে ঢুকেছে ভাঙা কাঁচ।

কুঁড়ের দরজা হিসাবে যে কাঁথা ঝুলছিল, সেটা একটা লগি

দিয়ে সরিয়ে দিল রানা। ঘন ধোঁয়ায় দেখা গেল না ভিতর দিক। ঘরে ঢুকবে ঠিক করেছে, কিন্তু তার আগেই ধড়াস্ করে নেমে এল ছাত। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল তপ্ত হাওয়া ও জ্বলন্ত কয়লা। তার আগে এক পলক করুণ একটা দৃশ্য দেখেছে রানা, কখনও ওটা ভুলবে না। ঝলসে কুঁকড়ে গেছে মানুষটার দেহ।

বিছানার সঙ্গে তখনও বাঁধা ছিল বুড়োর দুই হাত। ঘরে আগুন দেয়ার আগে তাকে অত্যাচার করা হয়েছে। শেষ আর্তি জানাতে হাঁ হয়ে ছিল ফোকলা মুখ। বিছানার উপর চিরচির করে পুড়ছিল লাল রক্ত। ঘুরে দাঁড়াল রানা, থমথম করছে ওর মুখ। বিড়বিড় করে বলল, 'তোমার হয়ে প্রতিশোধ নেব আমি, দাদু।'

দৌড়ে সৈকতে ফিরল রানা, ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে, দ্রুত চলেছে লাইফবোটের দিকে। অনেকটা উঁচু হয়ে ভাসছে নৌযান, কাজেই বো-র কাছে চলে গেল, নোঙরের শিকল ধরে উঠে পড়ল ডেকে। ওকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল কার্টা। রানাকে পিস্তলটা কোমরে গুঁজতে দেখেও কিছুই বলল না।

'চলো যাওয়া যাক,' মেয়েটির হাত ধরল রানা, দ্রুত রওনা হয়ে গেল স্টার্নের দিকে। ককপিটে উঠেই ড্যাশবোর্ডে একটা সুইচ টিপল রানা, সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল নোঙর। যন্ত্রের মত চলছে ওর হাত, থ্রটল ঠেলে দিয়েই বনবন করে ঘুরিয়ে নিল হুইল।

'কী করছ, রানা?' ইঞ্জিনের উপর দিয়ে জানতে চাইল কার্টা। 'ওটা স্কি বোট। আমাদের চেয়ে কমপক্ষে পাঁচ মিনিট এগিয়ে, গতিবেগ আমাদের দ্বিগুণ।'

'দেখি ওরা কী করে,' মেয়েটার দিকে চাইল না রানা। দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেছে চোয়াল। কোর্স ঠিক করে নিল, সরু খাল ধরে বিদ্যুদ্বেগে রওনা হয়ে গেল বোটের প্রাউ।

'আমরা ওদের ধরতে পারব না, রানা। তা ছাড়া, ওদের কাছে মেশিনগান আছে। তোমার কাছে মাত্র একটা পিস্তল।'

দু' পাশের নলখাগড়া চাবুকের মত এসে লাগছে বোটের দু'পাশে। রকেটের মত চলেছে লাইফবোট। ডেপথ গজের উপর একটা চোখ রেখেছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর ঘাসের বন থেকে ছিটকে বেরুল বোট।

এক পলক কার্টাকে দেখল রানা, তারপর ড্যাশবোর্ডের নীচে একটা সুইচ টিপে দিল। 'শক্ত করে কিছু ধরো!'

পানি থেকে উঠতে শুরু করেছে লাইফবোটের সামনের খোল। বোটের নীচে হাইড্রলিক্স অ্যাকটিভেট করেছে বেশ কয়েকটা ফিন ও উইংকে। দু' সেকেণ্ড দেরি করল কার্টা, ফলে টলে পড়ে গেল রানার বুকে। সোজা করে ওকে দাঁড় করিয়ে দিল রানা। হাইড্রোফয়েল থেকে দ্রুত সাড়া মিলছে। পানি থেকে উঠে এল খোল, এখন ডানার উপর ভর করে ছুটে চলেছে বোট। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে দ্বিগুণ হয়েছে গতি। চল্লিশ নট বেগ তুলে ছুটছে বোট।

অবাক চোখে রানার দিকে চাইল কার্টা। কী বলবে ভেবে পেল না। চোখের সামনে দেখেছে লাইফবোট হয়ে গেছে হাই পারফর্মিং হাইড্রোফয়েল। একটু সামলে নিয়ে বলল, 'তুমি আসলে কে, রানা?'

ওর দিকে চাইল রানা। সংক্ষেপে সবই বলত, যদি না দেখত বুড়ো মানুষটার করুণ পরিণতি। রাগে পুড়ছে ওর অন্তর। আগুন জ্বলছে ওর কুচকুচে কালো দুই মণিতে। 'আমি এমন একজন, যাকে এক কথায় উড়িয়ে দেয়া যায় না। ওরা ভেবেছে যা খুশি করবে।' সামনের পানির দিকে আঙুল তাক করল রানা। 'দেখছ একটু জ্বলজ্বল করছে সামনের সাগর?' মাথা দোলাল কার্টা। 'ওদের বোটের কারণে অমন হয়েছে। পানির বায়োলিউমিনেসেন্ট অর্গানিজম তৈরি করেছে ওই ফ্লুরেসেন্স। দিনের আলোয় দেখতাম না, কিন্তু এখন রাতের আঁধারে পরিষ্কার দেখব। তুমি হেলম

ধরতে পারবে? শুধু পিছু নেবে।'

'আগে কখনও এ ধরনের বোট চালাইনি।'

'অনেকেই চালায়নি। তোমার বাবার চার্টার বোটের মতই, তবে গতি বেশি। সোজা করে রাখবে হুইল, যদি বাঁক নিতে হয়, ধীরে ধীরে ঘুরবে। আমি এক মিনিট পরেই আসছি।'

কার্টা হুইল নেয়ার পর কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা, নিশ্চিত হলো বিপদে পড়বে না মেয়েটা। এবার কেবিনে ঢুকে পড়ল, মাঝের আইল ধরে চলেছে। সামনেই আছে ওর লেদার ডাফল ব্যাগ। কাপড়ের নীচ থেকে বের করে নিল মিনি উজি ও ম্যাগাযিনগুলো। রিলোড করে কোমরে রেখে দিল গ্লক পিস্তল। পিছন পকেটে চলে গেল বাড়তি ম্যাগাযিনগুলো। একটা বেঞ্চের নীচে রয়েছে বিশেষ সুইচ, ওটার কারণে চিত হয়ে যায় সিট। এসব সিটের নীচে থাকে খাবার ও অন্যান্য প্রভিশন। তবে এই সিট আলাদা। উপর থেকে টয়লেট পেপারের কয়েল সরাতে শুরু করল রানা, নীচে দেখল গোপন একটা লিভার। ফলস বটম সরে যেতেই ঢাকনি খুলল।

ভিতর অংশ থেকে এল ইঞ্জিনের গর্জন। বিলজ স্পেস এটা। হিসহিস আওয়াজ তুলে পানি কেটে ছুটে চলেছে ফয়েলগুলো। বিলজ থেকে ধাতব ক্লিপওয়ালা একটা টিউব তুলে নিল। জিনিসটা কঠিন প্লাস্টিকের, মুখে ওয়াটারপ্রুফ ক্যাপ। টিউব প্রায় চার ফুট দৈর্ঘ্যের। ব্যাস হবে দশ ইঞ্চির মত। এক মাথার ক্যাপ খুলে ফেলল রানা, ওটার ভিতর থেকে বের করে নিল এফএন-এফএএল অ্যাসল্ট রাইফেল, পাশের সিটের উপর রাখল। ভয়ঙ্কর নিখুঁত বেলজিয়ান অস্ত্রটার দাদা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালের, তবে এখনও এই জিনিস পৃথিবীর সেরা।

টিউবের ভিতর থেকে ৭.৬২ এমএম অ্যামিউনিশন বের করল রানা, গুলি ভরে নিল দুই ম্যাগাযিনে। একটা গুলি পাঠিয়ে দিল

চেম্বারে, আরেকবার দেখে নিল অস্ত্রটা নিরাপদ কি না। ওর বন্ধু গগল জানতে চেয়েছিল লাইফবোটে এ জিনিস রেখে কী হবে। জবাবে রানা বলেছে, 'কাউকে মাছ ধরতে শেখাও, সে নিজে খেয়ে বাঁচবে; কিন্তু তাকে দাও একটা অ্যাসল্ট রাইফেল, পানিতে হাঙর থাকলে ওগুলো মেরে নিজের ক্রুদের বাকি জীবন খাওয়াতে পারবে।'

রাইফেল হাতে পিছনের ডেকে ফিরে এল রানা। সামান্য জ্বলজ্বলে এলাকার ঠিক মাঝ দিয়ে বোট নিয়ে চলেছে কার্টা। স্কি বোট এখন অনেক কাছে চলে এসেছে, বুঝতে পারছে রানা। পানির সঙ্গে মিশে যাবার সময় কম পেয়েছে মাইক্রো-অর্গানিজমগুলো, তাই আগের চেয়ে বেশি জ্বলজ্বল করছে।

ড্যাশবোর্ডের উপর এফএন রাইফেল বসিয়ে নিল রানা, কেবিনের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দিল থার্মোস। তার জায়গা নিল মিনি উজি।

'তুমি কি সবসময় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য তৈরি থাকো?' ঠাট্টা করতে চাইল কার্টা।

লড়াইয়ে যাওয়ার সময় হাসি-ঠাট্টা মনকে হালকা করে, তাতে ভুল হওয়ার সম্ভবনাও কমে যায়। মৃদু হাসল রানা, হুইল থেকে কার্টা সরে যেতেই সেখানে এসে দাঁড়াল।

কয়েক সেকেণ্ড পর দূরে দেখা গেল স্পিডবোট, উপসাগর চিরে ছুটে চলেছে। রানা ও কার্টা যেমন দেখেছে, ঠিক তেমনি ওদেরকেও দেখতে পেয়েছে লোকদুটো। হঠাৎ বাঁক নিল স্পিডবোট, জলাভূমি পাশে রেখে ছুটছে।

দুই পাক হুইল ঘোরাল রানা, চলে যেতে চাইছে স্পিডবোটের ঠিক পিছনে। কাত হয়ে গেল হাইড্রোফয়েল বোট। দুই পায়ে ভারসাম্য বজায় রাখল রানা। তীরের মত বাঁক নিয়েছে বোট। মাত্র কয়েক মিনিট পর তিরিশ গজ দূরে থাকল স্পিডবোট। ওটার

ড্রাইভার সোজা পথে চলেছে। দ্বিতীয় লোকটা রিয়ার বেঞ্চের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে, রাইফেল রেস্টে রেখে গুলি শুরু করেছে।

'কার্টা, বসে পড়ো,' সতর্ক করল রানা।

বো-র রেলিঙে লেগে 'বিইইইং' শব্দে ছিটকে এল বুলেট, ককপিটের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। হাইড্রোফয়েল ডানা অনেক উঁচু করে দিয়েছে বোটকে, সরাসরি রানা বা কার্টার গায়ে লাগাতে পারবে না লোকটা। রাইফেল অন্য দিকে সরাল সে, তার লক্ষ্য এখন ফয়েলের সাপোর্টিং স্ট্রাট। পর পর কয়েকটা গুলি লাগল স্ট্রাটে। কিন্তু জিনিসটা হাই-টেনসিল স্টিল দিয়ে তৈরি। কোনও ক্ষতি না করেই নানা দিকে ছিটকে গেল বুলেট।

কাপ হোল্ডারে মিনি উজি বসিয়ে নিয়েছে রানা, সরাসরি পথ থেকে একটু সরিয়ে নিল হাইড্রোফয়েল, সরাসরি এবার স্পিডবোটের উপর গুলি চালাতে পারবে। আলতো করে ট্রিগার টিপল, ওর দুই হাতে লাফিয়ে উঠল ছোট্ট অস্ত্রটা। এক পাশে চকচকে বাঁকা স্রোত তৈরি হলো, হাইড্রোফয়েলের পিছনের পানিতে গিয়ে পড়ছে ব্রাসের খোসাগুলো। লোকদুটোকে মেরে ফেলতে চায় না রানা, স্কি বোটের এক পাশের খোল লক্ষ্য করে গুলি করল। স্পিডবোটের পোর্ট সাইডে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল পানি। প্রায় একই জায়গায় বিঁধল বিশটি বুলেট।

রানা ভেবেছিল হাল ছেড়ে দেবে লোকদুটো, পিছনের বোট তাদের চেয়ে অনেক বড় এবং দ্রুতগামী, তার উপর ওখান থেকে আসছে সাবমেশিনগানের গুলি— কিন্তু দেখা গেল পূর্ণ গতি তুলে ছুটছে স্কি বোট। বাঁক নিয়ে জলাভূমি ঘেঁষে চলেছে।

বাধ্য হয়ে পিছু নিল রানা।

দেয়ালের মত নলখাগড়া ও সরু গাছগুলোকে তীরের মত পাশ কাটাল স্পিডবোট। কয়েক মিনিট পর রানার মনে হলো,

সাগরে জন্মানো ঘাসের ভিতর খরগোশের মত ছুটছে ওরা। সামনে ছোট ছোট দ্বীপ। হাইড্রোফয়েলের চেয়ে অনেক কম গতি স্কি বোটের, কিন্তু এঁকেবেঁকে সুবিধা আদায় করছে। নানা বাধার কারণে কমে আসছে হাইড্রোফয়েলের গতি, কয়েক মিনিট পর আবারও বেড়ে গেল দুই বোটের মাঝের দূরত্ব। মাঝে থাকল পঞ্চাশ গজ সাগর।

রানা চাইলে আবারও খোলা সাগরে বেরুতে পারবে, সেক্ষেত্রে কমিয়ে আনা সম্ভব দূরত্ব, কিন্তু সাহস হলো না। একবার যদি স্পিডবোট চোখের আড়াল হয়, হারিয়ে যেতে পারে সাগরের দীর্ঘ ঘাসের বনে। অগভীর পানিতে পূর্ণ সুবিধা পাবে স্পিডবোট। নতুন করে খুঁজতে গেলে যে-কোনও সময়ে ওরা পড়বে অ্যাম্বুশে। এখন একমাত্র কাজ হওয়া উচিত পিছু লেগে থাকা।

নানা গাছের দঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে ওরা, ইঞ্জিনের আওয়াজে জেগে উঠছে অসংখ্য পাখি, ডানা ঝাপ্টে আকাশে উঠছে। জলাভূমির ভিতর জোর বাতাসে শ-শ আওয়াজ তুলে দুলে চলেছে ঘাসের ডগা। কান পাতলে মনে হয় গোটা উপসাগর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

পানির নীচে আকস্মিক বাধা থাকলে যে-কোনও সময়ে ভেঙে পড়বে ফয়েল। বাধ্য হয়ে মৃদু বাঁক নিল রানা। সাপের মত ছুটে চলেছে স্পিডবোট, ক্রমেই পিছনে ফেলছে হাইড্রোফয়েলকে। সামনে কী যেন দেখল রানা, পর সেকেণ্ডে বুঝল ওটা প্রায় নিমজ্জিত একটা গাছের গুঁড়ি। ওটার সঙ্গে ধাক্কা লাগলে বোট থেকে খসে পড়বে উইং। দ্রুত হাতে থ্রটল বন্ধ করল রানা, বনবন করে ঘোরাতে শুরু করেছে হুইল। খুব সাবধানে পাশ কাটাল গাছের গুঁড়ি, সামনে পাশাপাশি নিচু দুটো কাদা ভরা দ্বীপ। মাঝ দিয়ে এগুতে হবে।

ডেপথ গজ দেখল রানা, বোটের ডানার মাত্র ছয় ইঞ্চি নীচে জমাট মাটি। গতি কমাতে চাইল, মনে মনে বলে চলেছে, যদি মাত্র পাঁচ ইঞ্চি উপরে থাকত বোট! যে গতি তুলে চলেছে, তাতে হঠাৎ করে বোট থেমে গেলে ডেক থেকে ছিটকে গিয়ে পানিতে পড়বে ওরা। আছড়ে পড়বার সময় মনে হবে পাঁচ তলা থেকে সিমেন্টের চাতালের উপর পড়েছে। ফলাফল: নিশ্চিত মৃত্যু!

ক্রমেই ওদের দিকে ছুটে আসছে দুই দ্বীপের মাঝের সরু ফাঁক। একবার চট্ করে পিছন দিক দেখে নিল রানা। সাধারণত ফয়েল ও প্রপেলারের ঢেউ হয় সাদা রঙের, কিন্তু পিছনে শুধু গাঢ় বাদামী চকলেটের মত পানি। সামান্য দুলে উঠল বোট, মাটিতে ঘষা খেয়েছে একটা উইং। এখন আর থামতে পারবে না রানা, তা হলেই ধপ্ করে নেমে আসবে হাইড্রোফয়েল। সেক্ষেত্রে কাদার ভিতর নাক গুঁজবে বোট। তা ছাড়া, স্পিডোমিটারে দেখা গেল লাল দাগের চেয়ে অনেক উপরে কাঁটা।

কাছ থেকে দেখে মনে হলো দুই দ্বীপের মাঝের চ্যানেল আরও অনেক সরু।

'কিছু একটা শক্ত করে ধরো!' ইঞ্জিনের আওয়াজের উপর দিয়ে গলা চড়িয়ে বলল রানা। বুঝে ফেলেছে, ও জুয়া খেলেছে, এবং হেরেও গেছে!

চ্যানেলের সবচেয়ে সরু জায়গার ভিতর দিয়ে চলেছে লাইফবোট, সামান্যতম কমানো হয়নি গতি। ফরোয়ার্ড উইং স্পর্শ করল মাটি, পরক্ষণে চওড়া হলো চ্যানেল, আবারও গভীরতা বাড়তে লাগল।

সশব্দে দম টানল রানা।

'যা ভেবেছি ততই সরু ছিল?' জানতে চাইল কার্টা।

'তার চেয়েও বেশি।'

বাধ্য হয়ে এক ঝাড় ম্যানগ্রোভ এড়িয়ে গেছে স্পিডবোট, সে

কারণে সরাসরি দ্বীপ পেরিয়ে দূরত্ব কমিয়ে এনেছে হাইড্রোফয়েল। স্কি বোটের স্টার্নে সোজা হয়ে দাঁড়াল গানম্যান। গতি আরও বাড়াল রানা, জলাভূমির ভিতর দিয়ে সরাসরি স্পিডবোটের পিছনে চলে এল। হাইড্রোফয়েল আড়াল দিল রানা ও কার্টাকে। আর ঠিক তখন ক্ষিপ্র স্পিডবোট থেকে এল গুলি। সাগরে পড়ল বেশির ভাগ বুলেট। কিন্তু দুটো লাগল লাইফবোটের সেফটি গ্লাসে। ফাটল না কাঁচ, তবে চিড় ধরল।

সরাসরি সামনে জলাভূমির খোলা এক অংশ। সুযোগটা নিল রানা, বাড়িয়ে দিল ইঞ্জিনের গতি। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে স্কি বোটের ঘাড়ের কাছে গিয়ে হাজির হলো হাইড্রোফয়েল। সামনের ঢেউ ও স্রোত দোলাতে শুরু করেছে রানাদের বোটকে। ওয়াটার উইঙের নীচে ঢুকেছে বাতাস, ফলে লাফ দিয়ে দিয়ে উপর-নীচ করছে হাইড্রোফয়েল। এমনই হবে, আন্দাজ করেছে রানা। ওদের বো-র নীচ থেকে সরে যেতে চাইছে স্পিডবোটের স্টার্ন। আবারও বাঁক নিতে চাইল ড্রাইভার। তাকে অনুসরণ করছে রানা, ওর হাইড্রোফয়েলের বো চেপে বসতে চাইল স্পিডবোটের উপর। এতে ধাক্কা লাগল, কিন্তু তেমন কমল না সামনের বোটের গতি। একটু পিছিয়ে এল রানা, আবার উঁচু হয়ে উঠল হাইড্রোফয়েল।

চট্ করে আরপিএম দেখে নিল রানা, ঠিক তখনই চিৎকার করে উঠল কার্টা।

মুখ তুলল রানা। স্কি বোটের স্টার্নে হাইড্রোফয়েলের বো গুঁতো দেয়ার সময় সশস্ত্র লোকটা লাফ দিয়ে ধরেছে রেলিং, এক হাতে ধরেছে রেলিং, অন্য হাতে একে-৪৭। ওটার মাযল তাক করেছে ঠিক রানার দুই চোখের মাঝে।

রানার হাতে সময় নেই যে অস্ত্র বের করবে, কাজেই একমাত্র কাজটি করল।

ধপ্ করে থ্রটলে উপর নামল ওর হাত, একে-৪৭ গর্জে

উঠবার আগেই হোঁচট খেল হাইড্রোফয়েল। ড্যাশবোর্ডের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল কার্টা ও রানা। চল্লিশ নট গতি তুলে চলছিল ওরা, পরক্ষণে দেখা গেল প্রায় থেমে গেছে। এক পশলা গুলি গিয়ে লাগল কেবিনের উপর অংশে। থমকে গেছে হাইড্রোফয়েল, শক্ত করেই রেলিং ধরেছে লোকটা, কিন্তু তার বুক এসে আছড়ে পড়ল অ্যালিমিউনিয়াম স্ট্রাটের উপর। বিপুল পানি ছিটকে উঠল বো-র সামনে। স্টার্নে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল কার্টা ও রানা। হঠাৎ গতি থেমে যেতেই লোকটা চলে গেছে খোলের নীচে। প্রায় একই সময়ে থ্রটল খুলে দিল রানা, এক সেকেণ্ড পর দেখা গেল বোটের পিছনে লালচে ফেনা। ঘুরন্ত প্রপেলার পেঁয়াজকুচি করে দিয়েছে লোকটাকে।

'ঠিক আছ?' জানতে চাইল রানা।

ড্যাশবোর্ডের উপর পড়ে ব্যথা পেয়েছে কার্টা, এখন বুক ম্যাসেজ করছে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল, তারপর কপাল থেকে ভেজা চুল সরিয়ে বলল, 'মনে হয় ঠিকই আছি।' রানার বাহু দেখাল। 'তোমার হাত তো দেখছি কেটে গেছে।'

নতুন করে স্কি বোটের পিছু নিয়েছে রানা। সামনের দিক দেখে নিল, তারপর ক্ষতের দিকে চাইল। একটা বুলেট এসে ভেঙে দিয়েছে ফাইবার গ্লাস, এক টুকরো গেঁথে আছে বাহুর মাংসে।

আস্তে করে ফাইবার গ্লাসের টুকরো সরিয়ে নিল রানা। ভুরু কুঁচকে গেল ব্যথায়। ক্ষত গভীর নয়, কিন্তু দরদর করে পড়ছে রক্ত। ড্যাশবোর্ডের পাশের বিন থেকে মেডিক্যাল কিট বের করল রানা, ওটা বাড়িয়ে দিল মেয়েটির দিকে। বাক্স হাতড়ে এক রোল স্টেরাইল গজ পেল কার্টা। রানা হাত উঁচু করতেই ওর বাহু পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধল ব্যাণ্ডেজ। বলল, 'এবার আর রক্ত পড়বে না। শেষবার কবে টিটেনাস নিয়েছ?'

'ফেব্রুয়ারির তেরো তারিখে, দুই বছর আগে।'

'মনে রাখলে কী করে?'

'আমার পিঠে তেরো ইঞ্চি লম্বা একটা ক্ষত হয়েছিল। সারতে বেশ কয়েক দিন লাগে।'

পরবর্তী দুই মিনিটে স্কি বোটের অনেক কাছে চলে গেল ওরা। জলাভূমির ডান দিকে নলখাগড়া বা গাছ কমে গেছে, শুরু হয়েছে বোল্ডার ভরা সৈকত। ওদিকে কোথাও লুকাতে পারবে না স্পিডবোট। রানা টের পেল, এবার শেষ করতে হবে খেলা। 'আরেকবার হেলম ধরতে পারবে, কার্টা?'

'হ্যাঁ, পারব।'

'আমার ইঙ্গিতের জন্য অপেক্ষা করবে, তারপর গতি কমিয়ে আনবে। বাঁক নেয়ার জন্য তৈরি থেকো। আমি জানিয়ে দেব কোন্ দিকে যেতে হবে।'

কার্টা কীভাবে হেলম ধরছে দেখতে গেল না রানা, তুলে নিল এফএন অ্যাসল্ট রাইফেল ও স্পেয়ার ম্যাগাযিন। বো-র দিকে এগুতে শুরু করেছে।

হাইড্রোফয়েলের বো থেকে মাত্র পাঁচ গজ সামনে রয়েছে স্কি বোট। লাইফবোটের বো-র রেলিঙে এসে থামল রানা, কাঁধে তুলে নিল এফএন রাইফেল। তিন রাউণ্ডের এক পশলা গুলি ছুঁড়ল। প্রতিটি বুলেট বিঁধল ইঞ্জিন কাউলিঙে। বাক নিতে শুরু করেছে ড্রাইভার, সরে যেতে চাইছে অগভীর পানির দিকে। বামহাত তুলল রানা, ইশারা করে বুঝিয়ে দিল পোর্টে ঘুরতে হবে কার্টাকে। একটু বেশি দ্রুত হাইড্রোফয়েলকে বামে সরাল মেয়েটি, কিন্তু মনে হলো এই বোটের আচরণ বুঝতে শুরু করেছে।

আরেকবার সামনে দেখে নিল রানা, পরক্ষণে তিন রাউণ্ড গুলি ছুঁড়ল স্পিডবোটের ইঞ্জিনের উপর। খটর-মটর আওয়াজ তুলল ইঞ্জিন। বিরতি না দিয়েই আরও তিন রাউণ্ড বুলেট গেঁথে দিল

ওখানে। শত্রুকে পিছন থেকে সরাতে চাইছে ড্রাইভার, এঁকেবেঁকে ছুটতে চাইছে, কিন্তু পিছনের লোকটা কাঁঠালের আঠা।

রানার আধ ডজন গুলি সরাসরি লাগল বোটের স্টার্নে। হঠাৎ করে স্কি বোটের ইঞ্জিন কাউলিঙের ভিতর থেকে ভুস্ করে বেরুল সাদা বাষ্প। কয়েক সেকেণ্ড পর সাদা ধোঁয়ার বদলে শুরু হলো কালো মেঘ। যে-কোনও সময়ে সিয করবে ইঞ্জিন। কার্টাকে ইশারা দেয়ার জন্য তৈরি হলো রানা, এবার কমিয়ে আনতে হবে গতি, নইলে লাইফবোট চেপে বসবে স্পিডবোটের ঘাড়ে।

হাইড্রোফয়েলের বো লাইট ও স্কি বোটের ড্যাশ লাইটে লোকটাকে দেখতে পেল রানা। ঘুরে চেয়েছে সে। দু' সেকেণ্ডের জন্য দু'জনের চোখ আটকে গেল পরস্পরের চোখে। হিমশীতল ঘৃণা যেন দূর থেকে আঘাত হানল রানার উপর। লোকটার চোখে কোনও ভয় নেই, যেন বুঝে নিয়েছে, কখনও হারবে না সে।

ঘুরেই বন-বন করে হুইল ঘোরাল লোকটা। বাঁক নিল স্পিডবোট। চমকে গেছে রানা, থামতে ইশারা দিল কার্টাকে। সোজা পাথুরে সৈকত লক্ষ্য করে চলেছে লোকটা! প্রথম থেকেই রানা চেয়েছে বোটের যে-কোনও একজনকে বন্দি করবে, কিন্তু এখন টের পেল, ওই লোক জান থাকতে ধরা দেবে না। স্পিডবোটের স্টার্নে এক পশলা বুলেট ছুঁড়ল রানা, বুঝতে পারছে ধোঁয়ার ভিতর বোট লক্ষ্য করে গুলি করে কোনও লাভ হবে না। আর কিছুই করবার নেই, আত্মহত্যা করতে চলেছে লোকটা!

বাঁক নেয়ার সময় গতি কমেছে স্পিডবোটের, কিন্তু এত কমেনি যে হঠাৎ থামবে। তীর থেকে পনেরো ফুট দূরে থাকতেই ইঞ্জিনের ভিতর থেকে বেরুল বিশ্রী আওয়াজ, পারের মাটিতে আটকে গেল বোটের তলি। তখনও গতি রইল ত্রিশ নটের বেশি। পানি থেকে বর্শার মত ছিটকে উঠল বোট, আকাশে উঠে নামল গিয়ে দুটো বোল্ডারের উপর। বোমার মত আওয়াজ তুলে ফেটে

গেল ফাইবার গ্লাসের খোল। কয়েক শ' টুকরো হলো উপরের সব। একদিকে ছিটকে পড়ল ইঞ্জিন, সঙ্গে ফিউয়েল ট্যাঙ্ক। মাটিতে পড়েই আগুন ধরে গেল ইঞ্জিন ও ফিউয়েল ট্যাঙ্কে। গ্যাসোলিন হয়ে উঠল অ্যারোসলের মেঘরাশি। আর ঠিক বিশ ফুট দূরে গিয়ে পড়ল লোকটা। ফিউয়েল ও বাতাসের মিক্সচার তৈরি করল ব্যাঙের ছাতার মত বিশাল এক আগুনের কুণ্ডলী, মুহূর্তে গ্রাস করেছে স্কি বোটকে।

রানা ককপিটে ফিরবার আগেই হাইড্রোফয়েলের গতি কমিয়ে এনেছে কার্টা, এখন মন্থর ভাবে তীরের দিকে চলেছে। একবার এফএন-এফএএল রাইফেল দেখে নিল রানা, ওটার সেফটি ক্যাচ অন করে রাখল ড্যাশবোর্ডের পাশে। রিট্র্যাকটেবল ফয়েলগুলো তুলে নিল। বিধ্বস্ত বোট থেকে একটু দূরে থামল, গুঞ্জন করছে লাইফবোটের ইঞ্জিন। নোঙর ফেলে দিল রানা।

'লোকটা নিজেকে মেরে ফেলল, তা-ই না?'

জ্বলন্ত টুকরোগুলোর দিকে চেয়ে রইল রানা। 'হ্যাঁ, তা-ই।'

'এ থেকে কী বুঝব?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ রইল রানা, তারপর বলল, 'লোকটা জানত আমরা কর্তৃপক্ষ নই, কাজেই ভেবেছে বন্দি হওয়া বা ইন্টারোগেশনের চেয়ে মরে যাওয়াই তার জন্য ভাল। এক কথায় ফ্যানাটিকদের সঙ্গে টক্কর লেগেছে আমাদের।'

'কিন্তু এদেরকে মুসলিম বা খ্রিস্টান মৌলবাদী মনে হয়েছে তোমার?'

'না, তা মনে হয়নি।'

'তা হলে কারা এরা?'

জবাবটা জানা নেই, চুপ রইল রানা। সাঁতরানোর কারণে এখনও ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে ওর পোশাক, আস্তে করে আবার গলা পানিতে নেমে গেল। প্রায় পৌঁছে গেছে সৈকতে,

এমন সময় ঝপাস্ আওয়াজ শুনতে পেল, পিছু নিয়েছে কার্টা। ওর জন্য সৈকতে অপেক্ষা করল রানা, তারপর একসঙ্গে পা বাড়াল লোকটার দিকে। বোট পরীক্ষা করবার কোনও মানেই হয় না, ওখানে রয়েছে শুধু গলে যাওয়া ফাইবার গ্লাস ও পোড়া ধাতু।

পাথুরে জমিতে বারবার গড়িয়ে যাওয়ায় ভয়ঙ্কর চেহারা হয়েছে লাশের, মনে হলো ঘাড় মটকে দিয়েছে স্বয়ং শয়তান, মুচড়ে দিয়েছে হাত-পা। তা-ও কবজির শিরা ধরে দেখল রানা, কোনও পালস নেই। গ্লক পিস্তল কোমরে গুঁজে লাশের প্যান্টের পকেট হাতড়াল। কিছুই পাওয়া গেল না। চিত করল লাশ, ওটা যেন মরা সাপের মত হিলহিলে। দুই গাল খুবলে গেছে, বেরিয়ে এসেছে চোয়ালের রক্তমাখা হাড়।

এক হাতে মুখ চাপা দিল কার্টা।

'সরি,' বলল রানা। 'তোমার বোধহয় সরে যাওয়াই উচিত।'

'সেজন্য নয়, আমি চিনি একে। এ সেই দক্ষিণ আফ্রিকান কন্টার পাইলট। ওয়ারিলি আইবল। ছিহ্, কী বোকাই না ছিলাম! লোকটা জানত আমি দাদু এবেলের বলা সাপের এলাকায় যাব। আমি নিজেই বলেছিলাম। আমাদের পিছনে লাগিয়ে দিয়েছে ওই ইয়টের লোকগুলোকে। তারপর এখানে এসেছে বুড়ো মানুষটা যেন মুখ খুলতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে।'

মুষড়ে পড়েছে কার্টা, ভাবতে গিয়ে বুঝতে পারছে নামিবিয়ায় ওর উপস্থিতির কারণে মানুষ মরছে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'আমি যদি চ্যালেঞ্জার জাহাজটাকে খুঁজতে না আসতাম, এখনও বেঁচে থাকত দাদু এবেল।' কখন যেন ভিজে গেছে চোখদুটো, রানার দিকে চাইল। 'লাজরাস আমাদের গাইড ছিল, তাকেও বোধহয় মেরে ফেলা হয়েছে! ঈশ্বর জানেন, এখনও বেঁচে আছে কি না কুবলিকি।'

রানা জানে সাধারণ মেয়ে নয় কার্টা, বেশির ভাগ মেয়ের মত

করে চাইছে না ওকে সান্ত্বনা দেয়া হোক। আঁধারে দাঁড়িয়ে রইল ওরা দু'জন। একটু দূরে এখনও পুড়ছে স্কি বোটের টুকরোগুলো। কিছুক্ষণ পর ফুঁপিয়ে উঠল কার্টা, 'ওরা পুরোপুরি নিরপরাধ ছিল। মানুষগুলো মরল শুধু আমার ভুলে।'

রানা ভাবছে, এই একই অনুভূতি বারবার হয়েছে ওর। অন্যের ভুলে মরেছে বহু মানুষ। নীরবে নিজে ও দায় তুলে নিয়েছে কাঁধে। এই কষ্ট যেন অ্যাসিডের মত, পুড়িয়ে দিতে থাকে অন্তর।

পাশে দাঁড়িয়ে রইল রানা। পাঁচ মিনিট কাঁদল কার্টা, বা তারও বেশি সময় ধরে, তারপর সামলে নিল। বিড়বিড় করে বলল, 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, রানা।'

'কীসের জন্য?'

'তুমি সান্ত্বনা দাওনি বলে। বেশির ভাগ পুরুষ মেয়েদের কাঁদতে দেখলে বিব্রত হয়, কান্না থামাতে মিথ্যা বলতেও দ্বিধা করে না।'

'আমারও যে ভাল লাগে তা বলতে পারি না,' মৃদু হাসল রানা। 'তবে বুঝলাম, এখন যদি তুমি না কাঁদো, পরে অনেক বেশি কাঁদবে, সেটা তোমার জন্য অনেক বেশি কষ্টের হবে।'

'সেজন্যেই তো ধন্যবাদ দিলাম। তুমি মেয়েদের মন বুঝতে পারো।'

'নিজেও কখনও কখনও কষ্ট পেয়েছি। ...এবার শুরু থেকে সব খুলে বলবে?'

'না, বলার মত কিছুই তো নেই।'

'তুমি তো জানো তোমার কারণে মানুষগুলো মরেনি, ঠিক?'

'জানি। আমি যদি এ দেশে না আসতাম, মানুষগুলো বেঁচে থাকত, কিন্তু নিজে আমি তাদের খুন করিনি।'

'ওটাই ঠিক কথা। তুমি এই ঘটনার শেকলের মাত্র একটা

আঙটা, সেটার সঙ্গে সম্পর্ক আছে খুনের। বোধহয় ঠিকই বলেছ, গাইডকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু কুবলিকির জন্য ভাবতে হবে না। তীরের কেউ জানে না সাগরে গোলাগুলি হয়েছে। তাদের ধারণা: কুবলিকি বা তুমি মারা পড়েছ। কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার জন্য ওয়ালভিস বে-তে যাব আমরা। মনে করি না হিল্ডা এখনও বন্দরে পৌঁছতে পেরেছে। যদি চেষ্টা করি, এখনও কুবলিকি বা ক্যাপ্টেনকে সতর্ক করতে পারব।'

উইণ্ডব্রেকারের আস্তিন দিয়ে চোখ মুছল কার্টা। 'তাই কি পারব?'

'নিশ্চয়ই পারব। চলো, যাওয়া যাক।'

হাইড্রোফয়েলে উঠবার আধ মিনিটের মধ্যেই রকেটের গতি তুলে রওনা হয়ে গেল ওরা। কেবিনে ঢুকে ক্রাফটের স্টোর থেকে পোশাক নিয়ে পাল্টে নিল কার্টা, স্টার্নে চলে এল। ওর হাতে হুইল ধরিয়ে দিয়ে নিজে পোশাক পাল্টাল রানা। রেশন থেকে কিছু খাবারও নিয়ে এল।

'আমাদের কপালে শুধু জরুরি রেশন,' ওর দুই হাতে দুটো বাদামি ফয়েল প্যাকেট। 'হয় স্প্যাগাটি আর মিটবল নেবে, নইলে মুরগি ও বিস্কুট।'

'স্প্যাগাটি নেব, তোমার জন্য থাকল মিটবল। আমি প্রায় ভেজিটারিয়ান।'

'সত্যিই?'

'এত অবাক হচ্ছ কেন?'

'ঠিক জানি না। সবসময় আমার মনে হয়েছে ভেজিটারিয়ানরা বার্কেনস্টক পরে, থাকে অর্গানিক ফার্মে।'

'ওরা ভেগান, দুধও খায় না। ওদেরকে আমার এক্সট্রিমিস্ট মনে হয়।'

ওর কথাটা শুনবার পর ফ্যানাটিজম নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে

রানা। ওই ধরনের মানুষ ভয়ঙ্কর দানব হয়ে উঠতে পারে। প্রথমেই মনে পড়ল ধর্মের কথা, যারা ভাল তারা ভাল, কিন্তু এক দল পুরুষ ও নারী ধর্মের নামে শয়তানকেও হার মানিয়ে দিতে পারে। এদের পর রয়েছে এনভায়রনমেন্টাল ও এনিমেল রাইট মুভমেন্টের সঙ্গে জড়িত মানুষগুলো। এদের কেউ কেউ ল্যাবোরেটরি ভেঙে ফেলতে চায়, ছেড়ে দিতে চায় রিসার্চের জন্য রাখা জন্তু। বা পুড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে স্কি রিসোর্ট। এসবের মাধ্যমে বোঝাতে চায়, তারাই সঠিক পথে চলছে।

প্রয়োজনে মানুষ হত্যা করে নিজের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করবে ওরা। জীবের প্রতি এতই ভালবাসা— মানুষ মরুক ক্ষতি নেই।

হতেই পারে, মনে মনে বলল রানা। গত কয়েক বছরে বহু মানুষ চরমপন্থী হয়ে উঠেছে। এখন আর সমাজের তৈরি নিষেধাজ্ঞা মানতে চায় না অনেকে। অন্যের অধিকার কেড়ে নেয়া যেন খুব সোজা হয়ে গেছে। ইস্ট, ওয়েস্ট, মুসলিম, খ্রিস্টান, সোশালিস্ট, ক্যাপিটালিস্ট, ধনী বা দরিদ্র— এসবই হয়ে উঠেছে বড় ইস্যু, এগুলোর জন্য মানুষ একদিক থেকে আরেক দিকে ঝুঁকে পড়ছে, দরকারে অদরকারে মানুষ হত্যা করতেও তাদের হাত কাঁপছে না।

এ দুই নদীর মাঝ দিয়ে কঠিন এক পথে হেঁটে চলেছে রানা এবং ওর মত কিছু মানুষ। আবার আসিফ হায়দার চৌধুরির কথা মনে পড়ল ওর। ভদ্রলোকের জন্য কোনও মুক্তিপণ চাওয়া হয়নি।

কিন্তু কেন?

এই কিডন্যাপিং কি পলিটিকালি মোটিভেটেড?

শ্বেতাঙ্গ নয় বলেই সরিয়ে দেয়া হলো তাঁকে?

রাজনৈতিক চাল, না পরিবেশবাদীদের কোনও দল গুম করল?

কার্টা যে পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, সেসবের সঙ্গে

আসিফ হায়দার চৌধুরির কোনও যোগ থাকতে পারে?

না বোধহয়।

কিন্তু এই মেয়ের মতই ভদ্রলোক বোধহয় রয়েছেন নামিবিয়ার মাটিতেই। স্কেলিটন কোস্ট সভ্য দুনিয়া থেকে অনেক দূরের এলাকা। পরিবেশবাদীরা এখানে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেনি। ব্রাজিলের রেইন ফরেস্ট বা পলিউটেড ওয়াটারওয়ের কথা পৃথিবীর মানুষ জানে, কিন্তু একটা দরিদ্র দেশের এক ফালি মরুভূমি নিয়ে ভাবে না কেউ। বেশির ভাগ মানুষ মানচিত্রে খুঁজেই পাবে না ওই অঞ্চল।

অন্য একটা চিন্তা এল ওর মনে। নামিবিয়ায় হীরার খনি শিল্প দেশের সবচেয়ে বড় ইণ্ডাস্ট্রি। কার্টা যতই বলুক হীরার বাজার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, কিন্তু এমন হতেই পারে, ওরা জড়িয়ে গেছে বেআইনী মাইনিং অপারেশনের সঙ্গে। বেশির ভাগ মানুষ বিপুল সম্পদের জন্য জান বাজি ধরতে রাজি হয়ে যায়। তার চেয়ে অনেক কম লোভেই মানুষ একে অন্যকে খুন করে। পাইলট ওয়ারিলি আইবলের আত্মহত্যার কোনও যৌক্তিক কারণ খুঁজে পেল না রানা।

লোকটা হয়তো ভেবেছে, বন্দি হলে তার উপর যে ধরনের নির্যাতন চলবে, সে তুলনায় চট্ করে মারা যাওয়া অনেক সহজ।

'ওয়ারিলি আইবলের মত লোক বেআইনী ডায়মণ্ড মাইনিঙের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে এবং ধরা পড়লে কী হতে পারে?' মেয়েটির দিকে চাইল রানা।

'একেক দেশে একেক আইন। সিয়েরা লিয়োনে তাকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মেরে ফেলা হবে। নামিবিয়ায় ফাইন দিতে হবে বিশ হাজার ডলার, সঙ্গে পাঁচ বছরের জেল।' রানা চেয়ে আছে দেখে জোর দিয়ে বলল কার্টা, 'আমি জানি। আমি ওই কোম্পানির সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট। ডজন খানেক দেশের হীরক ব্যবসার

সব আইন আমাকে জানতে হয়েছে। ঠিক যেমন তুমি জানো বন্দরগুলোর কাস্টমস আইন।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা, তারপর বলল, 'পাঁচ বছর জেল খুব কঠিন শাস্তি নয়। এমন নয় যে কেউ আত্মহত্যা করবে।'

'তুমি আফ্রিকার জেলখানা সম্পর্কে কিছুই জানো না।'

'দুয়েকটা ঘুরে দেখেছি। ওগুলো মিশেলিন গাইডের স্টার রেটেড হোটেল নয়।'

'পরিস্থিতি ওখানে ভয়ঙ্কর। যক্ষ্মা ও এইচআইভি ইনফেকশন রেট দুনিয়ার আর সব জায়গা থেকে অনেক বেশি। বেশ কিছু হিউম্যান রাইট গ্রুপ বিশ্বাস করে আফ্রিকার জেলখানার ভিতর সময় কাটানো মানেই মৃত্যুদণ্ড লাভ করা। ...এসব জানতে চাইছ কেন, রানা?'

'বুঝতে চাইছি কেন বন্দি না হয়ে আত্মহত্যা করল ওয়ারিলি আইবল।'

'তুমি ভাবছ সে আসলে ফ্যানাটিক না-ও হতে পারে?'

'সে আসলে কে বা কী ছিল, এখনও জানি না,' বলল রানা। 'এদিকের সাগরে বা মাটিতে অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে, কী সেটা বুঝতে পারছি না। আপাতত কিছুই বলার নেই। একবার মনে হয়েছিল বিশেষ দুটো বিষয় একসঙ্গে জড়িয়ে পেঁচিয়ে রয়েছে। কিন্তু এখন নিশ্চিত নই দুটো ঘটনা একই পাযলের অংশ কি না। হতেই পারে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্রের অংশ। এটা ঠিক, দুটো কো-ইনসিডেন্স একই এলাকায় ঘটেছে...'

'এবং তুমি কখনও কো-ইনসিডেন্স বিশ্বাস করো না,' বলল কার্টা।

'ঠিক।'

'কী ঘটছে বললে আমি হয়তো সাহায্য করতে পারব।'

'সরি, তোমাকে বলা উচিত হবে না।'
সাগর চিরে এগিয়ে চলেছে ওদের নৌযান।

চোদ্দ

সরু, রুক্ষ রানওয়ের দিকে নেমে আসছে ডি হ্যাভিল্যাণ্ড টুইন অটার, দূর থেকে দেখলে মনে হবে মাটির একটু উপরে ভাসছে ওটা মৌমাছির মত। উড়োজাহাজটার ডিজাইন উনিশ শ' ষাট সালের, উঁচু ডানাগুলোর সঙ্গে মানানসই দুটো ইঞ্জিন, বেশিরভাগ বুশ পাইলটের কাছে আজও এর কদর মোটেও কমেনি। সামান্য সমতল জমি পেলেই নেমে পড়তে পারে, তাতে বড়জোর লাগে এক হাজার ফুট রানওয়ে। টেকঅফ করবার সময় আরও কম দৈর্ঘ্যের হলেও চলে।

রানওয়ের পাশে বিশাল গর্তের ভিতর বসে আছে ডেভিল্‌স্ ওয়েসিস, ওটাকে কমলা পতাকা দিয়ে চিনিয়ে দেয়া হয়েছে। জোরালো হাওয়ায় চারপাশে উড়ছে প্রচুর ধুলো, এরই মধ্যে নামছে অটার। এয়ারস্ট্রিপের ঠিক মাঝে নেমে এল পাইলট। গতি কমাতেই ধুলোর ঝড় তৈরি করল টার্বো-প্রপেলারগুলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য ধুলোবালির আড়ালে ঢাকা পড়ল বিমানটা। প্রপেলারগুলো বন্ধ হবার এক মিনিটের আগেই ঝাঁকি খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল অটার। দু' মিনিট পর ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে পিছন-দরজা খুলে গেল, কিন্তু ততক্ষণে এয়ারক্রাফটের পাশে এসে হাজির হয়েছে ছাতবিহীন এক জিপগাড়ি।

বিমানের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ডক্টর নিকোলাস ক্রিস্টোফার। খুবই আড়ষ্ট ভঙ্গি, ছ' ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা দেহটা আগাগোড়া টনটন করছে ব্যথায়। কট-কট করে ফুটছে মেরুদণ্ডের হাড়। সেই যিম্বাবুইয়ের রাজধানী হারেরো থেকে সাত শ' মাইল উড়ে এসেছে। তার আগে ইউনাইটেড স্টেট্স্ থেকে সোজা যিম্বাবুইয়ে-তে নেমেছে। ঠিক জায়গায় ঘুষ দেয়া হয়েছে, কাজেই কোনও রেকর্ডস নেই। কেউ জানবে না সে আফ্রিকায় পা রেখেছে, খোঁজ নিলে জানবে এখনও বিজ্ঞানী রয়েছে মেইনে, নিজ বাড়িতে।

জিপগাড়ির মহিলা ড্রাইভারের নাম ডুলি গ্রিন, ডক্টর ক্রিস্টোফার পরিবেশ নিয়ে কাজ শুরু করবার পর থেকেই সে এই সংঘের সঙ্গে জড়িত। প্রথম থেকেই উপযুক্তদের রিক্রুট করবার কাজ করছে। বলতে গেলে সে-ই খুঁজে বের করেছে দক্ষ এবং যোগ্য একদল মানুষকে। তাদের সবার ধারণা: প্রতিটি দেশকে ভাল ভাবে ঝাঁকিয়ে দিতে হবে, নইলে এসব দেশের সরকার বুঝবে না, জানবে না পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষা করবার এখনই শেষ সময়।

'যাক, তবু এলেন, এবার বুঝবেন আমরা কোন্ নরকে বাস করছি,' শুভেচ্ছা জানানোর বদলে ক্রিস্টোফারের দিকে চেয়ে হাসল ডুলি। ভক্তি ও ভালবাসা প্রকাশ পেল কালো চোখের দুই মণিতে। হল্যাণ্ডের মানুষ সে, ওই দেশের বেশিরভাগ মানুষের মতই প্রায় নিখুঁত ইংরেজি বলে।

'জানি, কিন্তু আগে আসার সময় হয়নি,' বলল ক্রিস্টোফার। 'আর তুমি তো জানো আমরা অশুভ জিনিয়াসরা সবসময় লুকিয়েই থাকি?'

'তাই বলে এমন জায়গা বাছতে হয়? এক শ' কিলোমিটারের ভিতর কোনও ফ্লাশ টয়লেট নেই, কামড়ে খেয়ে ফেলতে চাইছে

পোকাগুলো!'

'এখানে না এসেই বা উপায় কী? শুকিয়ে যাওয়া আগ্নেয়গিরির সব জ্বালামুখ দখল করে নিয়েছে আমার চেয়ে বড় বড় ভিলেনরা। বাধ্য হয়ে একটা ডামি কোম্পানির মাধ্যমে নামিবিয়ার সরকারের কাছ থেকে এই জেলখানা ভাড়া নিয়েছি। বলেছি আমরা একটা সিনেমার শুটিং করব।' পাশ ফিরল ক্রিস্টোফার, পাইলটের হাত থেকে বুঝে নিল ব্যাগ। লোকটাকে বলল, 'রিফিউয়েল করে নাও, কিছুক্ষণ পর আবারও উড়াল দেব।'

বিস্মিত চোখে ডক্টরকে দেখল ডুলি। 'তা হলে আপনি আমাদের সঙ্গে থাকছেন না?'

'সরি, উপায় নেই। ভেবেছিলাম থাকব, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে যেতে হবে ক্যাবিণ্ডা।'

'বড় কোনও সমস্যা?'

'একটু বড়ই, সঠিক সময়ে মার্সেনারিদের হাতে পৌঁছায়নি ইকুইপমেন্ট। তা ছাড়া, আগেই নিশ্চিত হতে চাই, অ্যাসল্টের জন্য যেসব বোট ব্যবহার করব, সেগুলো ঠিক আছে কি না। আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে প্রকৃতি মাতা। মাত্র গত ক'দিন আগে শেষ হলো একটা সাইক্লোন, এরই ভিতর তৈরি হচ্ছে আরেকটা। মনে হয় না এক সপ্তাহের বেশি অপেক্ষা করতে হবে।'

খুশি হয়ে উঠল মেয়েটি, উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ। 'এত তাড়াতাড়ি? এ তো বিশ্বাসই হচ্ছে না!' ডক্টর ক্রিস্টোফারের পাশে হেঁটে জিপগাড়িতে উঠল সে, দু'জন রওনা হয়ে গেল জেলখানার দিকে।

'দীর্ঘ আঠারো মাস ধরে কাজ করছি, এবার তার ফল দেখব,' বলল ক্রিস্টোফার। 'আমাদের কাজ যখন শেষ হবে, পৃথিবীর বুদ্ধিমান একটা লোকও বলবে না বৈশ্বিক উষ্ণতা ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর

নয়।'

দু' মিনিট পেরুনোর আগেই কারাগারে ঢুকে পড়ল জিপ। এই জেলখানা প্রকাণ্ড এক তিনতলা পাথরের বাড়িতে, দেখলে মনে হয় বিশাল কোনও ওয়্যারহাউস। ছাতে প্রহরীদের জন্য রয়েছে কয়েকটা পাথুরে মঞ্চ, ওখান থেকে নজর রাখা হতো মরুভূমিতে। চার দেয়ালে মাত্র একটি করে জানালা। সেকারণেই আরও ভয়ঙ্কর লাগে ভবনটা, প্রাচীন কোনও দুর্গ যেন, ওখানে আটকে রেখে নির্যাতন করা হতো মানুষকে। মাঝরাতে ওই ভবনের কালো ছায়া পড়ে সাদা মরুভূমির উপর, যে-কেউ ভাবতে পারে ওই বাড়িতে বাস করে স্বয়ং ইবলিস।

আকাশ-ছোঁয়া কাঠের দুটো কবাট জিপের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল। ওই দরজা দিয়ে একইসঙ্গে ঢুকতে পারে বড় দুটো ট্রাক। ভবনের মাঝে বড়সড় উঠান। ভবনের প্রথম তলা ব্যবহার করা হতো কারাগার কর্তৃপক্ষের অফিস ও প্রহরীদের ডরমেটরি হিসাবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় কুঠুরিগুলোর ভিতর রাখা হতো বন্দিদের।

এখন কড়া রোদে জ্বলছে এক্সারসাইয করবার উঠান। তাপে হালকা হয়ে গেছে বাতাস, তারপরও পরিবেশটা যেন ফুটন্ত সীসার মত গনগনে।

প্রধান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এরিয়ার সামনে জিপ থামতেই জানতে চাইল ক্রিস্টোফার, 'আমাদের অতিথিদের কী অবস্থা?'

'যিম্বাবুইয়ের লোকগুলো তাদের বন্দিকে নিয়ে গতকাল এসেছে,' ওর দেবতার দিকে ঘুরে চাইল ডুলি গ্রিন। 'বুঝতে পারছি না এরা এখানে কেন।'

'ওটা একটা ট্যাকটিকাল নেসেসিটি। আমাকে আফ্রিকায় ভিসা ছাড়াই ঢুকতে দেয়া এবং অন্য সব সুবিধা পাওয়ার বদলে কিছু দিনের জন্য তারা এই কারাগার ব্যবহার করবে। তাদের

বন্দি বিরোধী দলের প্রধান, তাকে দেশদ্রোহী হিসাবে বিচার করা হবে। যিম্বাবুইয়ের সরকার ভাবছে, লোকটার অনুসারীরা যে-কোনও সময়ে জেল ভেঙে তাকে বের করে নিয়ে লুকিয়ে ফেলবে দেশের অন্য কোথাও। সে কারণেই সরকার চাইছে আগে দেশের বাইরে কোথাও লুকিয়ে রাখবে লোকটাকে, তারপর প্রহসনের বিচার শেষ হলে হারেরোতে নিয়ে সবার সামনে ফাঁসি দেবে।'

'লোকটাকে যখন দেশে ফিরিয়ে নেবে, তার লোকরা জেল ভেঙে বের করবে না তাকে?'

'সময় পাবে না, যা করার করে ফেলবে এক ঘণ্টার ভিতর।'

'ব্যাপারটা আমার কাছে ভাল ঠেকছে না, ডক্টর। আফ্রিকার দুর্নীতি-পরায়ণ সরকারগুলোর ভিতর সবচাইতে খারাপ বর্তমান যিম্বাবুইয়ে সরকার। যারা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তারা বোধহয় সঠিক পথেই চলেছে।'

'আমিও তোমার সঙ্গে একমত, কিন্তু দরাদরি করার উপায় ছিল না আমার,' ক্রিস্টোফারের বলার ভঙ্গিতেই প্রকাশ পেল, আসলে বলছেঃ এর বেশি আর কিছু জানতে চেয়ো না। 'আমার প্রাক্তন বিজনেস পার্টনারের কী অবস্থা? কী করছে সে?'

নাক কুঁচকে ফেলল ডুলি। 'মাত্র বুঝতে শুরু করেছে অন্যায় ভাবে অন্যের সফলতা চুরি করার দায়ে তাকে দণ্ড দিতে হবে।'

'গুড। আমি ওই হারামজাদার চেহারায় ব্যর্থতা দেখতে চাই। ওর বুঝতে হবে, কত বড় অপরাধ করেছে।'

কারাগারের ভিতর ঢুকে পড়ল তারা। দলের প্রত্যেককে নাম ধরে ডাকল নিকোলাস ক্রিস্টোফার। তাতে মুগ্ধ হয়ে গেল সবাই। আসিফ হায়দার চৌধুরির মত করে মুহূর্তে মানুষকে আপন করে নিতে পারে না ক্রিস্টোফার, কিন্তু দেড় বছরের চেষ্টায় সে এই মানুষগুলোর অন্তরে ঢুকে গেছে, হয়ে উঠেছে সত্যিকারের হিরো। দলের এক মেয়ের হাতে তিনটে রেড ওয়াইন তুলে দিল সে।

পরের আধ ঘণ্টা আলাপের ফাঁকে সবাই মিলে মদ্যপান করল। এক মহিলার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দিল ক্রিস্টোফার, মেয়েটির সম্মানে টোস্ট করল, সবাই মিলে চিয়ার্স জানাল তাকে।

এরপর ওয়ার্ডেনের অফিসে ঢুকল ক্রিস্টোফার, তার নির্দেশে আসিফ হায়দার চৌধুরিকে নিয়ে আসতে গেল কয়েকজন প্রহরী। সেই ফাঁকে কয়েক মিনিট পোজ দিয়ে ক্রিস্টোফার ঠিক করে নিল আসিফ হায়দার চৌধুরি ঘরে ঢুকলে কীভাবে সে কোন্ ভঙ্গি নেবে। ডেস্কের পিছনে বসে দেখল, কিন্তু বসে থাকলে নিজেকে বিরাট কিছু মনে হয় না। শেষে দাঁড়াল গিয়ে অফিসের জানালায়, মাথা নিচু করে রাখল, ভাব দেখে মনে হলো একা ওর কাঁধের উপর চেপে বসেছে গোটা পৃথিবী।

এর এক মিনিট পর অফিসে এসে ঢুকল গার্ডরা। প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে আসিফ হায়দার চৌধুরিকে। হাত দুটো পিছনে হ্যাণ্ডকাফে আটকানো। ব্যবসা থেকে অবসর নেয়ার পর প্রাক্তন দুই বন্ধুর আর সামনা-সামনি দেখা হয়নি, কিন্তু বেশ কিছু টেলিভিশন ইন্টারভিউ দেখেছে ক্রিস্টোফার। সে-কারণেই আসিফকে দেখে হাসি পেল তার। গত কয়েক দিনের বন্দিত্ব এবং অনিয়মে ধসে গেছে লোকটা। উজ্জ্বল চোখ দুটোর চাহনি ভোঁতা হয়ে গেছে। গর্তের ভিতর ডেবে গেছে দুই চোখ, দেখে মনে হলো তাড়া খাওয়া কোনও বন্য জন্তু। কিন্তু অবাক ব্যাপার, এক সময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে দেখেই ঝিলিক দিয়ে উঠল ওর চোখদুটো। বিব্রত বোধ করল ক্রিস্টোফার। ওই তো সেই আসিফ হায়দার চৌধুরি, আগের মতই নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে পরিস্থিতি! ভাবল সে, যদি ওই হারামজাদার মত সবাইকে মুগ্ধ করতে পারতাম!

একবার তার মন চাইল, বসে পড়বে চেয়ারে।

'নিকোলাস,' শান্ত স্বরে বলতে শুরু করেছে আসিফ হায়দার

চৌধুরি, 'জানি না কেন আমার এমন ভয়ঙ্কর ক্ষতি করতে চাইছ, কিন্তু নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তুমিই জিতেছ। তুমি যা চাও, পরিষ্কার ভাবে বলো, আমি মেনে নেব। বদলে শুধু একটাই অনুরোধ, এসব বন্ধ করো। তুমি যদি কোম্পানিটা ফিরে পেতে চাও, আমি সই করে দেব, সরে যাব তোমার পথ থেকে। তুমি যদি আমার সব টাকা চাও, শুধু জানিয়ে দাও কোন্ অ্যাকাউন্টে ট্র্যান্সফার করতে হবে। তুমি কোনও ঘোষণা-পত্র লিখলে সেটা বিনা দ্বিধায় সই করে দেব, এবং পরেও সেটার জন্য দায়বদ্ধ থাকব। তোমার যদি মনে হয় এই শাস্তি আমার প্রাপ্য, তা-ও মাথা পেতে নেব।'

শুয়োরের বাচ্চা নাটকীয়তা ছাড়েনি, ভাবল নিকোলাস ক্রিস্টোফার। সন্দেহ কী হারামজাদার পিছনে ছুটবে সবাই! এক সেকেণ্ডের জন্য তার লোভ হলো, শয়তানটার প্রস্তাব মেনে নিলে কেমন হয়? তারপর নিজেকে সামলে নিল সে। কোনও ভাবেই সত্য-পথ থেকে সরবে না। দ্বিধা কাটিয়ে উঠল। 'এটা তোমার আলোচনার টেবিল কিংবা মিডিয়ার সাক্ষাৎকার নয়, চৌধুরি। আমার সঙ্গে গিয়ে সব দেখবে তুমি। এটা আমার জন্য একটা বোনাসের মত। প্রাক্তন বন্ধু, বর্তমানের শত্রু, এবার তুমি হবে শুধু সাইড শো, আসল অনুষ্ঠান চলবে আমার নির্দেশনায়।'

'এসবের কি কোনও প্রয়োজন আছে? আসলে কী চাও তুমি, বলো তো?'

'চোপ! একটা কথাও বলবে না!' গর্জে উঠল ক্রিস্টোফার। 'তোমার জানা নেই পৃথিবীর ক্ষমতাশালী মানুষগুলোকে কীভাবে শিক্ষা দিতে হবে?' বড় করে শ্বাস ফেলল সে, আগের চেয়ে অনেক শান্ত স্বরে বলল, 'আমি যেভাবে যা করব, প্রকৃতির তাণ্ডবকে নিতান্তই ছেলেখেলা মনে হবে। যেভাবে হোক পাল্টে দিতে হবে বর্তমানের পৃথিবীকে। উপকূল ভাসিয়ে এমন একটা

জলোচ্ছ্বাস তৈরি করতে যাচ্ছি, যাতে সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশের কয়েক লক্ষ লোক মারা পড়ে। বড় দেশগুলোর তাবৎ গর্দভ নেতারা আমার মত করে ভাবছে না। অবশ্য তুমি তো নিজেও সায়েন্টিস্ট, তুমি সবই বুঝবে। আগামী শতাব্দী আসার আগেই ধ্বংস হয়ে যাবে হাজার হাজার বছরের মানব সভ্যতা, সবই হারিয়ে যাবে কতিপয় নির্বোধ, স্বার্থান্ধ মানুষের জন্যে।

'মাত্র কয়েক ডিগ্রি তাপ বাড়লে গোটা পৃথিবীর পরিবেশের উপর ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়বে— এরই ভিতর পাল্টাতে শুরু করেছে পরিবেশ। এই গ্রহ এখনও অতটা উত্তপ্ত হয়নি যে গ্লেসিয়ারগুলো গলবে, কিন্তু এরই ভিতর গ্রিনল্যাণ্ডের বরফ গলতে শুরু করেছে। সব পানি এসে পড়ছে সাগরে। আগে কখনও এমন ঘটনা দেখা যায়নি। সাগরের পানি বাড়তে শুরু করেছে বলেই মাটির ভিতর নোনা পানি তেলের মত কাজ করছে। কোথাও কোথাও দ্বিগুণের বেশি গলছে বরফ। বহু দেশের বেশিরভাগ জমি সাগরের নীচে ডুবে যাবে। আমরা এখানে বসে আছি, কিন্তু আমাদের সন্তানরা কোথায় থাকবে?'

'আমি তোমার কথা উড়িয়ে দিচ্ছি না, কিন্তু বলতে চাই...'

'তোমার কিছুই বলতে হবে না, চাইলেই আমার কথা উড়িয়ে দিতে পারবে না,' ধমকে উঠল ক্রিস্টোফার। 'সচেতন কোনও মানুষ পারবে না, কিন্তু এ ব্যাপারে কেউ কিছু করছে না। কাজেই চাক্ষুষ দেখাতে হবে— মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে প্রকৃতি কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে। সবাই ভাবছে গ্রিনল্যাণ্ডে বরফ গললে তাদের কী, কিন্তু নিজের বাড়ি যখন থাকবে না, ভাল করেই বুঝবে সব। আমাকে এখন পৃথিবী রক্ষার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, নইলে একটা মানুষও বাঁচবে না।'

'এত মানুষ মেরে ফেলে, নিক...'

'এখনই সাবধান না হলে এর চেয়ে হাজার গুণ বেশি মানুষ

মরবে। এটা ভেবে দেখো, কয়েক বিলিয়ন মানুষের জন্য এক মিলিয়ন মানুষ মরলে তাতে পৃথিবীর কোনও ক্ষতি হবে না। এটা আত্মত্যাগও বলতে পারো। তোমার যদি একটা হাতে গ্যাংগ্রিন ধরে, বাঁচার জন্য বাধ্য হয়ে ওই হাত কেটে ফেলতে হবে—এটাই নিয়ম।'

'কিন্তু তুমি কথা বলছ নিরপরাধ কোটি কোটি মানুষের জীবন নিয়ে, গ্যাংগ্রিনের সঙ্গে এটাকে তুলনা করা যায় না।'

'বেশ, খুব ভাল তুলনা দিতে পারিনি, কিন্তু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যুক্তি ঠিক আছে? তা ছাড়া, তুমি যেমন করে ভাবছ কোটি কোটি মানুষ মরবে, আসলে তত মরবে না। আজকাল আবহাওয়ার রিপোর্ট দ্রুত পৌঁছে যায় মানুষের কানে। বহুবার সতর্ক করার সময় পাবে সরকার।'

'তাই ভাবছ?' থুতু ফেলল আসিফ হায়দার কামরার মেঝেতে। 'কখনও জানতে চেয়েছ এক-একটা সাইক্লোনে মারা যায় বাংলাদেশের কত লক্ষ মানুষ, কেমন অসহনীয় কষ্টের ভিতর পড়ে দরিদ্র শিশু-কিশোর-নারী-পুরুষ?'

'ক্ষতি তো কিছু হবেই। আর তোমার জন্য একটা চমকও রেখেছি। এবারের এই ঝড়টার পর বাংলাদেশের দিকে বিশেষ নজর দেব আমি। শুনেছি তোমার ওই দেশের সরকার দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণে পৃথিবীতে সেরা। ওদের দেখিয়ে দিতে চাই সত্যিকারের দুর্যোগ কাকে বলে। ...যাই হোক, আমি যা বলছিলাম, গত আড়াই দশক ধরে আমরা জানি পরিবেশ বিজ্ঞানীরা সবাইকে সতর্ক করছেন। আমরা কেউ তাতে কান দেইনি। কোনও ব্যবস্থাও নেইনি। এবার সময় হয়েছে কিছু করার। আমি নিজেই মানুষকে বোঝানোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছি। মানব জাতিকে রক্ষার জন্য এ কাজ আমাকে করতেই হবে।'

এক সময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দিকে অবিশ্বাস নিয়ে চেয়ে রইল

আসিফ হায়দার চৌধুরি। একটা কথাই এল তার মনে— বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে লোকটা! আগেও কেমন যেন ছিটেল মত ছিল, কিন্তু এমআইটিতে ওর মত ভাল ছাত্র খুব কম ছিল। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে পুরো পাগল হয়ে উঠেছে! পাগলামি নয়, ভয়ঙ্কর ম্যানিয়ায় ধরেছে তাকে! আসিফ বুঝতে পারছে, এখন আর কোনও যুক্তি দিয়ে কোনও লাভ হবে না, সম্পূর্ণ খারাপ হয়ে গেছে তার মাথাটা। দুনিয়ার সমস্ত যুক্তি দিয়েও ফ্যানাটিককে কখনও পথে আনা যায় না।

তারপরও শেষ চেষ্টা করল আসিফ। 'তুমি যদি মানব জাতির এতই মঙ্গল চাও, তো বেচারি ক্যারেন কুম্বসকে খুন করলে কেন?'

আসিফের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল ক্রিস্টোফার। 'যারা আমার সঙ্গে কাজ করছে, তারা যথেষ্ট দক্ষ নয়, সে কারণেই বাইরে থেকে সাহায্য নিতে হয়েছে।'

'মার্সেনারি?'

'হ্যাঁ। ওরা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। কিন্তু ক্যারেন কুম্বসকে খুন করা হয়নি। বলতে পারো গুরুতর ভাবে অসুস্থ।'

আসিফ হায়দার চৌধুরিকে দেখে মনেই হলো না কিছু করতে পারে, কিন্তু হাত ধরে রাখা পাশের লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল সে, তারপর তীরের মত সামনে বাড়ল। লাফ দিয়ে উঠে এল ডেস্কের উপর, ডান হাঁটু দিয়ে গায়ের জোরে গুঁতো দিল চেয়ারে বসা ক্রিস্টোফারের চোয়ালে। দুই সেকেণ্ড পর নড়ে উঠল দুই প্রহরী। তাদের একজন হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিল আসিফ হায়দার চৌধুরিকে। ডেস্ক থেকে ফ্লোরে পড়ল সে, দুই হাতে পিছমোড়া করে হাতকড়া পরানো; ঠেকাতে পারল না মুখের উপর পড়া লাথি ও ঘুষি। কিন্তু কোনও ব্যথা পেল না, মেঝেতে পড়তেই মাথা ঠুকে গেছে, জ্ঞান হারিয়েছে বিজ্ঞানী।

'সত্যিই দুঃখিত, ডক্টর ক্রিস্টোফার,' ডান দিকের প্রহরী

বলল। চলে গেছে সে ডেস্কের পিছনে, আস্তে করে টেনে তুলল ওকে।

ক্রিস্টোফার টের পেল, ঠোঁটের কষা ফেটে রক্ত পড়ছে। দুই আঙুলে রক্ত মুছল সে। ভঙ্গিটা এমন, ভাবতে পারছে না তার দেহ থেকে রক্ত বেরুতে পারে। বেসুরো কণ্ঠে বলল, 'ও বেঁচে আছে?'

আসিফ হায়দার চৌধুরির কবজি ও গলার শিরা পরখ করল এক প্রহরী। 'হৃৎপিণ্ড ঠিক ভাবেই চলছে। তবে জ্ঞান ফেরার পর কংকাশন হতে পারে, স্যর।'

'গুড,' অচেতন আসিফের পাশে দাঁড়াল ক্রিস্টোফার, আস্তে করে জুতোর ডগা দিয়ে থুতনিতে খোঁচা দিয়ে বলল, 'মেলোড্রামাটিক সিনেমার অভিনয় করলে, কিন্তু এরপর থেকে তোমার নিজের কোনও ক্ষমতা থাকবে না নড়বার। ...নিয়ে যাও ওকে, আটকে রাখো। জ্ঞান ফিরলে খবর দেবে, ওর সঙ্গে আরও কথা আছে আমার।'

এর দুই ঘণ্টা বিশ মিনিট পর আবারও আকাশে উঠল টুইন-ইঞ্জিন অটার, সোজা উত্তর দিকে অ্যাঙ্গোলার ক্যাবিণ্ডা প্রদেশ লক্ষ্য করে চলেছে।

পনেরো

এইমাত্র দড়ির মই বেয়ে নিজ টেণ্ডারে নেমেছে হার্বার পাইলট, আর দেরি না করে হুইল হাউসের গোপন এলিভেটরে করে অপারেশন্স সেন্টারে নেমে এসেছে সোহেল আহমেদ ও স্বর্ণা

সানজিদা। যেন অতি পুরনো ময়লা টয়লেট থেকে নাসার মিশন কন্ট্রোল রুমে ঢুকেছে ওরা। একটু আগে ক্যাপ্টেনের অভিনয় করেছে সোহেল, যদিও ওর ডিউটি অফ চলছে। ওর পাশে ছিল হঠাৎ বনে যাওয়া ফার্স্ট মেট স্বর্ণা সানজিদা।

'আপনি কি এখন কেবিনে ফিরবেন, সোহেল ভাই?' নিজের সিটে বসেই জানতে চাইল স্বর্ণা। কানে পরে নিয়েছে হেডসেট।

'না,' হতাশ স্বরে বলল সোহেল। 'ফারা বলছে আরও পাঁচ পাউণ্ড ওজন কমাতে হবে, নইলে ফিট থাকতে পারব না। কাজেই এখন যাব যিমে। আমাকে নাকি কী এক পাওয়ার-ইয়োগা শিখিয়ে দেবে।'

'ডিউটি না থাকলে শিখে নিতে পারতাম,' মুচকি হাসল স্বর্ণা। গত সপ্তাহে যিমনেশিয়াম এড়িয়ে গেছে সোহেল ভাই, আজ ঠিকই ধরা পড়েছে ডক্টর ফারার পরীক্ষায়। সুন্দরী ডাক্তারের ভয়ে ওরা কেউ যিমনেশিয়াম ফাঁকি দেয় না।

'আমাকে সাইকেলের চাকার মত গোল বানাতে চাইছে,' প্রায় নালিশ করল সোহেল। 'আমি একদিন পালিয়ে যাব।'

'সাগরে কোথায় পালাবেন, সোহেল ভাই?' জানতে চাইল রায়হান। 'হেথা নয়...'

'বন্দর দিয়ে ভাগতে না পারলে তোমাদের লাইফবোট নিয়ে ভাগব।' নিজ কেবিনের দিকে পা বাড়াল সোহেল।

নীরবে চারপাশে নজর রাখা হচ্ছে, শিপিং লেন এড়িয়ে এইমাত্র তুমুল গতি তুলতে শুরু করেছে মার্ভেল। জানা গেছে উত্তর দিকে তৈরি হচ্ছে বড় একটা ঝড়, কিন্তু ওটা সম্ভবত পশ্চিম দিকে সরবে, আগামীকাল বিকেলে কোয়াকোপমুণ্ডে পৌঁছুতে ওদের কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। অলস সময়ে জরুরি কাগজপত্র পড়তে শুরু করল স্বর্ণা। ওর প্রিয় সোহেল ভাই, রায়হান, ক্যাপ্টেন নবী, নিশাত আপা ও কমাণ্ডোরা অ্যাসল্ট

মিশনের জন্য কাগজ তৈরি করেছে। এখনও ঠিক হয়নি কারা যাবে ডেভিল্‌স্ ওয়েসিস মিশনে।

'স্বর্ণা,' কমিউনিকেশন্স স্টেশন থেকে বলল রায়হান। 'এইমাত্র ওয়ায়ার সার্ভিস থেকে তথ্য পেলাম। কথাটা আপনার বিশ্বাস হবে না— আপনার ডিসপ্লেতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

খবরটা চুপচাপ পড়ল স্বর্ণা, দেরি না করে শিপের চ্যানেলে যিমনেশিয়ামে সোহেলের সঙ্গে যোগাযোগ করল: 'সোহেল ভাই, দয়া করে এখনই অপারেশন্স সেন্টারে চলে আসুন।'

বিকট চেহারা করে প্রায় তিন কোনা হয়ে যিমনেশিয়ামে ফারার দেয়া শাস্তি ভোগ করছিল সোহেল, স্বর্ণার কণ্ঠ শুনে মনে মনে স্রষ্টার কাছে দোয়া করল: বাপু হে, স্বর্ণা মেয়েটা খুবই ভাল, ওর ভাল কোরো!' ফারার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এল ও।

'কী ব্যাপার, স্বর্ণা, হঠাৎ আমাকে কীসের দরকার?'

সোহেলের সুবিধার জন্য নিজের ফ্ল্যাট প্যানেল ডিসপ্লে ঘুরিয়ে দিল স্বর্ণা।

পড়তে শুরু করল সোহেল। ঘরের সবাই কান খাড়া করে ফেলেছে। প্রত্যেকে টের পেয়েছে, কোনও খারাপ সংবাদ আছে।

'সোহেল, কী ব্যাপার?' হেলমস থেকে জানতে চাইল গগল।

'স্যামুয়েল আবালা কু করতে যাচ্ছিল,' বলল স্বর্ণা। 'কয়েক ঘণ্টা আগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

'আবালা?' নিজেকেই যেন জিজ্ঞেস করল গগল। 'নামটা এত পরিচিত লাগছে কেন?'

জবাবে বলল সোহেল, 'কঙ্গোর ডেপুটি ডিফেন্স মিনিস্টার, অস্ত্র যোগানের ব্যাপারে আমাদের কন্ট্যাক্ট ছিল।'

'সর্বনাশ! তাই তো!' আরও গম্ভীর হয়ে গেল গগল।

'রায়হান, অস্ত্রের ব্যাপারে কোনও তথ্য পেলে?' জানতে

চাইল সোহেল। কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট বসের বন্ধুর ছেলে না হলে ওই দেশের স্থানীয় রাজনীতি নিয়ে মাথা-ব্যথা থাকত না ওর। বুঝতে পারছে, ওদের সাপ্লাই দেয়া অস্ত্রের দায়-দায়িত্ব ওরা এড়াতে পারবে না।

'সরি, সোহেল ভাই, এখনও চেক করিনি। মাত্র কয়েক মিনিট আগে এপি ওয়ায়ার সার্ভিস থেকে খবরটা পেলাম।'

'সোহেল ভাই, কী ভাবছেন?' জিজ্ঞেস করল স্বর্ণা।

'পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে,' বলল সোহেল। 'আবালা যদি বিদ্রোহীদের রেডিও ট্যাগের কথা বলে থাকে, ওগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তার মানে, আফ্রিকার সবচেয়ে বাজে একদল লোকের হাতে পাঁচ শ' অ্যাসল্ট রাইফেল এবং শ' খানেক গ্রেনেড লঞ্চার তুলে দিয়েছি।'

'অস্ত্র উদ্ধারের ব্যাপারে এখনও কোনও তথ্য দেয়া হয়নি,' ইন্টারনেট থেকে মুখ তুলল রায়হান। 'গুটি থেকে এইমাত্র খবর ছড়াতে শুরু করেছে। পরে সবই একে একে প্রকাশ হবে।'

'নাও হতে পারে,' সাধারণত অপারেশন্স সেন্টারে সিগারেট ধরায় না সোহেল, এখন ঠোঁটে ঝুলিয়ে ফেলেছে একটা সিগারেট। তবে না জ্বেলে চাপা স্বরে বলল, 'আবালা ওদের বলে দিয়েছে ধরে নিতে পারি।'

'রায়হান, আমরা এখন কোনও ভাবে রেডিও ট্যাগ থেকে সিগনাল পেতে পারি?' জানতে চাইল গগল।

ভুরু কুঁচকে ফেলল রায়হান রশিদ। 'বোধহয় না, মিস্টার গগল। ওগুলোর রেঞ্জ অনেক কম। কথা ছিল অস্ত্রের ভেতর বসানো ট্র্যান্সমিটারের সিগনাল পেয়ে কঙ্গোলিজ ফোর্স পৌঁছবে বিদ্রোহী বেসে। সেজন্য তাদের হাতে কয়েকটা ছোট ডিটেক্টর দেয়া হয়।'

'তার মানেই আমরা সব যোগাযোগ হারিয়েছি,' আনমনে

বলল গগল। 'ওগুলো যে-কোনও জায়গায় থাকতে পারে, খুঁজে বের করবে কে?'

'রানার উপস্থিত বুদ্ধির ওপর ভরসা রাখুন,' বলল সোহেল। 'অস্ত্র দেয়ার আগে কয়েকটা ট্যাগ পাল্টে দিয়ে আমাদের বিসিআই থেকে পাওয়া ট্যাগ বসিয়ে দেয়া হয়েছে। ওগুলোর রেঞ্জ প্রায় এক শ' মাইল।'

'কিন্তু সোহেল ভাই, রেঞ্জ বড় কথা নয়,' বলল রায়হান। 'আবালার জানা আছে অস্ত্রের কোথায় ট্যাগ আছে। নিশ্চয়ই বিদ্রোহীদের সেটা জানিয়েছে, এতক্ষণে সরিয়ে ফেলেছে সব। বিসিআইয়ের ডক্টর শমশের আলীর মালও।'

মাথা নাড়ল সোহেল। 'বিসিআই ট্যাগ আছে একে-৪৭-এর বাঁট ও গ্রেনেড লঞ্চারের গ্রিপের ভিতর।'

'অর্থাৎ, এই সম্ভাবনার কথাটা ছিল মাসুদ ভাইয়ের মাথায়!' প্রশংসার সুরে বলল স্বর্ণা। ওরা কেউ জানল না, অন্য কোথাও রাখার বুদ্ধিটা বেরিয়েছে সোহেলের মাথা থেকেই। 'আমাদের ট্যাগ সরিয়ে ফেলবে ওরা, কিন্তু ঠিকই থাকবে বিসিআইয়ের ট্যাগ।'

'আর অন্য ফ্রিকোয়েন্সিতে জানাবে: আমরা এখানে,' নিজ সিটে বসল সোহেল। প্যাকেটে রেখে দিয়েছে সিগারেট।

'আমরা জানলাম না কেন, সোহেল ভাই?' জানতে চাইল রায়হান।

'বলতে পারো রানা বা আমি একটু বেশি প্যারানইয়ার ভিতর ছিলাম,' বলল সোহেল। 'কাউকে আর বলা হয়ে ওঠেনি। আমরা ভাবিইনি ওসব ট্যাগ কাজে লাগবে।'

'সোহেল ভাই, কত যেন বললেন রেঞ্জ?' জানতে চাইল স্বর্ণা। 'কখন থেকে টের পাব আমরা?'

'এক শ' মাইল দূর থেকে।'

'তারপরও খড়ের গাদার ভিতর সুই খোঁজার মত কাজ,' বলল গগল। 'বিদ্রোহীরা কোথায় লুকাবে তা কে জানে!'

'সমস্যা অন্য জায়গায়,' বলল সোহেল। 'রেঞ্জ বাড়াতে গিয়ে ব্যাটারির ক্ষমতা আর বাড়ানো যায়নি। আটচল্লিশ ঘণ্টা থেকে শুরু করে বাহাত্তর ঘণ্টার ভিতর একটার পর একটা ট্যাগ বন্ধ হবে। তারপর কোনও ভাবেই আর খুঁজে পাব না। তার আগেই ট্র্যাক করতে হবে, কঙ্গোলিজ আর্মিকে জানিয়ে দিতে হবে ঠিক কোথায় আছে ওগুলো।'

'তার মানে সামনে থাকছে মাত্র দুটো অপশন,' বলল স্বর্ণা।

'এক মিনিট,' স্বর্ণাকে বলল সোহেল। 'রায়হান, রানার স্যাটালাইট ফোনে যোগাযোগ করা যায় কি না দেখো। ...হ্যাঁ, বলো স্বর্ণা, অপশন দুটো কী?'

'প্রথমত, আমরা ফিরতি পথ ধরতে পারি, কেপ টাউনে ফিরে একটা টিম পাঠাতে পারি কঙ্গোতে। তাদের কাছে দিতে পারি ডিটেকশন গিয়ার। ...সোহেল ভাই, জিনিসটা কি পোর্টেবল?'

'বুম বক্সের সমান হবে। কিন্তু আবারও কেপ টাউনে ফেরা মানেই কমপক্ষে পাঁচ ঘণ্টা খরচ করা। তা ছাড়া, থাকছে বন্দর কর্তৃপক্ষের ঝামেলা। আবারও এখানে ফিরতে পাঁচ ঘণ্টা।'

'সেক্ষেত্রে আমরা জাহাজ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি। আমাদের টিম নামতে পারে নামিবিয়ায়। সোয়াকোপমুণ্ড এয়ারপোর্টে তাঁর জাম্প প্লেন নিয়ে অপেক্ষা করছেন ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসান। ইচ্ছে করলে আমরা ওই এয়ারপোর্টে কন্টার দিয়ে আমাদের টিমকে পৌঁছে দিতে পারি। ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসান তাদের নিয়ে যেতে পারেন কঙ্গোতে, আবার রেইডের আগেই ফিরতে পারবেন। আরেকটা জেট বিমান ভাড়া করা হয়েছে, ওটাতে করে সরিয়ে নেয়া হবে বাঙালি বিজ্ঞানীকে।'

'স্যাটালাইট ফোনে মাসুদ ভাইকে পেলাম না,' জানিয়ে দিল

রায়হান।

'লাইফবোটের রেডিওতে যোগাযোগ করেছ?' জানতে চাইল সোহেল।

'কেউ সাড়া দিল না।'

'যাহ্!' বলল স্বর্ণা।

'ঠিক আছে, আমরা এখন কেপ টাউনে সার্চ পার্টি নামিয়ে এলে কত সময় বাঁচবে?' জানতে চাইল সোহেল।

'বারো ঘণ্টা,' এক কথায় জানিয়ে দিল গগল।

'আরও কম হবে,' কমপিউটার স্ক্রিন থেকে মুখ তুলল না রায়হান। 'আমি এখন কেপ টাউন ও সাইটেশনের ফ্লাইটগুলো চেক করছি। কোনও বিমান নেই বললেই চলে।'

'তা হলে কোনও বিমান চার্টার করতে হবে,' বলল স্বর্ণা।

'এখন ওটাই তো দেখছি আমরা,' বলল ক্যাপ্টেন খোরশেদ নবী। 'কেপ টাউনে মাত্র একটা কোম্পানির জেট এয়ারক্রাফট আছে। একমিনিট। না, ওয়েব সাইটে বলছে তাদের দুই লিয়ারজেট আপাতত নষ্ট।' একবার সবাইকে দেখে নিল সে। 'আমাদের সবার অসুবিধার জন্য তারা দুঃখ প্রকাশ করেছে।'

'তার মানে আমরা বড়জোর আট ঘণ্টা বাঁচাতে পারব,' বলল রায়হান।

'তার ফলে বারো ঘণ্টা পিছিয়ে পড়ব, আর বাঙালি বিজ্ঞানীকে উদ্ধার করার ব্যাপারে কমপক্ষে এক দিন,' বলল সোহেল। 'ঠিক আছে, আমার মত হচ্ছে: আমরা এগিয়ে যাব।' রায়হানের জন্য বলল, 'রানাকে ধরার জন্য পাঁচ মিনিট পর পর ফোন দিতে থাকো। যোগাযোগ হলেই আমাকে জানাবে।'

'ঠিক আছে, সোহেল ভাই।'

সোহেল ভাবতে শুরু করেছে: কোনও বিপদে পড়ল রানা? ঘনিয়ে আসছে ডেভিল্‌স্ ওয়েসিসে ওদের আক্রমণের সময়, কিন্তু

এখন বন্ধ রানার স্যাটালাইট ফোন! ওর এক শ' একটা কারণ থাকতে পারে ফোন অফ করে রাখবার, কিন্তু কেমন যেন দমে গেল সোহেল।

ষোলো

বহু দূরে চেয়ে রয়েছে মাসুদ রানা। পুবাকাশে ঘন কালো মেঘরাশি, সেদিকে খেয়ালই নেই। যখন কার্টাকে নিয়ে ওয়ালভিস থেকে বেরিয়ে এল, খুবই ভাল ছিল আবহাওয়া, কিন্তু এখন গুরুগম্ভীর হয়ে উঠেছে আকাশের মুখ। পৃথিবীর এদিকের প্রকৃতি এমনই, যে-কোনও সময়ে পাল্টে যায় মেজাজ-মর্জি। হয়তো চারপাশ ফকফকা পরিষ্কার, তার দু'মিনিট পর শুরু হবে ভয়ঙ্কর বালিঝড়, ঢেকে ফেলবে চারদিক। এখন তেমনই ঘটছে বলে মনে হচ্ছে।

একবার হাতঘড়ি দেখে নিল রানা। একঘণ্টা পর অস্তে যাবে সূর্য। চার মিনিট আগে ক্যাপ্টেন হাসানের বিমান নামিবিয়ার রাজধানী উইণ্ডহওক থেকে নাইরোবির দিকে চলে গেছে। ক্যাপ্টেনের পরের গন্তব্য: লণ্ডন।

গতকাল রাতে ওয়ালভিস বে বন্দরের এক মাইল আগে ফিশিং বোট হিল্ডাকে ধরেছে রানা। কুবলিকি ও ক্যাপ্টেনকে বলেছে কীভাবে মারা পড়েছে জেলে দাদু এবেল। ওর অনুরোধ শেষে আপত্তি তোলেননি বোটের ক্যাপ্টেন, ঠিক হয়েছে তিনি উত্তর দিকের আরেক শহরে চলে যাবেন, ওখানে এক বা দুই

সপ্তাহের জন্য মাছ ধরে সময় কাটাবেন। কুবলিকিকে লাইফবোটে তুলে নিয়েছে রানা।

কেন পছন্দনীয় পরিস্থিতি নেই তাই বাচ্চাদের মত জেদাজেদি শুরু করেছিল ব্রিটিশ এগযেকিউটিভ, তর্ক জুড়ল কার্টা অস্টিনের সঙ্গেঃ বেয়াড়া মাসুদ রানা লোকটা, ডিবিয়ার্স, নামিবিয়া এবং সবকিছুই তার মনে ভীষণ তিক্ত অনুভূতি এনে দিয়েছে। পুরো বিশ মিনিট তার কথা শুনেছে রানা, ভেবেছে মাথা ঠাণ্ডা হবে লোকটার, তারপর যখন বুঝতে পেরেছে কমপক্ষে আরও একঘণ্টা বকবক করবে, বাধ্য হয়ে তাকে একটা হুমকিই দিয়েছেঃ হয় চুপ করতে হবে, নইলে পিটিয়ে তাকে অজ্ঞান করবে ও।

'আপনার অত সাহস হবে না!' চিৎকার করে বলেছে কুবলিকি।

'মিস্টার কুবলিকি, আমি চব্বিশ ঘণ্টা হলো ঘুমাই না,' লোকটার নাকের এক ইঞ্চি সামনে নিজের নাক নিয়ে গেছে রানা। 'নিরীহ বুড়ো একজন মানুষের বিকৃত লাশ দেখেছি, তাকে অত্যাচার করে মেরে ফেলা হয়েছে, কাজেই যারা এ কাজ করেছে তাদের দিকে কমপক্ষে পঞ্চাশটা গুলি ছুঁড়েছি। তার চেয়ে বড় কথা, আমার ভীষণ মাথা-ব্যথা শুরু হয়েছে। কাজেই খুব ভাল হয় আপনি ডেকের নীচে চলে গেলে, বসুন গিয়ে বেঞ্চ সিটে, এবং মুখটা বন্ধ রাখুন।'

'আপনি জানেন, আমাকে অর্ডার দিতে পারেন না? আমি...'

একেবারে শেষ মুহূর্তে ঘুষির গতি কমিয়েছে রানা, চুরমার করে দেয়নি কুবলিকির খাড়া নাকের হাড়, কিন্তু সে আঘাতেও যথেষ্ট জোর ছিল, হোঁচট খেয়ে পিছিয়ে হ্যাচ পেরিয়ে লাইফবোটের প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্টের মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়েছে সে। 'আগেই সাবধান করেছি,' বলেই অন্য দিকে মনোযোগ দিয়েছে রানা। লাইফবোটের মুখ সোজা করে নিয়েছে

হাওয়ার দিকে।

তীর থেকে কয়েক মাইল দূরে থেমেছে ওরা। ভোরে সারাদিন মাছ ধরবার জন্য ওয়ালভিস থেকে বেরিয়ে এসেছে অজস্র ফিশিং বোট। এরপর স্যাটালাইট ফোনে একটা ট্যাক্সি ও কুবলিকির যাত্রার ব্যবস্থা করেছে রানা। তখনও ডেকের নীচে গ্যাঁট মেরে বসে ছিল লোকটা। ফোলা চোয়ালের ব্যথা তো আছেই, তার চেয়ে ঢের বেশি কষ্ট পেয়েছে মনে।

রানা বন্দরে ঢুকে বার্থে লাইফবোট রাখবার সময় বোটেই থাকতে বলেছে কার্টা ও কুবুলিকিকে, গ্লক পিস্তলটাও রেখে দিয়েছে বিলজের গোপন চেম্বারে। ওদের দুজনের পাসপোর্টে আগেই সিল দেয়া আছে, তবু তীরে নেমে তিনটেই দিল রানা কাস্টমস অফিসারকে। দুটো আগেই সিল দেওয়া দেখে দূর থেকে লাইফবোটের দিকে একবার তাকিয়েই সন্তুষ্ট হয়েছে লোকটা, সিল দিয়ে দিয়েছে রানার পাসপোর্টে।

বোট রি-ফিউয়েল করবার জন্য অ্যাটেণ্ড্যান্টকে মোটা টাকা বকশিশ দিয়েছে রানা, নিশ্চিত হয়েছে ঠিক ভাবেই তেল ভরা হচ্ছে।

পৌঁছে গেছে ট্যাক্সি, ওদের জন্য অপেক্ষা করছে তীরে। বোট ছেড়ে নামার আগে গ্লকটা আবার বের করে বেল্টের নীচে গুঁজে নিয়েছে রানা। গাড়ির পিছন সিটে বসেছে কার্টা ও কুবলিকি, রানা বসল প্যাসেঞ্জার সিটে। সোয়াকোপ নদী পেরিয়ে ঢুকে পড়েছে ওরা সোয়াকোপমুণ্ড শহরে, তারপর সোজা ধরল এয়ারপোর্টের রাস্তা।

গতরাতের লোক দু'জনের একজন ছিল কপ্টার পাইলট, কাজেই কুবলিকিকে দেশ থেকে বিদায় করতে কোনও প্রাইভেট এয়ারক্রাফট ভাড়া করবার ঝুঁকি নেয়নি রানা। সপ্তাহে চারবার উপকূলীয় শহর সোয়াকোপমুণ্ড থেকে রাজধানীতে যাওয়ার জন্য

এয়ার নামিবিয়ার বিমান সার্ভিস চালু আছে, আজ সেই চারদিনের একদিন। সঠিক সময় বুঝে হাজির হয়েছে রানা, যাতে মাত্র কয়েক মিনিট এয়ারপোর্টে থাকতে হয় কুবলিকিকে, কারও চোখে পড়ে যাবার আগেই উঠতে পারে বিমানে। রাজধানীতে নেমেই পাবে কেনিয়ার ফ্লাইট।

এয়ারপোর্টে রানা খেয়াল করল, একটা দুই ইঞ্জিনের বিমান টারমাকে অন্যগুলো থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর বুঝতে দেরি হলো না ওটাই ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসানের জাম্প প্লেন। ওটাতে করেই মিশনে যাবে ওরা। আগেই ভাড়া করা হয়েছে একটা গাল্‌ফস্ট্রিম ফোর। রানা একবার ভেবেছিল ওই বিমানে করেই নামিবিয়া থেকে কুবলিকিকে সরিয়ে নেবে, পরে ভেবেছে ওর হাতে অত সময় নেই, তার চেয়ে বড় কথা: ওই বস্তা পচা মালকে বেশিক্ষণ সহ্য করবে কে!

ওরা একইসঙ্গে ঢুকেছে ছোট্ট টার্মিনালে। চারপাশে নজর রেখেছে রানা, কিন্তু কোথাও অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েনি। শত্রুরা নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছে কার্টা ও কুবলিকি মারা পড়েছে।

কয়েক মিনিট পর ফ্লাইটের জন্য ইংরেজ এগযেকিউটিভকে ডেকে নিল কর্তৃপক্ষ। তার আগে লোকটাকে কথা দিয়েছে কার্টা, রানার সঙ্গে তদন্ত শেষে হোটেল থেকে কুবলিকির ব্যাগ-ব্যাগেজ সংগ্রহ করবে, সব পৌঁছে দেবে লণ্ডনে।

জবাবে অস্পষ্ট সুরে কী যেন বলেছে লোকটা।

যুক্তির বাইরে চলে গেছে সে, এবং সেজন্য তাকে পুরো দোষ দিতে পারছে না কার্টা। সিকিউরিটি এলাকার ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় একবারও পিছন ফিরে চাইল না কুবলিকি।

'খুবই হাসি-খুশি মানুষ,' কার্টাকে নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসার সময় বলল রানা। একটা ট্যাক্সি ডেকে রওনা হলো। আগেই ঠিক ছিল, একবার স্থানীয় গাইড ব্র্যাডলি এন

লাজরাসের এলাকা টুয়ামানাগুলাকাতে ঢুঁ দেবে ওরা।

টুয়ামানাগুলাকার বাড়িগুলো বেশির ভাগই দোতলা, শহরের জার্মান ঐতিহ্য ও সচ্ছলতার ছোঁয়া এদিকটায় মোটেই নেই। দরিদ্রদের এলাকা, প্রায় সাদা হয়ে যাওয়া পেভমেন্টে ছোট-বড় অসংখ্য খানা-খন্দ। বহু মানুষ কাজে যায়নি চাকরি নেই বলে, অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের সামনে বসে আছে বা হাঁটাহাঁটি করছে। চাঁদের মত ফরসা কার্টাকে দেখে সন্দেহ নিয়ে চাইল বাচ্চারা। বাতাসে ভাসছে প্রায় শুকিয়ে আসা মাছের আঁশটে ঘ্রাণ, চারপাশে নামিব মরুভূমি থেকে উড়ে আসা বালি-কণা।

'আমি ঠিক বলতে পারব না কোন্ বাড়িতে থাকত সে,' অপরাধীর মত করে বলল কার্টা। 'আমরা তাকে একটা বারের সামনে নামিয়ে দিতাম।'

'আপনারা কাকে চাইছেন?' জানতে চাইল ক্যাবের ড্রাইভার।

'নিজের নাম বলত ব্র্যাডলি এন লাজরাস। টুরিস্টদের গাইড ছিল।'

একটা কথাও বলল না ড্রাইভার, একটু পর থামল প্রাচীন এক বাড়ির সামনে। দেয়ালে বড় একটা গর্ত দেখা গেল, ওখান থেকে খদ্দেরদের খাবার সরবরাহ করা হয়। পাশে পুরনো পোশাকের ছোট একটা দোকান। দ্বিতীয়তলা ভাড়া দেয়া হয়েছে অ্যাপার্টমেন্ট হিসাবে। কিছুক্ষণ পর ঝড়ো দাঁড়-কাকের মত উস্কোখুস্কো এক লোক বেরিয়ে এল রেস্তোরাঁ থেকে। ক্যাবের ভিতর টুরিস্ট দেখে এগিয়ে এসে ড্রাইভারের জানালার পাশে থামল। দুই নামিবিয়ান সংক্ষেপে কথা বলল, লোকটা আঙুল তুলে সামনের রাস্তা দেখিয়ে দিল।

'এ বলছে দুই ব্লক গেলে পড়বে লাজরাসের অ্যাপার্টমেন্ট।'

এক মিনিট পর আরেক বাড়ির সামনে থামল ট্যাক্সি। এই বাড়ি অন্য সব বাড়ির চেয়ে অনেক প্রাচীন। দুই পাশে আটকানো

ক্ল্যাপবোর্ড, বয়সের ধাক্কায় সাদা। বাড়ির একমাত্র দরজার দুটো কবজা নেই, ঝুঁকে এসেছে কবাট। রোগা এক ঘেয়ো কুকুর বাড়ির কোনায় প্রস্রাব করছে, কাজ শেষে আকাশে উঠে গেল তার লেজ, প্রাণপণে ছুটল এক ইঁদুরের পিছনে। লাফ দিয়ে আবারও বাড়ির ফাটলে ঢুকে গেল ইঁদুর। বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে এল বাচ্চার জোরালো কান্না, হার মানবে পুলিশের সাইরেন।

ট্যাক্সির দরজা খুলে ফুটপাথে নামল রানা। উল্টো দিক দিয়ে বেরুল না কার্টা, পিছলে রানার দিক দিয়েই নেমে এল। পরিষ্কার বোঝা গেল কিছুতেই রানার কাছ থেকে সরবে না।

'তুমি এখানে অপেক্ষা করবে,' ক্যাবের ড্রাইভারকে বলল রানা। মানিব্যাগ থেকে বের করল এক শ' ডলারের নোট।

ওটা পকেটে রেখে চওড়া হাসল লোকটা। 'ঠিক আছে।'

'আমরা কী করে বুঝব ওর অ্যাপার্টমেন্ট কোনটা?' জানতে চাইল কার্টা।

'চিন্তা কোরো না, বড় কোনও ভুল না হলে আমরা বুঝব,' বলল গম্ভীর রানা।

ওর সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে ঢুকে পড়ল কার্টা। চারপাশে আবছা আলো, ভিতরে কোনও বাতি জ্বলছে না। গনগনে আগুনে যেন পুড়ছে গোটা বাড়ি। নানা ধরনের বাজে গন্ধে নাক কুঁচকে ফেলল কার্টা। দারিদ্র্যের নিজস্ব একটা গন্ধ আছে, সেটা পাওয়া যায় গরিবদের এসব বাড়িতে। দোতলায় চারটে ফ্ল্যাট, তার একটা থেকে বাজছে পুলিশের সেই সাইরেন। প্রতিটা দরজার সামনে থামল রানা, চট্ করে দেখে নিল সস্তা তালা। মন্তব্য করল না কোনও, সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় উঠতে শুরু করল।

ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছে যা-ভয় করেছিল তার আলামত দেখতে পেল। বোঁ-বোঁ করে উড়ছে অসংখ্য মাছির মত পোকা। বুল ফাইটারের কাপড়ের মত, উঠছে-নামছে, সরে যাচ্ছে একপাশে।

সেই সঙ্গে কানে আসছে ওদের সম্মিলিত গুঞ্জন। এক সেকেণ্ড পর নাকে এল চাপা একটা দুর্গন্ধ। ভয়ঙ্কর। সেটা এমনই, আগে কখনও না শুঁকলেও যে-কেউ বুঝবে কীসের গন্ধ।

রানার নাক ওকে নিয়ে গেল পিছনের একটা অ্যাপার্টমেন্টের দরজার সামনে। দরজা ঠিক ভাবেই বন্ধ, মনে হলো না তালার উপর জোরাজুরি করা হয়েছে। 'খুনিকে ঢুকতে দিয়েছে লাজরাস। তার মানে, তাকে চিনত সে।'

'কপ্টার পাইলট?'

'বোধহয়।'

দরজার উপর কষে লাথি দিল রানা। হ্যাণ্ডেলের চারপাশের কাঠ আগেই দুর্বল ছিল, ঝটাং করে খুলে গেল কবাট। রেগে গিয়ে ভন-ভন আওয়াজে উড়তে শুরু করেছে মাছিগুলো। ঘরের ভিতর এমনই ভয়াবহ দুর্গন্ধ, শ্বাস আটকে ফেলল রানা ও কার্টা।

রানা ভেবেছিল মেয়েটা ছিটকে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু তা করল না।

একমাত্র জানালার সামনে ঝুলছে ছেঁড়া একটা পর্দা, ওখান থেকে আবছা আলো এসে পড়েছে ঘরে। আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। একটা চেয়ার, টেবিল, সিঙ্গেল খাট, পাশেই বেডসাইড টেবিল হিসাবে একটা প্যাকিং ক্রেট। ওটার উপর অ্যাশট্রের বদলে একটা গাড়ির হাবক্যাপ, তাতে উঁচু হয়ে আছে পোড়া সিগারেটের শেষাংশ। কমপক্ষে ত্রিশ বছর আগে সাদা রং করা হয়েছিল দেয়ালে। পরবর্তী সময়ে সবই বাদামি হয়ে গেছে প্রচুর ধোঁয়ায়। এখানে ওখানে কালচে দাগ, নানা ধরনের পোকা চেপ্টে মারা হয়েছে দেয়ালে।

অগোছালো বিছানার উপর শুয়ে আছে ব্র্যাডলি এন লাজরাস, পরনে একটা পুরনো বক্সার হাফপ্যাণ্ট। পায়ে এখনও বুট। বুকের উপর থকথক করছে কালচে রক্ত।

মনোযোগ দিয়ে ক্ষতটা দেখল রানা। 'ছোট ক্যালিবারের বুলেট। টু-টু বা টু-ফাইভ, খুব কাছ থেকে গুলি করেছে। গান পাউডার পোড়ার দাগ দেখছি।' দরজা থেকে শুরু করে খাট পর্যন্ত দেখল রানা। রক্তের দাগ ফোঁটায় ফোঁটায় দরজা থেকে বিছানা পর্যন্ত এসেছে। 'খুনি টোকা দিয়েছে, লাজরাস দরজা খুলতেই গুলি করেছে। ধাক্কা দিয়ে পিছিয়ে গাইডকে ফেলেছে বিছানার উপর। ফলে আছড়ে পড়বার কোনও আওয়াজ হয়নি।'

'তোমার কি মনে হয়, আওয়াজ শুনলে এ বাড়ির কেউ দেখতে আসত?'

'বোধহয় আসত না। খুনি খুব সতর্ক ছিল। যদি গতকাল স্কি বোট খুঁজতাম, একটা সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তল পেতাম।'

ঘরে এমন কিছু থাকতে পারে যা থেকে বোঝা যাবে কে বা কারা খুন করেছে, কাজেই অ্যাপার্টমেন্টের প্রতিটি কোনা খুঁজে দেখল রানা। কিচেন-বেসিনের নীচে পেল কয়েক পুরিয়া গাঁজা, তোষকের নীচে দুটো পর্নো ম্যাগাযিন— আর কিছুই নেই। কয়েকটা খাবারের বাক্সের ভিতর অস্বাভাবিক কিছু মিলল না। অসংখ্য সিগারেটের টুকরো ও স্টাইরোফোম কফি কাপ ছাড়া ট্র্যাশক্যান খালি। খাটের পাশে মেঝেতে পড়ে আছে পোশাক, পকেট হাতড়ে দেখল রানা। পাওয়া গেল খালি একটা মানিব্যাগ, পকেটে কয়েকটা স্থানীয় কয়েন ও একটা পকেট নাইফ। এক দেয়ালের পেরেক থেকে ঝুলছে দুটো পোশাক, পকেটে কিছু নেই। রানা খুলতে চাইল জানালার কবাট, কিন্তু পুরু রঙে আটকা পড়েছে বলে ওটা উপরে তোলা গেল না।

'এটা বোঝা গেল লোকটা মারা গেছে,' দরজার দিকে রওনা হয়ে গম্ভীর স্বরে বলল রানা। কার্টা বেরিয়ে আসতেই দরজা পিছনে বন্ধ করে দিল। একবার সন্দেহ হওয়ায় কমোন টয়লেটে ঢুকে চারপাশটা দেখে নিল। ভিতরে কিছু নেই।

'এবার কী করতে চাও?' জানতে চাইল কার্টা।

'একবার কপ্টারের পাইলটের অফিসে ঢুঁ দিতে পারি,' নীরস স্বরে বলল রানা। ওর মন বলছে, ওখানে গিয়ে কোনও লাভ হবে না, কিছুই পাওয়া যাবে না।

'আমি চাই হোটেলে ফিরতে, জীবনের দীর্ঘতম শাওয়ার নেব, তারপর কমপক্ষে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ঘুমিয়ে পড়ব,' বলল কার্টা।

সিঁড়ির সবচেয়ে উপরের ধাপে থেমেছে রানা, তখনই দেখতে পেল সামনের দিকের নীচের দরজা থেকে আবছা আলো এল। এইমাত্র বাড়ির ভিতর ঢুকেছে কেউ। বামহাতে আস্তে করে কার্টাকে এক পা পিছিয়ে দিল রানা, কোমর থেকে বের করে ফেলল গ্লক পিস্তল।

এত গাধা হলাম কবে, ভাবছে। ওরা আগেই বুঝতে *পেরেছে ফিশিং বোটের উপর হামলা সফল হয়নি, ফেরেনি ইয়ট। তারপর দাদু এবেলকে খুন করতে গিয়েও ফিরল না স্কি বোট। যে তদন্ত করতে আসবে, সে অবশ্যই দেখতে আসবে ব্র্যাডলি এন লাজরাসের অ্যাপার্টমেন্ট। কাজেই নজর রেখেছে তারা।*

কয়েক সেকেণ্ড পর দু'জন লোককে দেখতে পেল রানা। তাদের হাতে ভয়ঙ্কর-দর্শন জার্মান মেশিন পিস্তল। তারপর দেখা গেল তৃতীয়জনকে, এর সঙ্গে চেকোস্লোভাকিয়ার স্করপিয়ন। প্রথম লোকটাকে ফেলে দিতে পারবে, বুঝতে পারছে রানা, কিন্তু অন্য দু'জন গুলি শুরু করলেই সিঁড়ি হয়ে উঠবে কসাইখানা।

নিঃশব্দে পিছিয়ে এল রানা, বামহাতে ধরেছে কার্টার হাত। মেয়েটা কী করে যেন বুঝে ফেলেছে মস্ত কোনও বিপদ সামনে। কোনও কথা বলছে না, রানার পাশে সাধ্যমত নিঃশব্দে পা ফেলছে।

এই বাড়ির হলওয়ে একটা বাক্সের মত জায়গা। আর পাঁচ সেকেণ্ড অপেক্ষা করলে ওদেরকে বদ্ধ জায়গায় বন্দি অবস্থায়

পেত লোকগুলো। ঘুরেই আবারও লাজরাসের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে পা বাড়াল রানা। এখন আর নিঃশব্দে চলবার মানেই হয় না, এক দৌড়ে দরজার সামনে পৌঁছে গেল, কবাট খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে। 'ভাবিনি এ পথে বেরোতে হবে,' বলল। 'আমার পিছু নাও।'

সোজা জানালার দিকে ছুটতে শুরু করেছে রানা। তিন সেকেণ্ড পর হাত দুটো সামনে রেখে সরাসরি ডাইভ দিল পুরু কাঁচের উপর। ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল জানালা, মনে হলো বিস্ফোরিত হয়েছে শক্তিশালী বোমা। ড্যাগারের মত তীক্ষ্ণ কাঁচগুলো ফালি করে দিল রানার পোশাক। লাজরাসের অ্যাপার্টমেন্টের বাইরেই করাগেটেড ধাতব ছাউনির ছাত, জানালা খুলবার চেষ্টা করবার সময় ভাল করেই দেখেছে রানা। ধাতুর ছাতের উপর ধুপ্ করে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও, সঙ্গে সঙ্গে ছড়ে গেল বাম হাতের তালু। আরেকটু হলে ডানহাত থেকে খসে যেত পিস্তলটা। লোহার ছাত আগুনের মত গরম, পুড়তে শুরু করেছে গা-হাত-পা। কয়েকবার গড়িয়ে থামল রানা, আরও দুই গড়ান দিয়ে নেমে যেতে চাইল কিনারা দিয়ে। পা দুটো তুলে ফেলেছে আকাশে, তারপর একটা বলের মত গোল হয়ে পিঠ দিয়ে পড়তে শুরু করল। ওর নেমে পড়া দেখে কেউ বলবে না ও অলিম্পিকের মেডেল পাবে, কিন্তু আছড়েও পড়ল না, নিজের পায়ের উপর ভর রেখেই দাঁড়িয়ে যেতে পারল। ছাত থেকে ঝরঝর করে নেমে এল অসংখ্য কাঁচের ছোরা।

ছাতের নীচে ছায়ায় আরাম করে বসে জাল মেরামত করছে এক বুড়ো জেলে, তার দিকে কোনও মনোযোগই দিল না রানা। এক সেকেণ্ড পর শুনতে পেল ধুপ আওয়াজ তুলে নামল কার্টা ছাউনির ছাতে। কিনারা থেকে গড়িয়ে নীচে পড়তে শুরু করেছে মেয়েটি। তৈরি ছিল রানা, ঠিক ভাবেই বুকের উপর নিতে পারল।

কিন্তু ওজনের কারণে দুই হাঁটু মুড়ে বসে পড়তে হলো ওকে।

একই সময়ে ধাতুর ছাতের উপর বেশ কয়েকটা ফুটো তৈরি হলো। মেশিন পিস্তলের গুলিতে খান-খান হলো চারপাশের নীরবতা। ছিটকে গেল লোকজন, যে যার জান নিয়ে পালাতে শুরু করেছে। এক ডজন গুলি ঢুকেছে বিশাল জালের ভিতর, ছিটকে উপরে উঠল জেলের গাঁজার প্যাকেট। ছাতের অনেক পিছনে রয়েছে জেলে, তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করল না রানা। খপ্ করে সঙ্গিনীর হাত ধরেই বাম দিকে ছুটতে শুরু করল। ওর ধারণা, ওদিকের সড়কে লোকজন বেশি।

ওদের চারপাশের মাটিতে বিঁধছে একের পর এক বুলেট। কাছাকাছি টার্গেটের জন্য তৈরি করা হয়েছে স্করপিয়ন, ওটার মালিক অতি উত্তেজনার বশে ভুলে গেছে খুঁতওয়ালা অস্ত্র দিয়ে কাউকে গাঁথতে পারবে না। এক ছুটে দশ চাকার একটা ট্রাকের আড়ালে চলে গেল রানা ও কার্টা।

'ঠিক আছ তো?' জানতে চাইল রানা।

'এখনও। এ দেশে আসার পর থেকে শুয়োরের মত খেয়েছি, এখন খারাপ লাগছে, ছুটতে গিয়ে হাঁপিয়ে যাচ্ছি।'

ম্যান ট্রাকের আড়াল থেকে চট্ করে উঁকি দিল রানা। ছাউনির ছাত থেকে নামতে চাইছে এক সশস্ত্র নামিবিয়ান। লাজরাসের জানালা থেকে তাকে কাভার দিচ্ছে পিছনের লোক দু'জন। রানাকে দেখে ফেলল তারা, এক পশলা গুলি এসে লাগল ট্রাকের পাশে। কার্টাকে নিয়ে এক দৌড়ে ক্যাবের পাশে চলে গেল রানা। পিছনের দীর্ঘ কার্গো বক্স আড়াল দিয়েছে ওদেরকে। সামনের চাকা থেকে শুরু হয়েছে লম্বা হুড, ওটার সাহায্য নিয়ে ক্যাবের ভিতর ঢুকে পড়ল রানা। পিস্তল হাতে কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে সাবধানে লক্ষ্য স্থির করল ছাউনির উপর দাঁড়ানো লোকটার দিকে। দুই পক্ষের মাঝে মাত্র পঁচিশ গজ দূরত্ব, তাই এলিভেশন

একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে হলো। সোজা গিয়ে গুলি বিঁধল লোকটার ডান বাহুতে, খাবলে তুলে নিল অনেকটা মাংস। হাত থেকে ছিটকে গেল স্করপিয়ন, বাম হাতে ক্ষতটা চেপে ধরল সে। চমকে যাওয়ায় সড়াৎ করে পিছলে গেল পা, কিনারা পেরিয়ে নীচে পড়বার আগে একহাতে করাগেটেড শিট ধরতে চাইল। ভারসাম্য রাখতে পারল না, ছেঁড়া পুতুলের মত এসে নামল মাটির উপর। দূর থেকেও শোনা গেল হাড় ভাঙবার মড়াৎ শব্দ।

তেতলার দুই গানম্যান বুঝবার আগেই জানালা থেকে সরে গেল রানা।

'এবার কী?' বিস্ফারিত চোখে রানার দিকে চাইল কার্টা।

'ওদের একজন জানালা থেকে নজর রাখবে, আমরা পালাতে চাইলেই গুলি করবে। অন্যজন নেমে আসবে সিঁড়ি বেয়ে।' ক্যাব থেকে নেমে চারপাশ দেখে নিল রানা।

শহরের এ অংশ মোটেই ব্যস্ত নয়, তার উপর এখন গোলাগুলি শুরু হওয়ায় একদম ফাঁকা হয়ে গেছে রাস্তা। মনে হলো এটা কোনও পরিত্যক্ত এলাকা। নর্দমা দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে আবর্জনা। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই।

ট্রাকের প্যাসেঞ্জার দরজা খুলে আবারও ক্যাবে উঠল রানা। না, ইগনিশনে চাবি নেই। কয়েক মিনিট ব্যয় করলে ইঞ্জিন চালু করতে পারবে, কিন্তু ওকে সে সময় দেয়া হবে এমন না-ও হতে পারে। আরেকবার অ্যাপার্টমেন্ট দেখে নিল রানা। জানালা থেকে সরে গেছে লোক দু'জন। মনে হয় পাল্টা গুলি আসতেই চমকে গেছে তারা।

চারদিকে চোখ বুলাল রানা।

পাশের দালান একসময় গ্রোসারি স্টোর ছিল, এখন জানালাগুলো আটকে দেয়া হয়েছে প্লাইউডের শিট দিয়ে। এক ব্লক দূরে একটা পার্ক। ওখানে ঘাস নেই, শুধু খড়খড়ে মাটি।

আরেক পাশে একের পর এক অ্যাপার্টমেণ্ট ভবন। মাঝে কখনও ছোট ছোট বাড়ি, দেখলে মনে হয় একটা আরেকটার উপর হেলে পড়ছে।

নেমে এসে ট্রাকের ফিউয়েল ট্যাঙ্কের উপর টোকা দিল রানা। ভিতর থেকে ফাঁপা আওয়াজ হলো। তবে বোঝা গেল, একেবারে খালি নয়। প্যাঁচ খুলে ফিলার ক্যাপ তুলে ফেলল রানা। প্রচণ্ড গরমের কারণে ট্যাঙ্কের ভিতর থেকে ধোঁয়ার মত উঠছে ডিজেলের বাষ্প।

টুকটাক কিছু জিনিস সবসময় সঙ্গে রাখে রানা, সেগুলোর ভিতর রয়েছে ছোট একটা কমপাস, পকেট নাইফ, যেনন বালবওয়ালা খুদে ফ্ল্যাশলাইট ও একটা লাইটার। ছুরিটা বের করল রানা, শার্টের নীচের দিক থেকে এক ফালি কাপড় কেটে নিল, ওটা সলতের মত পাকিয়ে নিয়ে লাইটার দিয়ে জ্বালল। কার্টাকে ট্রাকের সামনের দিকে যেতে ইশারা করল, তারপর জ্বলন্ত কাপড় ফেলে দিল ট্যাঙ্কের ভিতর।

এক দৌড়ে কার্টার পাশে চলে গেল রানা, দ্রুত বলল, 'বাম্পারের উপর ওঠো, সোজা হয়ে দাঁড়াতে যেয়ো না, মুখ খোলা রাখবে।' নিজেও উঠে পড়েছে বাম্পারের উপর। ইশারা করে জানিয়ে দিল দুই হাতে কান চেপে রাখতে হবে।

ট্যাঙ্ক যদি পুরো ভরা থাকত, প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চুরমার হয়ে যেত গোটা ট্রাক, খুঁজে পাওয়া যেত না রানা ও কার্টাকে। কিন্তু তলানিতে আছে ডিজেল, তার ভিতর কাপড়টা পড়তেই বিস্ফোরণ হলো। যা ভেবেছে তার চেয়ে অনেক বেশি ঝাঁকি খেল রানা। ওরা আছে ক্যাবের আড়ালে, সামনে গোটা ইঞ্জিন, তারপরও ওদের মনে হলো জ্বলে পুড়ে গেল দেহ। ভীষণ দুলে উঠল ট্রাক, যেন কামানের গোলা এসে লেগেছে। প্রচণ্ড আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল।

বাম্পার থেকে লাফ দিয়ে নামল রানা, চট্ করে একবার দেখে নিল পিছন দিক। যা আশা করেছে তাই দেখতে পেল। বিস্ফোরণের কারণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে গ্রোসারি স্টোরের প্লাইউড। বন্ধ সুপারমার্কেটের জানালাগুলো ঝনঝন করে ভেঙে পড়েছে। 'এসো!' তাড়া দিল রানা।

হাতে হাত রেখে ঝেড়ে দৌড় দিল ওরা, ঢুকে পড়ল প্রায় অন্ধকার গ্রোসারি স্টোরের ভিতর। একবার পিছনে চাইল রানা, পুড়তে শুরু করেছে ট্রাক। দোকানের পিছন-দেয়ালে একটা দরজা দেখে ওদিকে ছুটল ওরা। দরজা খুলতেই দেখা গেল স্টোরেজ এরিয়া ও লোডিং ডক। ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে বাইরের দরজা খুঁজে বের করল রানা। বুঝতে পারছে আততায়ীরা বুঝে নেবে ওরা এদিকে এসেছে। এখন লুকানোর সময় নেই, এক গুলিতে উড়িয়ে দিল দরজার শিকল। জিনিসটা কংক্রিট মেঝের উপর ঠনাৎ করে পড়ল। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল রানা।

গ্রোসারি স্টোর পেরুলে রাস্তা, ওপাশে চিকচিক করছে সুনীল সাগর। একটু দূরে ভাঙাচোরা ডক, সেখানে অনেকগুলো প্রাচীন চেহারার বোটের সঙ্গে বাঁধা আছে রানার লাইফবোট। এক দৌড়ে রাস্তা পেরুল রানা ও কার্টা, অসংখ্য জেটির ভিড়ে ঢুকে পড়ল, দৌড়াচ্ছে এঁকেবেঁকে। পিছনে গ্রোসারি দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে আততায়ীদের একজন, ওদের দেখতে পেয়েই তাড়া করে এল।

নৌকা মেরামত করছিল জেলেরা, তাদের ছেলেরা ডকের উপর বিছিয়ে দিচ্ছে জাল, কিন্তু বিস্ফোরণের আওয়াজে সবার চোখ চলে গেছে গ্রোসারি দোকানের দিকে। ওদিক থেকে ধোঁয়া উঠছে। এক ছুটে তাদের পাশ কাটাল রানা ও কার্টা। কাদা ও মাছের আঁশে পিচ্ছিল কাঠের ডকে ওদের দৌড়ের গতি কমল না।

করাতের তীক্ষ্ণ, কর্কশ আওয়াজ শুরু হলো, স্করপিয়নের

সমস্ত গুলি খরচ করছে আততায়ী। ডাইভ দিয়ে ডকের উপর পড়ল রানা ও কার্টা, কাঠের ডকে পড়ে পিছলে এগিয়ে গেল কয়েক ফুট। ডক থেকে খসে পড়ে গেল ছোট এক নৌকার ভিতর। ট্র্যানসমের পিছনে দেখা গেল আউটবোর্ড মোটর। এক সেকেণ্ড পর কুঁজো হয়ে দাঁড়াল রানা, কাছেই ডকের কাঠ ফাটতে শুরু করেছে।

'কার্টা, ইঞ্জিন চালু করো!'

জেটির আড়াল থেকে উঁকি দিল রানা। খুনি লোকটা আছে মাত্র পনেরো গজ দূরে, কিন্তু আউটবোর্ড ইঞ্জিনওয়ালা নৌকার কাছে আসতে হলে তাকে অনেকগুলো জেটি ডিঙিয়ে অন্তত পঞ্চাশ গজ পেরুতে হবে। পিয়ারগুলো অদ্ভুত ভাবে তৈরি করা হয়েছে। রানার মাথা দেখতে পেয়েই গুলি করতে চাইল লোকটা, কিন্তু খালি হয়ে গেছে মেশিন পিস্তলের ম্যাগাযিন।

গায়ের জোরে স্টার্টার কর্ড ধরে টান দিল কার্টা, মস্ত একটা শ্বাস ফেলল। প্রথমবারেই গর্জে উঠেছে ইঞ্জিন। ছুরির এক পোঁচে দড়িটা কেটে দিল রানা। সামনের দিকে থ্রটল ঠেলে দিল কার্টা। ডক থেকে বেরিয়ে লাইফবোটের দিকে ছুটতে শুরু করেছে নৌকা। আততায়ী বোধহয় বুঝতে পেরেছে হাতছাড়া হয়ে গেছে শিকার, সে নিজেও খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে, যে-কোনও সময়ে গুলি খেতে পারে। নামিবিয়ায় পুলিশ ফোর্স নেই এ কথা কেউ বলবে না, গত কয়েক মিনিটের গোলাগুলিতে ওয়ালভিস ও সোয়াকোপমুণ্ডের যেখানে যত পুলিশ আছে, সবাই ওই আওয়াজ পেয়েছে। আগামী কয়েক মিনিটের ভিতর বন্দরে এসে হাজির হবে তারা। আততায়ী কোনও প্রমাণ রাখতে চাইল না, অস্ত্রটা ছুঁড়ে ফেলে দিল পানিতে। ঘুরে দাঁড়িয়েই এক দৌড়ে গিয়ে ঢুকল গ্রোসারি স্টোরে।

কয়েক মুহূর্ত পর লাইফবোটের পেটে ভিড়ল ছোট্ট নৌকা। দু'

হাতে দুই জলযান ধরে রাখল রানা, সেই সুযোগে লাইফবোটে উঠে গেল কার্টা। ওর পর পর উঠে এল রানা, হাত বাড়িয়ে নৌকার থ্রটল খুলে দিল। লাইফবোটে হালকা একটা গুঁতো দিয়ে আরেক দিকে রওনা হলো ডিঙি।

দ্রুত হাতে লাইফবোটের দড়ি খুলল রানা, আগে কখনও এত তাড়াহুড়ো করে এই কাজ করতে হয়নি। তিন মিনিট পেরুনোর আগেই বন্দরের বাইরের দিকের বয়া পিছনে পড়ল, বেরিয়ে এল ওরা খোলা সাগরে। রানার একমাত্র চিন্তা এখন হার্বার প্যাট্রল আসবার আগেই আন্তর্জাতিক জলসীমায় পৌঁছানো। কর্তৃপক্ষ পিছু নিলেও যে খুব অসুবিধা হবে তা নয়, একবার হাইড্রোফয়েল চালু করলে পাখির মত ছুটতে শুরু করবে লাইফবোট।

'তোমার কী অবস্থা?' বোট সোজা করে নিয়ে জানতে চাইল রানা।

'কান ঝনঝন করছে,' বলল কার্টা। 'যা দেখালে... আগে কখনও এমন পাগলামি দেখিনি। একেবারে বদ্ধ পাগল!'

'সুন্দরী মেয়েদের সাহায্য করতে যাওয়াই তা হলে পাগলামি,' হাসল রানা। 'তাই তো বলতে চাও?'

হেসে ফেলল কার্টাও। 'এবার বলবে তুমি আসলে কে?'

'এসো একটা চুক্তি করি। দাদু এবেলের ওই এলাকা খুঁজে দেখব, বুঝব ওখানে কী ঘটছে, তারপর খুলে বলব আমার জীবনের বিস্তারিত কাহিনি— জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।'

'ঠাট্টা করছ?'

'উঁহুঁ। ভয় পেয়ো না। আগাগোড়া বলতে সময় এক মিনিটও লাগবে না।'

'তা হলে বলেই ফেলো না!'

'বেশ। আসলে আমি ফ্রেইটার মার্ভেলের ক্যাপ্টেন।'

'ব্যস? আর কোনও পরিচয় নেই?'

'আছে। আমার আসল পরিচয়: আমি একজন বাঙালী।'

রানার দিকে তিরিশ সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল কার্টা। কী বুঝল সে-ই জানে, তবে আর কোনও প্রশ্ন করল না।

বোটের জিপিএস অনুযায়ী বেশিক্ষণ লাগল না নামিবিয়ার বারো মাইল জলসীমা পেরুতে। ইঞ্জিনের গতি কমাল রানা, গুটিয়ে নিল হাইড্রোফয়েলের ডানা।

'এই ডানাওয়ালা বুড়ির উপর ভর করলে রাক্ষসীর মত তেল গেলে,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'গন্তব্যে পৌঁছে আবারও ফিরতে হলে পনেরো নট গতি তুলে যেতে হবে। পাহারা দেয়ার প্রথম পালা আমি নিলাম। শাওয়ার করার মত পানি দিতে পারব না, তবে চাইলে হাত-মুখ ধুতে পারো। নীচে গিয়ে কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো। ছয় ঘণ্টা পর তোমাকে তুলে দেব।'

ঠোঁট দিয়ে রানার গাল স্পর্শ করল কার্টা, নরম স্বরে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, রানা। সবকিছুর জন্য।'

বারো ঘণ্টা পর দাদু এবেলের সেই সাগরে চলে এল রানার লাইফবোট। এখানেই দেখা দিয়েছে ধাতব সাপ। ঝোড়ো বেগে বইছে হাওয়া, মরুভূমি থেকে এসে জলকণা শুষে শীতল হচ্ছে। সাগরে প্রচণ্ড ঝড় উঠতে পারে, কিন্তু এই লাইফবোট ডুববে না, জানে রানা। অন্য কারণে বিরক্ত হয়ে উঠছে। বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না। একটু পর ঘুটঘুটে আঁধার নামবে। শুধু তা-ই নয়, পরিবেশে খেলছে স্ট্যাটিক বিদ্যুৎ, একহাত নিচ্ছে লাইফবোটের ইলেকট্রনিক্সের উপর। স্যাটালাইট ফোনের টোন, বা রেডিওর কোনও ব্যাণ্ডে স্ট্যাটিক ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই। শেষবার যখন পরীক্ষা করেছে, জিপিএস থেকে যথেষ্ট সিগনাল আসেনি। নিশ্চিত হওয়া যায়নি অরবিটের স্যাটালাইটগুলো ঠিক তথ্য দিচ্ছে। ডেপ্‌থ্ মিটার দেখিয়েছে শূন্য ফুট। অথচ সাগরের উপর

দিয়ে ছুটে চলেছে বোট। খেপে উঠেছে কমপাস, পাগলের মত ঘুরছে কাঁটা, ওটার ভাব দেখে মনে হয়েছে ওদের চারপাশে ঘুরছে ম্যাগনেটিক নর্থ।

'তোমার কী মনে হয় পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে?' হাওয়ার শোঁ-শোঁ আওয়াজের উপর দিয়ে জানতে চাইল কার্টা। থুতনি তাক করেছে ঝড়ের দিকে।

'এখনও জানি না। মনে হয় না বৃষ্টি পড়ছে। অবশ্য হঠাৎ করে সব পাল্টে যেতে পারে।'

চোখে বিনকিউলার তুলল রানা, দূর-দিগন্তের দিকে চাইল। ওদিকে বড় ঢেউয়ের মত কী যেন। চারপাশের ঢেউগুলোও বিশাল হয়ে উঠছে। 'চারপাশে শুধু পানি ছাড়া কিছুই নেই,' কিছুক্ষণ পর বলল রানা। 'বলতে খারাপই লাগছে, কিন্তু জিপিএস ছাড়া ঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারব না।'

'এখন কী করতে চাও?'

'পুব থেকে আসছে হাওয়া, ওটার কারণে সোজা একটা পথে এগুতে পারব। আঁধার হওয়ার আগে খুঁজতে পারি। আশা করা যায় ভোরের আগেই ঝড় থামবে। ভোরে হয়তো জিপিএস-এর সাহায্য পাব।'

আন্দাজের উপর ভরসা করে দুই মাইলের লেন তৈরি করছে রানা। এগিয়ে চলেছে, তারপর যত দূর পশ্চিমে চোখ যায়, সে পর্যন্ত গিয়ে আবারও ডানে বাঁক নিয়ে ফিরছে। সাগরের বিশালতায় বড় ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে ওর নিজেকে। যেন মোয়িং মেশিন দিয়ে ঘাস কেটে চলেছে কোনও পিঁপড়ে। ধাতব সাপ খুঁজছে, কিন্তু চারপাশে খেপে উঠেছে সাগর। একেকটা ঢেউ কমপক্ষে সাত ফুটি। আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে হাওয়ার বেগ, সঙ্গে নিয়ে আসছে মরুভূমির বালির ঘ্রাণ।

একেকটা লেন শেষ করে পরেরটা ধরে আবারও ফিরছে ওরা,

দু'জন পুরোপুরি নিশ্চিতঃ বদ্ধ পাগলই ছিল বুড়ো দাদু এবেল।

কোথায় তার ধাতব সাপ? একটা ব্যাঙাচিরও তো দেখা নেই!

বহু দূরে যখন সাদা আলো দেখল রানা, ধরেই নিল ঢেউয়ের মাথায় ফেনা খেলছে। অবশ্য ওদিকে চেয়েই রইল। একের পর এক ঢেউয়ের উপর দিয়ে এল আলো, মিলিয়ে গেল না। হোল্ডার থেকে চট্ করে বিনকিউলার নিল রানা, ওর হঠাৎ নড়াচড়া খেয়াল করেছে কার্টা।

'কী হয়েছে, রানা?'

'ঠিক জানি না। হয়তো কিছুই নয়।'

ঢেউয়ের মাঝে আরেকটা খোঁড়ল হতে উঠে এল লাইফবোট। নতুন ঢেউয়ের উপর উঠতে আবারও ঝলমলে আলো দেখল রানা। ওদিকে ওটা কী বুঝতে পুরো এক সেকেণ্ড লাগল ওর, ভীষণ চমকে গেছে। বিড়বিড় করে বলল, 'ওটা ওখানে কেন?'

'কী?' ঝোড়ো বাতাসের উপর দিয়ে বলল কার্টা।

ওর হাতে বিনকিউলার ধরিয়ে দিল রানা। 'নিজের চোখেই দেখো।'

রানার চেয়ে ছোট ওর মুখ, কাজেই বিনকিউলার অ্যাডজাস্ট করে নিল কার্টা। জিনিসটার উপর নজর রেখেছে রানাও। জিনিসটা কত বড় নিশ্চিত নয়। এর সঙ্গে অন্য কিছু তুলনা করতে পারবে না। দৈর্ঘ্যে এক হাজার ফুট তো হবেই। রানা বুঝতে পারছে না এই জিনিস আলম সিরাজের চোখ এড়িয়ে গেল কীভাবে। এদিক দিয়েই কপ্টার চালিয়ে গেছেন ভদ্রলোক।

তারপর হঠাৎ জিনিসটার পাশ থেকে অতি উজ্জ্বল সাদা আলোর বিচ্ছুরণ হলো। মাথার উপরের মেঘে লেগে ফিরে এল ঝলমলে আলো। ওটা কমপক্ষে দুই মাইল দূরে, একটু বেশিও হতে পারে, কিন্তু হাজার মাইল গতি তুলে আসছে!

ইজরায়েলের তৈরি রাফায়েল স্পাইক-এমআর অ্যান্টি ট্যাঙ্ক

মিসাইল!

বড় দ্রুত আসছে!

মাত্র একবার মুখ খুলবার সময় পেল রানা, চেঁচিয়ে উঠল, 'কার্টা, পানিতে ঝাঁপ দাও!'

আগেই ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগের ভিতর রেখেছে স্যাটালাইট ফোন, পরের সেকেণ্ডে সঙ্গিনীর কোমর জড়িয়ে ধরে লাইফবোটের রেলিং টপকে ঝাঁপ দিল সাগরে। বোট থেকে পানিতে পড়েই পাগলের মত সাঁতরাতে শুরু করেছে দু'জন। অনেক দূরে সরতে হবে, নইলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হবে।

পিছনে জ্বলজ্বলে আগুন জ্বেলে আসছে ইজরায়েলি মিসাইল!

রকেটের ডুয়াল ইলেকট্রো-অপটিক এবং ইনফ্রারেড সিকার ঠিক ভাবেই নিশ্চিত হলো: সামনে টার্গেট। সাগরের উপর দিয়ে তীরের মত এল মিসাইল, তার জানা হয়ে গেছে লাইফবোট ইঞ্জিনের হিট সোর্স কোথায়। লঞ্চ হওয়ার কয়েক সেকেণ্ড পর বোটের খোল ভেদ করল ওটা। ছোট একটা গর্ত তৈরি করে ইঞ্জিনের খুব কাছে পৌঁছেই ডেটোনেট হয়েছে। লাইফবোট এমন ভাবে তৈরি, ওটার ইঞ্জিনের আগে রয়েছে একফুট আর্মার, কিন্তু পড়পড় করে ফেটে পড়ল বোটের গোটা তলি। এক লাফে তিরিশ ফুট উপরে উঠল লাইফবোট। ততক্ষণে ওটা পরিণত হয়েছে একটা জ্বলন্ত আবর্জনায়।

দু' টুকরো হয়েই পানিতে পড়ে ডুবে গেল বোট। ওখান থেকে ভুস-ভুস করে বেরুল তপ্ত ইঞ্জিনের সাদা বাষ্প।

ওয়ালভিস বে-তে যে ট্রাকের ট্যাঙ্ক ফাটিয়েছে রানা, তার চেয়ে ঢের বেশি ওভারপ্রেশার ওয়েভ চারপাশে ছড়িয়ে গেল। রানা বা কার্টা যদি বোটে থাকত, স্রেফ হালুয়া হতো। বিশাল সব ঢেউয়ের ভিতর ভেসে থাকতে চাইছে ওরা।

কয়েক ঢোক পানিও গিলে ফেলেছে কার্টা, বিস্ফোরণ এলাকা

থেকে সরে যেতে চাইছে।

মহা বিক্ষুব্ধ সাগরে একবার পুব দিকে চাইল রানা।

ওদিকে দেড় শ' মাইল দূরে উপকূল!

•

সতেরো

সুদূর মরুভূমি থেকে ধেয়ে আসছে তুমুল হাওয়া, দুলিয়ে চলেছে কালো অতলান্তিক মহাসাগরকে। পশ্চিমে চলেছে একমাথা উঁচু ঢেউয়ের সারি, তার ভিতর দিয়ে দেখা গেল অনেক দূরে জ্বলজ্বলে সাদা কী যেন। আকাশে ঘন কালো মেঘে ঝলসে উঠছে ভয়ঙ্কর বিজলি। হঠাৎ সাপের মত এঁকেবেঁকে সাগরে নেমে এল নীলচে বিদ্যুৎ, পরক্ষণে বিকট কড়-কড়াৎ আওয়াজে কাঁপিয়ে দিল চারপাশ। মাত্র এক শ' গজ দূরে বাজ পড়েছে। কানে তালা লেগে গেছে, শিরদাঁড়ার পাশে পিস্তল গুঁজে বামহাতে সঙ্গিনীর কোমর জড়িয়ে ধরল মাসুদ রানা, দুই পা চলছে সাইকেলের প্যাডেলের মত।

'জানতে চেয়ো না কেমন আছি,' কয়েক মুহূর্ত পর কাশতে কাশতে বলল কার্টা। 'গতকাল চারবার জানতে চেয়েছ। এখন তার চেয়ে অবস্থা ঢের খারাপ।'

'একবার নিরাপদ আশ্রয় পেলেই...' ডান পায়ের বুটের ডগা দিয়ে বাম বুট খুলতে শুরু করেছে রানা, 'তার আগে যতদূর পারা যায় সরতে হবে। জাহাজ থেকে কাউকে না কাউকে পাঠাবে।'

'ঠিক। ...কিন্তু কোথাও তো কোনও আশ্রয় নেই!'

'ঠিকই মিলবে। চিন্তা কোরো না।'

'আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ, যা সন্দেহ করছি সেদিকেই?'

'হ্যাঁ, দাদু এবেলের সাপের বাড়িতেই উঠব।'

সাগরে এক মাইল সাঁতার সুঠামদেহী দু'জনের জন্য খুব কঠিন নয়, কিন্তু ঝড়ের ভিতর চারপাশ থেকে ওদের উপর চড়াও হচ্ছে মস্ত সব ঢেউ। সামনে এগোনো প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। অন্য কারণে কার্টা ও রানার জন্য অনেক বেশি বিপজ্জনক সামনের সাগর। গতকাল ওদের উপর যে সাদা লাকযারি ইয়ট হামলা করেছে, ঠিক তেমনই আরেকটা দেখতে পাচ্ছে। একচোখো দানবের মত জ্বলজ্বলে সার্চলাইট ফেলেছে সাগরে। উন্মাতাল ঢেউয়ের ভিতর সম্ভবত রানাকে দেখে ফেলেছে ওই ইয়ট, ওটা বেঁধে রাখা হয়েছে একটা জেটিতে।

'একটা ইয়ট কিনুন তা হলে যমজটা ফাও দেব, এমন হতে পারে?' প্রশ্ন নয়, মন্তব্য করল রানা।

'সুপারমার্কেটে আলুর চিপস কিনলে আমি তো ফাও পাই না কিছুই,' নালিশের সুরে বলল কার্টা।

পনেরো মিনিট সাঁতার কেটে জোরালো সার্চলাইট এড়িয়ে এগোল ওরা। কিছুক্ষণ পর লাইফবোট সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে বুঝতে পেরে সার্চলাইট নিভিয়ে দিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল জেটিতে বাঁধা ইয়ট। শোঁ-শোঁ ঝোড়ো হাওয়ার উপর দিয়ে এবার শুনতে পেল শক্তিশালী জেনারেটারের গম্ভীর আওয়াজ। ওটার কারণেই রানা নিশ্চিত হলো কোন্ দিকে যেতে হবে।

বরফ-ঠাণ্ডা পানি যেন শুষে নিতে চাইছে ওদের সমস্ত শক্তি। সঙ্গিনীর হাতে গ্লক পিস্তল ও স্যাটালাইট ফোনের থলি ধরিয়ে দিল রানা। টেনে হেঁচড়ে খুলে ফেলল প্যান্ট, ওটার দুই গোড়ালিতে শক্ত গিঁঠ দিল, তারপর প্যান্টের কোমরের দিক উপরে তুলে বাতাস সহ ডুবিয়ে দিল সাগরে। প্যান্টের কোমরে শক্ত করে এঁটে

দিল বেল্ট। জিনিসটা ঝুলির মত দেখাল। এবার ওটার কারণে সহজে ভাসবে কার্টা। পিস্তল ও ফোনের থলি ফেরত নিল রানা, বদলে দিয়ে দিল ওর তৈরি লাইফ প্রিযার্ভার। বলল, 'পানির নীচে প্যান্টের কোমরে হাত রেখো, নইলে বেরিয়ে যাবে বাতাস।'

'শুনেছি এভাবে বেঁচেছে ডুবন্ত মানুষ, কিন্তু এই জিনিস আগে দেখিনি।'

কার্টা এখনও দাঁতে দাঁত ঠুকছে না, কিন্তু রানা টের পেল, ওর কণ্ঠে ক্লান্তির সুস্পষ্ট ছাপ। কথা চালিয়ে গেল রানা, 'খেপা সাগরের চেয়ে এটা দিয়ে সুইমিং পুলে প্র্যাকটিস ঢের সোজা।'

বাতাস ভরা প্যান্ট নিয়ে আগের চেয়ে সহজে ভাসছে কার্টা। গন্তব্যের কাছে চলে এসেছে ওরা। কাছ থেকে দাদু এবেলের ধাতুর সাপ বিশাল, ছোট করে দিয়েছে সব বড় ঢেউকে।

'তুমি টের পেয়েছ?' জানতে চাইল কার্টা।

'কী?'

'পানি। আগের চেয়ে গরম।'

রানা ধারণা করল: আর বেশিক্ষণ এই শীত সইতে পারবে না কার্টা। ঠাণ্ডার বোধ কমে গেছে, হাইপোথারমিয়ার কারণে একটু পর নিঃশব্দে তলিয়ে যাবে। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর চমকে গেল ও। সত্যিই পানি এখানে আগের চেয়ে কিছুটা গরম। অল্পক্ষণেই বেড়ে গেল আরও— কমপক্ষে দশ থেকে বারো ডিগ্রি বেশি। একবার ওর মনে হলো, এদিকের পানির তাপমাত্রা বাড়ছে কোনও সক্রিয় জিয়োথারমাল ভেন্টের কারণে। অথবা হতে পারে সাগরের উপর ভাসমান ওই বিশাল জিনিসগুলো তৈরি করছে উত্তাপ, কোনও ভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিপুল শক্তি।

দাদু এবেল যেগুলোকে বলেছে ধাতুর সাপ, সেগুলো আসলে ফ্যাকাসে সবুজ রঙের পাইপ। ডায়ামিটারে একেকটা ত্রিশ ফুট, মাত্র ছয় ফুট জেগে আছে পানির উপর। এসব পাইপ বোধহয়

ধাতুর তৈরি নয়, প্রতিটি ঢেউয়ের সঙ্গে গা মোচড়াচ্ছে, উঠছে-নামছে। রানার ধারণা সঠিক হলো, দৈর্ঘ্যে একেকটা এক হাজার ফুটেরও বেশি।

কাছে পৌঁছে রানা টের পেল, এদিকের পানির উষ্ণতা কমপক্ষে আশি ডিগ্রি। তারপর ওরা পৌঁছে গেল প্রথম পাইপের পাশে। জিনিসটার গায়ে হাত রাখল রানা। বেশ তাপ বেরুচ্ছে ওটার ভিতর থেকে। সেই সঙ্গে রয়েছে একটা কম্পন। পাইপের ভিতর কাজ করছে কোনও মেশিনারি। সাগরের দুলুনির সঙ্গে যেন সামনে-পিছনে সরছে বিশাল কোনও পিস্টন।

পাইপের দশ ফুট দূর দিয়ে এগুতে শুরু করল রানা ও কার্টা। এখন আর পাইপের উপর ওদেরকে আছড়ে ফেলবে না ঢেউ। এভাবে কয়েক শ' ফুট যাওয়ার পর পাওয়া গেল একটা হিঞ্জ পয়েন্ট। এদিকে এসে বহুগুণ বেড়েছে মেশিনারির আওয়াজ, সন্দেহ নেই ওই জিনিস ঢেউগুলোকে কোনও ধরনের শক্তিতে পরিণত করছে। উপরে উঠতে বা নামতে পাইপের পাশে লোহার ধাপ ঝালাই করে আটকানো আছে, উপরে রয়েছে বিশাল এক হিঞ্জ। আগে কার্টাকে পাইপের উপর উঠতে দিল রানা, তারপর উঠতে শুরু করল নিজেও। উপরে উঠে ওর প্যান্ট থেকে বাতাস ছেড়ে দিল কার্টা, গোড়ালির গিঁটদুটো খুলে সঙ্গীর দিকে প্যান্ট বাড়িয়ে দিল।

আবছা আলোয় রানার উরুর দিকে চাইল, নিচু স্বরে বলল, 'বেশ কয়েকবার উরুতে গুলি খেয়েছ।'

'কপাল মন্দ ছিল।'

'এক মিনিটের কাহিনি নয়, আমাকে জানতেই হবে তোমার গোটা জীবনের কাহিনি।'

'বিপদ থেকে বেঁচে নাও আগে।' রানা ভাবতে শুরু করেছে: কীভাবে এসব পাইপ এড়িয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ!

মার্ভেল থেকে কপ্টার নিয়ে এদিকে এসেছেন, ঘুরে গেছেন, কিন্তু কিছুই দেখেননি কেন? এবার অন্য দিকে মন দিল রানা, প্রথমেই চারপাশের পরিস্থিতি বুঝতে হবে। ওই যে দূরে পাইপের আরেক মাথায় জেটিতে এসে ভিড়েছে ইয়ট। ওখানে যেসব লোক থাকবে, তারা ওদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

প্যান্ট পরে পাইপের উপরের হ্যাচের কাছে চলে গেল রানা। দুই হাতে টান দিতেই খুলে গেল হ্যাচ, নীচে দেখা গেল আরেকটা হ্যাচ। ঠিক করল, পরে ওখানে নেমে ঘুরে দেখবে। আপাতত স্যাটালাইট ফোনের থলিটা রেখে দিল নীচের গরম হ্যাচের উপর। আবারও আটকে দিল বাইরের ঢাকনি।

কয়েক পা সরে কার্টার দুই হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিল, চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমি একটু ঘুরে ফিরে দেখতে চললাম। এখানে কতক্ষণ থাকতে হবে জানি না, কাজেই কোনও বাহাদুরি না দেখিয়ে চোরের মত গা ঢাকা দিয়ে থাকার চেষ্টা করব। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি চাই তুমি এখানে অপেক্ষা করো, কিন্তু কোনও জোর করব না।'

'আমি তোমার পাশে থাকতে চাই।'

'ঠিক আছে। তা হলে চলো।'

পরবর্তী পাঁচ শ' ফুট কুঁজো হয়ে দৌড়ে চলল ওরা, তারপর আরও সতর্ক হলো। এখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সামনে বাড়লে ইয়ট থেকে সহজেই ওদেরকে দেখা যাবে। রানার নির্দেশে শুয়ে পড়ল কার্টা, ওর পাশে ক্রল করে এগুতে শুরু করল রানা। একটু পিছিয়ে পড়ছে কার্টা। বড় ঢেউ এলে মসৃণ পাইপের উপর দু' হাত ছড়িয়ে ভারসাম্য রাখতে চেষ্টা করছে ওরা। কখনও কখনও চাবুকের মত ছিটকে উঠে ঝাঁকি দিচ্ছে পাইপ।

জীবনে কোনদিন সি-সিকনেস হয়নি রানার, কিন্তু পাইপের বিদ্‌ঘুটে দুলুনির কারণে এখন ওর মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। সঙ্গিনীর দিকে চাইল। সবজেটে হয়ে উঠেছে কার্টার মুখ।

ইয়ট থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে কার্টাকে নিয়ে থামল রানা, হাতের ইশারা করল। এখন থেকে পাইপের ঠিক উপর দিয়ে এগুতে হবে, তা হলে ইয়টের ডেক থেকে কেউ ওদেরকে দেখবে না। আবার এগুতে শুরু করল ওরা, কয়েক মিনিট পর পৌঁছে গেল ইয়টের বারো ফুট দূরে। উপর থেকে পরিষ্কার দেখা গেল পাইপের শেষমাথায় একটা জেটিতে বাঁধা রয়েছে ওটা। পাইপ ও জেটির মাঝে হেভি ডিউটি ফেণ্ডার, ঢেউয়ের দোলায় ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলছে। ইয়টের কেবিনের জানালা থেকে উজ্জ্বল আলো সাগরে পড়ছে। ব্রিজে সবুজ আবছা আলো, ওটা আসছে রেইডার মনিটর থেকে। সুদীর্ঘ ফোরডেকের মেঝেতে রাখা একটা ট্রাইপড, তার উপর রকেট লঞ্চার।

রানা নিজে এই অপারেশনের দায়িত্বে থাকলে অধীনস্থদের চাকরি থেকে কান ধরে বের করে দিত, কোথাও কোনও শৃঙ্খলা দেখল না ও। কমপক্ষে এক মাইল দূর থেকে চোখে পড়বে ইয়ট, এবং এই বিদ্যুৎ-ঝড়ের ভিতর ছোট কোনও নৌকা নিয়ে এলে সহজেই রেইডার ফাঁকি দিয়ে চলে আসবে সেটা ইয়টের পাশে।

মনে মনে স্বীকার করে নিল রানা, ওরা যখন এদিকে এল, লোকগুলো ভালভাবেই ওদেরকে ফাঁদে ফেলেছে।

পরবর্তী একঘণ্টা পাইপের উপর শুয়ে অপেক্ষা করল ওরা। ভেজা কাপড়ে দেহে কাঁপুনি শুরু হতো, হু-হু ঠাণ্ডা বাতাসও বইছে, কিন্তু পাইপ থেকে আসা তাপ সুস্থ রাখল ওদেরকে। রানা ধারণা করল, চারজন লোক আছে ইয়টে, পালা করে ব্রিজে রেইডারের ডিসপ্লের উপর নজর রাখছে। মার্ভেলের লাইফবোট উড়িয়ে দেয়ার পরেও প্রত্যেকের সঙ্গে অস্ত্র। কিন্তু দেড় ঘণ্টা

পেরুনোর পর পাহারায় ঢিল দিল তারা। রানা খেয়াল করল, এরা একে একে হাত ছাড়া করেছে মেশিন পিস্তল।

ইয়টে রয়েছে চারজন, তাদের বিরুদ্ধে একদম একা রানা। ও অন্তর দিয়ে বুঝল, এ অসম লড়াইয়ে বিজয়ী হতে হলে আচমকা হামলা করতে হবে, কোনও সুযোগ দেয়া চলবে না শত্রুকে।

'যা করার আমি একাই করব,' কার্টাকে বলল রানা, পাইপ থেকে পিছলে নামতে শুরু করেছে।

ওর কঠোর কণ্ঠস্বর শুনে একবার শিউরে উঠল কার্টা। ভাবছে, কোথায় হারিয়ে গেল চেনা মানুষটা! পাষাণের মত হয়ে উঠেছে তার মুখ!

কোনও আওয়াজ না করেই পাইপ থেকে ভাসমান জেটিতে নেমে এল রানা। একবারের জন্যও চোখ সরল না ইয়টের ব্রিজের উপর থেকে। এক লোক ব্রিজে নাইট ভিশন গগলসের ভিতর দিয়ে চেয়ে রয়েছে ঝড়ের দিকে। আলতো পায়ে জেটি পেরুল রানা, নিঃশব্দে গানওয়েল পেরিয়ে উঠে পড়ল ইয়টের পিছন ডেকে। একটু দূরে একটা কাঁচের স্লাইডিং ডোর, ওটা সরিয়ে দিলে যাওয়া যায় কেবিনে। আরেক দিকে মইয়ের কয়েকটি ধাপ, প্রতিটি গেঁথে দেয়া হয়েছে বোটের ফাইবারগ্লাস খোলের ভিতর। ধাপ ক'টা পেরুলেই উঁচু ব্রিজ।

জোরালো হাওয়া শক্ত ভাবে ঠেসে রেখেছে ব্রিজের দরজাকে।

সামান্য কুঁজো হয়ে সিঁড়ির ধাপ পেরুতে শুরু করল রানা, একপাশে ফিরিয়ে রেখেছে মুখ, কিন্তু চোখ দরজার উপর। তরতর করে সিঁড়ির সবচেয়ে উঁচু ধাপে উঠল, এখন মুখের একপাশ দেখা যাবে ব্রিজ থেকে। কিন্তু লোকটা দেখছে সামনের সাগর। নিঃশব্দে দরজা খুলে শামুকের গতিতে ব্রিজে ঢুকল রানা। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চলেছে। একপাশে ড্যাশবোর্ডের উপর পড়ে আছে মেশিন পিস্তল। লোকটা দৈর্ঘ্যে রানার চেয়ে কমপক্ষে তিন ইঞ্চি উঁচু,

ওজনও ওর চেয়ে তিরিশ পাউণ্ড বেশি। এই প্রকাণ্ড দানবকে দেখে একটু দমেই গেল রানা। এর শ্বাসনালী চেপে ধরে কীভাবে অজ্ঞান করবে? এ তো লড়বে মর্দা ষাঁড়ের মত!

নিঃশব্দে দশ ফুট গিয়ে শত্রুর পিছনে পৌঁছুল রানা। আর ঠিক তখনই দমকা হাওয়া দুলিয়ে দিল গোটা ইয়টকে। একই সময়ে চোখ থেকে গগলস খুলতে শুরু করেছে লোকটা। তার দুই হাতের ভাঁজে ডান হাত ভরে দিল রানা, খপ্ করে থুতনি চেপে ধরেই ডানদিকে প্রচণ্ড মোচড় দিল, একইসঙ্গে বাম কাঁধের সমস্ত জোর খরচ করল শত্রুর মাথার পিছনটা বাম দিকে ঘুরিয়ে দিতে। দ্বিমুখী টান খেয়ে মড়াৎ করে ভেঙে গেল দানবের ঘাড়ের হাড়। অতবড় লোকটা মুহূর্তে শিথিল হলো। দু' হাতে লাশটা ধরে ফেলল রানা, আস্তে করে শুইয়ে দিল ডেকের উপর।

'এখন তিনজনের বিরুদ্ধে একজন,' মনে মনে বলল রানা। খুন করে কোনও অনুশোচনা নেই ওর। মাত্র দু' ঘণ্টা আগে সতর্ক না করেই রকেট দিয়ে ওদের লাইফবোট উড়িয়ে দিয়েছে এই লোকগুলো— যেন যা-খুশি করার অধিকার দিয়েছে ঈশ্বর ওদের।

ব্রিজের আরেক পাশে সরে এল রানা, সামনে শুরু হয়েছে সরু ক্যাটওয়াক, ওটা চলে গেছে সামনের লম্বা ফরওয়ার্ড ডেকে। ওদিক আবার মিশে গেছে ইয়টের পিছনের ডেকে। ওখানে ডানে এবং বামে কয়েকটা জানালা। এখন সব জানালা আঁধার, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর একটা জানালা থেকে সামান্য আলোর আভাস এল। কেবিনের ভিতর চলছে টেলিভিশন। ওদিকে মনোযোগ দিল রানা, ব্রিজ থেকে নেমে পা টিপে টিপে চলে গেল ওই জানালার পাশে। উঁকি দিতেই দেখল গার্ডদের একজন বসে আছে চামড়ার সোফায়, ডিভিডিতে মনোযোগ দিয়ে দেখছে মার্শাল আর্টের সিনেমা। প্রায় অন্ধকার কিচেনেটের ভিতর আরেক গার্ড, গ্যাস বার্নারে ফোঁস-ফোঁস করছে চায়ের কেতলি। ওই লোকের কাঁধ

থেকে ঝুলছে পিস্তলের হোলস্টার। অন্য লোকটার সঙ্গে অস্ত্র আছে কি না নিশ্চিত হতে পারল না রানা।

এই দুই গার্ড ঘরের ভিতর যেদিকে রয়েছে, তাতে অ্যাফ্‌ট্ ডেক থেকে পুরো নিশ্চিত হয়ে গুলি চালাতে পারবে না রানা। আরেকটা বড় সমস্যা হতে পারে: ওর জানা নেই চতুর্থ লোকটা কোথায়। যদি ধরে নেয়া যায় সে ঘুমিয়ে আছে, গোলাগুলি শুরু হলেই অস্ত্র হাতে হাজির হবে। চোখ পাকিয়ে নিজেকে শাসন করল রানা। কোনও কিছুই আন্দাজে ধরে নেয়া ঠিক নয়। একটু ভুল হলেই মাশুল হিসাবে দিতে হবে বিসিআই চিফের কাছে বন্ধক দেয়া সাধের প্রাণটা।

চকচকে পালিশ দেয়া অ্যালিউমিনিয়ামের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রানা, ওয়াকওয়েতে বাড়তি একটু জায়গা বের করে নিয়েই গুলি শুরু করল। স্টোভের সামনের লোকটাকে লক্ষ্য করে দুটো গুলি গেল। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়েছে গার্ড, প্রবল একটা ঠেলা খেয়ে উঠে গেছে জ্বলন্ত চুলার উপর। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে গেছে শার্টে।

কিন্তু কাউচে বসে থাকা লোকটা যেন ক্ষিপ্র বিড়াল, তার চেয়েও বেশি কিছু, রানা মাযল ঘোরাবার আগেই বাঘের মত ঝাঁপ দিল সে। রানার দুটো গুলি ফাঁসিয়ে দিল কাউচের পেট, ছিটকে বেরুল একগাদা তুলা। ততক্ষণে দামি কার্পেটের উপর শরীর গড়িয়ে দিয়েছে লোকটা।

তৃতীয়বারের মত মাযল ঘোরাল রানা, কিন্তু লোকটা চলে গেছে ঘরের আরেক প্রান্তে বার কাউন্টারের পিছনে। একের পর এক গুলি করে লোকটাকে মোরব্বা করবার মত অ্যামিউনিশন রানার কাছে নেই। মনে মনে নিজেকে গালি দিল। খামোকা দুটো গুলি খরচ করেছে কাউচের উপর।

নিজেও আড়াল নিয়েছে ও, পাঁচ সেকেণ্ড পর জানালার কোণ

থেকে উঁকি দিয়ে দেখল কাউন্টারের পিছনে লোকটার হাতে মেশিন পিস্তল। সে-ও দেখতে পেয়েছে জানালার পাশে দাঁড়ানো শত্রুকে, দেরি না করে ট্রিগার টিপেছে। তার আগেই ঝুপ্ করে ডেকের উপর বসে পড়েছে রানা। এক পশলা গুলি ঝনঝন করে ভেঙে দিল জানালার কাঁচ। রানা আন্দাজ করল, অনিশ্চিত ভাবে গুলি করতে গিয়ে ম্যাগাযিনের অর্ধেক শেষ করে ফেলেছে লোকটা।

জানালা দিয়ে বেরুনো বুলেটগুলো রানার পিছনে বিশাল স্টিলের পাইপে গিয়ে লেগেছে, কারও ক্ষতি না করেই ছিটকে বেরিয়ে গেছে অন্ধকার আকাশে। রানার একবার মনে হলো লাফ দিয়ে সরে যায় পিছনের ডেকে, ওখান থেকে এক দৌড়ে নেমে পড়বে জেটিতে। কিন্তু তা না করে খপ্ করে ধরল রিট্র্যাকটেবল ছাউনির অ্যালিউমিনিয়ামের দণ্ড, দুই হাতের জোরে ঘুরিয়ে নিল দেহ, পরক্ষণে উঠে গেল সিঁড়ির ধাপের উপর। চিতার মত ছুটতে শুরু করেছে। কয়েক সেকেণ্ডে পৌঁছে গেল ভাঙা জানালার উপরের রেলিঙে।

জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল প্রহরীর নাক-বোঁচা মেশিন পিস্তল। শিকারকে বাগে পাওয়ার জন্য একবার পিস্তল উঁচু করছে, আবার নিচু করছে, এদিক থেকে ওদিকে সরিয়ে চলেছে মাযল। অত্যন্ত বিচলিত লোক। যখন দেখল ক্যাটওয়াকে পড়ে নেই রানার লাশ, জানালা দিয়ে মাথা ও দেহের উপরের অংশ বের করল। ইয়টের সামনে ও পিছনে দেখতে শুরু করেছে। তাতেও যখন দেখা গেল না লাশ, বাধ্য হয়ে জানালা দিয়ে অর্ধেক দেহ বের করে উঁকি দিল জেটির উপর।

'দোস্তো, তুমি কিন্তু ভুল দিকে খুঁজছ,' নিচু স্বরে বলল রানা।

চরকির মত কাঁধ ঘুরিয়ে আকাশের দিকে স্করপিয়ন তাক করতে চাইল সে। জবাবে তার কপালে লাল একটা ফুটো তৈরি

করল রানা। ইয়ট ও জেটির মাঝের ফাঁক দিয়ে পড়ে গেল মেশিন পিস্তল।

কিন্তু গ্লক পিস্তলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ চতুর্থ গার্ডকে জানিয়ে দিয়েছে কোথায় রয়েছে রানা। ব্রিজের মেঝে যেন বিস্ফোরিত হলো। নীচ থেকে কেবিনের ছাতে রুক্ষ সব গর্ত তৈরি করছে গার্ড। বুলেট রানার বাম পাশের মেঝে খুবলে দিল। একটা বুলেট শার্টের কনুই ছিঁড়ে নিতেই ঝেড়ে দৌড় দিল ও, এক লাফে গিয়ে উঠতে চাইল ব্রিজের ড্যাশবোর্ডের উপর। কিন্তু পিছলে গেল বাম পা, হুড়মুড় করে পড়ল ও নিচু উইণ্ডস্ক্রিনের উপর। ঢালু কাঁচটা ভেঙে সর-সর করে নেমে চলেছে। সামনেই নীচে আরেকটা কেবিনের দরজা।

ডেকের উপর পিঠ দিয়ে ধড়াস্ করে পড়ল রানা, ব্যথা পেয়ে ভুস্ করে বেরিয়ে গেল ফুসফুসের সমস্ত বাতাস। চোখে আঁধার দেখছে, তারই ফাঁকে এক গড়ান দিয়ে দুই হাঁটুর উপর ভর করে উঠে বসল। ঘুরেই দেখতে পেল চমৎকার ইয়টের পশ কেবিনের একটার ভিতর নড়ে উঠেছে চতুর্থ গানম্যান। পিছনের কেবিনে যে পাইপ গ্যাস দিত স্টোভকে, সেটা থেকে দাউ-দাউ আগুন ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। জ্বলছে মেইন সেলুন, ছাত চাটছে নীল আগুন। গলন্ত প্লাস্টিকের টুকরো পড়ছে কার্পেটের উপর, তৈরি হচ্ছে খুদে আগুন।

লেলিহান শিখার শোঁ-শোঁ আওয়াজের উপর দিয়ে রানার পতনের আওয়াজ শুনেছে চতুর্থ গার্ড। কেবিনের ছাতের দিক থেকে মেশিন পিস্তলের নল সরিয়ে নিল সে, এক দৌড়ে পৌঁছে গেল জানালার পাশে, জানালা না খুলেই কাঁচের ওপাশ থেকে গুলি শুরু করেছে। চওড়া প্যানের উপর তৈরি হচ্ছে মাকড়সার বহু জাল, ছিটকে রানার উপর ঝরঝর করে পড়ছে অজস্র হীরকখণ্ডের মত কাঁচের টুকরো।

দু' সেকেণ্ড অপেক্ষা করে উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে রানা, গার্ডের দিকে তাক করেছে পিস্তল। ওদিকে দুর্বল হয়ে যাওয়া সেফটি গ্লাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটা। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল পুরো কাঁচ, গার্ডের উড়ন্ত দেহ এসে ধাক্কা দিল রানার বুকে। ধড়াস্ করে আবারও পড়ে গেল রানা। পড়বার সময় এক হাতে লোকটার পা পেঁচিয়ে ধরেছে। প্রায় একইসঙ্গে ডেকের উপর পড়ল দু'জন। রানার উপর পড়েছে গার্ড, কিন্তু দু'জনের মাঝে আটকা পড়েছে মেশিন পিস্তল, ওটাকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল সে। রানার ডান কবজি ও পিস্তল বামহাতে গেঁথে রেখেছে মেঝের সঙ্গে। কপাল দিয়ে রানার নাক ভেঙে দিতে চাইল লোকটা। একই সময়ে থুতনি উপরে তুলল রানা, গার্ডের মাথার তালুতে ঠকাস্ করে নামল ওর থুতনির হাড়। ব্যথায় মুখ কুঁচকে ফেলল দু'জনই। চোখের সামনে দেখছে অসংখ্য লাল-নীল-হলুদ নক্ষত্র।

তিন সেকেণ্ড পর নড়ে উঠল গার্ড, ভুল করে ছেড়ে দিয়েছে শত্রুর ডানহাত। সুযোগ পেয়েই পিস্তলের নল তুলে লোকটার ডান কানের উপর তাক করে ফেলেছে রানা। পরক্ষণে ট্রিগার টিপে দিল। ওর বুকের উপর জোর কয়েকটা ঝাঁকি খেল লোকটা, তারপর শেষবার শরীর মুচড়ে হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। তার দুই কান থেকে কুলকুল করে নামছে উষ্ণ রক্ত, ভিজিয়ে দিচ্ছে রানার মুখ-গলা-বুক। পিস্তলটা ডেকের উপর রাখল রানা, দুই হাতে বুকের উপর থেকে সরিয়ে দিল লাশ।

পিস্তলটা আবারও তুলে নিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। খুব হতাশ হলো ইয়টের পিছন দিক দেখে। ভয়ঙ্কর আগুনে জ্বলছে সবই। জোরালো হাওয়ার কারণে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে অসংখ্য লাল-হলুদ-নীল শিখা। কোনও ভাবেই ইয়টকে রক্ষা করা যাবে না। রেলিঙের পাশে চলে গেল রানা, ওটা টপকে নেমে পড়ল জেটিতে। রক্ত ধুতে একবার সাগরে নেমে ডুব দিয়ে আবারও

জেটির উপর উঠল। ঝোড়ো হাওয়ার রাতে বিষণ্ন শোনাল ওর কণ্ঠ, 'কার্টা, তুমি এবার বেরিয়ে আসতে পারো।'

প্রকাণ্ড পাইপের শেষপ্রান্ত থেকে উঁকি দিল ভীত মেয়েটি। অন্ধকার রাতে মরাটে চাঁদের মত ফ্যাকাসে দেখাল ওর মুখ। আস্তে করে হাঁটু গেড়ে বসল ওখানেই। দ্রুত ওর পাশে চলে গেল রানা। হঠাৎ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে কার্টার চোখদুটো। মুখ খুলল কী যেন বলতে। তার আগেই রানা আন্দাজ করে নিয়েছে। চরকির মত ঘুরল ও, তার আগেই গ্লক তুলতে শুরু করেছে। ইয়টের পঞ্চম গার্ড বেরিয়ে এসেছে ডেকে, একহাতে পিস্তল, অন্য হাতে একটা ব্রিফকেস। রানার চেয়ে চালু হাত তার।

রানার পাঁজরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গার্ডের বুলেট। কিন্তু দ্বিতীয় কোনও সুযোগও পেল না সে। পর পর দুটো গুলি ছুঁড়ল রানা। লোকটার গলার পাশ দিয়ে গেল প্রথম গুলি। দ্বিতীয়টা লাগল ঠিক বাম বুকে, হৃৎপিণ্ডের উপর। হোঁচট খেয়ে পিছিয়ে গেল লোকটা, কাটা কলাগাছের মত আছড়ে পড়ল। আগেই ট্রিগার টিপে ধরেছে, দুই সেকেণ্ডে বেরিয়ে গেল ম্যাগাযিনের সমস্ত গুলি।

কার্টা ঠিক আছে কি না দেখতে চট্ করে ঘুরে চাইল রানা।

ওর পিছনে উঠে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি, এখন দুই হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে আবার। ডানহাতে চেপে ধরেছে বাম বাহুর ভিতর অংশ। কোনও শব্দ করছে না, কিন্তু কুঁচকে ফেলেছে মুখ।

এক দৌড়ে ওর পাশে পৌঁছল রানা। নরম স্বরে বলল, 'দেখি, দেখতে দাও আমাকে।'

খুব সাবধানে সঙ্গিনীর বাম বাহু উঁচু করে ধরল ও। দাঁতে দাঁত চেপে শ্বাস ছাড়ছে কার্টা। চোখ থেকে দরদর করে বেরোচ্ছে পানি। পাঁজর থেকে নামছে তপ্ত রক্ত। ক্ষতটা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল রানা। ছেঁড়া পেশির উপর আঙুল পড়তেই কাতরে উঠল

কার্টা।

'সরি।'

'আ...চ্ছা...'

কার্টার দেহ থেকে ব্লাউজ খুলতে শুরু করেছে রানা, তাতে সময় লাগছে দেখে ফড়াৎ করে ছিঁড়ে নিল কাপড়ের বড় এক অংশ। এবার ভাল ভাবেই দেখা গেল কোথায় লেগেছে বুলেট। কাপড়টা দিয়ে রক্ত মুছতে চাইল। জ্বলন্ত ইয়টের কম্পিত আলোয় আবছা ভাবে দেখা গেল সব। বাহুর ওদিকে কোমরের পাশে দুই ইঞ্চি দীর্ঘ একটা ক্ষত তৈরি করেছে বুলেট।

মেয়েটির চোখে চাইল রানা। 'কোনও ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। বুলেট ভিতরে ঢোকেনি, মাংস ফুঁড়ে চলে গেছে।'

'ব্যথা, খুব ব্যথা লাগছে,' ফুঁপিয়ে উঠল কার্টা, হেলান দিয়েছে রানার দেহে।

'জানি, ব্যথা লাগছে, একটু সহ্য করো।' এক হাতে কার্টাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে রানা।

'তুমি তো জানবেই,' যন্ত্রণায় শিউরে উঠল কার্টা। 'সামান্য ব্যথায় আমি বাচ্চাদের মত কাঁদছি, আর তুমি আগেও বহুবার গুলি খেয়েছ।'

'একটু বোসো, আমি এক্ষুণি আসছি।'

'আমি কিন্তু সাঁতরাতে পারব না, রানা। নোনা পানিতে নামলে...'

'নামতে হবে না। বোসো তো একটু।'

লম্বা পা ফেলে ইয়টে ফিরে গেল রানা। আগুন এত বেড়ে গেছে, এখন কেবিন থেকে কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব নয়। কিন্তু দ্রুত হাতে পঞ্চম গার্ডের কোট খুলে নিল রানা। ওটা হাজার ডলার দামি আরমানি ব্লেযার। ওটার মালিক সাধারণ গার্ড ছিল না, ছিল এদিকের অপারেশনের দায়িত্বে। রানার সন্দেহ মিথ্যা

নয়, ব্রিফকেস খুলতেই দেখা গেল ওটা একটা আধুনিক ল্যাপটপ কমপিউটার।

যদি এই জিনিস রক্ষা করা এতই জরুরি হয়, এটা ঠিকই ওর কাজে লাগবে, ভাবল রানা। থিঙ্কপ্যাড ও ব্লেযার নিয়ে আবারও কার্টার কাছে ফিরে এল ও, বলল, 'এটা পাওয়া দরকারী ছিল। এবার ইয়ট থেকে অনেক দূরে সরে যেতে হবে। ওটার যমজ বোন যখন মার্ভেলের পেটে গুঁতো দিল, আগুনের প্রকাণ্ড কুণ্ডুলি তৈরি করেছিল।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কার্টা। 'পানিতে পড়ে ভিজে বিড়াল হয়েছি, এখন আগুনে পুড়ে ভাজা চিংড়ি হতে চাই না।'

রানার সাহায্য নিয়ে আবারও পাইপের উপর উঠল ও। টলতে টলতে ফিরে চলল ওরা। পাঁচ মিনিট পর পৌঁছে গেল ফেলে আসা হ্যাচের পাশে। তপ্ত পাইপের উপর কার্টাকে শুইয়ে দিল রানা। ওর উরুর উপর মাথা রাখল কার্টা। আরমানি স্পোর্টস্ কোট দিয়ে ওকে ঢেকে দিল রানা, আলতো করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে চুলে। একটু পর ব্যথার বোধ হারাল কার্টা, নিশ্চিন্তে চেতনা হারিয়েছে।

এবার ল্যাপটপ খুলল রানা, একের পর এক ফাইল ঘাঁটতে লাগল। প্রায় একঘণ্টা পর বুঝল হাজার ফুট দীর্ঘ পাইপ আসলে এক ধরনের মেশিন। আরও জানা গেল, চারপাশে রয়েছে এই পাইপের মত আরও উনচল্লিশটা। কিন্তু বোঝা গেল না এগুলো কী কাজে ব্যবহার হচ্ছে। এক সময় ঘড়ি দেখল রানা। একঘণ্টা পর ভোর হবে। আরও পনেরো মিনিট কমপিউটার ঘেঁটে বুঝল, এই অ্যাক্সেস হ্যাচের ভিতর যেখানে স্যাটালাইট ফোন রেখেছে, সেখানে রয়েছে একটা সার্ভিস পোর্টাল, ওটার সঙ্গে এই ল্যাপটপ সংযুক্ত করলে থামিয়ে দিতে পারবে গোটা অপারেশন।

হ্যাচ খুলে ফেলল রানা, বের করে নিল স্যাটালাইট ফোনের থলি, ওটা কোমরে গুঁজে রাখল। এবার দ্বিতীয় হ্যাচ খুলতেই

পেয়ে গেল পাশেই প্লাগ। ওটার সঙ্গে ল্যাপটপের যোগাযোগ হতেই পাতলা মনিটরে ভেসে উঠল বেশ কিছু অপশন। রানার পাঁচ মিনিট লাগল সব অপশন পড়ে গোটা অপারেশন থামিয়ে দিতে। মনিটরে দেখা গেল, এখন ইলেকট্রিসিটি তৈরি করছে না প্রকাণ্ড মেশিনগুলো। কিন্তু ঢেউয়ের ভিতর দুলছে সব ক'টা পাইপ। এবার স্যাটালাইট ফোন বের করে চেক করল রানা। আবারও ফিরেছে সিগনাল।

ঢেউয়ের মাধ্যমে বিপুল ইলেকট্রিকাল ফিল্ড তৈরি করেছিল জেনারেটারগুলো, ফলে পাগল হয়ে ওঠে লাইফবোটের সমস্ত যন্ত্রপাতি। প্রথমেই বিকল হয় ফোন, পরে কমপাসের কাঁটা বনবন করে ঘুরছিল। এখন ল্যাপটপ দিয়ে জেনারেটারগুলোকে থামিয়ে দেয়ায় নষ্ট হয়ে গেছে বৈদ্যুতিক ফিল্ড। রানা ধারণা করল, জেনারেটারের শক্তিশালী ইএম পালসের কারণেই এত শক্তিশালী করতে হয়েছে এই ল্যাপটপকে।

স্যাটালাইট ফোনে ডায়াল করল রানা। চারবার বাজবার পর ওদিক থেকে কেউ কল রিসিভ করল।

'মিস্টার আহমেদ, আমি সামনের ডেস্ক থেকে যোগাযোগ করছি। আপনি কি সাড়ে চারটের সময় ঘুম থেকে উঠতে চান?'

'রানা? আরেহ্ শালা, তুই কই!'

'তোর বোনের পাশে শুয়ে আছি। আমি আবার কবে তোর শালা হলাম?'

'দোস্তো, তুই কই!' প্রাণের বন্ধুর সাড়া পেয়ে বকাবাজি ভুলে গেছে সোহেল। 'বারবার যোগাযোগ করছি লাইফবোটে, কিন্তু কোনও সাড়া নেই! ফোনও ধরলি না, এমন কী তোর ট্র্যান্সডার্মাল লোকেটার ব্রডকাস্ট বন্ধ হয়ে গেল!'

'তখন তুই ভাবলি তোর বোনটা বিধবা হয়েছে, তাই না? এবার শোন্, এই গহীন নিশীথে আমার পাশে ঘুমিয়ে... মানে

জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে এক অপূর্ব সুন্দরী সাগরকন্যা। কিন্তু দুঃখ, দারুণ কোনও দ্বীপের বালুকা বেলায় নেই আমরা; পড়ে আছি সাগরের মাঝখানে, দাদু এবেলের দানবীয় সেই সাপের গায়ে। ওরা মিসাইল মেরে উড়িয়ে দিয়েছে আমাদের বোট।'

'ঠিকই করেছে... অকর্মার ঢেঁকি!' জবাব দিল সোহেল। 'তোর জন্যে না, আমার বোনটার জন্যে দেখি কী ব্যবস্থা করা যায়। ততক্ষণ টিকে থাকার চেষ্টা কর্।'

'মার্ভেলের খবর কী?'

'অনেক কিছুই ঘটে গেছে এখানে। এসে শুনিস।'

লাইন কেটে দিল সোহেল আহমেদ।

(দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা

লাইমলাইট

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

ওই প্রবল ঝড় এসেছিল প্রায় সোয়া শ' বছর আগে। এখন কোথায় সেই জাহাজ, সে-ঝড়ে যেটা হারিয়ে যায়? আর কোটি কোটি ডলারের হীরা? ...আঁধার রাতে কঙ্গো নদীর এক পিয়ারে ভিড়ল পুরনো এক ধচাপচা জাহাজ। অস্ত্র পেয়ে খুশি হয়ে উঠল বিদ্রোহী-নেতা, ঠাণ্ডা মাথার জাত খুনি টমাস গাধাধারের দলের লোকগুলো। এখন হীরাগুলোও তাদের চাই। কিন্তু হাতে অস্ত্র পেলেই কি খুন করতে পারবে ওরা রানাকে?

একটা কাজ শেষ হতে না হতেই রানার কাঁধে চাপল আরেক দায়িত্ব। কোথায় গেলেন বিজ্ঞানী আসিফ হায়দার চৌধুরি? কারা কিডন্যাপ করল তাঁকে? ...ওই দ্রুতগামী ইয়টের ওরা কারা? খুন করতে চাইছে কাদেরকে? সাগরে দানবীয় সাপ খুঁজতে যাওয়ার আগেই একের পর এক বিপদ এসে জুটল। রানা পণ করল, এসব রহস্য ভেদ না করে ছাড়বে না।

কিন্তু উপকূল থেকে দেড় শ' মাইল দূর-সাগরে বিধ্বস্ত হলো লাইফবোট, হাড়ে হাড়ে টের পেল ও, এবার বাঁচার সম্ভাবনা নেই! অপরূপা কার্টা অস্টিনকে নিয়ে ডুবে মরতে হবে নির্ঘাত। এর পরেও কি রানার সঙ্গে যাওয়ার সাহস আছে, পাঠক?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

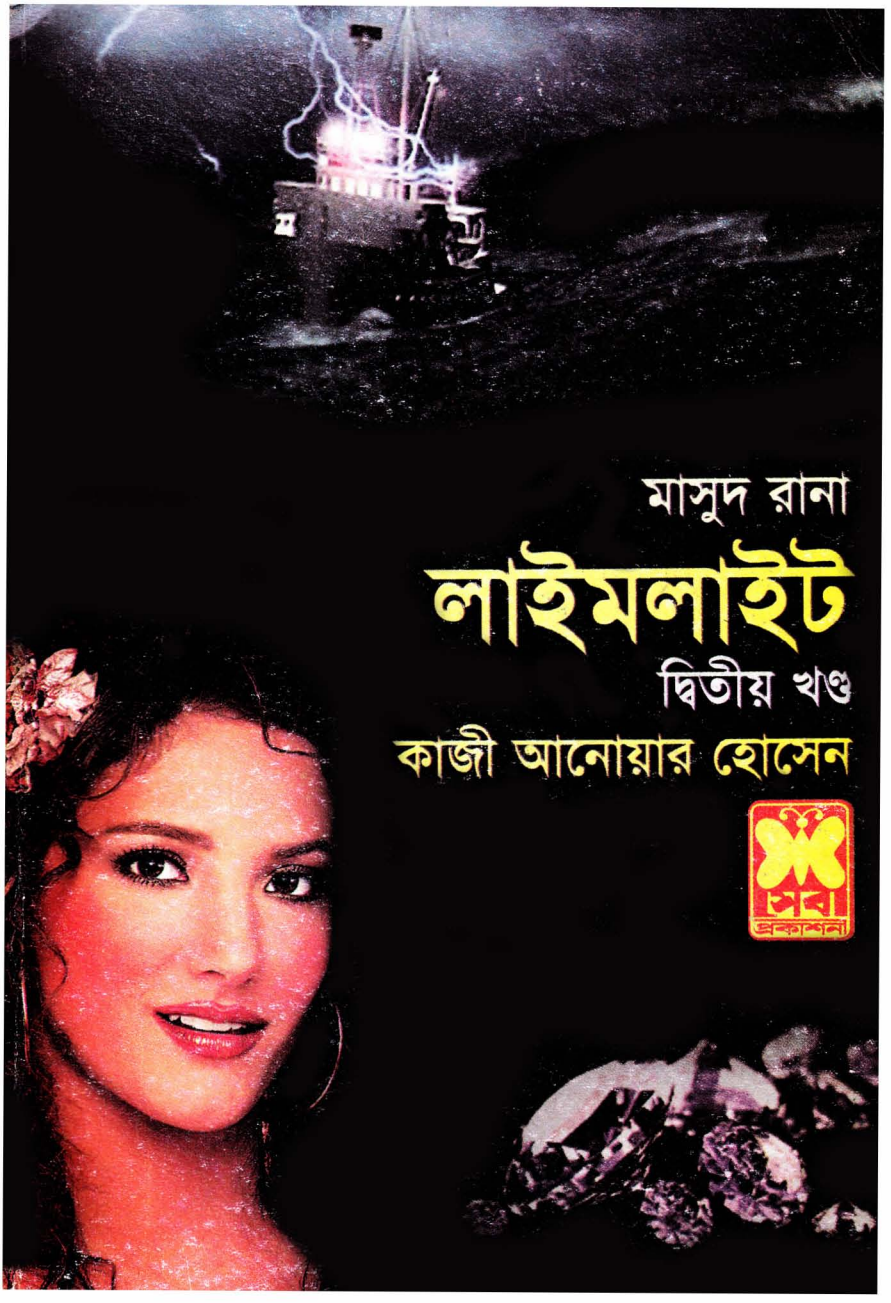

মাসুদ রানা

লাইমলাইট

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা ৪২৪

লাইমলাইট

(দ্বিতীয় খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7424-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৩

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-424
LIMELIGHT
Part-II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

ISBN 984-16-1424-X

সেবা প্রকাশনী

উননব্বই টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্রঃ বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা। সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর *গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হুংকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস *স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা *বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্ণরাজ্য*উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণকামড়*মরণখেলা*অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর *স্বাপদসংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া *হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগ ব্যাঙ*অপারেশন বন্দিনী*টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিসেস হিরা*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি*ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আলেক্স দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা *মাদকচক্র*শত্রুর ছায়া*চুক্তিপত্র ভাম*ঝামেলা*ঝড়বাতি, রানা*সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড় *কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোমটু জুবাদে*শত্রুপক্ষের দেশে*নরকের ঠিকানা*অগ্নিনাগ *কুহেলি রক্ত*বিষাক্ত ছোবল*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*মরুঝড়*কিনারা কোথায়*মৃত্যুপথের যাত্রী*পাশও, রানা!*মেজর রাহাত*রক্তপিপাসা *বাঘের থাবা*সিক্রেট এজেন্ট*অন্ধকূপ X-ট্রু*দুর্ভেদ্য*চীনে সঙ্কট*গোল্ড স্ক্র্যাপ*মোসাদ চক্রান্ত*চরসংবাদ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*লাভাস্রোত*আঘাত*ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*জঙ্গল প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল*শত্রুঘাঁটির উপকণ্ঠে*কালো ঘিপ*ডাইভ মিশন*টপ সিক্রেট*মরুসিংহ সঙ্কেত*সমুদ্র সঙ্কেত*অপারেশন কাজিরাঙা*গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারে বন্ধু*আবার সোহানা*মেরু কান্তার*অন্ধকূপে*মিশন তেলআবিব*ডোবিয়ে খড়্গ*মুক্তির ডাক*উপকূলে আতঙ্ক*কাগজের টোপ*স্বর্ণলোভ*নকশা*কালনাগিনী *বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা*রেড ব্রিগেড*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন *হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ*আক্রান্ত মিশন*শেষ হামলা*আগুনের নদী রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন*সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুইন কন্যা*রক্ষিত জলসীমা*দুরন্ত ঈগল*সর্পদংশন*অমানুষ*অশুভ অবসর*স্পাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান *জলরাক্ষস*মৃত্যুশীতল স্পর্শ*স্বপ্নের ভালবাসা*হ্যাকার*খুনে মাফিয়া*নিখোঁজ*বুশ পাইলট*অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অন্তর্ঘাত*ড্রাগলর্ড*দ্বীপান্তর*গুপ্ত আততায়ী*বিপদে সোহানা*চাই ঐশ্বর্য*স্বর্ণ-বিপর্যয়*কিল-মাস্টার*মৃত্যুর টিকেট*কুরুক্ষেত্র*ক্লাইম্যাক্স*আগুন নিয়ে খেলা*মরুস্বর্গ*সেই কুয়াশা*টেরোরিস্ট*সর্বনাশের দূত*শুভ্র পিঞ্জর*সূর্য-সৈনিক *ট্রেজার হান্টার*লাইমলাইট।

এক

ওয়েভ জেনারেশন স্টেশন থেকে রানাদের উদ্ধার করে আনতে ও কার্টাকে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দিতে ব্যাগটা নিয়ে হল্যাণ্ড-সুন্দরী ডাক্তার ফারা রাইনারও উঠেছিল ক্যাপ্টেন আলম সিরাজের সঙ্গে মার্ভেলের এমডি-৫২০এন কপ্টারে। ফলে যখন ফিরল, কার্টা অস্টিনের ডান বাহুতে আইভির সাহায্যে চালু হয়ে গিয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক্স, পেইনকিলার ও স্যালাইন। বেচারি ভুগছে চরম ডিহাইড্রেশনে। দ্রুত হাতে ওর ভেজা পোশাক খুলে ফেলেছে ফারা, শরীর ঢেকে দিয়েছে থার্মাল ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে। তার আগে ভাল ভাবে পরিষ্কার করেছে ক্ষত। জাহাজে ফিরে শুরু হবে আসল চিকিৎসা।

কপ্টার ল্যাণ্ড করবার পর দরজা খুলে যেতেই দুই অর্দ্দালিকে ইশারা করল ফারা। স্ট্রেচার নিয়ে অপেক্ষা করছিল তারা, রোগিণীকে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়ার জন্য দৌড়ে এল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হলো কার্টাকে। রাখা হলো লেভেল ওয়ান ট্রমা সেন্টারে।

রানাকেও যেতে হয়েছে ওখানে। এক মিনিট পরীক্ষা শেষে হাসল ফারা, হাতের ইশারা করল। 'তুমি এখান থেকে ভাগো, তোমার কিচ্ছু হয়নি!'

মেডিকেল বে থেকে ছাড়া পেতেই সোহেলের সঙ্গে দেখা হলো ওর।

'এখুনি কেবিন থেকে তৈরি হয়ে আয়, পনেরো মিনিট পর বোর্ডরুমে সিনিয়র স্টাফদের মিটিং,' তাড়া দিল সোহেল।

দ্রুত পায়ে কেবিনে ফিরল রানা, শাওয়ার সেরে চট্ করে পোশাক পাল্টে চলে এল বোর্ডরুমে। তখনও বারো মিনিট পেরোয়নি। নির্দিষ্ট চেয়ারে বসতে না বসতেই সামনে গরম কফির মগ নামিয়ে দিয়ে গেল মোস্তাফা আবুল। আগেই যে যার চেয়ারে বসে পড়েছে সিনিয়র স্টাফরা। হ্যাচের আর্মার্ড কাভার খুলে দেয়া হয়েছে, ঝকঝকে রোদ এসে পড়েছে ঘরে। চারপাশ রোদে উদ্ভাসিত হলেও প্রত্যেকের মুখে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। কেউ কোনও কথা বলছে না।

কফিতে চুমুক দিল রানা। একবার সবাইকে দেখে নিল। ওর চোখ থামল সোহেলের উপর। 'কীরে? কী হয়েছে?'

'অনেক কিছুই,' বলল সোহেল। 'গতকাল সকালে কিনসাশা পুলিশের একদল অফিসার শহরের বাইরে রেইড করে। তাদের ধারণা ছিল একটা বাড়িতে ড্রাগ বিক্রি চলছে। কয়েকজনকে গ্রেফতারও করেছে। ওখানে বেশ কিছু অস্ত্র এবং সামান্য পরিমাণ ড্রাগস পাওয়া গেছে। সঙ্গে টমাস গাধাধারের কঙ্গোলিজ আর্মি অভ রেভোলিউশনের সঙ্গে জড়িত অস্ত্র ও ড্রাগসের ডিলারদের বিষয়ে নানান তথ্য।'

'টমাস গাধাধার কিনেছে আমাদের দেয়া অস্ত্র,' অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলল রায়হান। চোখ সরাল না সামনে রাখা ল্যাপটপের উপর থেকে। ওটা জ্বলন্ত ইয়ট থেকে নিয়ে এসেছে রানা।

'জানা গেছে ড্রাগস বিক্রি করে সেই টাকা অন্য কাজে খরচ করেছে টমাস গাধাধার,' বলল সোহেল। 'এটা বড় কথা ছিল না। কিন্তু পুলিশ চমকে গেছে অন্য কারণে। গাধাধার ঘুষ দিয়ে উচ্চ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাদের হাত করেছে। তার হাতের মুঠোর ভিতর চলে গেছে অনেক বুরোক্র্যাট। তাদেরকে নিয়মিত-

ভাবে বেতন দেয়া হচ্ছে। তাদেরই একজন ডেপুটি ডিফেন্স মিনিস্টার স্যামুয়েল আবালা। প্রতি বছর তাকে দেয়া হতো পঞ্চাশ হাজার ইউরো। সব জমা পড়ত একটা সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে। আবালার কাজ ছিল টমাস গাধাধারকে নিয়মিত সরকারী তথ্য জোগান দেয়া। এ কারণেই সরকার বহু চেষ্টা করেও গাধাধারের গোপন বেস খুঁজে পায়নি। সরকারী প্রতিটি হামলার আগেই বিদ্রোহী নেতারা জেনে যেত কখন মুভ করবে আর্মি। সব সময় এক পা আগে হাঁটতে পেরেছে গাধাধার।'

পানির গ্লাসে চুমুক দিল সোহেল, তারপর আবার খেই ধরল: 'সরকারী অনুরোধ পাওয়ার পর অপেক্ষা করেছে গগল, ঠিকই অস্ত্র বিক্রির বিষয়ে যোগাযোগ করেছে গাধাধার; কিন্তু লোকটা আগেই জানত আমর্স বিক্রি করতে রাজি হবে গগল। আবালা আগেই তাকে জানিয়ে দেয় অস্ত্রের ভিতর রাখা হবে রেডিয়ো ডিরেকশন ট্যাগ। কাজেই পালিয়ে যাওয়ার পর, তার প্রথম কাজই ছিল একে-৪৭ বা আরপিজি থেকে ট্যাগ খুলে নদীতে ফেলে দেয়া।'

'স্যামুয়েল আবালা এটা স্বীকার করেছে?' জানতে চাইল রানা।

'মুখে কিছুই বলেনি,' বলল গগল।

'কিন্তু ফোনে কঙ্গো সরকারের কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার,' বলল সোহেল। 'যখন তাদের বলেছি আমি কে, প্রত্যেকে জানিয়েছে ওই অস্ত্র খুঁজতে যাদেরকে পাঠানো হয়, তারা বলেছে: ট্যাগ খুলে ফেলার পর সেই ডক থেকে সরে গেছে বিদ্রোহী সেনারা— কোথায়, কে জানে।'

'তার মানে আর্মি যখন ডকে গিয়ে হাজির হলো, সেখানে কোনও বিদ্রোহী বা আর্মস্ পেল না,' কী যেন ভাবছে রানা। সোহেলের দিকে চাইল। 'তোর কি মনে হয়, আমাদের বিসিআই

ট্যাগ এখনও কাজ করছে?'

'আরও চব্বিশ ঘণ্টা থেকে ছত্রিশ ঘণ্টা চলার কথা।'

'আমি যদি এর আগেই কঙ্গো পৌঁছুতে পারি, কোনও কম্পটার বা বিমান থেকে ওগুলো খুঁজে বের করতে পারব,' বলল গগল।

'ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসান কি ভাড়া করা সাইটেশন নিয়ে সোয়াকোপমুণ্ডে পৌঁচেছে?' জানতে চাইল রানা। দূরত্ব, গতি ও সময় নিয়ে হিসাব কষতে শুরু করেছে।

'দুপুর একটার আগেই ওখানে পৌঁছবার কথা,' বলল স্বর্ণা।

'ঠিক আছে, একটা কাজ করা যাক, গগল,' বলল রানা। 'উপকূলে চলে যাও তুমি, জাহিদ হাসান তোমাকে সাইটেশনে করে পৌঁছে দেবে কিনশাসা। ওখান থেকে কোনও চার্টার এয়ারক্রাফট ভাড়া নেবে। জাহিদ হাসানকে ছেড়ে দেবে, রাতের প্যারাশুট ড্রপের জন্য তাকে আমাদের লাগবে।'

'আমার সঙ্গে একজনকে নিতে চাই।'

'রায়হানকে নিতে পারো। আমাদের রেসকিউ মিশনের সঙ্গে যোগাযোগের কাজ চালিয়ে নিতে পারবে সোহেল বা স্বর্ণা।'

নবীর কণ্ঠে একটু আপত্তির সুর শোনা গেল, 'মাসুদ ভাই, আমরা কেউ জানি না অস্ত্রগুলো কোথায় গেছে। হয়তো ছড়িয়ে পড়েছে কঙ্গোর আনাচে কানাচে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'হতেই পারে। তবুও চেষ্টার ত্রুটি করব না আমরা। আমাদের বিসিআইয়ের ট্যাগের দশটাই যদি একসঙ্গে থাকে, তো ধরে নিতে পারি আর সব অস্ত্রও ওখানেই থাকবে।'

'মাসুদ ভাই, আপনি কি ভাবছেন কোনও ধরনের হামলা করবে টমাস গাধাধার?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'জানি না। গগল ও রায়হান অস্ত্র খুঁজে পেলে, সবই জানব।'

'পেয়েছি তোকে!' উত্তেজিত স্বরে বলল রায়হান। থিঙ্কপ্যাড

থেকে মুখ তুলে চেয়ে বিব্রত চেহারা হলো, সবার চোখ পড়েছে ওর উপর।

'বলো দেখি, কাকে পেলে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল সোহেল।

'এই কমপিউটারের ভিতর অনেক এনক্রিপটেড ফাইল,' একটু মিইয়ে গিয়ে জানাল রায়হান। 'আমি সেগুলোর কোড ভেঙে ফেলেছি।'

'তাতে কী লেখা?' জানতে চাইল রানা।

'এখনও জানি না তো, মাসুদ ভাই! এক মিনিট, আগে একটু চোখ বুলিয়ে নিই।'

কফিতে চুমুক দিতে শুরু করেছে রানা। টেবিলের উপর রাখা সামুসা ও পেস্ট্রির প্লেটের দিকে হাত বাড়াল সোহেল। আর ঠিক তখনই কনফারেন্স রুমের দরজায় এসে দাঁড়াল ডক্টর ফারা। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত প্লেট থেকে হাত সরিয়ে নিল সোহেল। উদাস হয়ে চেয়ে রইল ছাতের দিকে।

'আমাদের রোগিণী কেমন করছে, ফারা?' জানতে চাইল রানা।

'সুস্থ হয়ে উঠবে। এখনও একটু বেশি ডিহাইড্রেটেড, কিন্তু কোনও বিপদে নেই। কাটা জায়গা ঠিক করতে বিশটা সেলাই দিতে হয়েছে। পাঁজরের দুটো হাড়েও ফাটল ধরেছে। ঘুমের ওষুধ দিয়েছি। কয়েক দিন পেইনকিলার চালাতে হবে।'

'খুবই ভাল কাজ দেখিয়েছে ফারা,' প্রশংসার সুরে বলল সোহেল। চোখ সরিয়ে রেখেছে সামনের প্লেটের উপর থেকে।

চোখ পাকাল ফারা। 'পাম্প দিচ্ছ? আমি দেখিনি পেস্ট্রির দিকে হাত বাড়িয়েছিলে?'

'না-না, এ কথা ঠিক নয়!'

'তোমার মত জলদস্যুর কথার কোনও দাম নেই। মিটিং

শেষে যিমনেশিয়ামে আসবে, নতুন আরেকটা ব্যায়াম শিখিয়ে দেব। আর...' হাসল ফারা, 'ওগুলোর একটা খেতে পারো।'

হাসিমুখে হাত বাড়াল সোহেল। একটা পেস্ট্রি তুলে নিয়ে কামড় দিল। ওটা শেষ করেই গম্ভীর হয়ে গেল। ভাবতে শুরু করেছে, এবার ওকে আবারও 'দ'-এর মত করে আরও কঠিন কোনও প্যাঁচে ফেলবে ফারা।

'ফারা, কার্টা কি এরই ভিতর মোটামুটি সুস্থ হবে, নাকি ওর সঙ্গে থাকতে চাও তুমি?' জানতে চাইল রানা।

বিশ সেকেণ্ড ভাবল সুন্দরী ডাক্তার, তারপর বলল, 'ওর ভিতর কোনও ইনফেকশনের লক্ষণ দেখিনি। জ্বর নেই, হোয়াইট কাউন্ট বেড়ে যায়নি। আমার মনে হয় ওর পাশে না থাকলেও চলে। তা ছাড়া, কিডন্যাপাররা যদি আসিফ হায়দার চৌধুরিকে আহত করে থাকে... বুঝতেই তো পারছ, এমন হয়। সে কারণেই ভাবছি সাইটেশনে তাকে জরুরি ভাবে চিকিৎসা দিতে হতে পারে। আসলে এখনও জানি না এখানে রয়ে যাব, না তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি। শেষ মুহূর্তে ঠিক করব সব। অবশ্য আমার অভিজ্ঞতা বলছে কার্টা অস্টিন সুস্থই থাকবে।'

বরাবরের মতই ডক্টর ফারার উপর মেডিকেল সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিল রানা। 'ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে।'

কড়া চোখে একবার সোহেলকে দেখে নিয়ে ফিরতি পথ ধরল ফারা। নীরবতা নামল ঘরে। এক মিনিট পর বলে উঠল রায়হান, 'এই কথা কেউ বিশ্বাস করবে?'

ওর জানের দোস্তো নবী ঝুঁকে পড়ে ল্যাপটপের স্ক্রিনে চাইল। ওর নতুন চশমার উপর ঝিলিক দিয়ে উঠল মনিটরের আলো।

সবার চোখ গিয়ে পড়ল তরুণ ওয়েপন্স স্পেশালিস্টের উপর।

কী যেন পড়ছে সে। গলা পরিষ্কার করল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর লজ্জিত হয়ে বলল নবী, 'সরি। আসলে মাসুদ ভাই, আপনি একটা ওয়েভ পাওয়ার্ড জেনারেটার দেখেছেন। কিন্তু এত বড় আকারের জিনিস আগে কখনও তৈরি হয়নি। যতটুকু পড়েছি, এ টেকনোলজি এখনও শিশু পর্যায়ে। শুধু পর্তুগাল ও স্কটল্যাণ্ডের উপকূলের কাছে কয়েকটা ছোট মেশিন বসানো হয়েছে।'

'এসব পাইপ এঁকেবেঁকে ঢেউ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে,' বলল রায়হান। 'হাইড্রলিক র‍্যামকে চালাতে থাকে। আর ওই র‍্যামগুলো একটা মোটরের ভিতর দিয়ে ঠেলে দেয় প্রচুর তেল, ফলে তৈরি হয় পাইপের মুখে স্বাভাবিক একটা প্রবাহ। ওই মোটর চালু করে জেনারেটার, আর তাতেই মেলে ইলেকট্রিসিটি।'

'দারুণ কাজের জিনিস,' মন্তব্য করল সোহেল। 'খরচ নেই বললেই চলে। একেকটা পাইপ থেকে কতটা বিদ্যুৎ পাওয়া যায়?'

'বাংলাদেশে এই জিনিসই দরকার!' বলল রায়হান। 'প্রতিটা পাইপ দু' হাজার লোকের বসতির জন্য যথেষ্ট বিদ্যুৎ দেবে।'

'ওদিকের সাগরে আছে চল্লিশটা পাইপ, মানে চল্লিশটা পাড়ার বিদ্যুৎ,' বলল নবী।

'কী কাজে ব্যবহার করছে?' জানতে চাইল রানা। 'এত ইলেকট্রিসিটি কোথায় যাচ্ছে?'

'সে-কথা লেখা হয়েছে এনক্রিপশন করা ফাইলের ভিতর,' বলল রায়হান। 'প্রতিটি জেনারেটার সাগরের নীচে নোঙর করে রাখা, ইচ্ছা হলে টেনে তুলে নেয়া যায় কেবল। আর সে-কারণেই কয়েক দিন আগে কপ্টার নিয়ে গিয়ে কিছুই দেখেননি ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ। সাগর যখন শান্ত থাকে, বা যখন

গার্ডদের বোট থেকে রেইডারে দেখা যায় ওদিকে আসছে কোনও জাহাজ, পাইপগুলোকে পানির তিরিশ ফুট নীচে নামিয়ে দেয়া হয়। আরেকটা কেবল আছে, ওটার কাজ লম্বা জেনারেটারের অসংখ্য হিটারকে ইলেকট্রিসিটি জোগান দেয়া।'

'হিটারের কথা বললেন না আপনি?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

ঘন-ঘন মাথা ঝাঁকাল রায়হান। 'হ্যাঁ। ...কেউ ভাবছে এদিকের সাগর বড় বেশি ঠাণ্ডা। আর তাই সেটা গরম করে তুলতে চাইছে।'

'রায়হান, বলতে পারো কত দিন ধরে এ ধরনের অপারেশন চলছে?' জানতে চাইল রানা।

'বারো সালের শুরু থেকেই।'

'তার ফলে সাগরে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে?'

'কমপিউটারে সেই তথ্য নেই, মাসুদ ভাই,' বলল নবী।

'আমি কোনও ওশনোগ্রাফার নই, কিন্তু বলতে পারি, এত উত্তাপ গোটা সাগরের উপর প্রভাব ফেলতে বাধ্য,' বলল স্বর্ণা।

'একটা নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর যে-কোনও নদীর পানির তাপ কয়েক ডিগ্রি বাড়িয়ে দিতে পারে,' বলল রায়হান। 'ব্যাপারটা যৌক্তিক।'

মাথা দোলাল নিশাত।

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। কী যেন ভাবতে শুরু করেছে। কারও কথা কানে ঢুকছে না। সোহেল ও গগল ছাড়া অন্যরা আলাপ করছে, নিজেদের মতামত ও চিন্তা জানাচ্ছে। রানা কল্পনায় দেখতে পেল, বিশাল সব জেনারেটার দুলছে ঢেউয়ের ভিতর। এসব পাইপের টকটকে লাল হিটারগুলো ভীষণ উত্তপ্ত করে তুলেছে দক্ষিণ থেকে আসা বঙ্গোপসাগরের পানিকে। সঙ্গে আসতে শুরু করেছে প্রবল সাইক্লোন!

'সশস্ত্র লোকগুলো যদি লেফট-রাইট না করত...'

কী যেন বলে চলেছে রায়হান, বাস্তবে ফিরে এল রানা।

'আমি মনে করতাম এসব জেনারেটার একটা আর্ট প্রোজেক্ট। ওই লোকের নাম যেন কী? ওই যে, যে-লোক একের পর এক দ্বীপ মুড়ে দিতে চেয়েছিল কাপড় দিয়ে? সে-ই তো সেন্ট্রাল পার্কে অতগুলো ফটক বানিয়েছে। লোকটার নাম বোধহয় ক্রিসকো?'

'ক্রিস্টো,' অন্য মনস্ক ভাবে বলল সোহেল।

'রায়হান, তুমি একটা জিনিয়াস,' হঠাৎ বলে উঠল রানা।

'জী?' বোকা-বোকা চোখে রানার দিকে চাইল রায়হান। পরক্ষণে আগ্রহী হয়ে উঠল। 'মাসুদ ভাই, আপনিও মনে করেন জেনারেটার বা ওই আর্ট প্রজেক্ট ফালতু একটা প্রচেষ্টা?'

'না।' মাথা দোলাল রানা। 'তুমি বলেছ একটা নদীর কথা।' প্রত্যেকের উপর দিয়ে ঘুরে এল ওর চোখ। 'এরা গোটা সাগরকে উত্তপ্ত করে তুলতে চাইছে না। নির্দিষ্ট একটা জায়গায় তাই করবে। আমরা আছি এখন বেঙ্গুয়েলা স্রোতের ঠিক মাঝে, এমন শক্তিশালী স্রোত খুব কমই আছে। সাগরের মাঝ দিয়ে নদীর মত বইছে। এবং এখানেই স্রোতটা দুই ভাগে ভাগ হয়েছে। একটা শাখা উত্তর দিকে উপকূল ছুঁয়েছে। অন্য শাখা ঘুরে চলে গেছে পশ্চিমে আটলান্টিক সাবট্রপিকাল জায়ার-এ। ওই পানি বা স্রোত চলে গেছে দক্ষিণ আমেরিকায়, ওখানে গিয়ে কয়েক ডিগ্রি তাপ বেড়েছে। কিন্তু আফ্রিকার কাছের স্রোত বেশ শীতল।'

রানা থেমে যেতেই হতাশ হয়ে বলল রায়হান, 'আপনি যখন বলছেন, মাসুদ ভাই। ...কিন্তু তাতে কী হবে?'

'আবারও ওই দুই স্রোত মিলবে ইকুয়েটরে। তখন দুটো মিলে একটা বাফার যোন তৈরি করবে উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণ গোলার্ধের স্রোতগুলোতে।'

'তাতে সমস্যা কী?' এবার বলতে বাধ্য হলো সোহেল।

'কিন্তু দুই স্রোতের তাপ যদি কাছাকাছি হয়, তাদের বাফারিং ক্ষমতা মিলিয়ে যাবে। ওই দুই স্রোত এতই শক্তিশালী হয়ে উঠবে, বর্তমানের করিওলিস এফেক্টের হাওয়া প্রবাহকে হারিয়ে দেবে। সে-কারণে তৈরি হবে স্রোতের লঘু চাপ।'

কফির কাপ নামিয়ে রেখেছে গগল। বুঝতে শুরু করেছে সব। শুকনো স্বরে বলল, 'তাই যদি হয়, সাগরের স্বাভাবিক সব স্রোত বদলাতে শুরু করবে।'

'ঠিক,' বলল রানা। 'পৃথিবী ঘুরছে বলেই বইছে হাওয়া। এ জন্য পৃথিবীর উত্তর অঞ্চলে সব সময় ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে ঘুরতে থাকে হারিকেন। দক্ষিণে ঘড়ির কাঁটার মত করে ঘোরে সাইক্লোন। ওই একই কারণে উষ্ণ গাল্‌ফ্‌স্ট্রিম স্রোত বইছে ইউনাইটেড স্টেটস-এর উত্তর পাশ দিয়ে, পুব দিকে গিয়ে উষ্ণ করে তুলছে ইউরোপকে। তা যদি না হতো, ওই মহাদেশের আবহাওয়া বদলে যেত, বেশির ভাগ বসতি শেষ হয়ে যেত। এসব উষ্ণ স্রোত বইছে বলেই ক্যানাডিয়ান আর্কটিকের চেয়ে উত্তরে থেকেও মানুষ বাস করছে স্কটল্যাণ্ডে।'

'দক্ষিণের পানি যদি আফ্রিকার কাছে ইকুয়েটর পেরিয়ে যায়, তা হলে কী হবে?' রানার দিকে চেয়ে জানতে চাইল স্বর্ণা।

মার্ভেলের আন অফিশিয়াল মিটিয়োরলজিস্ট গগল, জবাবটা সে দিল, 'ওই স্রোত ঢুকে পড়বে আটলাণ্টিকে, আর ওখানেই জন্ম নেয় বেশির ভাগ হারিকেন। উষ্ণ পানি মানেই রোদের কারণে আরও বেশি বাষ্প তৈরি হওয়া। ফলে বাড়তি ওই বাষ্পের কারণে আরও অনেক বেশি শক্তিশালী ঝড় তৈরি হবে। কোনও ট্রপিকাল্ ডিপ্রেশনে আশি ডিগ্রির বেশি সারফেস টেম্পারেচার তৈরি হলেই সেটা হয়ে উঠবে হারিকেন। প্রতিদিন ওই ভয়াল ঝড় শুষে নেবে দুই বিলিয়ন টন পানি।'

'দুই বি-লি-য়ন টন?' অবাক হয়ে গেল স্বর্ণা।

'তারপর সেই ঝড় যখন তীরের কাছে হাজির হবে, ওটা প্রতি দিন দশ থেকে বিশ বিলিয়ন টন বৃষ্টি ঝরাতে থাকবে। ক্যাটাগরি ওয়ান ঝড় এবং ক্যাটাগরি ফাইভ ঝড়ের ভিতর তফাৎ হচ্ছে কত পরিমাণ পানি শুষে নিয়েছে আফ্রিকার উপকূল থেকে।'

স্বর্ণা বুঝতে পেরেছে। 'তার মানে আর্টিফিশিয়ালি বেঙ্গুয়েলা স্রোতকে উষ্ণ করে তুললেই প্রচুর পানি উত্তর দিকে না গিয়ে শক্তিশালী করে তুলবে হারিকেনকে।'

'এরকম পাইপের জেনারেটার আরও থাকতে পারে,' বলল রানা।

'গত কয়েক বছরে একের পর এক সামুদ্রিক ঝড় এসেছে,' বলল গগল। 'পরিবেশ বিজ্ঞানীরা অবশ্য বলছেন, স্বাভাবিক ভাবেই প্রকৃতির চাকা ঘুরতে শুরু করেছে, তাই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে হারিকেন ও সাইক্লোন।'

'তার মানে এটা নয় যে জেনারেটারগুলো এসব ঝড়কে বাড়তি শক্তি দিচ্ছে না,' বলল স্বর্ণা।

'এখন আমাদের কাজ, জেনে নেয়া এসব জেনারেটারের মালিক আরও কী করছে,' বলল রানা। 'আপাতত ওগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এই মিটিং শেষে বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল রাহাত খানের সঙ্গে যোগাযোগ করব। তাঁকে জানাব এখানে কী ঘটছে। তাঁর সঙ্গে কথা শেষ করে যোগাযোগ করব নুমার চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে। তিনি এ বিষয়ে আগ্রহী হতে পারেন। রায়হান, ল্যাপটপ তৈরি রেখো, ওই দুই অফিসে ফাইলগুলো পাঠাতে হবে।'

'কোনও সমস্যা হবে না, মাসুদ ভাই।'

'আপাতত আমাদের প্রথম কাজ বাঙালি বিজ্ঞানী আসিফ

হায়দার চৌধুরিকে উদ্ধার করা। এ কাজটা শেষ হলে আমরা মাথা ঘামাতে শুরু করব কারা ওখানে চালাচ্ছে ওই জেনারেটার।'

'তোর কি ধারণা বিজ্ঞানী কিডন্যাপিং আর জেনারেটারের ভিতর কোনও সম্পর্ক আছে?' জানতে চাইল সোহেল।

'প্রথমে তেমন মনে হয়নি। কিন্তু এখন সন্দেহ করছি দুটো ঘটনা সম্পর্কিত। কার্টা আর আমি লাইফবোট নিয়ে এক লোককে ধাওয়া করলাম, সে আমাদের হাতে ধরা দেবে না বলে আত্মহত্যা করল। আফ্রিকার জেল অত খারাপ নয় যে আগেই নিজেকে মেরে ফেলতে হবে। লোকটা ফ্যানাটিক ছিল, ভেবেছে এসব হিটারের ব্যাপারে মুখ খোলার চেয়ে আত্মহত্যা করাই ভাল। ...আমরা এরই ভিতর জেনেছি বাঙালি বিজ্ঞানীর জন্য কোনও মুক্তিপণ চাওয়া হয়নি। মনে করি না রাজনৈতিক কোনও শত্রু তাকে কিডন্যাপ করেছে। আসলে কাছের কাউকে খেপিয়ে তুলেছে সে।'

'এনভায়রনমেন্টালিস্ট,' মন্তব্য করল স্বর্ণা।

'আমারও তা-ই ধারণা,' বলল রানা। 'দুই ধরনের হামলা করছে তারা। একদিকে বাঙালি বিজ্ঞানী, যে-কোনও কারণেই হোক তাকে আটকে রাখা হয়েছে; আরেক দিকে দলটি চাইছে বিশাল জেনারেটার দিয়ে অশান্ত করে তুলবে সাগরের স্রোতকে।'

খুকখুক করে কাশল রায়হান। 'ঠিক বুঝলাম না, মাসুদ ভাই। এরা যদি সত্যিই পৃথিবীর পরিবেশের ভাল চেয়ে থাকে, তার সঙ্গে সাগরকে অস্থির করার কী সম্পর্ক?'

'আমরা বাঙালি বিজ্ঞানীকে উদ্ধার করতে চলেছি, তখন দুই একজন কিডন্যাপারকে বন্দি করব; আশা করি তাদের পেট থেকেই উত্তরটা বেরুবে।'

প্যারাশুটের দড়ি-দড়া ঠিক করে নেয়ার জন্য মার্ভেলের খালি একটা হোল্ড ব্যবহার করা হচ্ছে। চকচকে কালো নাইলন বিছিয়ে দেয়া হয়েছে ডেকের উপর, দেখতে লাগছে উপচে পড়া ক্রুড অয়েলের মত। গত আধঘণ্টা বিসিআই চিফ ও নুমার চিফের সঙ্গে আলাপ করেছে রানা। এইমাত্র হোল্ডের ভিতর ঢুকেছে। আগেই ক্রুদের সঙ্গে এসেছে নিশাত সুলতানা ও জলিল খান, দু'জনেরই প্যারা রেসকিউ জাম্পিঙের ট্রেইনিং নেয়া আছে, কাজেই ওদের উপর প্যারাশুটের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। খুব সাবধানে ওগুলোকে ভাঁজ করছে ওরা। নামিব মরুভূমিতে পঁচিশ হাজার ফুট উপর থেকে ঝাঁপ দেবে রানা ও তার দল, কাজেই প্যারাশুট ভাঁজ করবার ভিতর কোনও ভুল থাকলে বাঁচবার কোনও সুযোগ থাকবে না। হোল্ডের পাশের দেয়াল-ঘেঁষা ট্রেসল টেবিলের উপর রাখা হয়েছে ইকুইপমেন্ট ও সব অস্ত্র। ভাল ভাবে পরীক্ষা করছে সোহেল, ক্যাপ্টেন নবী ও কমাণ্ডো কাশেম বক্স।

মার্ভেলের প্রত্যেকে একই সঙ্গে একই ছন্দে কাজ করতে অভ্যস্ত, কারও ছন্দপতন হয় না। তবে ক্রুদের ভিতর কয়েকটি জুটি অকল্পনীয় সুচারু ভাবে কাজ করতে পারে। যেমন নিশাত ও জলিল, ওদের উপর কোনও দায়িত্ব দেয়া হলে তা নিখুঁত ভাবে পালন করে। হয়তো গুলিবৃষ্টির ভিতর পড়েছে, পরস্পরের ভিতর যোগাযোগ অসম্ভব, কিন্তু দেখা যায় যা করা উচিত ঠিক তাই করছে ওরা একইসঙ্গে। সোহেলের হাত কাটা পড়বার আগে রানা ও সোহেল এসপিওনাজে ঠিক এমনই এক দুর্দান্ত জুটি ছিল।

টেবিলের পাশে রাখা হয়েছে ন্যাড়া চেহারার চারটে মোটর সাইকেল। এগুলোর জন্য সেই কেপ টাউন ঘুরে এসেছে

মার্ভেল। এসব মোটর সাইকেল তৈরি করা হয়েছে রুক্ষ মরুভূমিতে চলবার জন্য। ফস্কা বালির উপর দিয়ে তীব্র গতি তুলতে পারে, চাকাগুলো বেলুনের মত ফোলা। শক অ্যাবযর্বার সাধারণ মোটর সাইকেলের দ্বিগুণ ওজন নিতে পারে। গত দু'দিন হলো একদল মেকানিক এসব মোটর সাইকেল থেকে বাড়তি ওজনদার সব কিছু খুলে নিয়েছে। এখন বডির চকচকে রং হারিয়ে গেছে মরুভূমির ধূসর রঙের নীচে। নিখুঁত ক্যামোফ্লেজ পেইন্টে কোথাও কোনও ত্রুটি নেই।

জাহাজে যে সেল ফোন ব্যবহার করে রানা, ওটা বেজে উঠল। প্রকাণ্ড গুহার মত হোল্ডে পা রেখেই কল রিসিভ করল ও। 'রানা বলছি।'

'মাসুদ ভাই, বিশ মিনিট পর আমরা সোয়াকোপমুণ্ডকে রেঞ্জের ভিতর পাব,' জানাল স্বর্ণা। 'জানিয়ে দিয়েছি ক্যাপ্টেন আলম সিরাজকে। কন্টার নিয়ে তৈরি থাকবেন তিনি। মিস্টার গগল ও রায়হান ইকুইপমেন্ট ঠিক করছেন। এয়ারপোর্টে সাইটেশন নিয়ে অপেক্ষা করছেন ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসান। এদিকে মিস্টার গগল ও রায়হানের জন্য কিনসাশায় একটা চার্টার বিমান ভাড়া করা হয়েছে।'

'গুড ওঅর্ক, স্বর্ণা।'

'যদি সব ঠিক চলে, আগামী ভোরে কাজে নামবেন মিস্টার গগল,' বলল নেভির লেফটেন্যান্ট।

'ব্যাটারি ফুরিয়ে যাওয়ার আগে মোটামুটি আঠারো ঘণ্টা পাবে।'

'জী। কম-বেশি। একটু লাইনে থাকুন। মিস্টার গগল কথ বলতে চান।'

'দাও।'

'রানা, শুনলে মনে হয় হাতে একেবারেই সময় নেই,' বলল

গগল। 'কিন্তু নিশ্চিত থাকো, ওই অস্ত্র আমরা ঠিকই খুঁজে বের করব।'

মার্ভেলের প্রত্যেকে জানে, অস্ত্রগুলো হারিয়ে ব্যক্তিগতভাবে দায় কাঁধে তুলে নিয়েছে রানা। বিসিআই চিফ এ বিষয়ে একটা কথাও বলেননি। কিন্তু তিনি চাইবেন রানা ও সোহেল যেন অস্ত্রগুলো উদ্ধার করে। কঙ্গোর ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধের ভিতর বহু অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে দুর্বলের উপর, সুস্থ বুদ্ধির কেউ চাইবে না ওখানে আরও অস্ত্র জোগান দেয়া হোক। ওই দেশে এমনিতেই অকাতরে মরছে অসংখ্য নিরীহ মানুষ। এখন যদি তাদের একজনও রানাদের জোগান দেয়া অস্ত্রের কারণে মারা পড়ে, মনের একটা অংশ চিরতরে মরবে রানার।

'অস্ত্র নিয়ে সুস্থ অবস্থায় ফিরে এসো,' নিচু স্বরে বলল রানা।

'একটু পর রওনা হব, রাখি।'

'আমাদের কাজ কতটা এগুলো?' ফোন রেখে হোল্ডের ভিতর অংশে পা বাড়াল রানা। টেবিলের উপর রাখা হয়েছে ডেভিল্‌স্ ওয়েসিস কারাগারের একটা স্কেল মডেল। স্যাটালাইট ইমেজ ও ইন্টারনেটের ছবি দেখে ওটা জাদুর দোকানে তৈরি করেছে মোফিজ বিল্লা।

'আমাদের তরুণ ছেলে সুন্দর খেলনা তৈরি করেছে,' মন্তব্য করল সোহেল। ওর চেয়ে কমপক্ষে দশ বছরের বড় মেকআপ আর্টিস্ট, কিন্তু তাকে তরুণ না বললে মনে খুবই কষ্ট পায়। 'তোরা ইন্টেরিয়র লে-আউট পাবি না। বিজ্ঞানী কোথায় আছে জানা নেই। অন্ধের মত হাজির হতে হবে তোদেরকে।'

'তুই হলে ওখানে কীভাবে ঢুকতি?'

তুখোড় এসপিওনাজ এজেন্ট ছিল সোহেল আহমেদ, হাত কাটা পড়বার আগে ভয়ঙ্কর সব মিশনে গেছে, মস্ত সব বিপদ থেকে বেরিয়েও এসেছে।

সবার কান খাড়া হয়ে গেছে দেখে বলতে শুরু করল সোহেল, 'আমরা আগে যে অ্যাসল্ট প্ল্যান করলাম, মোটামুটি সেটাই বহাল রাখতাম। হাই অল্টিচ্যুড, হাই ওপেনিং জাম্প। ফ্যাসিলিটির ষাট মাইল আগে বিমান থেকে নেমে পড়তাম। সেক্ষেত্রে কেউ বিমানের আওয়াজ পেত না, সন্দেহ করত না কোনও রেইডার। গ্লাইড করে এগুতে শুরু করতাম অ্যাসল্ট টিম নিয়ে। নামতাম জেলখানার ছাতে। এরপর প্ল্যান মত কিছুই চলবে না। কাজেই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে।'

ওর বলবার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলেছে সবাই।

'জলিল একে একে মোটর বাইকগুলো মাটিতে নামিয়ে দেবে, অন্যরা খুঁজে বের করবে বিজ্ঞানী ও ক্যারেন কুম্বসকে,' বলে চলেছে সোহেল। 'একবার তাদের পেলেই মোটর সাইকেল নিয়ে লেজ তুলে পালাতে শুরু করব। ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। সমতল কোনও জায়গায় বিমান নামাতে চাইবেন তিনি।'

'ঠিক আছে, এভাবেই হবে সব। তবে একটা কথা ভুলে গেছিস। অন্তত একজন কিডন্যাপারকে ধরে আনতে হবে। তার সঙ্গে পাওয়ার জেনারেটারের বিষয়ে খোশ গল্প করব আমরা।'

'তাকে ইন্টারোগেট করবে স্বর্ণা,' মাথা দোলাল সোহেল।

'তুই কি ঠিক করেছিস, কখন সবাইকে তীরে নামিয়ে দিবি?'

'হ্যাঁ, সময় ঠিক করে ফেলেছি। সব ওজন নিতে পারবে না কপ্টার। সোয়াকোপমুণ্ডের এয়ারপোর্টে সব পৌঁছে দিতে দু'বার ট্রিপ দিতে হবে ক্যাপ্টেন আলম সিরাজকে। এসব সেরে এয়ারপোর্ট থেকেই ফিউয়েল নেবেন উনি, নামিব মরুভূমিতে গিয়ে খুঁজতে শুরু করবেন কোথায় নামবে ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসানের বিমান।'

'আমি শেষ ট্রিপে যেতে চাই,' বলল রানা। 'মিশনে যাওয়ার

আগে একটু ঘুমাব।'

'কথাটা মাথায় রেখেছি।' সবার উপর থেকে ঘুরে এসে বন্ধুর উপর থামল সোহেলের চোখ। 'বস্ কী বললেন?'

'আমার প্যারাশুট প্যাক করার ফাঁকে বলি।' রানা পরীক্ষা করতে শুরু করেছে প্রকাণ্ড প্যারাশুট। প্রচণ্ড ওজন নেয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে ওটাকে। রানা দু' শ' পাউণ্ড গিয়ার নেবে সাথে, আকাশের অনেক উপরে ঘণ্টায় পঁচাত্তর মাইল বেগে হাওয়া বইবে, এসবই সহ্য করবে এই জিনিস। দুনিয়ার বেশির ভাগ স্পেশাল ফোর্স এই প্যারাশুট ব্যবহার করছে। স্ট্র্যাপগুলোর নীচে থাকে বাড়তি প্যাডিং। বিমান থেকে হঠাৎ করে পতন শুরু হলে টু-টাইয়ার করা ডিপ্লয়মেণ্ট সিস্টেম সেটা সামলে নেবে। এ ধরনের সেফটি ডিভাইস থাকলেও কর্ড টান দেয়া শক্ত নার্ভের কাজ। পতন শুরু হলে যে-কোনও প্যারাশুটিস্ট ভাবতে শুরু করে, নীচে গিয়ে আছড়ে পড়লে কী ঘটতে পারে!

'বিসিআই-এ কথা সেরে নুমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি,' বলল রানা। ওর আঙুলগুলো দেখছে কোনও দুর্বলতা আছে কি না রাইজার লাইনে। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন কথা দিয়েছেন, জেনারেটার দেখতে একটা জাহাজ পাঠাবেন। তাঁর কাছে শুনলাম চমকে গেছে সিআইএ-র আফ্রিকা ডেস্ক। তারা ভাবতেও পারেনি স্যামুয়েল আবালা টমাস গাধাধারের লোক।' প্যারাশুটের রাইজারগুলো ঠিক করে ফেলেছে রানা, এবার ভাঁজ করতে শুরু করে একসঙ্গে আটকে ফেলছে রাবার ব্যাণ্ড দিয়ে।

'তার মানে বোকা বনে গেছে?' জানতে চাইল সোহেল।

'আসলেই তাই। আফ্রিকার সিআইএ ডেস্কের হেড এরই মধ্যে রিযাইন করেছে।'

'লোকটার আর কোনও উপায় ছিল?'

'না। সরকার ওই পদে রাখতে চাইলেও পদত্যাগ তাকে

করতেই হতো।'

'আর এই ঘটনা বাংলাদেশে হলে?' তিক্ত শোনাল সোহেলের কণ্ঠ, 'সেই লোক নিজ দলের হলে তাকে কোলে তুলে গালে চুমু দিতেন সরকার-প্রধান, জনগণের কথা ভুলেও ভাবতেন না।'

মুখ তুলে বন্ধুর দিকে চাইল রানা। হাতদুটো কাজ করে চলেছে প্যারাশুটের উপর।

রানা ও সোহেলের কথা শুনতে পেয়েছে অন্যরা। আপন মনে মাথা দোলাল নিশাত। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাইছে ওরা, কিন্তু কোনও কথা বলছে না। হোল্ডের ভিতর থমথমে একটা পরিবেশ তৈরি হলো।

আধ ঘণ্টা পর নিজের প্যারাশুট একজন ক্রুর হাতে ধরিয়ে দিল রানা। ওটা তুলে দেয়া হবে কপ্টারে। সোহেলের কাছ থেকে বিদায় নিল রানা। এবার কেবিনে ফিরে একটু ঘুমাবে। কিন্তু অর্ধেক পথ গিয়ে আবারও মত পাল্টে ফেলল, ঢুকল মেডিকেল বে-তে। ডেস্ক বা পাশের অপারেশন থিয়েটারে ফারা নেই। পরের দুই রিকভারি রুমও ফাঁকা। তৃতীয় ঘরে কার্টাকে পেল রানা। প্রতিটি বাতি কমিয়ে দেয়া হয়েছে, টিমটিম করে জ্বলছে। হাসপাতালের বিছানায় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে মেয়েটি। বুকের উপর থেকে সরে গেছে ব্ল্যাঙ্কেট, পাঁজরের ব্যাণ্ডেজ দেখতে পেল রানা। এখন আর ক্ষত থেকে রক্ত বেরুচ্ছে না।

সাদা চাদর ও বালিশে ছড়িয়ে পড়েছে লালচে চুল। কপালের পাশে দুলছে এক গুচ্ছ। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে দুই ঠোঁট। ঘুমের ভিতর অস্পষ্ট কী যেন বলল। ওর উপর ঝুঁকে এল রানা। আর কিছু বলছে না মেয়েটি। সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগে ব্ল্যাঙ্কেট ঠিক করে দিল রানা। দরজার দিকে রওনা হবে, ঠিক তখনই আবারও শুনতে পেল: 'রানা... চলো না... আজ কোথাও

বেড়াতে যাই...'

বোধহয় স্বামী ও সংসারের সুখ-স্বপ্ন দেখছে কার্টা।

অদ্ভুত রূপসী মেয়েটির দিকে কয়েক পলক চেয়ে রইল রানা, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এল মেডিকেল বে থেকে। কেবিনে ফিরে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলল সুন্দরী কার্টা ও সামনের ভয়ঙ্কর কঠিন মিশনকে। দু' মিনিটের ভিতর ঘুমিয়ে পড়ল।

সোয়াকোপমুণ্ডে গিয়ে ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসানের বিমানে উঠবার এক ঘণ্টা আগে ঘুমের ভিতর রানার মনের ঘড়িতে বেজে উঠল অ্যালার্ম। চট্ করে চোখ মেলল ও, মুহূর্তে সচেতন হয়ে উঠল। এক গড়ান দিয়ে নেমে পড়ল বিছানা ছেড়ে, সোজা গিয়ে ঢুকল বাথরুমে। ভাবল আরেকবার গোসল করে নেবে, কিন্তু পরক্ষণে মত পাল্টাল। মুখ-হাত ধুয়ে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে, চলে গেল ওয়াক-ইন ক্লজিটের সামনে, জ্বেলে দিল বাতি।

ক্লজিট থেকে বের করে নিল রাইডিং বুটজোড়া, দ্রুত হাতে পরে নিল। ডান দিকের বুটের ভিতর রয়েছে একটা থ্রোয়িং নাইফ, বাম বুটের ভিতর পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পিস্তল .৩৮ ক্যালিবারের কেল-টেক অটোমেটিক। বুটের দুই গোড়ালির উপর খুব খুদে সারভাইভাল কিট ও হীরার গুঁড়ো মেশানো সরু তার। প্রয়োজন পড়লে ওটা দিয়ে মুহূর্তে যে-কোনও লোকের গলা পেঁচিয়ে ধরে শেষ করে দেয়া যায়। রানা ধূসর একটা প্যান্ট পরে নিয়ে কোমরে এঁটে নিল বেল্ট, ওটার ভিতর রয়েছে এক প্যাকেট চ্যাপ্টা সি-৪ এক্সপ্লোসিভ। পাশেই রাখা টাইমার/ডেটোনেটার। আরও কয়েকটা চমক রাখা হয়েছে বেল্ট ও বুটের ভিতর। বিসিআই-এর অস্ত্র বিশেষজ্ঞ ডক্টর শামশের আলী ভাবনা-চিন্তা করেই সঠিক জায়গায় গ্যাজেটগুলো রেখেছেন।

মরুভূমির ক্যামোফ্লেজ ফেটিগ পরে রানা চলে গেল অস্ত্রের সিন্দুকের সামনে, ওটা খুলে বের করে নিল এইচ অ্যাণ্ড কে এমপি৫ সাবমেশিন গান ও গ্লক পিস্তল। অস্ত্র ও খালি ম্যাগাযিনগুলো একটা সস্তা নাইলন ব্যাগের ভিতর রাখল। ও যখন হেলিপ্যাডে কপ্টারের জন্য অপেক্ষা করবে, সে সময়ে ম্যাগাযিনগুলোর ভিতর গুলি ভরে দেবে মার্ভেলের আর্মারার। এবার ব্যাগের ভিতর বাড়তি একটা কমব্যাট হার্নেস রাখল রানা।

কেবিনের দরজায় মৃদু টোকার আওয়াজ হলো, তারপর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল বাবুর্চি মোস্তাফা আবুল, ট্রেতে ব্রেকফাস্ট হিসাবে সাজানো ফলমূল ও কার্বোহাইড্রেটের খাবার। মরুভূমিতে গেলে ওই শক্তি রানার লাগবে। ট্রেতে রাখা এক মগ কড়া কফি ও কমলার জুসের জগ। টেবিলের উপর সব রাখতেই চেয়ারে বসে পড়ল রানা, কোলের উপর ন্যাপকিন রেখে কমলার জুস দিয়ে শুরু করল।

দারুণ মজাদার নাস্তার মাঝে বলল রানা, 'আপনি আসলেই বাংলাদেশ নেভির গর্ব ছিলেন।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল লোকটার মুখ। কিন্তু পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে গেল। 'আপনি তাই বলছেন, স্যর?'

'নিশ্চয়ই!'

'তাতে গর্বিত হতে পারছি না, স্যর। আমি সাগরে সাত নম্বর মহাবিপদ সঙ্কেতের সাইক্লোন পাত্তা না দিয়ে বিশজন অফিসারকে চা করে খাইয়েছি, এক ফোঁটা চা পড়তে দিইনি ডেকে। আপনি স্যর, আমার ক্ষমতাকে খুবই ছোট করে দেখছেন।'

'বেশ,' দুষ্ট হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। 'কোনও হারিকেন বা সাইক্লোন শুরু হলে আপনার কাছ থেকে গুয়েরে

চিজ সঙ্গে লবস্টার সৌফ্‌ল্‌ এবং বেক আলাস্কা ডেজার্ট চাইব।'

'ঠিক আছে, স্যর,' ঘুরে দাঁড়িয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল মোস্তাফা আবুল।

নাস্তা শেষ করে হ্যাঙারের দিকে রওনা হলো রানা। চলবার পথে একবার ঢুঁ দিল মেডিকেল বে-তে। এইমাত্র দুটো লাল প্লাস্টিকের মেডিকেল কেস গুছিয়ে রেখেছে ফারা। মুখ তুলে চাইল।

'মালপত্র প্যাক করছ, কাজেই ধরে নিচ্ছি তুমি আমাদের সঙ্গে আসছ,' বলল রানা। 'তোমার পেশেন্ট কেমন করছে?'

'এক ঘণ্টা আগে ঘুম ভেঙেছে,' বলল ফারা। 'প্রতিটি ভাইটাল সাইন স্টেবল, কোনও ধরনের ইনফেকশনও হয়নি। যখন এখানে থাকব না, মনে করি না খারাপ দিকে যাবে ওর শরীর। তা ছাড়া, বেশির ভাগ ইআর নার্সের চেয়ে বেশি ট্রেইণ্ড আমার আর্দালিরা।'

'গুড। একটু অপেক্ষা করো, কার্টার সঙ্গে একমিনিট কথা বলেই তোমার কেসগুলো নিয়ে হ্যাঙারে যাব।'

তিন-চারটে বালিশে আধ শোয়া হয়ে বসে আছে কার্টা। ফ্যাকাসে দেখাল মুখটা। গর্তে বসে গেছে চোখ। কিন্তু যেই দেখল দরজার চৌকাঠে এসে হেলান দিয়েছে রানা, ওর ঠোঁটে ফুটে উঠল মিষ্টি হাসি।

'হ্যালো, কেমন বোধ করছ?' খাটের পাশে এসে থামল রানা।

'কড়া ওষুধ খেয়ে মাথা একটু ঘুরছে, এ ছাড়া ভালই আছি।'

'ফারা বলল কয়েক দিনের ভিতর সুস্থ হয়ে উঠবে।'

'তুমি জাহাজে মহিলা ডাক্তার রেখেছ, অবাক হয়েছি।'

'আমাদের ক্রুদের ভিতর বেশ কয়েকজন মহিলা।'

'আমি কি ভুল শুনছি, না সত্যিই এ জাহাজে কপ্টার আছে?'

'আমরা কয়েকজন লোককে তীরে পাঠাব।'

রানার ক্লান্ত চোখের দিকে চেয়ে রইল কার্টা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'বলেছিলে আমাকে বলবে তুমি আসলে কে এবং কী।'

'মিথ্যা বলিনি,' বলল রানা। 'ফিরে এসে বলব একসময়।'

'এখন কোথায় যাবে?'

'নামিবিয়ায় যে কাজে এসেছি, সেখানে চলেছি। হয়তো ওখানে জানব কারা তোমার উপর হামলা করেছে, কারা তৈরি করেছে ওই ওয়েভ-পাওয়ার্ড জেনারেটার।'

'তুমি কি সিআইএ বা এ ধরনের কোনও সংস্থার সঙ্গে আছ?'

'তা বলতে পারো। এখন কিছু জানতে চেয়ো না। আগামী সকালে ফিরে নাস্তার টেবিলে সবই বলব।'

'ঠিক আছে, কথা দিলে কিন্তু।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'ভাল করে ঘুম দাও। সকালে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

রানার হাত ধরল কার্টা, নরম স্বরে বলল, 'আমি সত্যিই দুঃখিত, রানা। আমার সঙ্গে তোমাকে জড়িয়ে নেয়া বোধহয় ঠিক হয়নি।'

'আমার সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তোমারটাও, কাজেই মন খারাপ কোরো না। তা ছাড়া, আমারই উল্টো সরি বলা উচিত।'

'কী কারণে?'

'তুমি তোমার জাহাজ ভরা হীরা পেলে না।'

'বোকার মত অমন ভেবেছি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল কার্টা।

'যে কেউ লটারিতে সেরা পুরস্কার পেতে পারে,' ঘুরে দাঁড়াল রানা, বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ফারা অপেক্ষা করছিল। ওর পাশ

থেকে মেডিকেল কেস তুলে নিল রানা, অন্য হাতে অস্ত্রের ব্যাগ। দু'জন রওনা হয়ে গেল হ্যাঙারের উদ্দেশে।

দুই

অ্যান্টিক ডি হ্যাভিল্যাণ্ড সি-৭ ক্যারিব্যুর ভিতর অংশ বেশ প্রশস্ত। প্রায় সবাই হাত-পা ছড়িয়ে বসেছে বেঞ্চ সিটে। পাশেই নামিয়ে রেখেছে যার যার গিয়ার। লোডিং র‍্যাম্পের সামনের দিকে বিশ্রী চেহারার চারটে মোটর সাইকেল, আটকে দেয়া হয়েছে বানজি কর্ড দিয়ে। এই বিমানের দীর্ঘ জীবনে কোনও এক সময়ে ইন্টেরিয়র মডিফাই করা হয়েছিল। এবং সেকারণেই প্রেশারাইয করা যায় এই বিমান। আকাশের এত উপরে বরফ-শীতল পরিবেশে বসতে হয়নি মানুষগুলোকে। অক্সিজেনের সিলিণ্ডার থেকেও টানতে হচ্ছে না শ্বাস। জোরালো গোঁ-গোঁ আওয়াজ তুলছে দুটো প্র্যাট অ্যাণ্ড হুইটনি রেডিয়াল ইঞ্জিন, পাশের জনের সঙ্গে গল্প করবার উপায় নেই কারও।

সবার চেহারা লক্ষ করছে রানা। নিজে বালকহেডে হেলান দিয়ে বসেছে, প্যারাশুটের ওজন কমিয়ে নিতে চাইছে কাঁধ থেকে। জলিল খেয়াল করেছে রানার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। জবাবে আন্তরিক হাসি দিল। স্বর্ণা ও কাশেম বক্স পাশাপাশি বসেছে বেঞ্চ সিটে, ব্যস্ত হয়ে লুডু খেলছে। স্বর্ণা সানজিদা শেষ মুহূর্তে এই মিশনে যোগ দিয়েছে। রানা বা নিশাতের কিছু হলে দলের দায়িত্ব নেবে সে।

নিশাত সুলতানার দেহের প্রকাণ্ড আকারের কারণে ঠিক করা হয়েছে ওর প্যারাশুটের সঙ্গে মোটর সাইকেল দেয়া হবে না। এখন একটা ক্যানভাস সিটে গুটিসুটি মেরে বসে আছে সে, কাঁধের উপর হেলে পড়েছে মাথা। একটু হাঁ হয়ে আছে মুখ। ওটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে।

'মিস্টার রানা,' সামনে থেকে চিৎকার করল ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসান। ককপিটের দিকে চাইল রানা। দরজা খোলা। হালকা-পাতলা বাঙালি ক্যাপ্টেন বসে আছে পাইলটের সিটে, সিট বেল্ট দিয়ে ভাল ভাবেই আটকানো। তার পাশে কো-পাইলটের সিটে ডক্টর ফারা রাইনার। দুই সিটের দু'পাশে রেখেছে মেডিকেল কেসগুলো।

'হ্যাঁ, বলুন?'

'আপনারা তৈরি হয়ে নিন। পনেরো মিনিট পর ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাব।' কেবিনের মৃদু আলো আরও ম্লান করে দিলেন ক্যাপ্টেন, বদলে জ্বলে উঠল লাল ব্যাটল ল্যাম্প।

'ঠিক আছে,' জবাবে বলল রানা। টার্বো প্রপেলারের উপর দিয়ে গলা ছাড়ল, 'আর পনেরো মিনিট! আপা, উঠে পড়ুন!'

চমকে গিয়ে ঘুম ভেঙে গেছে নিশাতের, মস্ত একটা হাই তুলল।

নতুন করে আবারও চেক করবার দরকার নেই ইকুইপমেন্ট, মার্ভেল জাহাজে কমপক্ষে বারো বার পরীক্ষা করা হয়েছে। স্ট্র্যাপ ও হার্নেসগুলো সব ঠিক আছে। তবুও শেষ আরও একবার সবকিছু চেক করে দেখল ওরা। প্যারাশুট ড্রপিঙের সময় মাত্র একবারই সঠিক ভাবে নামবার সুযোগ মেলে। মোটর সাইকেলগুলো তৈরি রাখল। খুলে দেয়া হলো বানজি হুকগুলো। জাম্প পজিশনে নিয়ে যাওয়া হলো মোটর সাইকেল।

পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে হলুদ ওয়ার্নিং বাতি জ্বেলে দিল

জাহিদ হাসান। রানার কথায় দলের সবাই মুখে পরে নিল অক্সিজেনের মাস্ক, ভারী রাবারের টিউবগুলো আগেই পরীক্ষা করা হয়েছে, নিশ্চিত করা হলো এয়ারফ্লোও ঠিক আছে। ওদের বুকের সঙ্গে ঝুলছে সিলিণ্ডার। এবার বড়সড় গগলস পরে নিল। সবাই যখন বুড়ো আঙুল তুলল, রানা ঘুরে চেয়ে ইশারা করল ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসানের দিকে। এই সিগনাল পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল পাইলট। সে এবং ফারাও পরে নিয়েছে মাস্ক।

ককপিট ডোর বন্ধ করে দিল জাহিদ হাসান, কয়েক মুহূর্ত পর কর্কশ আওয়াজ তুলে চালু হলো রিয়ার র‍্যাম্পের মোটর। সেই আওয়াজ আবার হারিয়ে গেল শীতল হাওয়ার হু-হু গর্জনের নীচে। কার্গো হোল্ডের ভিতর যেন তুমুল ঝড় শুরু হলো। এক পাতা কাগজ উড়ে গেল রানার পাশ দিয়ে, স্যাঁৎ করে হারিয়ে গেল আঁধার আকাশে।

গালে এসে লাগল সাব যিরো টেম্পারেচারের দামাল হাওয়া। ওদের দেহের সামান্য অংশ খোলা, যেমন হাত বা গলা, তাতেই বেদম কাঁপ ধরে গেল শীতে। পুরু মাফলার দিয়ে গলা-ঘাড় মুড়িয়ে নিল রানা। অন্যরাও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে মাফলার নিয়ে।

র‍্যাম্প পুরোপুরি খুলে যেতেই বিমানের পিছনে দেখা দিল কুচকুচে কালির মত আঁধার আকাশ। অনেক নীচে দেখা গেল মরুভূমির বৈশিষ্ট্যহীন একঘেঁয়ে প্রকৃতি। দিগন্তের ওপাশে জ্বলছে অসংখ্য ঝিকমিকে নক্ষত্র। এত উপর থেকে রানার মনে হলো হাত বাড়িয়ে দিলেই ওগুলো ছুঁতে পারবে।

'কমিউনিকেশন চেক,' থ্রোট মাইকে বলল রানা। একে একে প্রত্যেকে জবাব দিল ট্যাকটিকাল নেটে।

কেবিনের হলুদ বাতি টিপটিপ করতে শুরু করেছে। আর মাত্র এক মিনিট পর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

বিমানে উঠবার পর নিজেকে মনে মনে শুনিয়েছে রানা কী

করতে হবে। আরেকবার নিজেকে মনে করিয়ে দিল। বিমান থেকে বেরুবে, নিজেকে সামনের দিকে নিয়ে যাবে, আকাশ থেকে খসে পড়তে শুরু করবে, বাঁকা করে নেবে পিঠ, দুই হাত ও পা ছড়িয়ে দেবে, নীচ থেকে ওকে জোর বাধা দেবে তুমুল বাতাস। এর ফলে শুট খুলবার সময় ঝাঁকি কম লাগবে। চোখ বন্ধ করে ফেলেছে রানা, কিন্তু বুঝতে পারছে নিজেকে সবকিছু মনে করিয়ে দিচ্ছে সবাই।

বিমানের ইঞ্জিনের আওয়াজ একটু বদলে গেল। বিমান নিয়ে আরও উপরের দিকে রওনা হয়েছে জাহিদ হাসান। ত্যাড়চা হয়ে গেল ডেক। হঠাৎ নিভে গেল হলুদ বাতি। সে জায়গা নিল একটা সবুজ বাতি।

কমাণ্ডো প্যারাশুট ড্রপের মত ওদেরকে এয়ারক্রাফট থেকে কাছাকাছি সময়ে লাফ দিতে হবে না, কাছাকাছি থাকতেও হবে না। ওরা সামান্য নামবার পরেই শুট খুলবে, অনেক নীচে থাকবে মরুভূমি, সহজেই একত্র হতে পারবে আবার। ওদের আলাদা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। একে একে সামনে বাড়ল ওরা, পিছনের র‍্যাম্প থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওদের পশ্চাদ্দেশের নীচ থেকে খসে পড়ল হালকা মোটর সাইকেলগুলো। পিঠ বাঁকা করে ফেলল ওরা, তৈরি হলো রিপ কর্ডে হ্যাঁচকা টান দিতে। সবার শেষে র‍্যাম্পের কাছে পৌঁছে বেশ নীচে চারটে প্যারাশুটের মাথায় খুদে চারটে বাতি দেখল রানা। ওগুলো বলে দিল শুটগুলো সফলভাবে খুলে গেছে। ওরা যখন ডেভিলস ওয়েসিসের কাছাকাছি পৌঁছবে, নিভিয়ে দেবে বাতিগুলো। বদলে জ্বলে উঠবে ইনফ্রারেড গ্লোব, নাইট ভিশন গগলসের কারণে ওগুলো ভালভাবেই দেখবে।

মোটর সাইকেলের সিটে বসে ফাঁকা আকাশে যাত্রা শুরু করল রানা, পরক্ষণে ওর নীচ থেকে হারিয়ে গেল মোটর বাইক।

পিঠ বাঁকিয়ে ফেলল ও, নিখুঁত ডাইভ শুরু করল। বিমানের প্রপেলারের তীব্র হাওয়া ওকে চাপড় দিয়ে নীচের দিকে পাঠিয়ে দিল। কাত হচ্ছে ও, তারপর যেই বুঝল চরকির মত ঘুরতে শুরু করবে, হাত-পা নেড়ে ঠিক করে নিল দেহ। আবারও বুক দিয়ে নামতে লাগল। মোটর সাইকেলের দীর্ঘ লাইন ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই বুকের উপর হাত নিয়ে গেল রানা, টান দিল রিপ কর্ডে। ছিটকে খুলে গেল ওর খুদে শুট, ওটা ভরে উঠল বাতাসে, আর ওটাই থলে থেকে টান দিয়ে বের করে দেবে মূল প্যারাশুট।

পরের এক সেকেণ্ডেই রানা বুঝে গেল, কোথাও মস্ত কোনও ভুল হয়েছে। থলির ভিতর থেকে বেরুতে শুরু করেও আটকে গেছে ওর প্যারাশুট, মাথার উপর ছাতির মত খুলে যায়নি ওটা, কোনও ঝাঁকিও লাগেনি। তীব্র বাতাসের কারণে সামান্য খোলা শুট চাপড় মারল রানার দেহে, ওকে দাঁড় করিয়ে দিল আকাশে। তীরের মত নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে ও। মাথার উপর পতাকার মত পতপত করে আওয়াজ তুলছে চার ভাগের এক ভাগ খোলা নাইলনের ছাতা।

মাথা তুলে উপরের দিক দেখতে চাইল রানা। আঁধারে কিছুই দেখা গেল না। বুঝবার উপায় নেই কোথায় সমস্যা। বহুবার ঝাঁপ দিয়েছে রানা, বুঝতে পারছে জড়িয়ে গেছে রাইজার লাইনগুলো।

পরের কাজ খুব ধীরে-সুস্থে করল ও, কিন্তু বিদ্যুতের বেগে ভেবে চলেছে। নিজেকে গালি দেয়ার ফাঁকে শরীর মুচড়ে ছাড়িয়ে নিতে চাইল জড়িয়ে যাওয়া লাইন। নিজ হাতে শুট প্যাক করেছে, কাজেই অন্য কাউকে দোষ দেয়ার উপায় নেই। এখন যদি রাইজার লাইনের জট্ ছাড়াতে না পারে, ভেস্তে যেতে পারে গোটা মিশন। কাউকে যদি দোষ দিতে হয়, ও নিজেই সেই লোক।

এখনও হাজার হাজার ফুট নীচে মরুভূমি, কাজেই লাইনগুলো নিয়ে ধস্তাধস্তি শুরু করল রানা। কিন্তু কিছুক্ষণ পর পৌঁছে গেল বিশ হাজার ফুট উচ্চতায়। এবার বুঝল, বাধ্য হয়েই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এখন যদি নিজেকে আরও নামতে দেয়, এবং প্যারাশুটও খুলে যায়, তারপরও গ্লাইড করে পুরো পথ যাওয়া অসম্ভব। সেফটি ফ্যাক্টরের যে হিসাব বের করেছে সোহেল, তাতে কোনওভাবেই ও ডেভিলস ওয়েসিস পৌঁছবে না। এদিকে এখন যদি মূল প্যারাশুট কেটে ফেলে, ওর বাড়তি ছোট শুট প্যারাগ্লাইড করে ভাসিয়ে রাখবে না। উপকূল থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে, নতুন করে ওকে কপ্টারে তুলে নিতে পারবেন না ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ। মোট কথা, মিশনে যোগ দেয়ার ইচ্ছাটা বিসর্জন দিতে হবে ওকে।

কবজিতে বাঁধা ডিজিটাল আল্টিমিটার দেখল রানা। ও নেমে এসেছে উনিশ হাজার ফুটে। মনে মনে ভাগ্যকে খারাপ একটা গালি দিয়ে মোটর সাইকেলের দড়ি কেটে দিল রানা। রিলিজগুলো খুলে দিতেই বাদুড়ের মত আরেক দিকে রওনা হলো মেইন শুট। এবার ছোট্ট শুট ছাড়া পেলেই টান দিয়ে বের করে দেবে অগযিলারি শুট। রিপ কর্ড টানবার পর এই প্রথম চারপাশের পরিস্থিতির দিকে খেয়াল দিল রানা। এখন যদি স্পেয়ার শুটটা কোনও গোলমাল করে, আন্দাজ তিন মিনিট পর পাথরের বস্তার মত মরুভূমির উপর ঘণ্টায় এক শ' বিশ মাইল বেগে আছড়ে পড়বে ও!

হুউইশ্ আওয়াজ তুলে খুলে গেল অগযিলারি প্যারাশুট, কালো একটা ফুলের মত ছড়িয়ে পড়েছে মাথার উপর। উরু-সন্ধি ও দুই কাঁধে বেদম টান খেল রানা, ওর মনে হলো এত মধুর আকর্ষণ জীবনেও টের পায়নি কোনও মেয়ের কাছ থেকে।

'তোমরা এগিয়ে যাও,' থ্রোট মাইকে জানিয়ে দিল রানা।

'আপনি বড় দ্রুত স্বর্গ থেকে পৃথিবীর মায়ায় নেমে গেলেন, মাসুদ ভাই,' বলল স্বর্ণা। 'কোনও সমস্যা?'

'মেইন শুট নষ্ট হয়ে গেছে। কেটে ফেলে দিতে হয়েছে।'

'স্যর, আপনার আল্টিচ্যুড কত?' জানতে চাইল নিশাত।

'আঠারো হাজার পাঁচ শ'।'

'এক মিনিট,' হিসাব কষতে শুরু করেছে স্বর্ণা।

'বেশ।'

স্বর্ণার কাছে একটা পোর্টেবল জাম্প কমপিউটার ও জিপিএস দেয়া হয়েছে।

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই। আপনি সেকেণ্ডে বড়জোর চোদ্দ ফুট করে নামছেন। তার মানে আপনি কম বেশি বাইশ মিনিট ভাসতে পারবেন।' বিশাল প্যারাশুটের কারণে ওরা মোটর বাইক নিয়েও এর দ্বিগুণ সময় ভাসবে। 'আপনি যে আল্টিচ্যুডে রয়েছেন, সেখানে হাওয়া বইছে ঘণ্টায় পঞ্চাশ নট গতিতে। অবশ্য, পরে আরও নেমে গেলে হাওয়ার বেগ কমবে।'

'আর কিছু?'

'উপকূল থেকে আন্দাজ চার শ' মাইল ভিতরে মরুভূমিতে আছেন।' টানা হাওয়া বইছে পুব থেকে পশ্চিমে, কাজেই ওরা জাম্প করেছে বতসোয়ানা সীমান্তের কাছে। রানা যেখানে নামবে, সেখানে ড্রপ ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে মার্ভেলের কপ্টার পৌঁছুতে পারবে, কিন্তু আর ফিরতে পারবে না।

'মার্ভেল থেকে কোনও টিম এসে আমাকে উদ্ধার করবে, সেজন্য বোধহয় অপেক্ষা করতে হবে,' বলল রানা। 'একটা মোটর বাইক গেছে। এখন তোমাদের কাজ হবে আসিফ ও কুম্বসকে উদ্ধার করা। চাইলেও কিডন্যাপারদের কাউকে নিতে পারবে না, কাজেই সে চেষ্টাও করবে না।'

নিজের উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে রানা। সত্যি যদি ওই

দলের কাউকে বন্দি করা যেত, অনেক কিছুই তার পেট থেকে বেরুত। একটা দুশ্চিন্তা বোধ করছে রানা: ওর দলের সবাই বিপদে পড়বে না তো?

এরই ভিতর মূল দল থেকে অনেক সরে গেছে রানা, ট্যাকটিকাল রেডিয়োর রেঞ্জের শেষ সীমায় পৌঁছে অস্পষ্ট শোনাল নিশাতের কণ্ঠ, 'বুঝতে পেরেছি, স্যর।'

দ্রুত ভাবতে শুরু করেছে রানা: কোনও কিছু বলতে ভুলে গেল না তো! একটু পর আর ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না। আপন মনে মাথা নাড়ল। না, বহুবার প্রতিটি বিষয়ে আলাপ হয়েছে। আর কিছু বাদ নেই। 'গুড লাক, অ্যাণ্ড আউট,' বলল রানা।

'আপনার জন্য একই শুভেচ্ছা রইল, স্যর,' বিমর্ষ স্বরে জানাল নিশাত।

আর কারও যোগাযোগ করবার কথা নয়, তবুও রেডিয়ো খুলেই রাখল রানা। বেশিক্ষণ ভেসে এগুবার জন্য দড়িদড়া ঠিক করল, কবজির সঙ্গের টগলদুটো দিয়ে অ্যারোডাইন্যামিক শেপ নিয়ে এল প্যারাশুটে। দিক পরিবর্তন করছে, কিন্তু সেজন্য প্রচুর খাটনি দিতে হলো। মুখে এসে লাগছে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। টগল টেনে রাখতে গিয়ে দুই কাঁধে টনটনে ব্যথা শুরু হয়েছে। একটু পর আড়ষ্ট হয়ে উঠতে লাগল পিঠের পেশি, চাপ পড়ছে পেটের পেশির উপরও।

কিছুক্ষণ যাওয়ার পর উল্টোপাল্টা হাওয়ার ভিতর পড়ল রানা। একবার ফাঁকা মরুভূমির দিকে চাইল। এত উপর থেকে আদিগন্ত কালো বিরান প্রান্তর কেমন যেন লাগল। কোথাও কোনও আলো নেই। নীচে যেন কোনও কুচকুচে কালো বিশাল সাগর।

দশ হাজার ফুট উচ্চতায় নেমে আসবার পর বাম হাত থেকে

ফস্কে গেল টগল। ওটা আবার ধরবার আগেই তীক্ষ্ণ বাঁক নিল প্যারাশুট, অতি দ্রুত নামছে। ক্যানোপির নীচে পেণ্ডুলামের মত ঝুলছে রানা, বনবন করে ঘুরছে। প্যারাশুটের ঘোরা থামাতে চাইল ডানদিকের টগল ব্যবহার করে। কয়েক সেকেণ্ড চেষ্টা করে আবারও ধরতে পারল বামদিকের টগল। ওই অতি ব্যস্ত কয়েক সেকেণ্ডে একবার ওর মনে হলো অনেক দূরে বামদিকে কী যেন দেখেছে। আবারও ওদিকে চাইল, কিন্তু কিছুই নেই।

বোধহয় ভুল দেখেছে, ডান হাত নিয়ে গেল বুকের কাছে, পাউচ থেকে বের করবে নাইট ভিশন গগলস। বাম হাতে খুলে ফেলল সেফটি গগলস ও অক্সিজেন মাস্ক। ওগুলো এখন আর কাজে লাগবে না, ফেলে দিয়ে নাইট ভিশন গগলস পরে নিল। টগল ধরে আবারও কমিয়ে নিল পতনের গতি।

হঠাৎ বদলে গেল মরুভূমির ফ্যাকাসে বাদামি রং, লাইট অ্যামপ্লিফাইং গগলসের ভিতর দিয়ে মরুভূমিকে মনে হলো ভুতুড়ে সবুজ। অনেক নীচে দেখা গেল ছোট একটা কনভয়। আরেক দিকে চলেছে গাড়িগুলো, শুধু সামনের গাড়ির হেডলাইট জ্বলছে। ওটার দুর্বল আলো গিয়ে পড়ছে বালি-ঢিবির উপর। বেশ দূরে ওই কনভয়, প্যারাশুট এখন যে উচ্চতায় ছুটছে, ওখানে পৌঁছুতে পারবে না রানা। সেজন্য হতাশ হলো না, ওর মন বলছে সামনে কোথাও থামবে কনভয়।

প্যারাশুটের গ্লাইড পাথ অ্যাডজাস্ট করে নিল রানা, শিকারী বাজের মত অনুসরণ করল কনভয়কে। আরও দূরে চলে যাচ্ছে ওটা। কয়েক মিনিট পর আর দেখাই গেল না। এদিক দিয়ে কোনও কনভয় গেছে তার প্রমাণ হিসাবে রইল শুধু বালির উপর চাকার দাগ।

যতক্ষণ পারা যায় ভেসে চলল রানা, একবার দেখে নিল ঘড়িঃ বিমান থেকে নামবার পর বিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে।

একটু পর নামতে হবে, চট্ করে নীচে চাইল।

ওদিকে যত দূর চোখ যায় একের পর এক বালির ঢিবি, সাগরের ঢেউয়ের মত। রানা ছড়িয়ে যেতে দিল প্যারাশুটের ডানা, তার কয়েক সেকেণ্ড পর হাঁটবার গতিতে আস্তে করে স্পর্শ করল বালির মেঝে। দ্রুত হাতে বাতাস বের করে দিল ক্যানোপি থেকে, নাইলনের কাপড় তুলে গোল একটা বাণ্ডিল বানাল। এখন বাতাস এসে উড়িয়ে নিতে পারবে না। স্ট্র্যাপগুলো খুলে নামিয়ে রাখল প্যারাশুটের বাণ্ডিল। ওটার সঙ্গের যৎসামান্য ইকুইপমেণ্ট রাখল বালির উপর।

কোমরের উপর থেকে জ্বলছে ওর বুক-পিঠ। টের পেল, ছেলা ত্বক ঠিক হতে বেশ কয়েক দিন লাগবে। পেশি আলগা রাখতে হবে, চাপ পড়লে শুরু হবে তীব্র ব্যথা।

ক্যারাভানের চাকাগুলোর দাগের পাশেই নেমেছে রানা, ওখানে দাঁড়িয়ে ক্যাণ্টিন থেকে এক ঢোক পানি খেয়ে নিল। এই ক্যাণ্টিনের পানি ফুরিয়ে গেলেই বিপদে পড়বে। ট্রাকের চাকাগুলোর দাগ মনোযোগ দিয়ে দেখল, ওসব চাকা তৈরি করা হয়েছে গভীর মরুভূমিতে চলবার জন্য।

তিনটে উপায় দেখছে রানা। তার দুটো বেশ ভালই লাগল। বোধহয় নামিবিয়ার মিলিটারি বা কোনও সাফারি কোম্পানি এসব ট্রাকের মালিক। এই বিরান মরুভূমির ভিতর তারা খুশি মনেই ওকে সাহায্য করবে। আবার অন্য কিছুও হতে পারে। এরা স্মাগলার কিংবা শত্রুপক্ষের লোক হলে পৌঁছানোমাত্র খুন করবে।

এখানে কয়েক দিন পড়ে থাকবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই রানার। সাবডার্মাল ট্রান্সমিটার থেকে তথ্য পাবে সোহেল, তারপর দল পাঠাবে ওকে উদ্ধার করতে। তাতে কয়েক দিন লাগবে। ওরই তৈরি এই ঝামেলা থেকে নিজেই উদ্ধার পাওয়ার

চেষ্টা তার চেয়ে ভাল।

ওর সব ইকুইপমেন্ট বালির উপর বিছিয়ে রাখল রানা। সবই সামান্য জিনিস, কাজেই বাদ। সঙ্গে রাখল কেবল মেশিন পিস্তল, গ্লক অটোমেটিক, প্রচুর নাইন মিলিমিটারের অ্যামিউনিশন, একটা ছোরা, ছোট একটা মেডিকেল কিট, পানির ক্যান্টিন, ছোট একটা সার্ভাইভাল কিট— ওটার ভিতর রয়েছে ম্যাচ, পানি পরিষ্কার করবার ট্যাবলেট, মাছ ধরবার সুতো ও বড়শি এবং কিছু টুকটাক জিনিস। পাশেই রেখেছে প্যারাশুট ও সঙ্গের প্যাক। তার ভিতর রয়েছে শক্ত প্লাস্টিকের একটা বড় বাসন। ওর পিঠের সঙ্গে বেশ মেলে ওটার আকৃতি। প্যারাশুট নিয়ে চলবার সময় পিঠ ও কাঁধের পেশির ব্যথা কমাতে পারে ভেবে এনেছিল।

সব মিলে কাছে যা আছে, তা দিয়ে ক্যারাভানের কাছে পৌঁছাতে পারবে না। কিন্তু আস্তিনের ভাঁজে একটা কৌশল আছে ওর। আনমনে ভাবল রানা: কৌশল তো আমার শার্টের আস্তিনে নেই, আছে বেল্টে।

উঠে দাঁড়িয়ে বেল্ট খুলতে শুরু করল ও।

পঞ্চাশ মিনিট হলো আঁধার আকাশ চিরে ছুটে চলেছে নিশাত, স্বর্ণা, কাশেম ও জলিল। সামনেই মরুভূমির ভিতর ডেভিলস ওয়েসিস কারাগার। আকাশে ওদের যে উচ্চতা, কয়েক মিনিট চক্কর কাটতে পারবে কারাগারের উপর। ভালভাবেই দেখে নিচ্ছে চারপাশ। ইনফ্রারেড গগল্‌সের কারণে এরই ভিতর জানা হয়ে গেছে বন্ধ ফটকের ওপাশে তিনজন প্রহরী। একটু দূরেই একটা গাড়ি। ওটার ইঞ্জিন এখনও ঠাণ্ডা হয়নি। নিশাত ধারণা করছে, একঘণ্টা আগে ওই গাড়ি নিয়ে পেরিমিটার ঘুরে এসেছে প্রহরীরা। ওটা ছাড়া উঠানের ভিতর এবং বাইরের গাড়িগুলোর

ইঞ্জিন এই হিম রাতের মতই বরফ-ঠাণ্ডা।

থ্রোট মাইকে টোকা দিল নিশাত সুলতানা, আগেই ঠিক করা হয়েছে সবার আগে নামবে সে। টগলগুলো ঢিলা করে দিল, এক সেকেণ্ড পর রওনা হলো। পঁচিশ সেকেণ্ড পর বাতাসে ভর করে পেরুল কারাগারের প্যারাপেট। নীচের গার্ডদের বুঝবার কথা নয় কেউ নামবে ছাতে। সামান্য ঘষা খেল ওর বুট জোড়া, পরক্ষণে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সামনে লুটিয়ে পড়ল ক্যানোপি। কয়েক মুহূর্ত পর গিয়ারগুলো গুছিয়ে নিয়ে নাইলন প্যারাশুটের উপর চাপিয়ে দিল। এখন ওটাকে উড়িয়ে নেবে না হাওয়া। থ্রোট মাইকে দু'বার টোকা দিল নিশাত।

ওর পর আঁধারে বাদুড়ের মত উড়ে এল জলিল, প্যারাশুটের ডানা দুটো বিস্তৃত হলো ওর। একটু কাত হলো ওটা, মোটর সাইকেলে চেপে নিশাতের পাশে নামল জলিল। বেলুন টায়ার ছাতে পড়তেই সোজা করে নিল মোটর বাইক। পারফেক্ট ল্যাণ্ডিং করেছে জলিল, প্যারাশুট গুটিয়ে নিতে না নিতেই এল স্বর্ণা। ওর মোটর সাইকেল কাঠের ছাতে নামতেই এক পাশ থেকে ওটা ধরে ফেলল নিশাত। কোনও আওয়াজ হলো না, সতর্ক হওয়ার সুযোগ পেল না প্রহরীরা।

সবার শেষে এল কাশেম বক্স। তার মোটর সাইকেল নেমে যেতেই হঠাৎ এল দমকা হাওয়া— পিছন থেকে কাশেমকে হ্যাঁচকা টান দিল প্যারাশুট, আবার উঠে যেতে চাইছে আকাশে। মোটর সাইকেলটা দুই হাতে শক্ত করে চেপে ধরল নিশাত। কিন্তু উপর থেকে জোর টান দিল কাশেমের প্যারাশুট। মনে হলো কোনও সাইক্লোনের ভিতর পড়েছে।

'সাহায্য করো,' প্রায় ফিসফিস করে বলল নিশাত। ব্যস্ত হয়ে প্যারাশুট সামলাতে চাইছে কাশেম।

সমতল ছাতের উপর রয়েছে ট্যালকমের পুরু আবরণ,

সেখানে সড়াৎ করে পা পিছলে গেল নিশাতের। দালানের ছাতের পাশে অসহায়ভাবে ঝুলছে কাশেম।

দুই হাতে নিশাতের কোমর জড়িয়ে ধরল জলিল, কোমরের জোরে পিছাতে চাইছে। এদিকে মোটর সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের পিছনে চলে এসেছে স্বর্ণা, প্রাণপণে সামনে ঠেলতে চাইছে। ওদের তিনজনের পুরো শক্তি আপাতত থামিয়ে দিয়েছে কাশেমের উঠে যাওয়া। কিন্তু হাওয়া আরও বাড়তে শুরু করেছে। বুঝতে দেরি হলো না এই লড়াইয়ে হারবে ওরা। আর মাত্র একফুট সামনে বাড়লে ছাত থেকে নীচে গিয়ে পড়বে নিশাত।

চট্ করে একটা সিদ্ধান্ত নিল সে, কমব্যাট হার্নেস থেকে বের করে নিল ছোরা, ওটা দেখতে দিল কাশেমকে। এরই ভিতর দক্ষ কমাণ্ডো বুঝে নিয়েছে আপা কী করতে চলেছে। দড়ির উপর ঘ্যাঁচ করে ছোরা বসিয়ে দিল নিশাত। কাটা পড়েছে দড়ি, দু' পাশে ছিটকে গেল দুই প্রান্ত।

আবারও প্যারাশুটের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল কাশেম। ভাসতে ভাসতে চলে গেল কারাগারের পাশে, ওখানে পৌঁছেই বের করে দিল শুটের বাতাস। দালানের ফাউণ্ডেশনের পাশে বালির ঢিবির উপর ধড়াস্ করে পড়ল কাশেম। ব্যথায় কয়েক মুহূর্ত নড়তে পারল না। নামবার সময় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে প্যারাশুট থেকে। ক্যানোপির ভিতরটা আবারও বাতাসে ভরে উঠতেই উড়াল দিল ওটা, কারাগারের মেঝের উপর দিয়ে ছেঁচড়ে গিয়ে থামল প্রাচীরের কাছে। ওদিকে চেয়ে মস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল কাশেম। কপাল ভাল যে ওই প্যারাশুট বানচাল করে দেয়নি গোটা মিশন। তিরিশ ফুট দূরে দেখতে পেল একটা খুঁটি। তার উপর কাঠের পাটাতনে নিজ কাজ করে চলেছে পোক্ত চেহারার ইলেকট্রনিক্স। কাশেম বড় করে ঢোক গিলল। ওর বুঝতে দেরি

হয়নি ওটা মোশন সেন্সার। কেউ বাইরে থেকে ঢুকতে চাইলে ওটা সতর্ক করে দেবে কিডন্যাপারদেরকে। এরই ভিতর সেন্সারের নীচে চলে গেছে নাইলনের ক্যানোপি। এখন যদি আবারও সামান্য হাওয়া ছাড়ে, ভুস্ করে ফুলে উঠবে প্যারাশুট, সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনিক্সের আই পিসের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, অমনি কান ফাটানো অ্যালার্ম বাজতে শুরু করবে।

পাগল হয়ে উঠল কাশেম, দুই হাতে ধরল রাইজার লাইন, প্রাণপণে নিজের দিকে টেনে নিতে চাইল প্যারাশুট। ওর পিছনে এসে জড় হচ্ছে নাইলনের কাপড়। তাতে কোনও কাজ হবে বলে মনে হলো না। কাপড়ের বড় এক অংশ এখনও রয়ে গেছে সেন্সারের নীচে।

আর ঠিক তখনই এল ঝিরঝিরে হাওয়া। বাচ্চাদের বেলুনের মত ফুলে উঠতে লাগল প্যারাশুট। চমকে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কাশেম, ঝেড়ে দৌড় দিল সেন্সারের উদ্দেশে। লক্ষ্যে পৌঁছবার পাঁচ ফুট আগেই লম্বা ডাইভ দিল ও। মোশন সেন্সারের ইলেকট্রনিক্সের চোখ বুঝবার আগেই উড়ে গিয়ে ফোলা ক্যানোপি চেপ্টে দিয়েছে। ভীষণ পিছলা নাইলনের উপর দিয়ে সরসর করে চলেছে কাশেম, সোজা গিয়ে খুঁটিতে জোর বাড়ি দেবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে শরীর গড়িয়ে সরে যেতে চাইল। দুই সেকেণ্ড পর টের পেল, খুঁটি থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে ওর কোমর থেমেছে।

দুর্গের ছাতে কয়েকটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল কাশেম। অ্যালার্ম যাতে ট্রিগার না হয়, সে দিকে লক্ষ রেখে উঁচু করল ডান হাত। এবার খুব সাবধানে গোছাতে শুরু করল প্যারাশুট। দুই হাতে বাণ্ডিল পাকিয়ে ধীরে ধীরে ক্রল করে ফিরে এল কারাগারের পাশে। প্যাকের মোল্ডেড প্লাস্টিকের একটা টুকরো দিয়ে বালিতে খুঁড়ল অগভীর গর্ত, ওটার ভিতর রাখল গোটা

রিগ। গর্তে বালি ফেলে সমতল করে দিল জমি। লক্ষ করল দালানের ভিত্তির পাশে বেশ কিছু সুড়ঙ্গ। ওর মনে পড়ল মিশনে আসবার আগে ব্রিফিঙের সময় শুনেছে: এসব সুড়ঙ্গ চলে গেছে কারাগারের নীচ দিয়ে। শুধু বাতাস চলাচলের জন্য নয়, ওখান দিয়েই সরিয়ে নেয়া হতো বন্দিদের মল-মূত্র। চারপাশ দেখে নিল কাশেম। উপর থেকে দড়ি ফেলেছে নিশাত।

পরের আড়াই মিনিটে ছাতে উঠে এল কাশেম। জলিল ও নিশাত ওকে তুলে নিতেই ফিসফিস করে বলল, 'অল্পের উপর দিয়ে বাঁচোয়া!'

'আসলেই তাই,' সায় দিল স্বর্ণা।

পরবর্তী দু' ঘণ্টা ছাতের নানান জায়গা থেকে নীচের দিকে চেয়ে রইল ওরা। প্রহরীরা সবাই কৃষ্ণাঙ্গ দেখে অবাক হয়েছে, ওরা ভেবেছিল পরিবেশবাদী কিডন্যাপাররা ইউরোপিয়ান বা আমেরিকান হবে। কিন্তু বাঙালি বিজ্ঞানীকে আটকে রাখতে আফ্রিকান মার্সেনারিদের ভাড়া করেছে তারা। প্রধান ফটকে রয়েছে দু'জন প্রহরী, এরা প্রতি ঘণ্টায় একবার করে পেরিমিটার ঘুরে আসছে। তখন ফটক পাহারা দিতে আসছে তৃতীয় এক প্রহরী।

এরা রুটিন মেনে চলেছে, সত্যিকারের প্রফেশনাল হলে মাঝে মাঝে নিয়ম ভাঙত। পাহারা দেয়ার ফাঁকে এদের একজন একটু পর পর সিগারেট জ্বালছে। ম্যাচের আগুনে তার নাইট ভিশন গগলস কিছুক্ষণের জন্য কাজ করছে না। তার চেয়ে বড় কথা, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সে। জ্বলজ্বল করছে সিগারেটের ডগা।

সবার সঙ্গে আলাপের পর নিশাত ঠিক করল পরের রাউণ্ডের জন্য অপেক্ষা করবে, তারপর কাজে নামবে। তখন এক-এক করে মোটর সাইকেলগুলো মাটিতে নামিয়ে দেবে জলিল।

অন্যরা ঢুকে পড়বে কারাগারের ভিতর। আশা করা যায় অসতর্ক থাকবে কিডন্যাপাররা। ওরা খুঁজে বের করবে ডক্টর চৌধুরি ও ক্যারেন কুম্বসকে, তাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়বে মরুভূমিতে। তা যদি সম্ভব না হয়, প্রাণপণে লড়বে, কিন্তু অসহায় বন্দিদের ফেলে কারাগার থেকে বেরুবে না। ওদের সঙ্গে রয়েছে যথেষ্ট অ্যামিউনিশন।

ভোর হলে ক্যারাভানের পিছু নেয়া সোজা হতো রানার জন্য, কিন্তু সূর্য উঠবার পর মরুভূমির তাপমাত্রা হবে কমপক্ষে এক শ' বিশ ডিগ্রি। তখন দরদর করে ঘামবে, খুব দ্রুত শুকিয়ে যাবে গলা, শুরু হবে ডিহাইড্রেশন। কাজেই দেরি করবার উপায় নেই ওর।

স্যাটালাইট ফোনে সোহেলের সঙ্গে কথা শেষ করে কাজে নেমে পড়েছে রানা। বেল্ট থেকে সি-৪ প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের প্যাকেট বের করেছে, প্যারাশুট প্যাক থেকে মস্ত বাসন। ওটার উপর ডান পা রেখে বুঝতে চাইছে ভারসাম্য রাখতে পারবে কি না।

কয়েক সেকেণ্ড পর টের পেল, ঠিকই কাজ চলবে। বালির উপর কাত হয়ে পড়ছে না বাসন। সন্তুষ্ট হয়ে ওটার উপর থেকে ডান পা সরিয়ে নিল, প্যাকেট থেকে বের করল দুই টুকরো প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, রাখল বাসনের উপর। জ্বেলে নিল লাইটার, সেই আগুনে পোড়াতে শুরু করল নরম জিনিসটা। আগুন ধরে যেতেই গলতে লাগল প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। ব্রিটেনের স্যাণ্ডহার্টসে কমাণ্ডো ট্রেইনিঙের সময় শিখেছে ও এই কৌশল। পরে আন্দেজ পাহাড়ে রান্না করবার কাঠ না পেয়ে ব্যবহার করেছে সি-৪।

এবার বাসনের নির্দিষ্ট জায়গায় ডান পায়ের পুরো ওজন

চাপিয়ে দিল রানা। দেখতে না দেখতে বাসন ও বুটের সোলকে মিশিয়ে দিল প্লাস্টিকের গলন্ত দুই টুকরো। কয়েক সেকেণ্ড পর প্রায় বসে পড়ে বালি তুলল রানা, বাসনের উপর ফেলতেই নিভে গেল আগুন। এবার ঝালাই করা অংশ ঠাণ্ডা করতে পুরো দশ মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল ওখানে। গ্লকের গুলি দিয়ে বাসনের ভিতর তৈরি করেছে চারটে গর্ত। ওগুলোর ভিতর দিয়ে দড়ি ঘুরিয়ে এনে ডান বুটের সঙ্গে ভাল ভাবে বাঁধল।

এরপর ডান পা বের করে নিল বুট থেকে। অন্যান্য জিনিস বালির উপর থেকে তুলে নিল, কিছু গুলি ফেলে দিল ওজন কমানোর জন্য। পিঠে বেঁধে নিল অস্ত্র ও অ্যামিউনিশনের ঝুলি। একহাতে প্যারাশুটের বাণ্ডিল ও অন্যহাতে বুটের বাসন নিয়ে উঠতে লাগল উঁচু এক ঢিবির উপর। চূড়ায় পৌঁছে বালির উপর বিছিয়ে দিল প্যারাশুট, কমব্যাট হার্নেসে কাঁধের স্ট্র্যাপে শক্ত করে বাঁধল রাইজারগুলো। উচ্চতা ঠিক করে নিল টগলের। ওগুলোর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে প্যারাশুট। নিচু হয়ে আবারও বাসনের বুট পরে নিল, উঠে দাঁড়িয়ে বিন্দুমাত্র টলমল করতে হলো না ওকে। চলার সময় মুক্ত বাম পা-টা বড়সড় বাসনের ওপর রাখবে ও স্বচ্ছন্দে, ব্যালেন্স ঠিক রাখার জন্য যখন দরকার ওটা বাসন থেকে তুলে বালির উপরও ব্যবহার করতে পারবে।

ওর পিছন থেকে আসছে টানা হাওয়া। কখনও বেগ উঠছে তিরিশ মাইলের বেশি। বিশ মাইলের নীচে কখনোই কমছে না গতি। ঢিবির উপর থেকে গাড়ির চাকার স্পষ্ট চিহ্ন দেখছে রানা, সবই কিছু দূর গিয়ে হারিয়ে গেছে আঁধারে। নক্ষত্রের আলোয় আবছা দেখা গেল চাকার দাগ, কাজেই নাইট ভিশন ব্যবহার করতে হবে না।

একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঢিবির চূড়ার কিনারায় গিয়ে

দাঁড়াল রানা, পরক্ষণে দৌড়ে নেমে যেতে লাগল। ও যেন স্নো-বোর্ডার, অলিম্পিকের সোনা জয় করতে ছুট দিয়েছে। ওর পিছনে ভেসে উঠতে শুরু করেছে প্যারাশুট, ওর ডান পায়ের নীচে বাসন পিছলে চলেছে নরম বালিতে। ঢিবি থেকে নেমে যাওয়ার গতি বাড়ছে, যথেষ্ট হাওয়াও ঢুকে পড়েছে প্যারাশুটের ভিতর, ফুলে উঠল ক্যানোপি। ওটার টান খেয়ে এক চক্কর ঘুরতে বাধ্য হলো রানা। ওর সামনে চলে এসেছে প্যারাশুট, হাওয়ার তোড়ে ভেসে উঠেই ছুটতে শুরু করেছে। রানাকে আর আটকে রাখতে পারল না মাধ্যাকর্ষণ, শুরু হলো প্যারা-স্কিইং।

পিছনে হেলান দিল রানা, টান তৈরি করছে প্যারাশুটের উপর। দ্রুত গতিতে ঢিবি থেকে নেমে যাওয়ার সময় সেন্টার অভ গ্র্যাভিটি বজায় রাখতে চাইছে। ঢিবির নীচে নেমে যেতেই ঝাঁকি সামলাতে ভাঁজ করে ফেলল দু' হাঁটু, যেন মরুভূমির উপর দিয়ে পাল তুলে ছুটতে ছুটতে চলেছে কোনও ডিঙি নৌকা। একটু পর অন্য দিক থেকে হাওয়া আসতেই গাড়িগুলোর চাকার দাগ থেকে সরে গেল রানা। কিন্তু প্যারাশুটের টগল ব্যবহার করল সাগরের স্কুনারের মত করেই, কখনোই ক্যারাভানের চিহ্ন থেকে আধ মাইলের বেশি দূরে সরল না।

ভারমন্ট বা কলোরাডোতে স্নো বোর্ড বা স্কি দিয়ে প্যারা স্কিইং করা হয়, তখন যে প্যারাশুট ব্যবহার করা হয় তা রানার প্যারাশুটের চেয়ে অনেক ছোট। নরম তুষারের চেয়ে অনেক বেশি বাধা তৈরি করছে মরুভূমির বালি, কিন্তু রানার বিশাল প্যারাশুটের ভিতর ধরা পড়ছে প্রচুর হাওয়া, এবং সে কারণেই মরুভূমির উপর দিয়ে তীরের মত ছুটে চলেছে। যাদের ভিতর রয়েছে তীব্র গতি তুলে ছুটবার নেশা, তারা এখন রানাকে দেখলে হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরত।

পরবর্তী পনেরো মিনিটে তিনবার আছাড় খেল রানা। গা

ছিলে গেল, বেশ ব্যথাও পেল, কিন্তু এরপর বুঝে গেল একটা ছন্দ তুলে এগিয়ে যেতে হবে। এরপর সর্পিল কোনও রকেটের মত ছুটে চলল রানা, একেকটা ঢিবি থেকে নেমেই আবার উঠছে নতুন ঢিবিতে। পিছনে রেখে এল সরু চিহ্ন। পরে কেউ দেখলে ভাবতে পারে, কোনও বিশাল সাইডওয়াইণ্ডার সাপ গেছে ওখান দিয়ে।

মাঝরাতের দশ মিনিট পর এক চক্কর ঘুরে এল ডেভিলস ওয়েসিসের প্রহরীরা। জোর আওয়াজে বন্ধ হলো প্রকাণ্ড ফটক। এর কয়েক সেকেণ্ড পর ঘটাং করে আটকে দেয়া হলো লোহার বার। ছাতে নড়েচড়ে বসল নিশাত, স্বর্ণা, জলিল ও কাশেম। ওরা ঠিক করেছে গার্ডদের সুস্থির হতে আরও দশ মিনিট সময় দেবে, তারপর নামবে কাজে।

এরই ভিতর নিঃশব্দে র‍্যাচেট ব্যবহার করেছে কাশেম ও জলিল, ছাতের কিনারায় পুরু কাঠের গায়ে বসিয়ে দিয়েছে বড় একটা বল্টু। ওখান থেকেই মোটর সাইকেল নামিয়ে দেয়া হবে নীচে। ওরা আরও দুটো বল্টু ব্যবহার করেছে দালানের গায়ে বসানো একটা জানালার দু' পাশে। ওই দুটো বল্টুর সঙ্গে আটকে নিয়েছে দুটো পুলি। দড়িও ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে নীচে।

কিছুক্ষণ পর তৈরি হয়ে মেশিন পিস্তল পিঠে ঝুলিয়ে নিল নিশাত, চোখে পরে নিল নাইট ভিশন গগলস। প্যারাপেট থেকে দড়ি বেয়ে আস্তে করে নেমে গেল। পাঁচ সেকেণ্ড পর তেতলার একটা খোলা জানালার সামনে থেমে হোলস্টার থেকে বের করল সাইলেন্সার লাগানো অটোমেটিক পিস্তল, তারপর সাবধানে উঁকি দিল ভিতরে।

গোটা দালানের একপাশে চার ভাগের এক ভাগ জায়গা জুড়ে তিনতলা উঁচু প্রিজন ব্লক। বেকায়দা ভাবে ঝুলতে ঝুলতে

নিশাত দেখল, বিশাল একটা ঘরের দুই পাশে তৈরি করা হয়েছে দুই সারি লোহার গরাদ লাগানো পাথুরে সেল। দোতলার সেলে যাওয়ার জন্য এদিকটায় রয়েছে সরু স্টিলের ক্যাটওয়াক। তার পাশেই ঘোরানো লোহার মই। যাতে বন্দিদের কেউ প্রহরীদের দিকে তেড়ে আসতে না পারে, সেজন্য ক্যাটওয়াক ও মইয়ের ধাপ। প্রতিটি সেলে দুটো করে বাঙ্ক বেড ফ্রেম। মরুভূমির আবহাওয়ায় অনেক আগেই ছিঁড়ে গেছে ম্যাট্রেস।

জানালা দিয়ে যতদূর দেখা গেল, তাতে নিশাত আন্দাজ করল, সেলগুলো দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে দশ ফুটের মত হবে। ওর মনে হলো, উপরের সেলগুলো খালি।

দড়ির নীচের অংশ জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল নিশাত, মুখ তুলে সঙ্গীদের উদ্দেশে মাথা দোলাল, তারপর নেমে গেল ক্যাটওয়াকের উপর। কয়েক সেকেণ্ড পর ওর পাশে চলে এল স্বর্ণা ও কাশেম। ধাতব ডেকে কোনও আওয়াজ হলো না। ওদিকে এখন কারাগারের বাইরে একে একে মোটর-সাইকেলগুলো নামিয়ে দেবে জলিল।

হাতের ইশারা করল নিশাত, অন্য দু'জন কাভার দেবে, সে নিজে তেতলার পুরো সেল ব্লক ঘুরে দেখবে। গগলসের নাইট ভিশন অফ করে দিল, চালু করল ইনফ্রারেড। সামনে কারও দেহের তাপ থাকলে ইমেজ পাবে।

কাউকে পাওয়া গেল না তেতলায়। সাবধানে নেমে এল ওরা দোতলায়। নীচে নেমেই চমকে গেল ওরা। ওই তো, কাছেই একটা সেলে কে যেন শুয়ে আছে!

একজন নয়, সেলে রয়েছে দু'জন বন্দি!

জানালা থেকে যে আলো আসছে তাতে পরিষ্কার বোঝা গেল, তারা খুব কাছাকাছি হয়ে কম্বলের উপর শুয়েছে। এক লোক আর এক মেয়ে। লোকটা কাত হয়ে দেয়ালের দিকে মুখ

করে ঘুমিয়েছে। তার দিকে পিঠ দিয়ে শুয়েছে মেয়েটা, দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছে ভাঁজ করা দু' হাঁটু।

স্বর্ণা ও কাশেমের উদ্দেশে ইশারা করল নিশাত, দুই আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল কোথায় আছে বন্দিরা। কাশেম মইয়ের গোড়ায় রয়ে গেল লেসার সাইটেড মেশিন পিস্তল হাতে, অন্য দু'জনকে কাভার দেবে।

পা টিপে এগোল নিশাত ও স্বর্ণা। সেলের সামনে পৌঁছে দেখল দরজা সিকি ইঞ্চি খোলা। বিস্মিত দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চাইল ওরা। ওদের ধারণা ছিল আসিফ হায়দার চৌধুরি ও ক্যারেন কুশ্বসকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তা করা হয়নি। কিডন্যাপাররা বোধহয় ধরে নিয়েছে সেল ব্লকের প্রবেশ-দ্বার বন্ধ থাকাই যথেষ্ট। তা ছাড়া, সশস্ত্র প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে এই দুর্গ, এরা পালাবে কোথায়?

কোমরের পাউচ থেকে ছোট একটা বোতল বের করল নিশাত, দরজার কবজার উপর স্প্রে করল গ্র্যাফাইটের গুঁড়ো। এ জিনিস তেলের চেয়ে ভাল কাজ করে। শিকের দরজা ধরে টানতেই সামান্য আওয়াজ হলো। একেবারে বরফের মূর্তির মত জমে গেল নিশাত ও স্বর্ণা। সেলের ভিতর মৃদু নাক ডাকছে মেয়েটি, ঘুম ভাঙেনি লোকটারও। খুব সাবধানে আরও এক ইঞ্চি দরজা খুলল নিশাত। এরই ভিতর কবজাগুলোর উপর ভাল কাজই করেছে গ্র্যাফাইট, এবার নিঃশব্দে দরজা খুলতে অসুবিধা হলো না।

পিস্তল হাতে সেলের ভিতর ঢুকে পড়ল দুই কমাণ্ডো। জিম্মিকে মুক্ত করবার জন্য স্ট্যাণ্ডার্ড প্রসিডিউর-এ বলা হয়: টার্গেটকে ভেরিফাই করে নাও আগে, নিশ্চিত হয়ো না তারা বন্ধু-সুলভ আচরণই করবে।

কম্বল বিছিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে দুই বন্দি। তাদের পাশে চলে

গেল ওরা। ঘুমন্ত মেয়েটির দিকে আঙুল তুলল নিশাত, স্বর্ণাকে জানানো হয়ে গেল এবার কী করতে হবে। নিজে নিশাত চলে গেল উল্টো দিকে।

একই সময়ে উবু হলো দু'জন, খপ্ করে চেপে ধরল বন্দিদের মুখ। মেঝের সঙ্গে ঠেসে ধরা হয়েছে মাথা। এক সেকেণ্ড পর নিশাত বুঝল, যার ফটোগ্রাফ দেখেছে, এই লোক সেই বিজ্ঞানী আসিফ হায়দার চৌধুরি নয়।

ঘুম ভেঙে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে লোকটা। কানের পাশে খটাস্ করে পিস্তলের বাঁট নামিয়ে আনল নিশাত। মার খেয়ে আরও ভড়কে গেল লোকটা। তার করোটি নারকেলের মত শক্ত, এখনও পিটপিট করে দেখছে। আরও দু'তিনটে বাড়ি দেয়ার পর জ্ঞান হারাল সে।

ওদিকে মেয়েটার মুখ চেপে ধরেছে স্বর্ণা, কয়েক সেকেণ্ডেই বুঝল এ ক্যারেন কুম্বস। মুখ থেকে হাত সরাল না ঠোঁটের উপর তুলল বাম হাতের তর্জনী। তাতে শান্ত হলো না মেয়েটি, উঠে বসতে চাইছে।

ইতোমধ্যে লোকটার মুখে টেপ লাগিয়ে দিয়েছে নিশাত, গোড়ালি ও কবজি আটকা পড়েছে ফ্লেক্সিকাফে।

ফিসফিস করে মেয়েটিকে বলল স্বর্ণা, 'আমরা আপনাদের উদ্ধার করতে এসেছি।'

আরও কয়েক সেকেণ্ড পর সুস্থির হলো ক্যারেন কুম্বস। এবার তার মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিল স্বর্ণা।

মেয়েটির চোখ এখনও বিস্ফারিত। বেসুরো স্বরে বলল, 'আপনারা কারা?'

হাত দিয়ে ওর মুখ চাপা দিল স্বর্ণা, নিচু স্বরে বলল, 'জোরে কথা বলবেন না। আমরা ডক্টর চৌধুরি আর আপনাকে নিতে এসেছি। ...এ কে?' অজ্ঞান লোকটাকে দেখাল। তাকে সেলের

শিকের সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে নিশাত।

'এ... কিডন্যাপার... একজন কিডন্যাপার...' মিলিয়ে গেল ক্যারেন কুম্বসের কণ্ঠ।

বিস্তারিত কিছু জানতে চাইল না নিশাত বা স্বর্ণা। বুঝতে দেরি হয়নি ওদের, এই সেলে ক্যারেনকে ধরে এনেছে কিডন্যাপার, গায়ের জোরে রেপ করেছে।

'ওর সঙ্গে অস্ত্র আছে?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'বালিশের নীচে এটা পেয়েছি,' নাক বোঁচা এক পিস্তল দেখাল নিশাত। নরম স্বরে সান্ত্বনা দিল, 'আর ভয় নেই, বিপদ হবে না। আপনাকে আর ছুঁতেও পারবে না এরা।'

'মারা গেছে?' ম্লান স্বরে জানতে চাইল ক্যারেন কুম্বস।

'শুধু চেতনা হারিয়েছে,' মেঝে থেকে পোশাক তুলে বাড়িয়ে দিল স্বর্ণা। 'পরে নিন।'

কম্বলের নীচে চলে গেল পোশাক, সঙ্গে ক্যারেন কুম্বস। হাত-পা নাড়ছে দেখে বোঝা গেল কাপড় পরছে।

মেয়েটা কম্বলের নীচ থেকে বেরিয়ে আসতেই জানতে চাইল নিশাত, 'আপনি জানেন কোথায় রাখা হয়েছে ডক্টর চৌধুরিকে?'

'হ্যাঁ, জানি। অন্য একটা সেলে।'

'কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে?'

অনেকটা সামলে নিয়েছে ক্যারেন। 'আপনাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি।'

মাথা নাড়ল নিশাত। 'কাজটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।'

'প্লিয, আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে চাই,' একটু ইতস্তত করে বলল ক্যারেন। 'আমাকে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে হবে। তা ছাড়া, সেল ব্লকের বাইরে গার্ড আছে, ভিতরে নেই। উপর তলায় তারা কেউ নেই। সবাই ঘুমায় নীচের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইঙে।'

'সব মিলে ক'জন?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'মনে হয় আট-দশজন। ঠিক বলতে পারব না।'

মেইন গেটে রাখা হয়েছে তিনজন গার্ড। ভিতরে এত কম লোক হলে তো ভালই। অবশ্য এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করল না নিশাত। 'তারা এই জোকারের মতই সশস্ত্র?'

'প্রথম যখন এলাম, কয়েকজনের কাছে মেশিনগান দেখেছি,' বলল ক্যারেন। ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। 'প্লিয, আমাকে ডক্টর চৌধুরির কাছে নিয়ে চলুন।' থুতনি দিয়ে ধর্ষণকারী লোকটাকে দেখাল। 'আপনারা সহায়তা না করলে আমার এখানে এই আঁধারে থাকতে হবে, তারপর সারা জীবন শুধু দুঃস্বপ্ন দেখব।'

বারণ করতে গিয়েও থেমে গেল নিশাত। মেয়েটা ঘুটঘুটে আঁধারে থাকতে চাইছে না, নিশ্চয়ই মনের ভিতর ভীষণ আতঙ্ক কাজ করছে। ওর উপর দিয়ে যা গেছে, তাতে এমন হতেই পারে। খালাতো বোন প্রিয়ার কথা মনে পড়েছে নিশাতের। বেচারি গ্রামে গিয়ে ধর্ষিত হওয়ার পর একশ'টা ইনোকটিন ট্যাবলেট ও এক বোতল স্পিরিট খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। শিউরে উঠল নিশাত, ওর বোনটির শীতল ঠোঁটে ছিল স্বর্গীয় হাসি, যেন মরতে পেরে বেঁচে গেছে।

ওদের সঙ্গে ক্যারেন কুম্বসকে নিলে কোনও ক্ষতি নেই। এই মেয়ের কথা অনুযায়ী কারাগারের ভিতর এদিকটায় আছে শুধু ওই অচেতন ধর্ষণকারী গার্ড। 'ঠিক আছে,' নরম স্বরে বলল নিশাত। খেয়াল করল স্বর্ণা আপত্তির চোখে চেয়েছে। হাতের ইশারা করল নিশাত। 'কোনও ভয় নেই, আমি থাকছি আপনার সঙ্গে, সেল ব্লকের দরজার কাছেই।'

'সত্যি, অনেক ধন্যবাদ,' হাতের উল্টো পিঠে অশ্রু মুছল ক্যারেন কুম্বস।

ধর্ষণকারীর প্যান্টের পকেট থেকে এক গোছা ভারী পিতলের চাবি বের করেছে নিশাত, হাতের ইশারায় কাশেমকে বুঝিয়ে দিল: চলো রওনা হই।

মইয়ের গোড়া থেকে চলে এল কাশেম, ওরা চলল সেল ব্লকের একমাত্র দরজাটার দিকে। ওই দরজার বাইরের দিকে কবজা, ক্যাঁচক্যোঁচ আওয়াজ কমাতে দু'পাশ থেকে দরজা উঁচু করে ধরল নিশাত ও কাশেম, আস্তে করে কবাট খুলল স্বর্ণা। একে একে ঢুকে পড়ল সেল ব্লকের দরজা দিয়ে।

সামনে পড়ল দীর্ঘ এক হলওয়ে। মেঝের উপর পাউডারের মত মসৃণ বালি। কোথাও কোনও আলো নেই যে সেটাকে উজ্জ্বল করে তুলবে নাইট ভিশন গগলস, কাজেই চোখ থেকে ওটা খুলে মাথার উপর তুলে রাখল ওরা। অন্ধের মত দুই হাত সামনে বাড়িয়ে কর্কশ পাথরের দেয়াল ধরে চলেছে, একটু পর পৌঁছে গেল একটা বাঁকে। মোড় ঘুরবার পর সামনে শুরু হলো আরেকটা লম্বা প্যাসেজওয়ে।

'করিডোরের মাঝে গিয়ে ডানে যেতে হবে,' ফিসফিস করে বলল ক্যারেন কুম্বস। 'ওই দরজার সামনে গার্ডের চেয়ার আছে।'

লাল লেন্সওয়ালা একটা ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল নিশাত, কাঁচের উপর অংশ ঢেকে রেখেছে বাম তালু দিয়ে। মৃদু রক্তিম আলো পড়ল করিডোরের মেঝেতে। ক্যারেন কুম্বসের কথা মত একটু পর একটা দরজার পাশে ধাতব ফোল্ডিং চেয়ার পাওয়া গেল। প্রাচীন তালার উপর পাউডার করা গ্র্যাফাইট ছড়িয়ে দিল নিশাত। কাশেমের হাতে দিল ক্যান, সে কবজাগুলোর উপর ও তালার ফুটোতে স্প্রে করল। তালার ভিতর চাবি ঢোকাল নিশাত, প্রথম চারটে চাবি কোনও কাজে এল না, তারপর পঞ্চমটা ঠিক ভাবে বসল।

গ্র্যাফাইটের লুব্রিক্যান্ট যতই দেয়া হোক, বেশ আপত্তির সঙ্গে খুলতে লাগল তালা। কপাল ভাল, কোনও আওয়াজ করছে না। ক্যারেন ছাড়া অন্যরা আবার পরে নিয়েছে নাইট ভিশন গগলস। নিশাতের পিছনে দু' পাশ থেকে মেশিন পিস্তল বাগিয়ে ধরেছে স্বর্ণা ও কাশেম, কোথাও স্থির হচ্ছে না ওদের হাত। আস্তে করে দরজা ধরে টান দিল নিশাত। মৃদু গুঙিয়ে উঠল কবজাগুলো, তারপর ধীরে ধীরে খুলে যেতে লাগল কবাট।

করিডোরে ঢুকবার আগে দুপাশ দেখে নিল কাশেম ও স্বর্ণা। দরজা খুলে যেতেই নিঃশব্দে সামনে বাড়ল ওরা। অনেক উপরের একটা জানালা দিয়ে মেঝেতে এসে পড়েছে দুধসাদা জ্যোৎস্না, লোহার শিকগুলো হাতির দাঁতের মত লাগল।

অস্ত্র হাতে দু'জন দু'দিকের দেয়াল ঘেঁষে চলেছে স্বর্ণা ও কাশেম, কাভার করছে সামনের দিক। হলওয়েতে কেউ নেই। একটু দূরে নেমে গেছে ঘোরানো এক লোহার সিঁড়ি। নিঃশব্দে সেটার মাথায় গিয়ে দাঁড়াল কাশেম। বামদিকে পঞ্চাশ ফুট এগিয়ে নীচে নামার আরেকটা সিঁড়ি পেল স্বর্ণা। ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল ও, চোখ রাখল নীচের দিকে।

করিডোরের মুখে ক্যারেনকে নিয়ে দাঁড়িয়েছে নিশাত।

পাঁচ মিনিট পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থেকে যখন কানে কোনও আওয়াজ এল না, কিংবা গগলস পরেও কিছুই দেখা গেল না, তখন দুই পাশের প্রতিটা জায়গা দেখতে দেখতে ফিরে আসতে শুরু করল পরস্পরের দিকে।

প্রথম দিকের এক কুঠুরিতে ঘুমন্ত এক লোককে পেল স্বর্ণা। ইশারায় কাশেমকে ডাকল। সেলের দরজার কবজা ও তালার উপর স্প্রে ছিটাল কাশেম, ততক্ষণে সঠিক চাবি খুঁজে বের করল স্বর্ণা। পাঁচ সেকেণ্ড পর কুঠুরির ভিতর ঢুকে পড়ল ওরা, মানুষটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেই বুঝল: মুখ জুড়ে খোঁচা-খোঁচা

দাড়ি সত্ত্বেও চেনা গেল, এই লোকই বিজ্ঞানী আসিফ হায়দার চৌধুরি। মানুষটার মুখে হাত রাখল কাশেম, অন্য হাতে আস্তে করে বুকে ঝাঁকি দিল।

ধড়মড় করে উঠে বসতে চাইল বাঙালি বিজ্ঞানী, কিন্তু তাকে মেঝের সঙ্গে গেঁথে রাখল কাশেম। পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'আমরা আপনাকে নিতে এসেছি, ভয় পাবেন না।'

বিস্ময় ও ভয় দূর হয়ে গেল মানুষটার চোখ থেকে, সেখানে ভর করল স্বস্তি। এবার আর জোর করে উঠে বসতে চাইল না। কাশেম যখন বলল মুখের উপর থেকে হাত সরাতে পারে কি না, ঘন-ঘন মাথা দোলাল।

কয়েক সেকেণ্ড পর ফিসফিস করে বলল, 'আপনি কে?'

'পেশাদার জিম্মি উদ্ধার দলের সদস্য। আপনি কি আহত? হাঁটতে পারবেন?'

'বললে দৌড়াতেও পারব,' বলল বিজ্ঞানী। 'আমার কোম্পানি কী আপনাদের পাঠিয়েছে?'

'তাদের সঙ্গে এখনও আমাদের কথা চলছে। পরে সব শুনবেন, এখন ক্যারেন কুম্বস আর আপনাকে নিয়ে বেরিয়ে যাব আমরা।'

'ক্যারেনকে পেয়েছেন? ও কেমন আছে?'

'খুবই বিচলিত। ওকে বলাৎকার করা হয়েছে।'

'ওরা এত ভয়ঙ্করভাবে ওকে মারল, তারপর ধর্ষণও করেছে! কসম খোদার, মস্ত শাস্তি পেতে হবে নিকোলাস ক্রিস্টোফারকে।'

'ও, তা হলে এসবের পিছনে আপনার প্রাক্তন পার্টনার,' আসিফ হায়দার চৌধুরিকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল কাশেম।

দু'জনের মাঝে বিজ্ঞানীকে রেখে দরজার দিকে চলল ওরা। ক্যারেন কুম্বসকে দেখে হাঁটবার গতি বাড়ল মানুষটার। নিশাতের

পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটি, চাঁদের আলো এসে পড়েছে মুখে। কাছে গিয়ে হাত প্রসারিত করল বিজ্ঞানী, জড়িয়ে ধরবে প্রিয় কর্মচারীকে, কিন্তু তার চেহারায় ফুটে উঠল অবিশ্বাস।

'তোমার মুখ...' অবাক হয়ে বলল, 'তোমাকে তো...'

আর কিছু বলতে পারল না আসিফ হায়দার চৌধুরি, ঠিক তখনই নিশাতকে গায়ের জোরে ঠেলা দিল ক্যারেন, অন্য হাতে খোলা হোলস্টার থেকে খপ করে তুলে নিল পিস্তল। মেয়েটার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে, চেহারায় রাগ, পরক্ষণে পিস্তল তাক করল মনিবের উপর, বুড়ো আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিল বেরেটার সেফটি ক্যাচ।

'হারামজাদা, এবার মর্!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল ক্যারেন কুম্বস, পরের সেকেণ্ডে টিপে দিল ট্রিগার।

পরিস্থিতি যতই ঘোলাটে হোক, কেউ বুঝবার আগেই বিদ্যুতের মত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে নিশাত, ও বুঝে ফেলেছে কী ঘটেছে— ক্যারেন কুম্বস কোনও জিম্মিই নয়! কিডন্যাপারদের সঙ্গে আঁতাত আছে তার, তাকে কেউ ধর্ষণ করেনি; প্রেমিকের সঙ্গে ওই নির্জন সেলে গিয়েছিল ফুর্তি করতে।

বেরেটা গর্জে উঠবার আগের মুহূর্তে ক্যারেন কুম্বসের কবজির নীচে থাবা দিয়েছে নিশাত। পরক্ষণে গুলির ধাক্কা ও চাপড় খেয়ে মেঝের উপর ঠন-ঠনাৎ করে পড়ল পিস্তল, মৃদু আলোকিত হলওয়ের উপর পিছলে বহু দূরে চলে গেল। ক্যারেন কুম্বসের গলার উপর কারাতে চপ্ বসাতে পারে নিশাত, তা না করে হাতের পাশ দিয়ে স্ল্যাশ করল ঘাড়ের উপর। কিন্তু শেষ মুহূর্তে গতি কমিয়ে ছেঁচে দিল না ক্যারোটিড আর্টারি, মেরে ফেলল না মেয়েটাকে। ঘুরেই সামনে চাইল নিশাত।

মেঝের উপর লুটিয়ে পড়েছে আসিফ হায়দার চৌধুরি, তার উপর ঝুঁকে পড়েছে স্বর্ণা ও কাশেম। ওদের পিছন-দেয়ালে

ছিটকে লেগেছে তাজা রক্ত।

- 'উনি বেঁচে আছেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু বুকের উপর অংশে গুলি লেগেছে,' মেডিকেল কিট থেকে স্টেরাইল ড্রেসিং বের করছে স্বর্ণা। হাড়ের মত সাদা হয়ে গেছে বিজ্ঞানীর মুখ, তীব্র ব্যথার কারণে কয়েকবার খাবি খেল। ভেসে যাচ্ছে বুক, ক্ষত থেকে এখনও বলকে বেরুচ্ছে রক্ত। 'জানি না মেজর কোনও অর্গানে লেগেছে কি না। কিন্তু আপাতত ওঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, আপা।'

'তা আমি পারিনি,' বলল নিশাত। স্বর্ণার হাত থেকে ড্রেসিং নিয়ে নিল। 'এখন চিকিৎসার সময় নেই। এই মেয়ে ওদের দলের, ধরে নিতে পারি গার্ডদের সংখ্যার ব্যাপারেও নিশ্চয়ই মিথ্যা বলেছে। সেক্ষেত্রে দশ সেকেণ্ডের মধ্যে পৌঁছে যাবে গার্ডরা। ওঁকে তুলে নিয়ে পালাতে হবে।'

'ওখানে কী হচ্ছে, আপা?' ট্যাকটিকাল রেডিয়োতে জানতে চাইল জলিল।

'বিজ্ঞানীকে গুলি করেছে ক্যারেন কুম্বস। সে কিডন্যাপারদের দলের।' কুঁজো হয়ে দাঁড়াল নিশাত, তার চওড়া পিঠের উপর বিজ্ঞানীকে তুলে দিল স্বর্ণা ও কাশেম। ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছে নিশাত, পিঠের উপর মৃদু গুঙিয়ে চলেছে বিজ্ঞানী, কিন্তু চেঁচিয়ে উঠছে না বলে নিজের কপালকে ধন্যবাদ দিল ও। পিঠ বেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে রক্ত, তার সঙ্গে মিশেছে ক্যামোফ্লেজ কালি, পুরনো কয়েনের মত গন্ধ ছাড়ছে।

'এবার কী করতে চান, আপা?' জানতে চাইল জলিল।

'প্ল্যান থেকে সরব না। আশা করি সময় ফুরিয়ে যায়নি। তৈরি থাকো। মোটর সাইকেলের উপর নামিয়ে দিতে হবে বিজ্ঞানীকে। বাজে ভাবে আহত হয়েছে।'

'আমি অপেক্ষা করছি।'

'ওই হারামজাদি কুত্তির কী হবে?' মেঝের উপর অচেতন কুম্বসকে দেখাল স্বর্ণা। মেয়েটা পড়ে আছে ছেঁড়া পুতুলের মত, যেন বের করে নেয়া হয়েছে বেশির ভাগ তুলো।

'পড়ে থাক্।' চাপা রাগ প্রকাশ পেল নিশাতের কণ্ঠে। নিজের উপর ভীষণ খেপেছে। আগেই ওর বোঝা উচিত ছিল, কিন্তু বোনের কথা মনে পড়তে ব্যক্তিগত অনুভূতিকে মূল্য দিয়েছে। এমন ভুল ওকে তো শেষ করবেই, সঙ্গে নেবে ওর দলের সবাইকে। ভীষণ লজ্জা লাগছে এখন, যদি এই বিপদ থেকে বেঁচেও যায়, কীভাবে দাঁড়াবে তীক্ষ্ণধী স্যরের সামনে?

ছুটতে শুরু করল ওরা। আগে চলেছে স্বর্ণা, মাঝে নিশাত, পিছনে কাশেম। সিলিঙের সঙ্গে ঝুলন্ত বাল্‌ব্‌গুলো একইসঙ্গে দপ করে জ্বলে উঠল। পরক্ষণে নিভু নিভু হয়েই আবার উজ্জ্বল হলো। দুর্গের ভিতর কোথাও চালু করা হয়েছে জেনারেটার। দূরে কোনও এক বাঁকে দড়াম করে খুলে গেল দরজা। পরক্ষণে মেঝের উপর ধুপ-ধাপ আওয়াজ শুরু হলো। দৌড়ে আসছে কমপক্ষে দশ-বারোজন। হাতে একদম সময় নেই। যেখান দিয়ে ওরা নেমেছিল, সেখানে পৌঁছুতে হবে। দড়ি বেয়ে বেরিয়ে যেতে হবে কারাগার থেকে। এখন আর নিঃশব্দে চলবার কোনও মূল্য নেই, প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল মার্ভেলের দলটি।

এখন আর বিজ্ঞানীর গোঙানি লক্ষ করছে না নিশাত বা অন্যরা। পিঠের উপর বেদম ঝাঁকি খাচ্ছে মানুষটা, মাংস ছিঁড়ে ক্ষতটা বড় হচ্ছে ক্রমে।

সেল ব্লকের দরজা মাত্র বিশ ফুট দূরে, এমন সময় মোড় ঘুরে বেরিয়ে এল আটজন আফ্রিকান মার্সেনারি। এদের বেশির ভাগের পরনে বক্সার শর্টস্, পিস্তলের গুলির আওয়াজে ঘুম থেকে উঠে এসেছে, কিন্তু প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। যে-কোনও সময়ে গোলাগুলি শুরু হবে, হলওয়ে হয়ে উঠবে শুটিং গ্যালারি।

গার্ডরা পেয়ে গেছে তাদের শিকার, কিন্তু কেউ প্রতিক্রিয়া দেখাবার আগেই এক সেকেণ্ড বাড়তি সময় পেল নিশাত। মেশিন পিস্তল ছুঁড়ে ফেলে দিল ও, একহাতে পিছনে ধরে আছে বিজ্ঞানীকে, অন্য হাত তুলল মাথার উপর। জীবনে প্রথমবারের মত এমন জুয়া খেলছে নিশাত। অস্ত্র নামাল না কোনও গার্ড। এক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, তারপর দুই সেকেণ্ড। পিছনে খটাস্ করে দুটো আওয়াজ শুনল নিশাত। স্বর্ণা ও কাশেম ফেলে দিয়েছে অস্ত্র। বোধহয় পিছন থেকে হাজির হয়েছে আরও প্রহরী। চট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল নিশাত। তারা বারোজন, কাঁধে তুলেছে একে-৪৭, তাক করেছে ওদের তিনজনের উপর।

'আমরা ধরা পড়লাম,' জলিলের জন্য মাইকে ফিসফিসিয়ে বলল নিশাত। 'মার্ভেলে যোগাযোগ করো।'

কয়েক মুহূর্ত পর এল আরেক লোক, তার পরনে ফেটিগ প্যাণ্ট। এখনও বুটের লেস বাঁধা হয়নি। মনে হলো সে-ই অফিসার। সরু চেহারা, ঈগলের মত নাক, দুই চোয়ালের ভিতর মস্ত গর্ত, ওখানে রাখা যাবে দুটো পিংপং বল।

'রিপোর্ট পেলাম আর্মির ছোট একটা দল ম্যাথিউস জাস্টাসকে উদ্ধার করতে আসছে,' নিখুঁত ইংরেজিতে বলল সে। 'নিশ্চয়ই মাত্র এই ক'জনের দল না সেটা। তা যাই হোক, আজ ভোরে খুশি মনে এদের কোর্ট মার্শাল করে ফায়ারিং স্কোয়াডে মেরে ফেলব।'

'হয়তো শুনে খুশি হবেন, আমরা এসেছিলাম ডক্টর চৌধুরিকে উদ্ধার করতে, বাপের জীবনেও ম্যাথিউস জাস্টাসের নাম শুনিনি,' হাসি হাসি চেহারা করল স্বর্ণা।

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল লোকটা। 'ঠিক আছে, তা হলে দুঃখিত হয়েই তোমাদের মেরে ফেলব।'

তিন

এ ধরনের দৈহিক যন্ত্রণা আছে, আগে জানত না মাসুদ রানা। বুক ভেদ করে গুলি যাওয়ার মত নয়, কিন্তু দেহের প্রতিটি পেশিতে ভীষণ খিঁচ ধরছে, পাগল করে তুলছে তীব্র ব্যথা। এমন শুরু হওয়ার পর দুই মিনিট পেরুনোর আগেই রানা বুঝেছে, এভাবে চলতে পারবে না। প্যারা-স্কিইং করতে গিয়ে যেন পুড়ে গেছে উরু ও পিঠ। শুধু তাই নয়, পেশির ভিতর দাউ-দাউ জ্বলছে আগুন। টগল ধরতে গিয়ে দু' হাতের তালু জানোয়ারের থাবার মত কুঁকড়ে গেছে, এখন খোলাই কঠিন। একটু বিশ্রাম নেই গোটা দেহের। আর পারছে না রানা, এবার থামতেই হবে।

অথচ, থামলে মোটেই চলবে না!

মরুভূমির উপর দিয়ে যতক্ষণ বইল হাওয়া, দাঁতে দাঁত খিঁচে প্যারাশুট নিয়ে এগোল রানা। ক্রমেই চলবার আঁকাবাঁকা পথ হয়ে উঠল সরল রেখার মত, বারবার আছড়ে পড়ল ও। প্রতিবার উঠতে এখন অনেক বেশি সময় লাগছে। সোহেল স্যাটালাইট ফোনে যোগাযোগ করবার পর একবারের জন্যও থামেনি রানা, মনের ভিতর দুশ্চিন্তা: ধরা পড়েছে নিশাত আপা, স্বর্ণা ও কাশেম, ওদেরকে নিয়ে কী করা হবে, এতক্ষণে মেরে ফেলা হয়েছে কি না জানা নেই।

ট্যাকটিকাল রেডিয়োতে যা শুনেছে জলিল খান, তাতে বুঝেছে ওর সঙ্গীরা ধরা পড়বার সময় ডেভিলস ওয়েসিস

কারাগারে ছিল যিম্বাবুইয়ের একদল সৈনিক, তারা তাদের দেশের বিরোধী-দলীয় নেতা ম্যাথিউস জাস্টাসকে পাহারা দিচ্ছিল। মার্ভেলে এই খবর পৌঁছে যাওয়ার পর নবী সার্চ করেছে ইন্টারনেটে। জানা গেছে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের দায়ে ম্যাথিউস জাস্টাসকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, যে-কোনও দিন তাকে মৃত্যু-দণ্ড দেয়া হবে। ইউএন থেকে সরকারকে দোষারোপ করা হয়েছে, কিন্তু তাতে টনক নড়েনি তাদের। উল্টো এখন কঠোর ভাবে পাহারা দেয়া হচ্ছে সীমান্ত। যিম্বাবুইয়ের রাজধানী হারেরোতে সামরিক আইন জারি হয়েছে, চলছে সন্ধ্যা-সকাল কারফিউ।

নবী আরও জানতে পেরেছে: ওই দেশে ম্যাথিউস জাস্টাসের বিপুল জনপ্রিয়তা আছে। তিনি কোনও সাধারণ উপজাতীয় নেতা নন, গোটা দেশের লক্ষ-কোটি মানুষ তাঁকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে চাইছে। বিশ্বের সমস্ত বড় বড় রাজনীতিক ধারণা করছেন, দুর্নীতি-পরায়ণ যিম্বাবুইয়ের সরকারকে হটিয়ে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা সম্ভব শুধু ম্যাথিউস জাস্টাসের পক্ষেই। একসময় যিম্বাবুইয়ে ছিল আফ্রিকার অন্যতম ধনী দেশ, কিন্তু সামরিক আইন ও দুর্নীতি শেষ করে দিয়েছে দেশটাকে; খাবার নেই, চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই, এখন সে দেশে আছে শুধু দুর্ভিক্ষ ও অসুস্থ, অর্ধভুক্ত জনতা। অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গদের চালিত আগের সেই রোডেশিয়ার নাম বদলে গেল, নতুন দেশ হলো যিম্বাবুইয়ে, কিন্তু সাধারণ মানুষের কপাল আর ফিরল না। রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ করেছেন ম্যাথিউস জাস্টাস, কিন্তু বর্তমান দুর্নীতি-পরায়ণ কৃষ্ণাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেননি, তাদের হঠাতে চেয়েছেন আন্দোলন করে। ইন্টারনেটে পড়তে গিয়ে নবীর মনে হয়েছে, ভারতের মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীজির সঙ্গে প্রচুর মিল আছে

ম্যাথিউস জাস্টাসের।

নবী জানানোর পর বিসিআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সোহেল। চিফ বলেছেন, রানা যদি ওই নেতাকে উদ্ধার করতে পারে, তা হলে খুব ভাল হয়। এটা হবে মস্ত বড় একটা ইন্টেলিজেন্স ক্যু। পরবর্তী সময়ে ম্যাথিউস জাস্টাস ওই দেশের প্রধান হলে বাংলাদেশের সঙ্গে তৈরি হবে বিশেষ সুসম্পর্ক। ন্যায় যুদ্ধে আমরা সাধ্যমত সাহায্য করব এই সৎ মানুষটাকে।

এ ছাড়া রানাকে জানিয়েছে সোহেল, আসলে কিডন্যাপ্‌ড্ হয়নি ক্যারেন কুম্বস, নিজ খুশিতে সে গেছে, এবং প্রথম সুযোগেই বিজ্ঞানীর বুকে গুলি চালিয়েছে। জলিল জানাতে পারেনি বিজ্ঞানী কতটা গুরুতর আহত।

অন্য তিনজন ধরা পড়েছে এবং ভোরে তাদের মেরে ফেলা হবে, এই অবস্থায় জলিল জানতে চেয়েছে সে এখন কী করবে। সন্দেহ নেই প্রহরীরা গোটা কারাগারে তল্লাসী চালাবে, যে-কোনও সময়ে বন্দি হবে ও-ও। প্রাণপণ লড়াই করবে, নাকি মোটর সাইকেল নিয়ে পালানোর চেষ্টা করবে?

'তুই কী বলেছিস?' জানতে চেয়েছে রানা।

'তোর কী মনে হয়?'

'সবাইকে ফেলে যেতে ভীষণ খারাপ লেগেছে ওর। কিন্তু এ ছাড়া কোনও উপায়ও ছিল না।'

'তা-ই আসলে।'

'ওকে ট্র্যাক করা হচ্ছে?'

'বিশ মাইল দূরে জাহিদ হাসানের বিমান, সেদিকে চলেছে এখন তিরিশ মাইল গতি তুলে। তুই পার করেছিস চল্লিশ মাইল।'

এক মুহূর্ত ভেবেছে রানা, তারপর জানতে চেয়েছে, 'বিমান থেকে কতটা দূরে আমি?'

'দেড় শ' মাইল।'

অর্ধেক পথ পেরুনোর আগেই ভোর হবে, তার মানে ওকে ছায়া বা কোনও গর্ত পেতে হবে, নইলে শুরু হবে ডিহাইড্রেশন। আরেকটা চিন্তা এল ওর মনে। ভাল হতো কাছে কোথাও জাহিদ হাসান নামলে, কিন্তু বাস্তব হচ্ছেঃ চারপাশে কোথাও কোনও সমতল জায়গা নেই। একের পর এক বালির ঢিবি। হালকা কোনও বিমানও নামতে পারবে না এদিকে, দূরে থাক ওদের টুইন ইঞ্জিন কার্গো এয়ারক্রাফট।

'জলিলকে যদি এখনও ধাওয়া না করে থাকে,' বলল রানা, 'আমি চাই ও অপেক্ষা করুক জাহিদ ও ফারার সঙ্গে।'

'তোর কোনও প্ল্যান আছে?'

'না, নেই, আমি বুঝতে চাইছি আমাদের কাছে কী ধরনের অ্যাসেট আছে। নতুন কোনও প্ল্যান করতে হবে এখন।'

এরপর চুপ হয়ে গেছে রানা ও সোহেল।

এটা দুই ঘণ্টা আগের কথা।

রানার মনে পড়ে না এর চেয়ে দীর্ঘ সময় কখনও পার করেছে।

অন্য দিকে হাওয়া সরে যেতেই ডান দিকের টগল টান দিল ও, উঠে এসেছে এক ঢিবির উপর। আবারও হাওয়া শুরু হতেই তিরিশ সেকেণ্ড পর নেমে এল ঢাল বেয়ে। দুই হাঁটুর ঝাঁকি কুঁচকে দিল ওর মুখ— তীরের মত চলেছে এক ঢিবির পাশ দিয়ে। চাকার দাগ ছিল ডান দিকে, কিন্তু হাওয়া সরিয়ে নিয়েছে ওকে, এখন চাকার দাগ বামে রেখে চলেছে। প্যারাশুটের জোর টান খেয়ে পাহাড়ের মত এক ঢিবির উপর উঠছে রানা, আগে এত বড় ঢিবি দেখেনি। চার হাত-পা তৈরি রাখল ও, একটু পর দ্রুত গতিতে নীচের দিকে নামতে হবে। আবারও প্রায় থেমে গেল হাওয়া, প্লাস্টিকের বাসনের নীচে বাধা তৈরি করছে মসৃণ

বালি, গতি কমে যাওয়ায় টলমল করতে লাগল রানা।

জীবনে এত হতক্লান্ত হয়নি ও, যেন পেট ভরে মদ গিলেছে, ঠিক ভাবে নাড়তে পারছে না হাত-পা। ভীষণ ঘুম পেল। মন বলছেঃ যথেষ্ট তো করলে, এবার চুপচাপ শুয়ে পড়ো বালির বিছানায়, আরাম করে ঘুমিয়ে পড়ো।

ধীর গতিতে ওকে টানছে প্যারাশুট, দেহটা দুই ভাঁজ হয়ে গেছে, বালি ছুঁই-ছুঁই হয়ে চলেছে নিতম্ব। কয়েক সেকেণ্ড পর রানা টের পেল, এবার বোধহয় একেবারে থেমেই যাবে হাওয়া। তার মানে বাকি পথ লেংচে লেংচে উঠতে হবে। ঠিক তখনই আবারও দমকা হাওয়া ঠেলে দিল প্যারাশুটকে, সরসর করে চূড়ার উপর উঠে এল রানা। এবার আর ভারসাম্য রাখতে পারল না, চূড়ার ওপাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। তারই ফাঁকে চমকে গেল, ঢিবির পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে চারটে ট্রাক। আট হেডলাইটের আলো পড়েছে পঞ্চম এক ট্রাকের উপর। ওটার লম্বা হুড খোলা। ওই নষ্ট ট্রাকের পাশে ভিড় করেছে বেশ কয়েকজন। বাম্পারের সামনে ইঞ্জিনের উপর ঝুঁকে পড়েছে দু'জন। বেশ কয়েকজনের হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল।

বিশ ফুট গড়িয়ে নামবার পর থামতে পারল রানা, দুই হাতে প্যারাশুটের ভিতর থেকে বাতাস বের করতে পাগল হয়ে উঠেছে।

এসব গাড়ির দিকে সাবধানে যেতে চেয়েছিল রানা, ভেবেছিল আগে দেখে-বুঝে নেবে কারা ট্রাক নিয়ে চলেছে এই মরুভূমিতে। কিন্তু যে হাওয়া সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ঠেলে তুলেছে ঢিবির উপর, সেই একই হাওয়া এখন বিশ্বাসঘাতকতা করে লোকগুলোর কোলের উপর নিয়ে ফেলছে ওকে!

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল রানা, এবার এক দৌড়ে উঠবে চূড়ার উপর, ওপাশে গিয়েই আড়াল থেকে চোখ রাখবে।

কিন্তু সব ভেস্তে দিল প্লাস্টিকের বাসন, ওটার কারণে মচকে গেল পা, আবার হুড়মুড় করে পড়ল রানা, পরক্ষণে ঢিবির গোড়ার দিকে নাক তাক করে সরসর করে নামতে লাগল। প্যারাশুট ও রাইজার লাইনে জড়িয়ে গেছে গোটা দেহ, যেন জালে আটকা পড়েছে বড়সড় কাতলা মাছ।

প্যারাশুটে মুড়ে প্রাচীন মামির মত ঢিবির গোড়ায় এসে থামল রানা। শুষ্ক বালিতে ভরে গেছে নাক-মুখ। খক-খক করে কাশতে শুরু করতেই নাক খুলে গেল, শ্বাস নিতে পারল। থুহ্-থুহ্ করে বালি ফেলল মুখ থেকে। প্যারাশুটের কাপড়ে এমনই জড়িয়ে-পেঁচিয়ে গেছে, চেষ্টা করেও হাত বের করতে পারল না। অসহায় হয়ে চেয়ে রইল, একটু দূরের ক্যাম্প থেকে ছুটে আসছে চারজন লোক, হাতে তৈরি একে-৪৭।

লোকগুলো কাছে চলে আসতেই হাসি-হাসি ভঙ্গিতে বলল রানা, 'আরে, কেমন আছেন? একটু সাহায্য করতে পারেন?'

পাশে এসে দাঁড়িয়েছে লোকগুলো। একজন ঝুঁকে এল রানার উপর, কঠোর দৃষ্টিতে চাইল, এবার রাইফেলের কুঁদো বেদম জোরে নামিয়ে আনবে শত্রুর পেটের উপর।

অস্ত্র, রেডিও এবং সমস্ত গিয়ার কেড়ে নেয়ার পর নিশাত, স্বর্ণা ও কাশেমকে নিয়ে ভরে দেয়া হয়েছে ম্যাথিউস জাস্টারের সেলের পাশেরটাতে। ক'জন বেসামরিক তরুণ-তরুণী এসে নিয়ে গেছে আহত বিজ্ঞানীকে। মার্ভেলের টিম আঁচ করেছে, তারা এনভায়রনমেন্টালিস্ট। প্রত্যেকের চোখে-মুখে উন্মাদনা। কে যে ছেলে আর কে মেয়ে, বুঝবার উপায় ছিল না। প্রত্যেকের পিঠে ছড়ানো দীর্ঘ চুল। পোশাক থেকে ভুসভুস করে আসছিল গাঁজার বিশ্রী গন্ধ।

আপাতত দু' হাতে চোয়াল ডলছে ক্যাপ্টেন নিশাত

সুলতানা। এনভায়রনমেন্টালিস্টরা জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছে ক্যারেন কুম্বসের, উঠে দাঁড়িয়েই ঘুষি মেরেছে সে নিশাতের চোয়ালে। এইমাত্র এক লোক এসে দাঁড়িয়েছে সেলের সামনে। কুম্বসের ঘুষি খেয়াল করেছে সে, মুখ বিকৃত করল নিশাতকে দেখে।

কারাগারে কমপক্ষে এক শ' লোক আছে, আন্দাজ করছে নিশাত। ওর বুঝতে দেরি হয়নি এত লোক কেন। অনেকেই মনে করে ম্যাথিউস জাস্টাস এই ক্রান্তিকালে রক্ষা করতে পারবেন দেশ ও গণতন্ত্রকে। বর্তমান সরকার চাইছে তাঁর মুখ চিরতরে বন্ধ করে দিতে। তাঁকে যদি যিম্বাবুইয়ের কোনও কারাগারে রাখত, তাঁর লক্ষ সমর্থক জেল ভেঙে নিয়ে যেত প্রিয় নেতাকে। কিন্তু বর্তমানে কেউ জানে না মানুষটা কোথায়। এই ডেভিলস ওয়েসিস কারাগারে তাঁকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দি করে রাখা হতে পারে।

একই সময়ে আসিফ হায়দার চৌধুরি ও ম্যাথিউস জাস্টাসের উপস্থিতি নিয়ে ভাবছে নিশাত। দুটো বিষয় কি কোনওভাবে একই সুতোয় গাঁথা? যদি এই দুটো বিষয়ের ভিতর কোনও যোগাযোগ থেকেও থাকে, তা ও বুঝতে পারছে না। বোধহয় যিম্বাবুইয়ের জান্তা সরকারের সঙ্গে কোনও চুক্তি করেছে নিকোলাস ক্রিস্টোফার। তাদেরকে এই কারাগার ব্যবহার করতে দিয়েছে সে, বদলে অন্য কোনও সুবিধা নিয়েছে।

ওরা বন্দি হওয়ার পর পেরিয়ে গেছে কয়েক ঘণ্টা। সেল ব্লকে আনা হয়নি জলিল খানকে, এ থেকে আঁচ করা যায় মোটর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যেতে পেরেছে কমান্ডো। এতে একটু স্বস্তি লাগছে নিশাতের। অন্তত একজন তো বাঁচল? এই দুর্গের দায়িত্বে যে অফিসার, সে বলে দিয়েছে ভোরে ওদেরকে খুন করা হবে। আত্মসমর্পণ না করে ভাল করেছে জলিল, হয়তো জান নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে মরুভূমি থেকে।

মাসুদ রানা আটকা পড়েছেন মরুভূমির মাঝে, পালাতে হচ্ছে জলিলকে, দূরে কোথাও বিমান নিয়ে নেমেছে জাহিদ হাসান, তার সঙ্গে রয়েছে নিরস্ত্র ডক্টর ফারা রাইনার, এখান থেকে কমপক্ষে দুই শ' মাইল দূরে মার্ভেল— কাজেই নিশাত অন্তরের অন্তস্তলে টের পেল, এই অবস্থা থেকে কেউ ওদেরকে উদ্ধার করবে সে সম্ভাবনা একেবারেই নেই। ওদেরকে বাঁচাতে হলে কমপক্ষে বিশটা কন্টার নিয়ে ট্রেইণ্ড কমাণ্ডোদের আসতে হবে, নইলে এরিয়াল অ্যাসল্ট অসম্ভব। মার্ভেলে একমাত্র ভেহিকেল বলতে মোস্তাফা আবুলের শখের মোপেট। অর্থাৎ, মরুভূমি পেরিয়ে এসে আক্রমণ করা বহু দূরের কথা।

তারপরও কেন যেন বারবার স্যরের কথা মনে আসছে নিশাতের। ওই একজন মানুষ, উনি কিছুতেই ওদেরকে মরতে দেবেন না, কোনও না কোনও উপায়ে হাজির হবেন এবং উদ্ধার করে সরিয়ে নেবেন এখান থেকে। তা কীভাবে সম্ভব, বলতে পারবে না নিশাত। ওর মন বলছে, ওদেরকে মরতে হবে না এই মরু কারাগারে। অথচ মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর ভোর হবে, ওদেরকে দাঁড় করানো হবে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে।

আরও কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে হাল ছেড়ে দিল নিশাত। এখনও ওর মন বলছে: আসছেন সেই দুর্ধর্ষ বেপরোয়া কমাণ্ডো নেতা, আজরাইলের হাত থেকে ওদেরকে ছিনিয়ে নেবেন উনি।

'দাঁড়াও, আগেই মেরে ফেলো না!' বলে উঠল কর্কশ একটা কণ্ঠ।

রাইফেলের কুঁদো সরে গেল। ফ্ল্যাশলাইটের অত্যুজ্জ্বল আলো পড়েছে রানার চোখে। পিটপিট করে চাইল ও, স্থিরভাবে শুয়ে আছে বালির উপর। এপাশে এসে দাঁড়িয়েছে এক লোক, হাতে বিশাল এক রিভলভার। ভুল না হয়ে থাকলে ওটা পুরনো

কোনও ওয়েবলি। লোকটার বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ, অসংখ্য চুলের সুতলির ভিতর সাদা রং দেখা গেল। কপালে প্রচুর ভাঁজ।

'কে তুমি?'

'মাসুদ রানা।' লোকটার বয়স পঞ্চাশের মত, সঙ্গে একদল সশস্ত্র লোক, চলেছে ডেভিলস ওয়েসিসের দিকে, কাজেই জীবন নিয়ে জুয়া খেলল রানা, বলল, 'আমিও চাই উদ্ধার করা হোক ম্যাথিউস জাস্টাসকে।'

অ্যাণ্টিক রিভলভারের উপর শক্ত হয়ে বসল মুঠো। জোরালো আলোয় কালো চোখদুটো পড়ে কিছুই বোঝা গেল না। কোনও ভুল হলে সঙ্গে সঙ্গে মরব, ভাবল রানা। কয়েক সেকেণ্ড বিরতি নিয়ে বলল, 'এখন কারাগারে আছে আমার তিনজন। তারা এক বিজ্ঞানীকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছে, এমন সময় তাদের বন্দি করেছে ম্যাথিউস জাস্টাসকে পাহারা দেয়া সৈনিকরা। আমাদের একজন পালাতে পেরেছে, কারাগার থেকে চল্লিশ মাইল দূরে বিমান নিয়ে অপেক্ষা করছে সে। আমি চলেছি আমার সঙ্গীদের ছাড়িয়ে আনতে, সেই সঙ্গে সরিয়ে নিতাম আপনাদের নেতাকে।'

অস্ত্রগুলোর মাযল মোটেও রানার উপর থেকে সরল না।

'আপনি আমাদেরকে কীভাবে খুঁজে পেলেন?'

'মূল প্যারাশুট নষ্ট হতেই অক্সিলারি শুট খুলি, তখনই দেখতে পাই আপনাদের ট্রাকের হেডলাইট। তারপর থেকে প্যারা-স্কিইং করে আপনাদের পিছু নিয়েছি।'

'শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হয়, আর সেজন্যই বোধহয় এই ঘটনা সত্যি,' রিভলভার নামিয়ে নিল লোকটা। স্থানীয় ভাষায় কী যেন বলে উঠল। রানার পাশে এসে উবু হলো এক আফ্রিকান, পকেট থেকে বের করেছে ছুরি।

'আগেই বলে রাখি, আমার কাছে গ্লক অটোমেটিক আর

এমপি-৫ মেশিন পিস্তল আছে।'

দলের নেতার দিকে চাইল ছুরিওয়ালা লোকটা। নেতা মাথা দোলাতেই কাটতে লাগল নাইলনের কাপড়। ঢিবির উপর থেকে পড়বার পর এই প্রথম সহজ ভাবে শ্বাস নিল রানা। প্যারাশুট থেকে মুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, দুই হাত সরিয়ে রেখেছে গ্লক পিস্তলের হোলস্টার থেকে।

'অনেক ধন্যবাদ,' বয়স্ক লোকটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রানা। 'আমি বাংলাদেশের লোক, মেজর মাসুদ রানা। আমাকে রানা বলে ডাকতে পারেন।'

'আমি আমাহ্‌লে,' বলল দলের সর্দার, খপ্ করে ধরল রানার ডান হাতের বুড়ো আঙুল, এতে দু'জনের হ্যাণ্ডশেক হয়ে গেল। 'আমাদের বাবা, মহান পিতা ম্যাথিউস জাস্টাসের ব্যাপারে কীভাবে জানতে পেরেছেন?'

'শুনেছি শীঘ্রি তাঁর বিচার হবে, এবং বিচার শেষে মেরেও ফেলা হবে। এটা যদি ঘটে, আপনারা কখনও সরাতে পারবেন না জান্তা সরকারকে।'

'উনি প্রথম নেতা, যিনি শোনা ও নেডবেল, দুই উপজাতিকে একত্র করেছেন,' বলল আমাহ্‌লে। 'আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন জেনারেল, বয়স ছিল মাত্র তিরিশ বছর। এরপর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ক্ষমতাবান রাজনীতিকরা বুঝল আমাদের বাবা অনেক বেশি জনপ্রিয়, ভীষণ ভয় পেল তারা, আর তাই বাবাকে বন্দি করল। এরপর থেকে বহু ধরনের অত্যাচার করেছে। গত দুই বছর হলো তাঁকে বন্দি করে রেখেছে। ঠিক করেছে এবার মেরেই ফেলবে। তাই আমরা চলেছি তাঁকে ছাড়িয়ে আনতে।'

'আপনার সঙ্গে ক'জন আছে?'

'তিরিশজন। প্রত্যেকে ম্যাথিউস জাস্টাসের পক্ষে লড়াই

করেছে।'

লোকগুলোর দিকে চাইল রানা। কারও বয়স চল্লিশের নীচে নয়। চোখে ক্ষিপ্ত সিংহের হিংস্র দৃষ্টি, রুখে দাঁড়াতে চাইছে পরাক্রমশালী শত্রুর বিরুদ্ধে। প্রত্যেকে আত্মবিশ্বাসী, বহু বছর যুদ্ধ করেনি, কিন্তু আবারও লড়তে তৈরি। প্রয়োজনে এসব মুক্তিসেনা বিনা-দ্বিধায় মরবে, কিন্তু জমি ছেড়ে এক ইঞ্চিও পিছাবে না।

'আপনারা ওই ট্রাকের ইঞ্জিন চালু করতে পারবেন?' বলল রানা, এক পা সামনে বাড়ল। আরেকটু হলে বালির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত। ওর মনেই ছিল না বাসনে ডান পা আটকানো।

কয়েকজন হো-হো করে হেসে ফেলল।

'যুদ্ধের সময় এই বাসনে অনেকে খেতে পারবে।' বসে পড়ে বুট থেকে পা বের করল রানা, বাসন থেকে মুচড়ে ছিঁড়ে নিল বুট, প্রায় বাতিল জিনিসটা আবারও পরে নিল।

হাত ধরে রানাকে দাঁড় করিয়ে দিল আমাহ্‌লে। ক্যাম্পের দিকে পা বাড়াতেই রানার পাশে চলে এল সে। 'হ্যাঁ, ট্রাক মেরামতি হবে। ফিউয়েল পাম্পে ধুলো ঢুকেছে, তাই কাজ করছে না। কয়েক মিনিট পর রওনা হব। এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।'

'ম্যাথিউস জাস্টাসকে কীভাবে মুক্ত করতে চান?'

'যখন বাবাকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে, কারাগারের বাইরে অ্যাম্বুশ করব। ট্রাক ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু আমাদের ধারণা তাঁকে সরিয়ে নিতে এয়ারক্রাফট আসবে। রাজধানীতে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে আর দুই দিন পর বিচার শুরু হবে।'

ততক্ষণে নিশাত আপা, স্বর্ণা ও কাশেম মারা পড়বে, ভাবল রানা। আরও একটা ব্যাপারে ভাবছে। আমাহ্‌লে হয়তো অ্যাম্বুশ করবে, কিন্তু প্রথম গুলি শুরু হতেই একটা বুলেট গেঁথে দেয়া

হবে ম্যাথিউস জাস্টাসের মাথায়। এখন এমন কোনও পরিকল্পনা চাই যেটা পুরো ফুল-প্রুফ। ভোরের আগেই আমাহ্‌লেকে নিয়ে ডেভিলস ওয়েসিসে হামলা করতে হবে, নইলে ওর নিজের তিন বিশ্বস্ত সঙ্গী খুন হয়ে যাবে। 'এমন হলে কেমন হয়,' বলল রানা, 'আমি আজ রাতেই মুক্ত করব ম্যাথিউস জাস্টাসকে, নিরাপদে সরিয়ে দেব দক্ষিণ আফ্রিকায়।'

নিবিড় দৃষ্টিতে রানার দিকে চাইল আমাহ্‌লে। 'আপনার পরিকল্পনা খুলে বললে বুঝব কী করা উচিত।'

'সেটাই তো কথা,' বিড়বিড় করে বলল রানা। বুঝতে পারছে আগামী কিছুক্ষণের ভিতর খুব ভাল কোনও পরিকল্পনা লাগবে, নইলে... 'তার আগে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন। আপনাদের সঙ্গে রকেট-প্রপেল্ড গ্রেনেড আছে?'

'পুরনো রাশান আরপিজি-৭এস, যুদ্ধের সময় ওগুলো ব্যবহার করেছি আমরা।'

মনে মনে গুঙিয়ে উঠল রানা। যিম্বাবুইয়ের স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হয়েছে আজ থেকে তিরিশ বছরেরও বেশি।

'চিন্তা করবেন না,' তাড়াহুড়ো করে বলল আমাহ্‌লে। 'আমরা ওগুলো পরীক্ষা করে দেখেছি।'

'সঙ্গে কী পরিমাণ দড়ি আছে?'

এক লোককে কী যেন বলল আমাহ্‌লে। তার কথা শুনে নিয়ে ভাষান্তর করল, 'অনেক দড়ি আছে। নাইলনের দড়ি, দৈর্ঘ্যে দুই হাজার ফুটের বেশি।'

'আর মাত্র একটা প্রশ্ন,' বলল রানা। কাটা পড়া প্যারাশুটের দিকে ফিরে চাইল। মাটিতে লুটিয়ে আছে, ওটার বুকে ঢেউ তুলছে বাতাস। হঠাৎ বিদ্যুদ্বেগে একটা চিন্তা এল ওর। 'আপনার লোকেদের ভিতর কেউ সেলাইয়ের কাজ জানে?'

চার

সর্বক্ষণ গুনগুন গুঞ্জন তুলছে লক্ষ-কোটি পোকা, আরেকটু হলে স্যাটালাইট ফোনের রিং শুনত না নিকোলাস ক্রিস্টোফার। ঘামে ভেজা চাদর ও কুণ্ডলী পাকানো মশারির ভিতর অন্ধের মত যন্ত্রটা খুঁজতে লাগল সে। পাশেই রেখে ঘুমিয়েছে, ভয় ছিল ভাড়াটে কোনও মার্সেনারি ওটা চুরি করবে। আজকাল টাকা দিয়ে এর বেশি বিশ্বস্ততা মেলে না।

'হ্যালো,' ঘুম মেশানো কণ্ঠে কল রিসিভ করল সে।

'নিক, ডুলি বলছি। এখানে সমস্যা হয়েছে। আসিফ হায়দার চৌধুরিকে সরিয়ে নিতে চাইছে কয়েকজন।'

পুরোপুরি কেটে গেল নিকোলাস ক্রিস্টোফারের ঘুম। 'কী? খুলে বলো কী হয়েছে।'

'ওরা চারজন ছিল। তিনজনকে আটক করেছি আমরা। চতুর্থজন মোটর সাইকেল নিয়ে পালিয়ে গেছে। আসিফ হায়দার চৌধুরির বুকে গুলি করেছে ক্যারেন। ওর গুলির আওয়াজে আমরা বুঝতে পারি এই দল ডেভিলস ওয়েসিসে ঢুকে পড়েছে। যারা ম্যাথিউস জাস্টাসকে পাহারা দিচ্ছে, পরে তারা কারাগারের ছাতে প্যারাশুট পেয়েছে।'

'এক মিনিট। আসিফকে গুলি করেছে ক্যারেন?'

'হ্যাঁ, বুকে। ক্যারেন নিজেকে কিডন্যাপড বোঝাতে চেয়েছে, তারপর প্রথম সুযোগেই একজনের পিস্তল কেড়ে নিয়ে গুলি করেছে। লোকটার রক্ত বেরুনো বন্ধ করেছি আমরা। জিলের

কাছ থেকে হেরোইন কেড়ে নিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কোনও চিন্তা কোরো না, পুরো হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছি।'

ওর লোকের ভিতর ড্রাগস? ভুরু কুঁচকে গেল নিকোলাসের। এসব লোক বেসামাল হয়ে যে-কোনও ভুল করতে পারে। আরও সতর্ক থাকতে হবে। 'যারা এসেছে তারা কারা?'

'বলছে একটা কোম্পানি পাঠিয়েছে। ক্যারেন এবং আসিফকে নিয়ে যেতে। পেট থেকে আর কিছুই বের করা যায়নি। গার্ডদের ক্যাপ্টেন ভোরে তাদের মেরে ফেলতে চায়, নিক।' মেয়েটার কণ্ঠে আপত্তি ও ভয় প্রকাশ পেল, 'কিছুই আমাদের নিয়ন্ত্রণের ভিতর থাকছে না। এখন বুঝছি না কী করব।'

'প্রথম কাজ হচ্ছে মাথা ঠাণ্ডা রাখা, ডুলি।' বড় করে শ্বাস নিল বিজ্ঞানী, ভাবতে শুরু করেছে এবার কীভাবে পরিস্থিতি সামলে নেবে। ছাউনির ভিতর শুয়েছে সে, পাশের জলাভূমি থেকে বগ্-বগ্ আওয়াজ তুলে গ্যাস উঠছে। একটু দূরে ঘুমের ভিতর কী যেন বলে উঠল একজন আফ্রিকান মার্সেনারি। দূরে অয়েল ফ্যাসিলিটির অসংখ্য চিমনি থেকে উঠছে ধোঁয়া ও আগুন। ওদিকে চাইলে মনে হয় জ্বলছে গোটা পৃথিবী। এভাবে পরিবেশ ধ্বংস করা হচ্ছে দেখে মন খারাপ হয়ে গেল তার।

'এখন তুমি আমাকে কী করতে বলো?' জানতে চাইল ডুলি।

হাতঘড়ির লিউমিনাস ডায়াল দেখল নিকোলাস। ভোর সাড়ে চারটে। শুতে যাওয়ার আগে নতুন মিটিওরোলজিকাল রিপোর্ট শুনে ঘুমিয়েছে। জানা গেছে, আটলান্টিকের মাঝে পাকিয়ে উঠছে ঝড়, ওটা বছরের বারোতম। ধারণা করা হচ্ছে বিশাল হারিকেন আসবে।

ডেভিলস ওয়েসিসে প্রাক্তন পার্টনারকে আটকে চিন্তিত করে

তুলতে চেয়েছে সে, কিন্তু ওটা মূল কাজের মাত্র প্রথম একটি ধাপ। গত ক'দিন ভয়াল কোনও ঝড় আসবে সেজন্য সময় ক্ষেপণ করেছে। ওই ঝড় এলেই আসিফ হায়দার চৌধুরিকে দ্বিতীয় কাজে ব্যবহার করবে। প্রিয় বিশ্ব-মাতা হঠাৎ করেই মুখ তুলে চাইছে। তাকে আরেকটু উস্কে দিয়েছে সে। ওসব হিটার সত্যি কাজের জিনিস। এবার আজ সকালে নামিবিয়ার মরুভূমি থেকে চৌধুরিকে নিয়ে আসা যায় ক্যাবিণ্ডায়।

'সকালে তোমাদেরকে সরিয়ে আনার জন্য প্লেন পাঠাব,' বলল নিকোলাস।

'উম্-ম্,' শুরু করেও থেমে গেল ডুলি গ্রিন।

'কী ব্যাপার, বলো?'

'ভোরে ওই তিন কমাণ্ডোকে গুলি করে মারবে। নিজেদের ভিতর আলাপ করেছি। যখন তাদের খুন করা হবে, আমরা এখানে থাকতে চাই না। অস্থির হয়ে উঠছে সবাই। গার্ডদের ক্যাপ্টেন এখনও ভাবছে ম্যাথিউস জাস্টাসকে ছিনিয়ে নিতে আসছে একদল সৈনিক। এই লোকগুলো এখানে আসার পর মেয়েরা, এমন কী আমিও, আমরা খুব অস্বস্তির ভিতর পড়েছি। ...নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি কী বলতে চাই?'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল নিকোলাস ক্রিস্টোফার, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, ওখান থেকে চল্লিশ মাইল পুবে একটা জায়গা আছে। প্রথম যখন ডেভিলস ওয়েসিসে গেলাম, পাইলট ওটার কথা বলেছিল। নামটা এখন মনে পড়ছে না, কিন্তু ম্যাপে জায়গাটা দেখে নিতে পারবে। ওখানে একটা ভুতুড়ে পরিত্যক্ত শহর আছে, পাশেই এয়ারস্ট্রিপ। আমি কিনসাশায় পাইলটের সঙ্গে কথা বলব। ভোরের প্রথম আলো ফুটলেই রওনা হবে সে। একটা ট্রাক নেবে তোমরা, ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করবে। দুপুরের দিকে প্লেন নিয়ে পৌঁছবে পাইলট।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, নিক। তাতেই চলবে।'

কানেকশন কেটে দিল ক্রিস্টোফার, টের পেল এখন আর ঘুমাতে পারবে না। কয়েক বছরের মস্ত এই পরিকল্পনা শেষে চূড়ান্ত একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে সব। সব আসিফের কাছে বিক্রি করবার পর যে টাকা এল, তার বড় একটা অংশ খরচ না হলে খুবই ভাল হতো। সেক্ষেত্রে যা চাইত তা-ই কিনে নিতে পারত, প্রতি পদে এত সমস্যার মুখে পড়ত না।

ছাউনির একটা খুঁটির পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ক্রিস্টোফার, চেয়ে রইল তেলক্ষেত্রের লালচে আগুনের দিকে। ওদিকটা যেন স্রেফ নরক, চারপাশে শুধু আগুন আর ধোঁয়া।

ভাবছে সে, শেষ পর্যন্ত ঠিকই সফল হবে, তখন এই সাফল্য মধুর মত মিষ্টি লাগবে। আসলে সুকঠিন কাজের কোনও বিকল্প নেই, অতি সহজে কিছু পাওয়া গেলে তার মূল্য থাকে না। হয়তো সেজন্যই এত বিলিয়ন ডলার খরচ করতে পেরেছে! বড় সহজেই টাকা এসেছিল। তখন মাত্র ওরা টগবগে যুবক, সেই সময়েই পেটেন্ট করল কয়লার স্ক্রাবার। অবশ্য এটাও ঠিক, প্রতিদিন আঠারো ঘণ্টা খেটে সিস্টেমটা নিখুঁত করতে হয়েছে। ওদ্রেরকে সারাজীবন ধরে প্রচণ্ড খাটুনি দিতে হয়নি। হঠাৎ করেই এসেছে প্রশংসা, অর্থ এবং বিপুল সাফল্য। তারই মাঝে কয়েক বছর আগে পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়ে গেল সে, সেই ব্যর্থতার স্বাদ আজও ভোলেনি।

আসিফের ভিতর কী পেয়েছিল সুন্দরী মেয়েটা!

গম্ভীর হয়ে গেল নিকোলাস ক্রিস্টোফার। মন সরিয়ে নিয়ে আবারও ভাবতে লাগল, এই অপারেশনকে বাস্তবে পরিণত করতে কঠোর পরিশ্রম করেছে। সেজন্যই দারুণ লাগবে বিশাল বিজয়। বহু ত্যাগ স্বীকার করেছে, নীরবে কাজ করে গেছে, টাকা দিয়ে যা কেনা যায় তার সবই করেছে সে, টাকার দিকেই ফিরে

চায়নি। এবং এতসব করেছে শুধু মানবজাতির মঙ্গলের জন্য।

বৈশ্বিক উষ্ণতা কত ভয়ঙ্কর তা ঠিকই বুঝবে কয়েক শ' কোটি মানুষ। একসময় ভবিষ্যৎ ইতিহাসবিদরা বলবে: এই বছরের ওই ঝড়টা বদলে দিয়েছিল মানবসভ্যতাকে। এর পর থেকে কোনও মানুষ ভুলেও প্রকৃতি ধ্বংস করেনি।

এত কিছুর মূলে যে মানুষটি, তার কথা ভাবতে গিয়ে সবাই বলবে: 'সত্যিই, নিকোলাস ক্রিস্টোফার এসেছিলেন মহান স্রষ্টার তরফ থেকে, এবং রক্ষা করে গেছেন আমাদের সবাইকে।'

'মাসিহা,' ফিসফিস করে বলল ক্রিস্টোফার। 'ওরা কেউ জানে না আমিই তাদের রক্ষাকারী, আমিই সত্যিকারের মাসিহা!'

ডেভিলস ওয়েসিস কারাগার থেকে পাঁচ মাইল দূরে থেমেছে কনভয়ের চারটে ভেহিকেল। কঠিন মিশনের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে আমাহ্লের যোদ্ধারা। চার ট্রাক নিয়ে গিয়ে কারাগারে হামলা করবে ওরা। সবাই আশা করছে শেষ ট্রাকের পিছনে টানা হাওয়া থাকবে। এদিকে আসবার পথে বেশির ভাগ সময় সামনের ট্রাকের ক্যাবে আমাহ্লের সঙ্গে পরিকল্পনা করেছে রানা। এরই ভিতর কথাও বলেছে সোহেল ও জলিলের সঙ্গে। ওরা যুদ্ধের প্রতিটি আঙ্গিক নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলাপ করেছে, এবং এসব করতে গিয়েই রানার স্যাটালাইট ফোনের ব্যাটারি প্রায় ফুরিয়ে গেছে।

পরে মনে হয়েছে আমাহ্লে খুবই খুশি তাদের সঙ্গে মাসুদ রানা আছে বলে। সরল মনে স্বীকার করেছে, সে যুদ্ধের সময় সার্জেন্ট ছিল, তার মগজ এত চলে না যে রানার মত দারুণ সব ট্যাকটিক্স নিয়ে ভাববে। রানা যে জটিল পরিকল্পনা করেছে, এতে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়েছে। আমাহ্লের সহজ-সরল পরিকল্পনার ভিতর এত কিছু ছিল না। এবং সে

কারণেই সবাইকে নিয়ে মরত।

ট্রাক থেকে নেমে পড়ল রানা, শিরদাঁড়ার গোড়ার জায়গাটা দুই হাতে টিপতে শুরু করেছে। নিজেই টের পেল, পেশাদার ম্যাসেজকারীরা লজ্জা পেত ওর আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখে। ধুলোর কারণে রক্ত-লাল হয়ে উঠেছে দুই চোখ, প্রচুর পানি গিলেও দাঁত থেকে কিচকিচে বালি সরাতে পারেনি। নিজেকে বলেছে, সামনের কাজ শেষ হোক, ওর জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ শাওয়ার নেবে। ক্লান্তিতে ভেঙে আসতে চাইছে শরীর। ভাগ্যিস মেডিকেল কিটের ভিতর ক্যাফেনের পিল রেখেছিল, নইলে বহু আগেই বালির উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

বুক ফুলিয়ে শ্বাস নিতে শুরু করেছে রানা। দু' পাশে ছড়িয়ে দিয়েছে দুই হাত, স্বাভাবিক করতে চাইছে দেহের রক্ত চলাচল। কিছুক্ষণ পর ভাবল, কাজ শেষে সামান্য পানি খরচ করে স্নান সেরে নেবে, তারপর জীবনের সবচেয়ে বড় ঘুম দেবে, উঠবে কমপক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা পর। দূরে আমাহ্‌লের কয়েকজন যোদ্ধা ওর প্যারাশুটের ভাঁজ খুলছে, ভাল ভাবে ছড়িয়ে দেবে বালির উপর। ইকুইপমেন্টের প্যাকের পাশে চলে গেল রানা, সব ঘেঁটে দেখতে লাগল। একেবারে প্রয়োজনীয় না হলে সে জিনিস সরিয়ে নিল। গ্লক ও হোলস্টার, থ্রোয়িং নাইফ, ক্যান্টিন, মেডিকেল কিট বাদ পড়ল, এইচ অ্যাণ্ড কে মেশিন পিস্তলের অর্ধেক অ্যামিউনিশনও বাদ দিতে হলো। বদলে আমাহ্‌লের কাছ থেকে ধার নেয়া বাড়তি দুটো আরপিজি-৭-এর রকেট ঠাঁই পেল প্যাকে।

প্যান্টের পকেটে থাকল বাক নাইফ। আজ থেকে দুই বছর আগে জন্মদিনে ওটা উপহার দিয়েছিলেন বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। ছোটবেলায় ঠিক এমনই একটা বাক নাইফের স্বপ্ন দেখত। শুনেছিল ওই ছুরি দিয়ে তিন ইঞ্চি

পেরেকও কাটা যায়। অনেক আবদার করবার পর একদিন সত্যিই বাবা কিনে দিয়েছিলেন, কিন্তু ওটা চুরি করে এক ক্লাস মেট। পরে তাকে আচ্ছামত পিটিয়েছিল রানা, কিন্তু উদ্ধার করতে পারেনি ছুরিটা।

সোহেলকে আবারও ফোন দিল রানা। 'পাঁচ মিনিট পর রওনা হব। একটু পর শুরু হবে আক্রমণ।'

'জাহিদ হাসান আর জলিলের সঙ্গে আলোচনা শেষ,' বলল সোহেল। 'এমডি-৫২০এন কপ্টার নিয়ে অপেক্ষা করছেন ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ, একটু পর পজিশনে চলে যাবে। গগল ফোন করেছিল, ভোর হলেই রায়হানকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে নামবে। বলতে ভুলে গেছি, জাহিদ হাসান পরিচিত এক বুশ পাইলটের সঙ্গে কথা বলে সব ঠিক করেছে, সে লোক নাকি মধ্য আফ্রিকার সেরা।'

'গুড।'

'তোর অবস্থা কি বেহাল? গলা শুনে তো অসুস্থ মনে হচ্ছে।'

'না, ঠিকই আছি। কিন্তু মার্ভেলে ফিরেই বিশাল ঘুম দেব।'

'তোর জন্য ফ্রিজে কয়েকটা বিয়ার রাখব। আর আমার জন্য নেপোলিয়ন ব্র্যাণ্ডি।'

'ঠিক আছে, তুই খাবি রাজকীয় জিনিস আর আমার জন্য ফকিরা আয়োজন? ...আর কিছু বলবি?'

'না।'

'রাখলাম,' ফোন অফ করে দিল রানা।

ক্যাম্প ঘুরে এসে ওর পাশে দাঁড়াল আমাহ্‌লে। আবারও প্লাস্টিকের বাসনের সঙ্গে ডান পায়ের বুট আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে শুরু করেছে রানা। কাজটা শেষ করে খুব শক্ত করে গিঁঠ দিল। এই বাসন হয়তো কাজেই লাগবে না, কিন্তু ঝুঁকি নেয়া ঠিক হতো না।

'আপনি তৈরি?' জানতে চাইল প্রাক্তন বিদ্রোহী। 'এক ঘণ্টা পর ভোর হবে। তার আগেই সবাইকে পজিশনে যেতে হবে।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'হ্যাঁ, আমি তৈরি।'

আমাহ্‌লের সাহায্য নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে প্যারাশুটের পাশে পৌঁছে গেল রানা। ওর নির্দেশে আমাহ্‌লের লোক মরুভূমির মেঝেতে ছড়িয়ে দিয়েছে কালো নাইলনের কাপড়। বালির ঢিবি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে কিনারাগুলোর উপর, নইলে প্যারাশুটের নীচে বাতাস ঢুকে উড়িয়ে নিত। এবার আরপিজির রকেট ভরা প্যাক বুকে ঝুলিয়ে নিল রানা, রিগের সঙ্গে নিজেকে আটকে নিতে লাগল। কোমর থেকে ঝুলছে রকেট লঞ্চার টিউব ও এমপি-৫। প্যারাশুটের ছেঁড়া অংশ ভাল করেই পরীক্ষা করেছে রানা। দক্ষভাবে সেলাই করেছে আমাহ্‌লের দরজি। রিগের সব গিঁঠ দেয়া শেষে সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা, টের পেল বুকের ভিতর পরিচিত রোমাঞ্চ। অসম যুদ্ধে চলেছে, ওর সঙ্গে রয়েছে মাত্র তিরিশজন যোদ্ধা, বিপক্ষে এক শ'র বেশি মার্সেনারি।

'আপনি সিগনাল দিলেই আমরা রওনা হব,' বলল আমাহ্‌লে। আন্তরিক ভাবে হ্যাণ্ডশেক করল। 'আজ রাতে আপনি হতভাগ্য এক দেশ ও তার দরিদ্র জনসাধারণকে সাহায্য করতে চলেছেন, স্রষ্টা আপনার ভাল করুন।'

এবার তার লোককে নির্দেশ দিতেই ছুট দিল তারা, সিকি মাইল দূরে তাদের ভেহিকেল। তিন মিনিট পর গর্জে উঠল ট্রাকের ইঞ্জিন। গিঁঠগুলো দ্বিতীয়বার পরখ করেছে রানা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মরুভূমির ভিতর। যে-কোনও সময়ে বেদম হ্যাঁচকা টান আসবে।

কয়েক সেকেণ্ড পর মনে মনে ড্রাইভারের প্রশংসা করল। রওনা হয়েছে সে, গতি তুলছে অতি সাবধানে। প্রথমে গিঁটওয়ালা দড়ির কুণ্ডলী পাক খেয়ে খুলে গেল, তারপর ধীরে

ধীরে টানটান হলো। বুকের হার্নেসে বাঁধা দড়িতে টান পড়তেই উল্টো পিছনে হেলে গেল রানা। সামনে বাড়ছে, বুটের প্লাস্টিকের নীচে খসখস আওয়াজ তুলে সরছে বালি। গতি তুলতে শুরু করেছে ট্রাক। বালির স্তূপ সরিয়ে ছেঁচড়ে চলেছে প্যারাশুট। দশ মাইল গতি উঠতেই ফয়েলের ভিতর ঢুকতে লাগল হাওয়া। আরও একটু পর ভেসে উঠল প্যারাশুট, টান পড়ল রানার রাইজারগুলোর উপর। ট্রাক এত দ্রুত চলছে না যে রানাকে ভাসিয়ে তুলবে ক্যানোপি।

দুই হাজার ফুট দড়ির শেষে আছে রানা, এখন যদি পড়েও যায় পিছনে ওকে দেখতে পাবে না ড্রাইভার। ছেঁচড়ে যেতে হলে দড়ি খুলবার আগেই বিশ্রী ভাবে আহত হবে। ভারসাম্য রাখতে গিয়ে প্রায় দুই ভাঁজ হয়ে গেছে ও। আরও গতি তুলছে ট্রাক। প্রতি মুহূর্তে রাইজারগুলোকে টেনে চলেছে।

সামনে বড়সড় একটা পাথর দেখে বামে সরে গেল রানা। ওকে হোঁচট খাওয়াতে গেল আরেকটা পাথর, নীচ থেকে সরেও গেছে বাসন। বাধা এড়াতে লাফিয়ে উঠল রানা, মনে মনে আশা করল এখনই প্রচণ্ড টান দেবে না প্যারাশুট। আরেকটু হলে হুড়মুড় করে পড়ত, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলে নিল, আবারও ফিরে পেল ভারসাম্য।

ঘণ্টায় বিশ মাইল গতি তুলেছে ট্রাক। তারপর গতি বাড়ল পঁচিশ মাইলে। পা ও হাঁটু জ্বলছে রানার, তারপর হঠাৎ করে কিছুই অনুভব করল না। প্যারাশুট ওকে তুলে নিয়েছে আকাশে।

ক্যানোপির ভিতর যথেষ্ট হাওয়া ঢুকেছে। ক্রমেই গতি তুলছে ট্রাক। সমস্ত গিয়ার সহ উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে রানা। কয়েক মিনিট পর কবজির আল্টিমিটার দেখল: উনিশ শ' ফুট। অনেক নীচের মরুভূমির দিকে চেয়ে মন খুশি হয়ে উঠল। ভাবল, একই দিনে প্যারাশুটিং, প্যারা-স্কিইং এবং শেষে প্যারা-

সেইলিং!

বাক নাইফের ফলা দিয়ে বাসন ও বুটের দড়ি কেটে ফেলল রানা, এবার শুধু উড়ে যেতে হবে। ট্রাকের সঙ্গে যুক্ত দড়িটা যথেষ্ট ঢিলা হয়ে উঠেছে প্যারাশুট পর্যন্ত, প্রায় কোনও ঝাঁকি ছাড়াই এগুতে পারছে রানা। অবশ্য কখনও কখনও গভীর উপত্যকার ভিতর ঢুকছে ট্রাক, তখন লাটাইয়ের শেষ প্রান্তে ঘুড়ির মত টান খেয়ে নামছে ও। তাতে বড় কোনও সমস্যা হচ্ছে না।

কখন টো লাইন খুলবে সেটা রানাই ঠিক করবে। ওর পিছনে দেখা দিয়েছে ভোরের ধূসর রং। মার্ভেলে কমব্যাট ব্রিফিঙের সময় জানতে পেরেছে রুপালি আলো দেখা দেয়ার পনেরো মিনিট পর উঠবে সূর্য। মরুভূমিতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আলো, এক মাইল দূরে বাক্সের মত ডেভিলস ওয়েসিস কারাগার দেখতে পেল ও। দ্বিতীয়বার ভাবতে গেল না, কমব্যাট হার্নেসের ডি রিং থেকে খুলে দিল ট্রাকের দড়ি। হাত থেকে ওটা ছেড়ে দিতেই ঝটকা দিল প্যারাশুট, এক লাফে উঠে গেল দেড় শ' ফুট।

আমাহ্লের কোনও লোক আকাশের দিকে চেয়ে আছে। উপর থেকে দড়ি পড়লেই থামবে কনভয়। আরও সামনে বাড়লে কারাগার থেকে তাদেরকে দেখে ফেলতে পারে সেন্ট্রিরা। সেক্ষেত্রে চারপাশে পজিশন নেয়ার সময় পাবে না ওরা।

কিছুক্ষণ ভেসে চলবার জন্য টগলগুলো নিয়ে কাজ শুরু করল রানা। এগিয়ে আসছে পুরনো আমলের দুর্গ-কারাগার। আজ বোধহয় রানার পাশেই ঠাঁই নিয়েছেন ভাগ্যদেবী, একবারের জন্য থামছে না হাওয়া। অনায়াসে কারাগারের ছাতে নামতে পারবে।

বাতাস তো থামলই না, নতুন উদ্যমে বইতে লাগল, ওকে

সামান্য পাতার মত ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। টগলগুলো দিয়ে সামান্য দিক পরিবর্তন করল রানা, কারাগারের ছাতের ঠিক মাঝে নামতে চাইছে। আকাশ হয়ে উঠছে ফ্যাকাসে নীল। নিঃশব্দে কারাগারের উপর দিয়ে ভেসে গেল রানা, নীচ থেকে কোনও চিৎকার এল না। ক্যানোপি থেকে নিয়ন্ত্রিত ভাবে বাতাস ছেড়ে নীচের দিকে নামল ও, আলতো করে স্পর্শ করল ছাত, ওর ভঙ্গি দেখে কেউ ভাবতে পারে মানুষটা এইমাত্র সিঁড়ির উপরের শেষ ধাপ পেরুল।

বাতাস এসে প্যারাশুট উড়িয়ে নেয়ার আগেই ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত হাতে ওটা গুছিয়ে নিল রানা। খুলে ফেলেছে হার্নেস, নামিয়ে রাখল রকেট শেলের ব্যাগ। ওটা দিয়ে চাপা দিল প্যারাশুট। হাতে তুলে নিয়েছে এমপি-৫, চট্ করে দেখে নিল প্যারাপেট। ওর দলের সবাই যে দড়ি নামিয়ে দিয়েছিল, সেগুলো কেটে ফেলেছে প্রহরীরা, কিন্তু ছাতের পুরু কাঠের ভিতর এখনও রয়ে গেছে আইবোল্টগুলো। সাবধানে বাইরে চাইল রানা, প্রাচীরের ওপাশে মোটর সাইকেলের চাকার দাগ দেখল। দুটো মোটর সাইকেলের চিহ্ন ঘুরে চলে গেছে প্রধান ফটকের দিকে। তৃতীয়টা গেছে অনুর্বর মরুভূমির দিকে। ওটা নিয়ে গেছে জলিল খান। এ ছাড়া বালিতে আছে অন্যান্য চিহ্ন, দেখে মনে হলো বড় কোনও ট্রাক ওদিক দিয়ে গেছে।

একটা আইবোল্টের সঙ্গে প্যারাশুট বেঁধে রেখে চারপাশ ঘুরে দেখল রানা। দু' মিনিট পেরুনোর আগেই স্থির করে ফেলল কোন্ জায়গা থেকে হামলা শুরু করবে। আরপিজি-৭-এর জন্য সঙ্গে এনেছে সাতটা রকেট। টার্গেট হিসাবে বেছে নিয়েছে চারটে জায়গা। আন্দাজ করছে, এত বছর পর দু'চারটে প্রজেক্টাইল নষ্ট বেরুবে, তারপরও ওর মনে হলো যথেষ্ট সুবিধা পাবে এর অর্ধেক ফাটাতে পারলেও।

আবারও মার্ভেলে যোগাযোগ করল। সঙ্গে সঙ্গে কল রিসিভ করল সোহেল। কণ্ঠ থেকে দূর করতে পারল না উদ্বেগের ছাপ, 'কী রে, পৌঁছে গেলি?'

'হ্যাঁ। তবে অন্দরমহলে ঢুকিনি।'

'পনেরো মিনিট হলো আকাশে উঠেছে ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসান। সূর্য উঠবার পনেরো মিনিট পর রেঞ্জে পৌঁছবে। তখন জলিলের সঙ্গে ট্যাকটিকাল নেটে কথা বলতে পারবি।'

চুপ করে থাকল রানা।

'গুড লাক, রানা,' বলল সোহেল। 'ওদেরকে নিয়ে ফিরে আয়।'

বাটন টিপে ফোন বন্ধ করে দিল রানা, ওটা রাখল কোমর থেকে ঝুলন্ত হার্ড কেসে।

প্রধান ফটকের সামনে যে তিন প্রহরী পায়চারি করছিল, হঠাৎ তারা ঘুরে চাইল। আগের চেয়ে সতর্ক হয়ে উঠেছে। রানা যেখানে আছে, তার ঠিক নীচে একটা দরজা খুলে গেছে। প্রাচীন দুর্গের মত ছাতের রেলিঙে একটু দূরে দূরে পাথরের কলাম। সহজেই ওগুলোর আড়াল নেয়া যায়। একটা পিলারের পাশ থেকে উঁকি দিল ও। ফ্ল্যাশলাইট হাতে উঠানে বেরিয়ে এসেছে এক লোক, প্রহরীদের একজনকে কী যেন বলল, তারপর আবার ঢুকে পড়ল দালানের ভিতর।

দিগন্তের ওপাশ থেকে উঁকি দিয়েছে সূর্য, রক্তিম আলো এসে পড়ল রানার পিঠে। নীচে এখনও আবছা অন্ধকার, তবে দেখা গেল প্রধান ফটকের বামে, প্রাচীরের সামনে মাটির ভিতর গেঁথে দেয়া হয়েছে তিনটে কাঠের তক্তা। উঠানে গিয়ে রোদ পড়বার আগেই পকেট হাতড়াল রানা, বাক নাইফ বের করে ওজন বুঝে নিল, তারপর ছুঁড়ে মারল তক্তা লক্ষ্য করে। বালিতে পিছলে মাঝের তক্তার সঙ্গে গিয়ে ঠোকর দিল ছুরি, ওখানেই থামল।

ছোটবেলায় ইঁটের চারা দিয়ে খেলা খুব খারাপ নয়, ভাবল রানা।

রকেট লঞ্চারের ভিতর একটা শেল ভরল। একে একে অনেক লোক এসে হাজির হয়েছে প্যারেড গ্রাউণ্ডে। একটু পর একইসঙ্গে বারোজন লোক বেরিয়ে এল। রানা খেয়াল করল, এদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলছে খানিক পরেই মানুষ খুন করবে, সেজন্য তাদের মজাও লাগছে। আন্দাজ এক শ' লোক জড় হয়েছে প্যারেড গ্রাউণ্ডে। খারাপ দিক, এদের পঞ্চাশ ভাগ লোক সঙ্গে এনেছে রাইফেল। ছাত থেকে নিচু গুঞ্জন শুনছে রানা। দু'চারজন হো-হো করে হেসে উঠল। এক মিনিট পর সবাই চুপ হয়ে গেল, দড়াম করে খুলে গেছে নীচের একটা দরজা।

আড়াল থেকে উঁকি দিল রানা। কয়েকজন লোক কারাগার থেকে বের করে এনেছে নিশাত, স্বর্ণা ও কাশেমকে। হঠাৎ করেই বুক ভরে গেল রানার, গর্ব হলো ওদের জন্য। সিনা ফুলিয়ে হাঁটছে নিশাত, স্বর্ণা ও কাশেম, উঁচু করে রেখেছে মাথা। পিছমোড়া করে না বাঁধলে হাত দুলিয়ে চৌকশ সৈনিকের মত হাঁটত। করুণ ভাবে মরবে বলে বিন্দুমাত্র ভয় নেই ওদের চোখে-মুখে।

বাটন টিপে মেশিন পিস্তলের লেসার সাইট চালু করল রানা।

বাংলাদেশ আর্মির তরফ থেকে ইউএন-এর মিশনে যোগ দিয়েছিল ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা, তখন এসেছিল এই আফ্রিকার কঙ্গোতে, দুর্ভাগ্যবশত দেখতে হয়েছিল নিষ্ঠুর কিছু বেসামরিক হত্যাকাণ্ড। এখন বুঝতে পারছে এখানে ওই একই ঘটনা ঘটবে। গার্ডদের ক্যাপ্টেন বোধহয় কোনও আমেরিকান সিনেমায় মানুষ-হত্যার দৃশ্য দেখেছে, তার মনে হয়েছে ওভাবেই খুন করতে হয়। খুশি মনে দলের সমাবেশ করেছে, সবাইকে মজা দিতে পারবে ভেবে মুলোর মত দাঁত বের করে নিজেও

হাসছে।

খুবই সাহসী মেয়ে নিশাত, কিন্তু এভাবে অসহায় হয়ে মরতে চায় না— এখন ওদের হাতে অস্ত্র থাকলে প্রাণপণ লড়ত, তাতে মরলেও অন্তত মানসিক শান্তি নিয়ে মরত।

চট্ করে বাংলাদেশ নেভির লেফটেন্যান্ট সানজিদা স্বর্ণার দিকে চাইল নিশাত। হাঁটছে, কিন্তু উদাস হয়ে দূর আকাশে চেয়ে আছে মেয়েটি। একটু ভেজা ওর দুই চোখ। হয়তো ভাবছে: *মা, তোমাকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিল নিষ্ঠুর ক্যান্সার, এখন আমিও আসছি অন্য এক পথে। অনেক দিন তোমার সঙ্গে গল্প করি না, মা, বুকে জমে গেছে অনেক কথা, অনেক কষ্ট; একটু অপেক্ষা করো, মা, আমি এলেই বুক উজাড় করে সব বলব তোমায়।*

নিষ্পলক সৈনিকদের দেখছে কাশেম। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্যদিকে তাকাল। নিশাত বুঝতে পারছে কাশেম নিজেকে সামলে নিতে চাইছে। পরিবারের বড় ছেলে ও, এখনই চলে গেলে মস্ত বিপদে পড়বে পরিবারটি। ওর একার বেতনেই চলে সাতজনের সংসার। এখনও ছোট দুই বোনের বিয়ে দিতে পারেনি। ছোট দুই ভাইয়ের স্কুল ও কলেজের বেতন, সংসারের খরচ, বাবার ব্রেন স্ট্রোকের দামি ওষুধ...

আর ভাবতে পারল না নিশাত, কাশেমের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল। বাবা-মা'র কথা মনে পড়ল ওর। পাঁচ বছর হলো মা পৃথিবী ছেড়ে গেছেন, এখন ভীষণ একা বাবা। তাঁর বড় একটা ভরসা ছিল ও, কিন্তু এখন ওকেও চলে যেতে হবে। সেটা এমন এক সুদূর দেশ, যেখান থেকে কখনও কেউ ফেরে না। কোনও সন্দেহ নেই, স্বর্ণা, কাশেম বা ওর বাবার হাতে বড় অঙ্কের চেক তুলে দেবেন মাসুদ ভাই। তাঁরা যখন জানতে চাইবেন: কী কাজে এত টাকা পেল আমার ছেলে বা মেয়ে? স্যর

কি তাঁদেরকে বোঝাতে পারবেন? নইলে ন্যায়-নিষ্ঠাবান মানুষগুলো ভাববেন তাঁদের সন্তান বেআইনী কোনও পথে টাকা করেছে। সেক্ষেত্রে চেক ছুঁড়ে ফেলে দেবেন তাঁরা। যতদিন বাঁচবেন ভীষণ কষ্ট পাবেন, কিন্তু বিপথে চলে যাওয়া সন্তানের নাম কখনও আর মুখেও নেবেন না।

প্রথমে কাশেমের ঘাড়ের উপর সামান্য আলো নড়তে দেখল নিশাত, আনমনে ওদিকে চেয়ে আছে, কয়েক মুহূর্ত পর টের পেল আসলে ওটা বড় অস্বাভাবিক। আরও পাঁচ সেকেণ্ড পর বুঝল কে যেন আলো দিয়ে মোর্স কোড পাঠিয়ে চলেছে!

বধ্যভূমির দিকে হাঁটতে হাঁটতে অন্য দিকে চাইল না নিশাত। গর্বে ভরে গেছে বুক। না, ওদেরকে পরিত্যাগ করেনি সঙ্গীরা। ওদেরকে বাঁচাতে নিজ জীবনের একবিন্দু তোয়াক্কা করেননি স্যর, নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন! এখন একটা লেসার ব্যবহার করছেন। সম্ভবত অস্ত্রের সাইট ব্যবহার করে সংকেত দিয়ে চলেছেন। কাশেমের ঘাড়ের সংকেত পড়তে শুরু করল নিশাত।

'আরপিজি। মাঝের তক্তার ঠিক সামনে ছুরি। বাঁধন খুলুন।'

তার মানে, ওদেরকে কাভার দেয়ার জন্য রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড দিয়ে হামলা করবেন মাসুদ স্যর। যে তক্তার সঙ্গে ওদের দাঁড় করিয়ে গুলি চলবে, তার মাঝের কাঠের কাছে একটা ছোরা আছে। একবার স্বর্ণা ও কাশেমকে দেখে নিল নিশাত। ওর দু'পাশে হাঁটছে ওরা। তার মানে, মাঝ তক্তার সঙ্গে ওকেই বাঁধবে গার্ডরা। পাকা বুদ্ধি স্যরের, ভাবল নিশাত। আর একটু সামনে বাড়লে ওদেরকে ঘুরিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে গার্ডরা, তখন যদি আক্রমণ আসে, গার্ডদের সঙ্গীরা ওদের দিকে গুলি করবে সে সম্ভাবনা খুবই কম।

সৈনিকদের আলাপ ছাপিয়ে বাংলায় বলল নিশাত, 'স্যর

এখন এরিয়ার ভেতর।' আর কিছু বলবার প্রয়োজন থাকল না। ওরা বুঝে গেল মাসুদ ভাই আক্রমণ শুরু করলেই পরিবর্তিত পরিস্থিতি বুঝে সে অনুযায়ী কাজে নামতে হবে। স্বর্ণা ও কাশেম মৃদু মাথা দোলাল।

'একেবারে ঠিক সময়ে এসেছেন মাসুদ ভাই,' মন্তব্য করল কাশেম। পিছন থেকে ওর মাথার তালুতে জোরসে চাঁটি মারল এক গার্ড।

সমাবেশের সামনে দিয়ে নিয়ে চলেছে ওদেরকে। থুতু ছুঁড়ল কেউ কেউ। দু'জন পা বাড়িয়ে ল্যাং মারতে চাইল। নিশাত, স্বর্ণা ও কাশেম যেন কিছুই দেখছে না। সমাবেশের পিছন থেকে কুকুরের ডাক শোনা গেল। হেসে উঠল বেশির ভাগ সৈনিক। মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করল নিশাত, যে করে হোক হাতে পেতে হবে ওই ছুরি। ভাবতে শুরু করেছে কীভাবে পাল্টা হামলা করবে। প্রথমেই স্বর্ণার কবজি থেকে কেটে দিতে হবে প্লাস্টিকের টাই।

তক্তাগুলোর কাছে চলে গেছে ওরা। সৈনিকদের গুঞ্জন বাড়তে লাগল। কাঠের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তিন প্রহরী, হাতে পাটের কর্কশ দড়ি। আরও কাছে যেতেই সামনের এক প্রহরী হঠাৎ বালির উপর চোখ ফেলে চমকে গেল। দারুণ ছুরি তো! অন্য কেউ বুঝবার আগেই উবু হলো সে, খপ্ করে বাক নাইফ তুলে নিয়ে ভরে রাখল প্যান্টের পকেটে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দিদের দেখল। আরেকবার চমকে গেছে, খুনির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়েছে বিশালদেহী মেয়েটা।

'তুমি তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করলে,' ভাবল নিশাত। বিদ্যুদ্বেগে পাল্টে নিতে শুরু করেছে পরিকল্পনা।

কেউ চেয়ে নেই ছাতের দিকে, সবার চোখ বন্দিদের উপর। পিলারের পাশ থেকে উঁকি দিল রানা, এক হাতে শক্ত করে ধরেছে আরপিজি-৭-এর পিস্তল গ্রিপ, অস্ত্রটা মুহূর্তে কাঁধে তুলে ফায়ার করবে।

হৈ-হৈ করছে সৈনিকরা, তাদের ভিড়ের ভিতর দিয়ে চলেছে গার্ডদের কমাণ্ড্যান্ট, অনেকে তাকে সকালের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, কেউ কেউ স্যালিউটও দিচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে সবাই আনন্দিত। আচমকা তাদের জন্য মজার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন স্যর। বন্দিদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা, দুই হাত তুলল উপরে, বারকয়েক ঘনঘন বাহু ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিল এবার চুপ করতে হবে।

লোকটাকে নিজ হাতে শেষ করতে পারলে খুশি হতো রানা, কিন্তু যুদ্ধ শুরু হলে কী ঘটবে নিশ্চিত হওয়া অসম্ভব।

গার্ডদের ক্যাপ্টেন যিম্বাবুইয়ের স্থানীয় কোনও ভাষায় বক্তৃতা দিতে শুরু করেছে। প্যারেড গ্রাউণ্ডের চারপাশে চৌকো দালান, বাইরের দিকে সুউচ্চ প্রাচীর, গমগম করে উঠল চিকন লোকটার কণ্ঠ। মনোযোগ দিয়ে শুনছে সৈনিকরা, হঠাৎ হৈ-হৈ করে উঠল তারা। বাড়তি কোনও ফুর্তির ব্যবস্থা করেছে ক্যাপ্টেন।

লোকটা কী বলেছে বুঝল না রানা। ধারণা করল, বোম-বোম সব কথা বলে চলেছেঃ আমাদের সরকারপ্রধান দীর্ঘজীবী হোন... তোমাদের কী মনে হয় না আমিই তোমাদের জীবনে সবচেয়ে সেরা অফিসার... ইত্যাদি।

টানা দশ মিনিট বক্তৃতা দিল কমাণ্ড্যান্ট, এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে তিন বন্দিকে দেখাল। এবার তক্তার সঙ্গে বেঁধে ফেলা হবে বেচারাদের।

পাথরের পিলারের পিছন থেকে বেরিয়ে এল রানা, কাঁধে তুলে ফেলল আরপিজি। রকেট লঞ্চারের সাদামাঠা সাইট তাক

করেছে কারাগারের এক দরজার উপর। আস্তে করে স্পর্শ করল ট্রিগার। তপ্ত হাওয়া লাগল হাতের পিছন দিকে, তার আগেই দুপ্ আওয়াজ তুলে টিউব থেকে বেরিয়েছে রকেট। প্রায় একই সময়ে লঞ্চার হাতে ছুটতে শুরু করেছে রানা। একটু দূরে আরেক পিলারের পাশে পরের প্রজেক্টাইল।

পিছনে সাদা ঘন বাষ্প তুলে ছুটছে রকেট, মুহূর্তে উঠান পেরিয়ে লক্ষ্যে গিয়ে লাগল পাঁচ পাউণ্ডের গ্রেনেড। বিস্ফোরিত হলো কয়েদীদের ব্যারাকের দরজা। ভেঙে পড়েছে লিনটেল, হুড়মুড় করে নীচে পড়ল উপরের দেয়াল। পাথর ও সিমেন্টের আবর্জনা বুজে দিল ফোকরটা।

রকেট মোটরের হুউইস্ আওয়াজ শুনেই কাজে নেমে পড়েছে নিশাত, ঘুরেই প্রচণ্ড লাথি দিল পিছনের প্রহরীর বুকে। দড়ি হাতে একেবারে অপ্রস্তুত ছিল্ লোকটা, ছয় ফুট উড়ে প্রাচীরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ল সে। যে গার্ড বাক নাইফ নিয়েছে একলাফে তার সামনে পৌঁছে গেল নিশাত, লোকটাকে ল্যাং মারল ডান পা বাড়িয়ে, নিজে তখনও সামনে বাড়ছে। ওর চেয়ে তিন ইঞ্চি উঁচু লোকটা, কিন্তু নিশাতের আছে চমকে দেয়ার সুবিধা। ল্যাং খেয়ে হুড়মুড় করে পড়ল গার্ড।

রকেটও বিস্ফোরিত হলো, একইসঙ্গে আছড়ে পড়ল দু'জন। নিশাতের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, কিন্তু পড়বার সময় পড়েছে গার্ডের গলার উপর থুতনি দিয়ে। থ্যাচ্ আওয়াজ তুলে ছেঁচে গেছে ল্যারিঙ্কস্। শ্বাস আটকে যেতেই বাতাস নিতে চাইল গার্ড, দুই সেকেণ্ড পর দাপাতে শুরু করল নিশাতের নীচে। খামচে ধরেছে নিজের গলা, যেন দু' হাতে আবারও স্বাভাবিক করবে শ্বাস-প্রশ্বাস।

এক গড়ান দিয়ে উপর থেকে নেমে এল নিশাত, হাতড়াতে

গিয়ে বুঝল লোকটার প্যান্টের পকেটে আঙুল ভরতে পারছে না। বালির উপর দাপিয়ে চলেছে গার্ড। তার ফেটিগের উপর ফুটে উঠেছে বাক নাইফের আকৃতি। ওটার উপর পুরো মনোযোগ দিল নিশাত, পাঁচ সেকেণ্ড পর হ্যাঁচকা টানে ছুটিয়ে আনল, সঙ্গে এল প্যান্টের ছেঁড়া কাপড়।

এক সেকেণ্ড পর চৌকো আকাশে রওনা হলো দ্বিতীয় রকেট। ওটার দিকে খেয়াল দিল না নিশাত, বুঝতে পেরেছে দালানের দরজাগুলো একে একে বিধ্বস্ত করতে চাইছেন স্যর। ছুরি খুলবার জন্য মনোনিবেশ করল। এদিকে সবই বুঝেছে স্বর্ণা, মাত্র এক ফুট দূরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ওর দিকে ছেঁচড়ে গেল নিশাত, সঙ্গিনীর পিঠে পিঠ ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। ছুরির ফলা খুলে যেতেই স্বর্ণার প্লাস্টিকের টাই কাটতে শুরু করল ও।

'উহ্!' বলে উঠল স্বর্ণা। ওর কবজির উপর কামড় বসিয়েছে তীক্ষ্ণধার ফলা। কয়েক সেকেণ্ড পর কাটা পড়ল প্লাস্টিকের টাই, ছুরিটা নিয়ে নিল স্বর্ণা, উঠে বসেই ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ করে কেটে দিল নিশাতের কবজির টাই। ক্রল করে রওনা হয়ে গেল কাশেমের দিকে। এদিকে দু' হাত মুক্ত হতেই উঠে দাঁড়িয়েছে নিশাত, দ্বিধান্বিত এক সৈনিকের হাত থেকে ছোবল দিয়ে কেড়ে নিল একে-৪৭। দড়াম করে ওটার কুঁদো নামল লোকটার মাথার উপর। ক্যারেন কুম্বসকে দয়া করেছিল নিশাত, এখন মেরেছে গায়ের জোরে। ধুলোর উপর লুটিয়ে পড়বার আগেই মারা পড়ল সৈনিক।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়িয়েছে নিশাত, একটু দূরে কাশেমের টাই কাটতে ব্যস্ত স্বর্ণা, ওর দিকে রাইফেল তাক করেছে এক সৈনিক— নিশাতের দুটো গুলি বুকে নিয়ে সঙ্গীদের উপর ছিটকে পড়ল লোকটা। রাইফেলের আওয়াজ শুনল না কেউ। ছাতের র‍্যামপার্টের উপর গুলি ছুঁড়ছে অনেকে। কমপক্ষে বিশজন

সৈনিক পিলার ও রেলিং থেকে পাথরের কুচি ও ধুলো তুলছে। ঝরঝর করে নীচে এসে পড়ছে সব।

কাশেম ও স্বর্ণার দিকে ঝেড়ে দৌড় দিল নিশাত। তারই ফাঁকে ওদের কাভার করছে। কয়েক মুহূর্ত পর উঠানে একটা ট্রাকের নীচে আড়াল নিল ওরা।

পুব ও পশ্চিমে রেলিঙের উপর গুলি করছে সৈনিকরা, উবু হয়ে কারাগার এক চক্কর ঘুরে এল রানা। এরই ভিতর টিউবে ভরেছে আরেকটা শেল। দ্বিতীয় যে দরজার উপর হামলা করেছে, তার ঠিক উল্টো দিকে এসে থেমেছে। ওর কৌশল এখনও ধরতে পারেনি গার্ডরা, যদি সফল হয়, প্যারেড গ্রাউণ্ডে আটকা পড়বে লোকগুলো। হয়তো চালাক কোনও অফিসার ধরে ফেলবে এই কৌশল, সেক্ষেত্রে নিজ লোকদের বলবে দালানের ভিতর ঢুকতে। তাদের প্রথম কাজ হবে ম্যাথিউস জাস্টাসকে খুন করা। রানার প্ল্যান: সৈনিকদেরকে বাইরের উঠানে ব্যস্ত রাখবে, সেই সুযোগে গ্রেনেড দিয়ে বুজে দেবে দরজাগুলো।

দুই পিলারের মাঝে উদয় হলো রানা, লক্ষ্যস্থির করেই ট্রিগার টিপে দিল। ছিটকে পিছিয়ে এল, নীচ থেকে আসতে শুরু করেছে অজস্র গুলি। আরপিজির সাদা বাষ্পের লেজ বলে দিয়েছে ও আছে এদিকে। চারপাশে উড়ছে সিমেন্ট, পাথর ও চেপ্টে যাওয়া বুলেটের টুকরো। তৃতীয় রকেট ঠিক ভাবে জ্বলেনি, লক্ষ্যে না গিয়ে আকাশের দিকে ছুটল ওটা। গুলির তোড়ে আরও পিছিয়ে এল রানা, তারপর ক্রল করে পৌঁছে গেল তিরিশ ফুট দূরে। ওখানে অপেক্ষা করল, কিছুক্ষণ পর গুলিবর্ষণ কমে যাওয়ায় আবারও গেল রেলিঙের সামনে— কিনারার উপর তুলে দিল এমপি-৫, আন্দাজে খালি করল অর্ধেক ম্যাগাযিন। নিজ লোকের গায়ে লাগতে পারে বলে দ্বিতীয় তলার দেয়ালে

গুলি করেছে।

জবাবে এল বিশগুণ গুলি, পাথরের দেয়াল খামচে তুলছে। পাত্তা দিল না রানা, ওর মাথার দুই ইঞ্চি উপর দিয়ে সাঁই সাঁই আওয়াজ তুলে ছুটছে গুলি। নিষ্কম্প হাতে আরপিজি রিলোড করল ও, ক্রল করে আবারও দূরে সরল। এখন রেলিঙে এমন এক জায়গায় এসে থেমেছে, খুব খেয়াল না করলে তৃতীয় দরজা উড়িয়ে দেয়া যাবে না। ওর কাছ থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরের রেলিঙে এসে লাগছে গুলি।

এই পঞ্চাশ ফুট দূরত্ব বড়জোর এক সেকেণ্ড বাড়তি সময় দেবে, তারপর ওকে দেখে ফেলবে সৈনিকরা। নতুন একটা স্ট্র্যাটেজি মনে ধরেছে, উঠানের দিকের রেলিং থেকে সরল রানা, ক' ফুট গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। এখান থেকে নীচের সৈনিকদের দেখতে পাবে না। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, তারাও দেখবে না ওকে। আবার কয়েক ইঞ্চি সামনে বাড়ল। কারাগারের সামান্য অংশ চোখে পড়ছে। আরও কয়েক ইঞ্চি এগুনোর পর থেমে গেল। ওই যে দেখা যায়! দূরের ওই দরজার উপর রোমানিয়ান আর্চ। ওটার কাছে কোনও সৈনিক নেই।

কাঁধে আরপিজি তুলে নিল রানা, খুব সাবধানে তাক করে স্পর্শ করল ট্রিগার। ওর জানা নেই গার্ডদের এক সার্জেন্ট ধরে ফেলেছে এই রণ-কৌশল। চারজন লোক নিয়ে দরজার কাছে পৌঁছে গেছে সে। তখনই উঠানের আকাশে দেখা দিল রকেট। দরজার আর্চওয়ের নীচে চলে গেছে সৈনিকরা, এমন সময় দেয়ালে লেগে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। প্যারেড গ্রাউণ্ডের চারপাশে ছিটকে গেল ভাঙা পাথর ও সিমেন্টের টুকরো। মুহূর্তে মারা পড়ল সার্জেন্ট ও তার চার সৈনিক। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড ধাক্কা গুঁড়ো করে দিল ওদের হাড়গোড়। বিধ্বস্ত আর্চের নীচে চাপা পড়ল পাঁচটা দেহ।

রানা কয়েক পা সামনে বেড়ে দেখল দরজার জায়গায় বড় বড় পাথরের স্তূপ। কিন্তু এক পাশে তৈরি হয়েছে একটা ফোকর, ভিতরে ঘরের অন্ধকার একাংশ। কেউ চাইলে হামাগুড়ি দিয়ে ওদিকে যেতে পারবে। এক লোককে দেখল রানা, ওই ফোকরের দিকে ছুট দিয়েছে সে। দ্রুত সুইচ টিপে মেশিন পিস্তলের লেসার চালু করল ও, লোকটার দুই কাঁধের মাঝে আলোর বিন্দু স্থির হতেই একহাতে গুলি ছুঁড়ল। পুরো অটোতে রাখা অস্ত্রটা। এখন পাঁচটা গুলি ফস্কে গেলেও কিছু যায় আসে না, আসল কথা লোকটাকে ঠেকানো। অবশ্য রানার প্রথম গুলিই লাগল ঠিক জায়গায়। পাথরের স্তূপের উপর আছড়ে পড়ল লোকটা, আর নড়ল না।

পঞ্চমবারের মত রকেট লঞ্চার রিলোড করল রানা, এক দৌড়ে পৌঁছে গেল নতুন এক পজিশনে। এখান থেকে ভাল ভাবেই দেখা যায় দরজাটা। কয়েক মুহূর্ত আগে রানা যেখানে ছিল, সেদিকে এসে লাগছে অসংখ্য গুলি। নিজেদের লোক মরতে দেখে খেপে উঠেছে সৈনিকরা। ইঞ্চি ইঞ্চি করে আবারও সামনে বাড়ল রানা, দরজা যেখানে ছিল তার একটু উপরে তাক করল। ট্রিগার টিপে দিতেই রওনা হলো রকেট। বুঝতে পেরেছে এবার ঠিক জায়গায় লাগবে, দ্রুত পিছিয়ে এল ও। রাশানদের প্রাচীন অস্ত্র আবারও লোড করল। মাথার উপর দিয়ে ছুটছে প্রচুর গুলি, সেই শিস ছাপিয়ে উঠল ধস নামবার আওয়াজ। একটু পর সাবধানে রেলিঙের উপর চোখ তুলল রানা, দরজা এখন আর নেই, সে জায়গায় পাহাড়ের মত উঁচু পাথরের স্তূপ। বাতাসে ভাসছে বালির ঘন মেঘ।

এখন চাইলেও কারাগারের ভিতর ঢুকতে পারবে না সৈনিকরা। এবার আমাহ্লের লোকদের সুবিধা করে দিতে হবে।

উঠানের মাঝে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে চলেছে কমাণ্ডিং অফিসার, মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছে। অ্যাম্বুশে পড়ে ভড়কে গেছে সৈনিকরা, জানে না বধ্যভূমির মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। মাত্র একজন, এক সার্জেন্ট বুঝেছে প্যারেড গ্রাউণ্ডে ওদেরকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে উপরের লোকটা। যে-কোনও সময়ে গুলি শুরু করবে লোকটা। সেক্ষেত্রে ভেড়ার পালের মত অসহায় হয়ে মরবে সবাই।

তার কথায় চার সৈনিককে বাছাই করল ক্যাপ্টেন। আকারে এরা অপেক্ষাকৃত ছোট, সহজে দরজার ফোকর দিয়ে ঢুকতে পারবে। তাদেরকে বলে দেয়া হলো: *কারাগারে ঢুকে সময় নষ্ট করবে না, দেরি না করে হত্যা করবে ম্যাথিউস জাস্টাসকে।* এদিকে বাইরের সবাই শেষ করবে ছাতের লোকটাকে। গর্জে উঠছে অসংখ্য রাইফেল, বুঝবার উপায় নেই পেরিমিটার অ্যালার্ম ট্রিপ করা হয়েছে কি না। আরেক দলকে পাঠাল সে প্রধান ফটক খুলতে। বলে দিল যেন সতর্ক থাকে, বাইরে থাকতে পারে শত্রুদল।

কোথা থেকে লোহার দীর্ঘ পাইপ এনেছে এক অফিসার, হালকা-পাতলা এক লোককে ইশারা করছে। সে ছাতে উঠবে। ওদিকে চেয়ে অধীনস্থের উপর সন্তুষ্ট হলো ক্যাপ্টেন। দুটো পিলারের মাঝে পাইপ রেখেছে লোকটা। কাঁধে একে-৪৭ ঝুলিয়ে নিল সৈনিক, পা থেকে খুলে ফেলেছে জুতো, জং-ধরা পাইপ বেয়ে বাঁদরের মত উঠতে লাগল।

নিশাত সুলতানা অনেক পরে দেখেছে লোকটা পাইপের উপর, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। রাইফেলের মাযল তাক করতে না করতেই রেলিঙে উঠল সে, তারপর একলাফে নেমে গেল ওদিকে। ট্রাকের নীচ থেকে বেশি দূর দেখছে না নিশাত, দ্রুত

চিত হয়ে চোখ রাখল উপরে। আন্দাজে তাক করেছে অ্যাসল্ট রাইফেলের মাযল। এবার টিপে দেবে ট্রিগার, কিন্তু হঠাৎ দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে গেল লোকটার মাথা। নিজের উপর রেগে গেল নিশাত, হতাশ হয়ে ট্রিগার থেকে সরিয়ে নিল আঙুল। খামোকা গুলি করে নিজেদের অবস্থান জানিয়ে দেয়ার কোনও মানে হয় না। ওই বিপদটা মোকাবিলা করতে হবে স্যরকেই। ট্রাকের নীচে সরে ছায়ার ভিতর থামল ও। ওর কাঁধে হাত রাখল স্বর্ণা, নীরবে যেন বুঝিয়ে দিল: আপা, আপনার কিছু করবার ছিল না।

কিন্তু কোনও সান্ত্বনা পেল না নিশাত।

আরপিজির উপর ঝুঁকে পড়েছে রানা, লোড করছে ষষ্ঠ রাউণ্ড। বেশি কিছু আর করতে হবে না ওকে, শুধু উড়িয়ে দেবে প্রধান ফটক, আর তা হলেই হুড়মুড় করে কারাগারের ভিতর ঢুকবে আমাহ্লের সৈনিক। গোলাগুলি শুরু হলে ম্যাথিউস জাস্টাস ও আসিফ হায়দার চৌধুরিকে খুঁজে নেবে ও, তাদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে বন্দিশালা থেকে। ক্লিক শব্দে ঠিক জায়গায় রাউণ্ড বসে যেতেই উঠে দাঁড়াল রানা।

দিগন্তে ঝুলছে সোনালী ফুটবলের মত সূর্য, সব ধরনের ছায়া এখনও অনেক দীর্ঘ, চট্ করে বোঝা যায় না ওগুলো কীসের। কিন্তু একটু আগে রানার পাশে ওখানে কোনও ছায়া ছিল না। চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল ও, বিস্ফারিত হলো দুই চোখ। উঠানের দিকে পিঠ দিয়ে রেলিঙের সামনে দাঁড়িয়েছে লোকটা, হাতের একে-৪৭-এর মাযল থেকে দপদপে আলো এল।

তার আগেই বামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রানা, কাঠের ছাতে পড়েই গড়িয়ে দিয়েছে শরীর। খটাস্ করে লেগেছে কাঁধের হাড়ে, মুখ কুঁচকে ফেলল রানা। কিন্তু লোকটা আবারও তাক

করবার আগেই কোমরের কাছ থেকে তুলে নিল আরপিজি লঞ্চার। সাইটের দিকে চাওয়ারও সময় পেল না, তার আগেই টিপে দিল ট্রিগার।

লেজে বিষাক্ত গ্যাসের মেঘ নিয়ে রওনা হলো রকেট। গার্ডের শরীর এত শক্ত নয় যে গ্রেনেড বিস্ফোরিত হবে, ওটা গিয়ে লেগেছে লোকটার বুকে। পাঁচ পাউণ্ডের প্রজেক্টাইল ছুটছে প্রচণ্ড কাইনেটিক এনার্জি নিয়ে, প্রতি সেকেণ্ডে পেরুবার কথা এক হাজার ফুট, কাজেই বারোটা বাজিয়ে দিল সৈনিকের বুকের। পাঁজরগুলো মটমট করে ভেঙে সেঁটে গেল মেরুদণ্ডের সঙ্গে। ছাত থেকে ছেঁড়া পুতুলের মত আকাশে উঠল সৈনিক, ছিটকে গেল উড়ন্ত কবুতরের মত। প্রাচীরের তিরিশ ফুট দূর থেকে এসেছিল সে, আবারও গিয়ে নামল সঙ্গীদের মাঝে। কিন্তু অনেক উপর থেকে নীচে পড়েছে, বিকট আওয়াজে ফাটল গ্রেনেড। বিস্ফোরণের ফলে চারপাশের লোকগুলো ছিন্নভিন্ন হলো। বালির ভিতর বড় একটা গর্ত তৈরি করেছে গ্রেনেড, সেই গহ্বরের নীচ থেকে চুইয়ে উঠছে ধোঁয়া। চারপাশে পড়ে রইল মৃত এবং আহতরা।

এখন মাত্র একটা আরপিজির শেল অবশিষ্ট আছে রানার কাছে। ওটা যদি ফায়ার না করে, সবই শেষ হবে পাঁচ মিনিটের ভিতর, ওরা একজনও বাঁচবে না। দ্রুত হাতে লঞ্চারে শেল ভরল ও, ফটকের উপর লক্ষ্যস্থির করতে এগিয়ে গেল। কারাগারে ঢুকতে-বেরুতে হলে বিশাল ওই দরজা খুলতে হবে। ট্রিগার টিপে দিল রানা, আবছা ভাবে দেখল ওদিকে জটলা করছে বেশ ক'জন সৈনিক।

ঠিকভাবে উড়ে গিয়ে গেটের মাঝে লাগল রকেট, কিন্তু ডেটোনেট হলো না প্রজেক্টাইল। কাঠে গেঁথে ঝুলতে লাগল। ওটা আসতে দেখে বালির মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে

সৈনিকরা, বিস্ফোরণ হলো না দেখে এবার মাথা তুলল তারা। একে একে উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে। খুশিতে হাসছে, আরেকটু হলে মারা পড়ত!

নীচে কী ঘটেছে ভাল করেই দেখেছে রানা। কোমরের পাশ থেকে মেশিন পিস্তল নিল ও, কাঠে গেঁথে থাকা রকেটের উপর লেসার সাইট স্থির হতেই গুলি শুরু করল। নাইন এমএম রাউণ্ডগুলো খুবলে তুলছে কাঠের ফটকের বুক। ম্যাগাযিন ফুরিয়ে এসেছে এমন সময় বুলেট লাগল প্রজেক্টাইলে। বিকট আওয়াজে বিস্ফোরণ হলো, মুহূর্ত আগে হাস্যরত সৈনিকরা হৈ-হৈ করছিল, পরক্ষণে তাদের নিয়ে উড়ে গেল গোটা দরজার বেশিরভাগ তক্তা।

পেরিমিটার অ্যালার্মের সেন্সার থেকে একটু দূরে অপেক্ষা করছে চারটে ট্রাক! ওগুলোতে করে এসেছে আফ্রিকার সবচেয়ে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধে কঠিন ইস্পাত হওয়া একদল যোদ্ধা। নিজ জান দিতে দ্বিধা নেই তাদের, এখানে এসেছে মস্ত মনের এক নেতাকে মুক্ত করতে। ওরা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে, ওদের প্রিয় দেশকে রক্ষা করতে হলে লাগবে ওই মানুষটাকে।

পাঁচ

'মাসুদ ভাই, সাড়া দিন! আপনি কোথায়?'

আটচল্লিশ ঘণ্টা প্রায় নির্ঘুম কাটিয়েছে রানা, বিশেষ করে গত বারো ঘণ্টা ছিল নরকের মত, সে-কারণে ভুলে গেছে সঙ্গে

রয়েছে ট্যাকটিকাল রেডিয়ো; হঠাৎ ওর মনে হলো কানে ভুল-ভাল শুনছে। আপনমনে ভাবল, শেষে পাগলই হয়ে যাচ্ছি? পরক্ষণে মনে পড়ল: আরে, ওটা তো জলিলের কণ্ঠ!

'হ্যাঁ, জলিল,' রেডিয়োতে সাড়া দিল রানা। 'বলো।'

'হঠাৎ করে দেখলাম বিস্ফোরিত হয়েছে কারাগারের গেট। পিল পিল করে ঢুকছে আমাদের পক্ষের সৈনিকরা।'

'হ্যাঁ। তোমার পজিশন কী?'

'আমরা পাঁচ হাজার ফুটে, তিন মাইল দূরে। ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসানের চোখ বাজ পাখির মত, উনিই বিস্ফোরণটা দেখেছেন। আপনারা কি তৈরি? আমরা কি ল্যাণ্ড করব?'

'না, ভুলেও নামবে না,' জবাবে বলল রানা। 'এখনও বিজ্ঞানী বা মিস্টার জাস্টাসকে পাইনি। আগে নিশ্চিত হতে হবে এদের কোণঠাসা করছে আমাহ্লের লোক, নইলে বিমান নামলেই হামলা হবে।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই, আমরা চক্কর কাটতে থাকি,' বলল জলিল।

এমপি-৫-এর রিসিভারে নতুন ম্যাগাযিন ভরল রানা, বোল্ট টানতেই চেম্বারে ঢুকল নাইন এমএম রাউণ্ড। কেউ ছাতে উঠবার আগেই ঝেড়ে দৌড় দিল ও, কয়েক মুহূর্ত পর পৌঁছে গেল প্যারাশুটের পাশে। কারাগারের বাইরের দেয়াল থেকে পতপত করে উড়ছে কালো সিল্কের মত নাইলন কাপড়। আগেই আইবোল্টের সঙ্গে বেঁধে রেখে গেছে এক কোনা।

নীচের উঠানে শুরু হয়েছে লড়াই, শুনে মনে হলো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে দুই দল যিম্বাবুইয়ান, কমে গেল গুলির শব্দ, বদলে হাতাহাতির ধুপধাপ-খটাস্ আওয়াজ শুরু হয়েছে। একে অপরের মাথা বা বুকের উপর নামিয়ে আনছে রাইফেলের বাঁট।

দুই হাতে শক্ত করে প্যারাশুটের কাপড় ধরেছে রানা, ছাতের কিনারা থেকে নেমে পড়ল। তিনতলার উপর থেকে ঝুলছে, নীচে মরুভূমির শুষ্ক বালি। সিল্কের মত পিছলা নাইলন বেয়ে সাবধানে নামছে, কাপড়ের শেষপ্রান্তে পৌঁছে টের পেল এখনও তিন ফুট নীচে দোতলার জানালা। পাঁচ সেকেণ্ড বিশ্রাম নিয়ে দেয়ালে স্থির ভাবে রাখল দুই বুট, বুকের কাছে ভাঁজ করে ফেলেছে দুই হাঁটু, এবার গায়ের জোরে পিছিয়ে যেতে চাইল।

কারাগারের দেয়াল থেকে দশ ফুট দূরে ছিটকে গেল ও, তারপর ওকে ধরে বসল মাধ্যাকর্ষণ, ভারী পেণ্ডুলামের মত দেয়ালের দিকে ফিরছে। পাথুরে দেয়ালে আছড়ে পড়তেই বুঝল আরেকটু হলে ফেটে যেত দুই হাঁটুর বাটি। চোখে অন্ধকার দেখছে। কিছুক্ষণ পর বুঝল, দোতলায় নামতে পারবে, কিন্তু একদম সঠিক হতে হবে ওর সময় ও লক্ষ্য।

দুই পায়ের জোরালো লাথি দেয়াল থেকে ছিটকে পিছিয়ে দিল ওকে, দুই বজ্রমুঠির ভিতর নাইলনের কাপড়। শেষ-মাথায় পৌঁছে আবার ছুটে এল তীব্র গতিতে। জানালার কালো গহ্বর ছাড়া কিছুই দেখছে না। ওদিক দিয়ে ঢুকতে হবে কারাগারে। দুলুনির মাঝে পৌঁছে বুকে তুলে ফেলল ভাঁজ করা দুই হাঁটু। ক্রমশ বাড়ছে গতি, নেমে চলেছে কোনাকুনিভাবে। দু' সেকেণ্ড পর ছেড়ে দিল কাপড়। রানা যেন ঘুরন্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা কোনও পাথর, হঠাৎ ছুটে গেছে। জানালার দিকে তাক করেছে দুই পা।

চড়ুই পাখির মত জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল রানা, মাথার মাত্র এক ইঞ্চি উপরে থাকল চৌকাঠ। পরক্ষণে ধড়াস্ করে মেঝের উপর পড়ল। গড়াতে শুরু করে পাঁচ সেকেণ্ড পর ঠেকে গেল একটা সেলের শিকে। সারাদেহের ব্যথা ভুলে যেতে চাইছে। মাথা উঁচু করে চাইল নীচতলার দিকে। ও নামবার সময় জোরালো আওয়াজ হয়েছে। গুহার মত সেলরুকে এখনও

মিলিয়ে যায়নি প্রতিধ্বনি।

মুখ কুঁচকে উঠে দাঁড়াল রানা, হাতে এমপি-৫ মেশিন পিস্তল। বুঝতে পারছে, বেঁচে থাকলে কয়েক ঘণ্টা পর ওর পিঠে জেব্রার দাগের মত অসংখ্য দাগ পড়বে। একবার চারপাশ দেখে নিল। এখানে নামতে গিয়ে যথেষ্ট আওয়াজ করেছে, গোপনে এগুনোর চেষ্টা এখন হাস্যকর হবে। নিশাত আগেই জলিলকে বলেছে, উপরের সেলব্লকে কেউ নেই। সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নামতে লাগল রানা। একতলায় এসে এক সেকেণ্ড দ্বিধা করল, তারপর দরজা খুলে হলওয়েতে বেরিয়ে দু'পাশের করিডোর দেখে নিল। কপাল ভাল যে জেনারেটার এখনও চলছে, করিডোরে একটু দূরে দূরে একটা করে উলঙ্গ বাতি জ্বলছে। ডানদিকের করিডোর বেছে নিল রানা, বাল্‌ব্ ভাঙতে ভাঙতে এগুতে লাগল। যেমন ছিল সব তেমন রাখবে, কাউকে এ কথা দেয়নি ও। তা ছাড়া, যে-কোনও সময়ে কোনও দরজার ফোকর দিয়ে ঢুকে পড়বে গার্ডরা। তাদেরকে বাড়তি সুবিধা দেয়ার কোনও মানেই হয় না।

সামনে মোড় নিয়েছে করিডোর। বাঁকে থেমে উঁকি দিল রানা। একটু দূরে একটা বড় দরজা। এক পাশে রাখা চেয়ার। নিশাত সুলতানা এই করিডোরের কথাই বলেছিল। ওপাশে ছিল আসিফ হায়দার চৌধুরি। ওদের প্রধান কাজ ছিল বিজ্ঞানীকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু এখন কাঁধে চেপেছে ম্যাথিউস জাস্টাসকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়ার দায়িত্বটাও। দরজা পেরিয়ে হলওয়েতে ঢুকে পড়ল রানা। ধারণা করছে, এদিকে কোথাও লুকিয়েছে বিজ্ঞানীর কিডন্যাপাররা, তাদের জানা নেই এই পরিস্থিতিতে কী করবে।

সারাদিন প্রচণ্ড রোদে তপ্ত হয়ে ওঠে কারাগার, পাথুরে দেয়াল বা ছাতে রয়ে যায় সেই উষ্ণতা। ভোর হতে না হতেই

নতুন করে আবারও পাথরের বুকে তাপ ঝাড়তে শুরু করেছে সূর্য। বদ্ধ প্যাসেজওয়ে বা করিডোরগুলোর ভিতর গুমোট আবহাওয়া। দৌড়াতে শুরু করে ঘামতে লাগল রানা। দীর্ঘ করিডোরের মাঝে পৌঁছে গেছে, এমন সময় দূরে কী যেন নড়তে দেখল। ওদিক থেকে ছুটে আসছে হালকা-পাতলা দু'জন সৈনিক। তাদের অনেক কাছে পরের সেলব্লক। রানা ওখানে পৌঁছবার আগেই গন্তব্যে পৌঁছবে তারা। এদের উপস্থিতি রানাকে বলে দিল ওদিকে আছেন ম্যাথিউস জাস্টাস।

সৈনিকদের দেখেই মেঝের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে রানা, পাথরের মেঝেতে ভীষণ ঘষটে গেল দুই কনুই, তারই ফাঁকে তাক করেছে মেশিন পিস্তল। এক পশলা গুলি ছুটে গেল সৈনিকদের দিকে। দৌড়ের উপর ব্রেক কষল তারা, ঘুরেই এক দৌড়ে ফিরে গেল মোড়ের ওপাশে।

কোনও দরজার আবর্জনা সরিয়ে ভিতরে ঢুকেছে, ভাবল রানা। ও নিজে আছে খোলা প্যাসেজওয়েতে, লোক দু'জনের কাছে রাইফেল। এসব পাত্তা দিল না রানা, ক্রল করে পিছিয়ে এল অপেক্ষাকৃত গাঢ় ছায়ার ভিতর। শরীর গড়িয়ে চলে গেল অন্য পাশের দেয়ালের কাছে। প্যাসেজওয়েতে একটু পর পর উঁকি দিচ্ছে লোকদুটো। জবাবে দুটো করে গুলি পাঠাতে শুরু করল রানা। পোড়া গান পাউডারের কটু গন্ধে ভরে উঠছে হলওয়ে। ওর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে ব্রাসের শেল কেসিং।

ক্রল করে চলে গেল উল্টো দিকের দেয়ালের পাশে। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড পর গুলিবর্ষণ শুরু করল এক সৈনিক, কাভার ফায়ার দিচ্ছে। করিডোর ভরে উঠল তপ্ত পাথরের টুকরো ও চেপ্টে যাওয়া তামার বুলেটে। পাল্টা জবাব দিতে চাইল রানা, কিন্তু লোকটা সত্যি দক্ষ, আড়াল নিয়ে গুলি করছে।

কয়েক মুহূর্ত পর মোড় ঘুরে ছিটকে বেরিয়ে এল তার সঙ্গী,

শুরু হলো একনাগাড়ে গুলি। অন্ধকারে শত্রুকে দেখছে না তারা, কিন্তু যে-কোনও সময়ে একটা বুলেট খতম করে দিতে পারে রানার খেল্। আগের পজিশন থেকে এক দৌড়ে বেরিয়ে এল প্রথম সৈনিক, ছুট লাগিয়েছে সেলব্লকের উদ্দেশে। ওই দরজা বোধহয় লক করা নেই, অথবা গুলি করে উড়িয়ে দিয়েছে তালা, রানা ঠেকাবার আগেই দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল লোকটা।

হয়তো পাঁচ সেকেণ্ডও নেই, তার আগেই খুন হবেন ম্যাথিউস জাস্টাস। নিজের উপর রেগে উঠেছে রানা, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই ছায়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তীরের মত ছুটতে শুরু করেছে। কোমরের কাছ থেকে বুলেট ও আগুন উগরে চলেছে মেশিন পিস্তল। ধোঁয়ার ভিতর যেন কাটাকুটি খেলছে লেসারের রক্তিম রশ্মি। কয়েক সেকেণ্ড পর আলো পড়ল দ্বিতীয় লোকটার বুকে। বুকে-পেটে তিন রাউণ্ড গুলি খেল সে, মেঝে থেকে ছিটকে উঠে গেছে দুই পা, অন্তত পাঁচ ফুট পিছনে গিয়ে পড়ল লাশ।

প্রাণপণে দৌড়ে চলেছে রানা। আড়াল নিয়ে দরজার দিকে যাওয়ার সময় নেই। সেলব্লকের দরজা খোলা। তীরের মত ভিতরে ঢুকল ও। ওখানেই বেমক্কা বাধা পেল। ওপাশে পেট সমান উঁচুতে দরজার দুই ব্র্যাকেটে বসানো পুরু কাঠের দণ্ড। ভীষণ হোঁচট খেয়েছে রানা, আড়াটা ভেঙে পাঁচ ফুট দূরে গিয়ে থামল।

তীব্র ব্যথা সামলে নিতে চাইছে, তারই ফাঁকে দেখল সামনে এক সারিতে কিছু ফুটো। এদিকে শিকের দেয়াল ও দরজা। এসব সেলে কেউ নেই। দ্বিতীয় বা তৃতীয়তলায় থাকতে পারেন ম্যাথিউস জাস্টাস। সেক্ষেত্রে কিছু করবার থাকবে না। ওর চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে সৈনিক। যে-কোনও সময়ে গন্তব্যে

পৌঁছবে। ফোঁসফোঁস দম নিয়ে চলেছে রানা, তারপর ওই শব্দের উপর দিয়ে শুনল গলার আওয়াজ। কণ্ঠ আসছে সেলগুলোর পিছন থেকে। সুরেলা কণ্ঠ, যেন সান্ত্বনা দিয়ে চলেছে— ওই মিষ্টি স্বর কোনও দোষী লোকের হতে পারে না। যেন বেয়াদব-বেয়াড়া ছেলেকে সুন্দর করে বুঝিয়ে চলেছে কোনও স্নেহপরায়ণ পিতা।

এক দৌড়ে করিডোর পেরিয়ে বাঁক নিল রানা। একটা কুঠুরির সামনে থেমেছে সৈনিক। সেলের ভিতর তার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে এক লোক, পরনে কয়েদীদের নোংরা পোশাক। তার বুকের উপর একে-৪৭-এর মাযল তাক করছে সৈনিক। শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ম্যাথিউস জাস্টাস, উরুর পাশে ঝুলছে দুই হাত, মনেই হয় না তিনি জানেন, তাঁকে মেরে ফেলতে এসেছে কেউ। যেন বহু দিন পর ঘনিষ্ঠ কোনও বন্ধুর দেখা পেয়ে আলাপ জুড়েছেন।

মেশিন পিস্তলের স্টিলের বাঁট কাঁধে তুলল রানা, লেসার গিয়ে পড়ল সৈনিকের চকচকে কপালে। দৌড়ে আসবার আওয়াজ শুনে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সে, শত্রু মাত্র তিরিশ ফুট দূরে। ওদিকে অস্ত্র তুলতে শুরু করেছে সৈনিক, তারপর বাধ্য হয়ে থমকে গেল। যে-কোনও সময়ে ট্রিগার টিপে দেবে শত্রু। এবং টিপেও দিল রানা। কিন্তু খালি চেম্বারে খট্ করে পড়ল হ্যামার। ধাতুর উপর ধাতুর টোকার আওয়াজ বেশি জোরালো শোনাল। মেশিন পিস্তলে গুলি নেই!

রাইফেলের ব্যারেল প্রায় তুলে ফেলেছে সৈনিক, কিন্তু এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। রানা, না জাস্টাসকে গুলি করবে সে? তাকে বলা হয়েছে ম্যাথিউস জাস্টাসকে মেরে ফেলতে হবে। আবার ওই লোকটাকে খুন করাও জরুরি। তারপর সিদ্ধান্ত নিল সে: আগে দেশের স্বৈরাচারী শাসকের শত্রুকে শেষ করবে, তারপর

খতম করবে নতুন এই আপদকে। লোকটা এখনও রিলোড করতে পারেনি, সঙ্গে কোনও পিস্তলও নেই।

ম্যাথিউস জাস্টাসের দিকে ঘুরতে শুরু করেছে সৈনিক।

হাত থেকে হেকলার অ্যাণ্ড কচ ছেড়ে দিল রানা, খামচে ধরল বুটের গোড়ালি। খট্ আওয়াজে খুলে গেল সোলের পিছন অংশ, বেরিয়ে এল .৩৮ ক্যালিবারের কেল-টেক অটোমেটিক।

মাত্র এক সেকেণ্ড পর ম্যাথিউস জাস্টাসের বুকে গুলি চালাবে সৈনিক। কেল-টেক ঘুরিয়েই গুলি করল রানা। বিকট বুম্ শব্দে হাতের ভিতর লাফিয়ে উঠল খুদে অস্ত্র, ঝাঁকিয়ে দিয়েছে ওর কবজি। তার আগেই বেরিয়ে গেছে বুলেট। দ্বিতীয়বার গুলি করতে গিয়েও থেমে গেল। সৈনিকের ডান হাতের পেশি ভেদ করে বুকের সব কলকবজা ছিঁড়ে-খুঁড়ে বাম দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। ধপ্ করে মেঝের উপর পড়ল লাশ।

থমকে গিয়ে অচেনা লোকটার দিকে চাইলেন ম্যাথিউস জাস্টাস। মেশিন পিস্তল তুলে নিয়ে নতুন ম্যাগাযিন ভরল রানা, কেল-টেক বুটের সোলের স্লটে রেখে ওদিকে চাইল। জাস্টাসের পরনে বন্দিদের পোশাক, তাতে ছোপ ছোপ রক্ত। দুই হাতে আগুনের ছেঁকা দেয়া হয়েছে। ফুলে উঠেছে দুই চোখ ও মুখ। এক পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর পায়ের দিকে চাইল রানা। ডান পা-টা স্বাভাবিক, কিন্তু অন্যটা ফুলে ফুটবলের মত হয়েছে। আন্দাজ করল, মানুষটার গোড়ালি থেকে শুরু করে পায়ের বুড়ো আঙুল পর্যন্ত সবটা হাড় ভেঙে দিয়েছে।

'মিস্টার জাস্টাস, আমি আপনার সেনাবাহিনীর সঙ্গে এসেছি,' বলল রানা। 'ওই দলের নেতা আমাহ্লে নামের এক লোক। আমরা আপনাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

আস্তে করে মাথা নাড়লেন জাস্টাস। 'ও একটা বোকা।

আমাকে যখন বন্দি করল, তার আগে ওকে বলেছি এ ধরনের পাগলামি যেন না করে। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল কিছুই মানবে না। আমার বন্ধু আমাহ্‌লে নিজের পছন্দ মত নির্দেশই কেবল পালন করে, অন্যগুলোর কথা ভুলে যায়।'

ভদ্রলোককে সেলের দরজার কাছ থেকে সরে যেতে বলল রানা, গুলি করে উড়িয়ে দেবে তালা। এক পায়ে সরে গেলেন জাস্টাস, বাম পা মেঝে স্পর্শ করল না।

'ভাল কোনও ডাক্তার হাড় মেরামত করবে,' বলল রানা। লোহার তালার উপর দুটো গুলি করল, তারপর খুলতে চাইল দরজা। বিশ্রী আওয়াজে খুলে গেল কবাট। সাবধানে সামনে বাড়লেন জাস্টাস। একহাতে তাঁর কাঁধ জড়িয়ে ধরল রানা, তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে এল সেল থেকে।

'আমরা অন্য একটা পথে বেরোব।'

ডেভিলস ওয়েসিস নিয়ে গবেষণা করবার সময় স্বর্ণা ও রায়হান জেনেছে, এক বন্দি পালানোর চেষ্টা করেছিল। সে নীচতলায় ছয় ইঞ্চি সুয়েরেজের গর্ত বড় করে। কারাগারের এক বিশ্বস্ত কয়েদী সেটা বুঝে ফেলে এবং বলে দেয় কর্তৃপক্ষকে। প্রথম কয়েদী চামচ বা এ ধরনের কিছু দিয়ে এক ফুট পাথর ফুটো করে বেরুতে চেয়েছিল। শাস্তি হিসাবে ওই ছোট গর্তের ভিতর তার দেহ ঠেসে দেয়া হয়। দরকার মত ভেঙে নেয়া হয় লোকটার বেয়াড়া হাড়গুলোকে। শেষে পুরো দেহটাই চলে যায় গর্তের ভিতর, বাকি ছিল শুধু মাথা।

এর পর থেকে ওই পথে কেউ বেরুতে চেষ্টা করেনি।

ম্যাথিউস জাস্টাসের হাতে এমপি-৫ ধরিয়ে দিল রানা। কেউ এলে ওকে কাভার দেবেন উনি। কোমর থেকে বেল্ট খুলে ফেলল, বের করে নিল অবশিষ্ট প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। পাশের সেলে ঢুকে গর্তের পাশে বসল। লম্বা করে পাকিয়ে নিয়েছে

প্লাস্টিক, গর্তের চারপাশে টিপে টিপে লাগিয়ে দিল। আগেই বেল্ট থেকে নিয়েছে ডেটোনেটার, প্লাস্টিকের ভিতর গেঁথে দিল এক মিনিটের টাইমার। এই এক মিনিটে জাস্টাসকে নিয়ে সরে যেতে হবে।

বেল্ট হাতে কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এল রানা, জাস্টাসের হাত ধরে এগুতে শুরু করেছে। বিশ ফুট যেতে না যেতেই প্রচণ্ড আওয়াজে ফাটল বোমা। কুঠুরির শিকের ভিতর থেকে ভলকে বেরিয়ে এল কালো ধোঁয়া ও কমলা আগুন। ছাতের দিকে ছুটল অসংখ্য খণ্ড-বিখণ্ড পাথর। বেল্ট পরে নিয়েছে রানা, চলে এল কুঠুরির ভিতর। ওর ধারণা ছিল ওই পরিমাণ বোমা যথেষ্ট হবে। সুয়েরেজ গর্ত এখন পাঁচ ফুট বৃত্তের। বিস্ফোরণের ফলে পুড়ে কালো হয়েছে এবড়োখেবড়ো কোনাগুলো।

গর্তে নেমে পড়ল রানা, নামিয়ে নিল ম্যাথিউস জাস্টাসকে।

'উহ্!' বলে উঠলেন উনি, নামবার সময় মেঝের সঙ্গে ঘষ্টে গেছে আহত পা।

'দুঃখিত, খুব বেশি লাগছে?' জানতে চাইল রানা।

'এই পা বোধহয় কেটেই ফেলতে হবে।'

'ভাববেন না, আমাদের পরিচিত ভাল ডাক্তার আছে।'

সুয়েরেজ সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে বইছে মরুভূমির উষ্ণ হাওয়া, এগুতে শুরু করল দু'জন। খুবই সংকীর্ণ গলি, কোথাও কোথাও ক্রল করে এগুতে হচ্ছে। হাঁটুর নীচে কচকচ করছে বালি। জাস্টাসকে নিয়ে কারাগারের পুব দিকে চলেছে রানা। ওদিকটা এয়ারস্ট্রিপের সবচেয়ে কাছে। ওদের কপাল ভাল পিঠের দিক থেকে আসছে হাওয়া, নইলে মুখে এসে আছড়ে পড়ত কড়কড়ে বালি। পাঁচ মিনিট পর দালানের পেরিমিটারে পৌঁছে গেল ওরা। সুড়ঙ্গের মুখে সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ চোখ ধাঁধিয়ে দিল। আর মাত্র তিন ফুট ক্রল করলে বেরুতে পারবে, কিন্তু ওখানেই থামল

রানা।

'জলিল, রানা বলছি, শুনছ?'

'ফাইভ বাই ফাইভ,, মাসুদ ভাই,' জবাব দিল জলিল। 'আপনি কোথায়?'

'কারাগারের বাইরে, দেয়ালের কাছে। আমার সঙ্গে স্থানীয় এক অতিথি আছেন। এয়ারস্ট্রিপের দিকে চেয়ে আছি। প্রাইমারি টার্গেট সিকিউর করার জন্য পনেরো মিনিট দাও, তারপর এসে তুলে নিয়ো। বিমান নামলেই আমাদের পক্ষের সবাই বুঝবে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিতে হবে।'

'তা বোধহয় হবে না, মাসুদ ভাই। উপর থেকে দেখছি তাদেরকে কোণঠাসা করে ফেলেছে শত্রুদল। আমাদের মিত্ররা পনেরো মিনিট টিকবে না। আপনি বললে এখনই নামতে পারি।'

'তা হলে দশ মিনিট পর এসো।'

'বোধহয় উচিত হবে না, মাসুদ ভাই। ওদের অবস্থা খুবই করুণ। একেবারে সময় পাবে না। যদি পাঁচ মিনিট দেরি করি, আমাহ্লের জীবিত লোকদের এক আঙুলে গুনতে পারব।'

এক মুহূর্ত ভাবল রানা, তারপর বলল, 'এটা সুইসাইডাল মিশন নয়। পিছিয়ে আসার জন্য ওদেরকে কাভার দিতে হবে। ঠিক আছে, নেমে এসো তোমরা।'

'আরও কথা আছে, মাসুদ ভাই,' বলল জলিল। 'সোহেল ভাইয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে, আমাদের গোটা পরিস্থিতি বদলে গেছে।'

ভুরু কুঁচকে ভাবল রানা, সোহেল নতুন কী জেনেছে? গোটা অপারেশনের দৃশ্যপট বদলে গেল কী কারণে?

দূরাকাশে কার্গো বিমান দেখল রানা, তীরের মত আসছে। গম্ভীর হয়ে গেল, বদলাতে হবে ওর পরিকল্পনা। সাহায্য ছাড়া এয়ারস্ট্রিপ পর্যন্ত পৌঁছবেন না জাস্টাস। তাঁকে পিঠে তুলে নিয়ে

যেতে হবে। এত সময় নেই যে ভদ্রলোককে বিমানে রেখে আবারও আসিফ হায়দার চৌধুরির জন্য কারাগারে ঢুকবে। গোটা সময়টা অরক্ষিত থাকবে বিমান। আমাহ্লের লোক পিছাতে শুরু করলেই নতুন উদ্যমে ধাওয়া করবে সৈনিকরা। সেক্ষেত্রে জাস্টাসের লোকদের এয়ারিয়াল কাভার না দিলে মরুভূমিতে কিছুক্ষণের ভিতর মারা পড়বে তারা।

পুরনো ডি হ্যাভিল্যাণ্ড ক্যারিব্যু বড় বিদঘুটে চেহারার বিমান, ওটার রাডার তিনতলা বাড়ির চেয়ে উঁচু, নাকের সামনে ঝুলছে বিচ্ছিরি ভোঁতা ককপিট। ধপধপে সাদা রঙের, ফিউজেলাজের উপর লম্বা নীল রেখা। উঁচু ডানার কারণে, ছোট আকৃতির তুলনায় অনেক বেশি ওজন বহন করে। অল্প জায়গা ছুটেই উঠে যায় আকাশে, নামতেও লাগে কম জায়গা। ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসান সঠিক বিমানই ভাড়া নিয়েছে।

নাক ঠিক করে নিয়েছে ক্যারিব্যু, রানওয়ের দিকে আসছে। এবার তৈরি হয়ে নিতে হবে। 'আসুন,' জাস্টাসকে বলল রানা। কারাগারের নীচ থেকে বেরুবে। দুর্গের পাথুরে পুরু দেয়াল অনেকটা চাপা দিয়েছে গোলাগুলির আওয়াজকে। তারপরও মনে হলো ওদিকে কমপক্ষে এক শ' লোক গোলাগুলি করছে।

সুড়ঙ্গের ভিতর উঠে দাঁড়িয়েছে রানা ও ম্যাথিউস জাস্টাস। মেশিন পিস্তল বাম হাতে নিল রানা, ঝুঁকে পড়ল আফ্রিকান নেতাকে কাঁধে তুলে নিতে। উনি যথেষ্ট দীর্ঘকায়, কিন্তু বছরের পর বছর কারাগারে তাঁকে অনাহারে-অর্ধাহারে রাখা হয়েছে, চামড়া ও হাড় ছাড়া শরীরে তেমন কিছুই নেই। ওজন হবে বড়জোর এক শ' বিশ পাউণ্ড। স্বাভাবিক অবস্থায় এই ওজন খুব সহজে বহন করত রানা, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম করে এখন ফুরিয়ে এসেছে ওর শক্তি।

ম্যাথিউস জাস্টাসকে কাঁধে তুলে নিতেই আড়ষ্ট হয়ে এল

দুই উরুর পেশি। এক সেকেণ্ড ভারটা বুঝে নিল রানা, তারপর দুলকি চালে ছুটতে লাগল। বালির ভিতর গেঁথে বসছে বুটজুতো। থরথর করে কাঁপছে সারাদেহের পেশি। প্রতি পদক্ষেপে খচখচ করে লাগছে পিঠে। ছুটবার ফাঁকে প্রধান ফটকের খোলা জায়গাটা দেখল। এখন পর্যন্ত আমাহ্লের একজন লোকও পালাতে চায়নি। প্রাণপণে লড়ে চলেছে। ওরা জানে যতক্ষণ লড়বে, ততই ওদের নেতার জন্যে ভাল। হয়তো এ সুযোগে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারবে বাংলাদেশের ওই অসমসাহসী যুবক।

রানা ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপের দিকে আধাআধি যেতেই রানওয়ে স্পর্শ করল সত্তর ফুটি টুইন ইঞ্জিন কার্গো বিমান। প্রপেলারের পিচ রিভার্সে নিল জাহিদ হাসান, পূর্ণ-গতিতে ঘুরছে মোটরগুলো। বালি ও কাঁকরে ফুঁ দিয়ে সামনে ঝড় তুলেছে প্রপেলারগুলো। ঢাকা পড়ল গোটা বিমান। এই ম্যানুভারের কারণে মাত্র ছয় শ' ফুট দৌড়েই থামতে পারে ক্যারিব্যু। পড়ে থাকে বেশির ভাগ রানওয়ে, নতুন করে ফিরে গিয়ে আবারও ছুটতে হয় না, উড়েও যেতে পারে বাতাসের বিরুদ্ধে। প্রপেলারগুলোর গতি কমিয়ে এনেছে জাহিদ হাসান, এখন আর বাতাস কাটছে না পনেরো শ' হর্সপাওয়ার ইঞ্জিনগুলো। কিন্তু প্রচণ্ড শক্তির কারণে থরথর করে কাঁপছে এয়ারফ্রেম।

চোখের কোণে বামে নড়াচড়া দেখল রানা। কারাগারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে আমাহ্লের ট্রাক। পিছনের লোকগুলো গুলি করছে উঠানের উদ্দেশে। বিমানের দিকে আসছে ট্রাক। কয়েক মুহূর্ত পর উঠান থেকে বেরিয়ে এল অন্য তিন ট্রাক, গতি বেশ মন্থর। বিপ্লবীরা কারাগারের দিকে গুলি ছুঁড়ছে, দেরি করিয়ে দিতে চাইছে সৈনিকদেরকে।

ক্যারিব্যুর দিকে মনোযোগ দিল রানা। নেমে আসছে

বিমানের কার্গো র‍্যাম্প। ওটার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে জলিল খান, হাতে অ্যাসল্ট কারবাইন। ইশারা করে রানাকে আসতে বলল, কিন্তু ওর চোখ পড়ে আছে অগ্রসরমান ট্রাকের উপর। জলিলের সঙ্গে এক কালো-লোককে দেখল রানা। তাকে গতকাল রাতে ক্যারিব্যু বিমানে রন্দেভুর জন্য বলে দিয়েছিল।

রানার পায়ের নীচে শক্ত হয়ে উঠেছে জমিন। নুড়িপাথর ভরা রানওয়ের উপর পৌঁছে গেছে। শেষ কয়েক গজ ছুটে এগোল রানা, যেন ভুলেই গেছে সারাশরীরের দপদপে ব্যথা। মাতালের মত র‍্যাম্প বেয়ে উঠল। পাঁচ সেকেণ্ড পর র‍্যাম্পের পাশে থামল আমাহ্‌লের ট্রাক। এদের জন্য অপেক্ষা করছিল ডক্টর ফারা রাইনার, পাশে রেখেছে মেডিকেল কেসগুলো। আগেই সিলিঙে টাঙিয়ে দিয়েছে একটা দড়ি, ওখান থেকে ঝুলছে স্যালাইনের ড্রিপ ব্যাগ। ক্যানিউলাও তৈরি, দরকার হলে আহত যোদ্ধাদের রক্ত দেবে। একটা মেশ বেঞ্চ সিটে ম্যাথিউস জাস্টাসকে নামিয়ে দিল রানা, কাউকে সাহায্য করতে হবে কি না দেখতে ঘুরে চাইল।

এরই ভিতর ট্রাকের পিছন-দরজা খুলে ফেলেছে জলিল। মেঝের উপর পড়ে আছে কমপক্ষে বারোজন আহত যোদ্ধা। বিমানের ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজের উপর দিয়েও রানা শুনতে পেল মানুষগুলোর কাতর গোঙানি। টেইলগেট দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত। ভনভন আওয়াজ তুলে হাজির হয়েছে অসংখ্য পোকা।

সামনের লোকটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েছে জলিল, রাখল গিয়ে এয়ারক্রাফটের হোল্ডের মেঝেতে। ওর ঠিক পিছনে নিশাত সুলতানা, দু'হাতের ভাঁজে নিয়ে এসেছে আরেক লোককে। তৃতীয় একজনকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল স্বর্ণা ও কাশেম। মানুষটার গালে দাড়ির বিশাল গোছা, প্যান্টের উরু

থেকে হাঁটু পর্যন্ত জবজবে ভেজা রক্তে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল আরেকজন, ডান হাতে বুকে চেপে ধরেছে বাম হাতটা। তাকে ধরে বিমানের হোল্ডে তুলল রানা, পরক্ষণে চিনল আমাহ্‌লেকে। একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বেচারার মুখ। কিন্তু যেই দেখল একটা বাল্‌ক্‌হেডের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে আছেন জাস্টাস, খুশিতে হৈ-হৈ করে উঠল। দু'জনই আহত, কিন্তু পরস্পরকে দেখে কুশল বিনিময় শুরু হলো।

অন্য তিন ট্রাক বিমানের দিকে না এসে বাঁক নিয়ে মরুভূমির দিকে ছুটছে। পিছনে ফেলছে পুরু বালির মেঘ। পাঁচ সেকেণ্ড পর কারাগার থেকে বেরিয়ে এল আরও দুটো ভেহিকেল। একটা রওনা হয়েছে ফোর-হুইল ড্রাইভ ট্রাকগুলোর পিছনে। দ্বিতীয় ভেহিকেল ছুটে এল এয়ারস্ট্রিপের উদ্দেশে।

'স্যর, ট্রাকে আর কেউ নেই,' বলে উঠল নিশাত, এইমাত্র ট্রাক থেকে আহত শেষ লোককে বিমানে তুলেছে সে, 'ক্যাপ্টেন হাসানকে বলুন এবার রওনা হতে পারে।'

র‍্যাম্প থেকে বিমানের পেটের দিকে পা বাড়াল রানা, ঘন ঘন হাতের ইশারা করল। সিটে কাত হয়ে দেখছিল জাহিদ হাসান, রানার হাত দেখেই সোজা হয়ে বসল, ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কন্ট্রোলগুলো নিয়ে। কয়েক সেকেণ্ড বদলে নিল প্রপেলারের আওয়াজ, জোর একটা ঝাঁকি দিয়ে রওনা হলো বিমান।

আবারও বিমানের পিছনে চলে এল রানা। এক লোকের বুশ জ্যাকেট কেটে ফেলেছে ফারা, বুক বেরিয়ে আসতে দেখা গেল দুটো গুলি খেয়েছে মানুষটা। ক্ষতের উপর উঠছে বুদ্বুদ। ফুটো হয়ে গেছে ফুসফুস। পরিবেশ চিকিৎসা দেয়ার উপযুক্ত নয়, তা ছাড়া টেকঅফ করবার জন্য লাফিয়ে চলেছে বিমান, কিন্তু অন্য কোনও দিকে মনোযোগ না দিয়ে কাজ করে চলেছে ফারা।

রানা পাশে চলে আসতেই স্বর্ণা বলল, 'মাসুদ ভাই, সবসময়

কি দেরি করে আসতে হবে?' খুশি হয়ে হাসছে।

'অনেক দিনের অভ্যেস, দেরি না করে পারি না,' বলল রানা। 'তোমাদের অবস্থা কী?'

'আরও কয়েকটা চুল পেকে গেছে, নইলে ঠিকই আছি সবাই। একদিন কিন্তু বলতে হবে, কীভাবে মরুভূমির ভিতর আর্মি জোগাড় করলেন।'

'ভাল জাদুকর কখনও নিজের কৌশল কাউকে বলে না।'

এখনও গতি তুলছে ক্যারিব্যু। কয়েক সেকেণ্ড পর পিছনে পড়ল গার্ডদের ট্রাক। খোলা র‍্যাম্প থেকে রানা দেখল এখনও গুলি আসছে। তারপর হতাশ হয়ে গতি কমিয়ে দিল ট্রাকের ড্রাইভার। ঘুরিয়ে নিয়েছে গাড়ি, এবার রওনা হলো আমাহ্‌লের ট্রাক বহরের পিছনে। কারাগার থেকে বেরিয়ে এল তৃতীয় এক ভেহিকেল। পাঁচ সেকেণ্ড পর চতুর্থ ট্রাক। এরা ঠিক করেছে ধাওয়া করবে আমাহ্‌লের বাহিনীকে।

ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসান পিছিয়ে নিয়েছে ইয়োক, রানওয়ের রুক্ষ জমি থেকে আস্তে করে ভেসে উঠল পুরনো ক্যারিব্যু। এতক্ষণ ধপ-ধপ আওয়াজ তুলে ছুটছিল চাকাগুলো, কয়েক সেকেণ্ড পর থেমে গেল বাড়তি ঝাঁকুনি। একটু পর সমতল হয়ে এল মেঝে। আগেই বলে দেয়া হয়েছে, খোলা থাকবে র‍্যাম্প, কাজেই আহতদেরকে বিমানের সামনের দিকে নিয়ে গেছে নিশাত, স্বর্ণা, কাশেম ও জলিল। ফাঁকা হয়ে গেছে পিছন র‍্যাম্পের চারপাশ। আপাতত র‍্যাম্পের উপর এসে দাঁড়িয়েছে জলিল, মেঝের ডি রিঙে আটকে নিয়েছে কমব্যাট ভেস্টের সেফটি লাইন। মাইক্রোফোন সহ একটা হেলমেট পরেছে, ওটার কারণে ককপিটে জাহিদ হাসানের সঙ্গে কথা বলতে পারবে। পায়ের সামনে পড়ে আছে লম্বা একটা ক্রেট।

কমব্যাট ভেস্টের সঙ্গে সেফটি লাইন আটকে নিল রানা,

চলে গেল জলিলের পাশে। হু-হু তপ্ত হাওয়া ঢুকছে কেবিনের ভিতর। বাঁক নিয়েছে ক্যাপ্টেন হাসান, আবারও ফিরে এসেছে গার্ডদের ট্রাকের পিছনে। তাদের ভেহিকেল অনেক আধুনিক, শত্রুবাহিনীর পুরনো ভেঁহিকেল যত দ্রুতই চলুক, এরই ভিতর অর্ধেক দূরত্ব কমিয়ে এনেছে তারা।

গভীর এক উপত্যকার দিকে চলেছে ট্রাক বহর। দু'পাশে আকাশ ছোঁয়া বালির ঢিবি। দুই সারি চাকার দাগের উপর চলে এল ক্যারিব্যু। মাত্র আধ মাইল দূরে দুই ট্রাক। এক হাজার ফুট উপর দিয়ে চলেছে বিমান। কিন্তু তিন মাইল গিয়ে হঠাৎ করেই শেষ হয়েছে উপত্যকা, জায়গাটা কানাগলির মত। এই উপত্যকা অন্যগুলোর মত মরুভূমির মেঝেতে গিয়ে মেশেনি। সামনে যথেষ্ট খাড়া একটা ঢিবি, ওটার চূড়া পেরুতে হলে হাঁটবার গতি তুলে ট্রাক নিয়ে উঠতে হবে।

'আবারও আমাদেরকে ঘুরিয়ে আনুন,' মাইকে বলল জলিল। 'ট্রাকের পিছনে পৌঁছতে হবে।'

নিশাত ও স্বর্ণার উদ্দেশে হাত নাড়ল জলিল।

কমব্যাট হার্নেসের সঙ্গে ডি রিঙের লাইন আটকে নিল ওরা, পিছন র‍্যাম্পের দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে গেল। দেয়াল ধরে সামলে নিতে চাইছে। এইমাত্র বাঁক নিতে শুরু করেছে বিমান। জলিল এরই ভিতর খুলে ফেলেছে ক্রেট। ভিতরে রয়েছে আমাহ্‌লের আনা চারটে আরপিজি। এই জিনিস দিয়ে আমাহ্‌লের লোককে পঞ্চম ট্রাকে জলিলের কাছে পাঠিয়েছিল রানা।

একে একে রানা, স্বর্ণা ও নিশাতের হাতে গ্রেনেড লঞ্চার তুলে দিল জলিল।

'এই জিনিস দিয়ে লক্ষ্যভেদ প্রায় অসম্ভব,' সন্দেহ নিয়ে বলল স্বর্ণা। 'চারটা ট্রাক। চারটে আরপিজি। আমরা চলেছি এক

শ' বিশ মাইল গতি তুলে। ওরা ছুটছে কমপক্ষে পঞ্চাশ মাইল বেগে।'

'ছুঁড়ি, তোর মনে বিশ্বাস বলতে কিচ্ছু নেই,' পাল্টা চেঁচাল নিশাত। 'চড় খাসনে!'

'আম্মুর কথা, শুনতে হয়!' মনে মনে বলল রানা।

আড়ালে নিশাত সুলতানাকে আম্মু বলে ডাকে অনেকে। কোনও মিশনে কারও সমস্যা হলে সবার আগে হাজির হয় সে। সত্যিকারের ভাল নার্স নিশাত, কেউ অসুস্থ হলে দারুণ আরামে থাকে, কষ্ট করে পানিও খেতে হয় না, খাইয়ে দেয়া হয় তাকে।

আবারও সোজা হলো বিমান, নতুন করে উপত্যকার মুখে পৌঁছে গেছে। ক্যাপ্টেন হাসান এখনও নীচে নামছে। মরুভূমির মেঝে থেকে তপ্ত হাওয়া উঠছে, কাঁপিয়ে চলেছে বিমানটাকে। বিশাল উঁচু ঢিবিগুলো পিছিয়ে পড়ছে। চূড়া থেকে মাত্র এক শ' ফুট উপর দিয়ে ছুটছে ক্যারিব্যুর ডানা। জলিল অপেক্ষা করছে ক্যাপ্টেনের নির্দেশের জন্য। সে কাউন্ট ডাউন করছে, একটু পর পৌঁছবে সৈনিকদের ট্রাক কনভয়ের উপর। জলিল আরপিজি কাঁধে তুলে নিতেই, অন্য তিনজনও তাই করল।

রানা ও স্বর্ণার দিকে চাইল জলিল। 'আপনারা কনভয়ের সামনে বাম দিকের ঢিবির গোড়া তাক করুন। আপা আর আমি ডানদিক দেখব। প্রথম ভেহিকেল থেকে বিশ গজ এগিয়ে গ্রেনেড ফেলবেন।'

বিমান নিয়ে ডাইভ দিয়েছে ক্যাপ্টেন হাসান। বোধহয় আরও নামবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে বাধ্য হয়ে আবারও উঠতে লাগল। নীচ থেকে আসতে শুরু করেছে গুলি। কনভয়ের উপর দিয়ে ভেসে গেল বিমান। বাইরে চেয়ে রইল রানা, নিশাত, স্বর্ণা ও জলিল। বিমানের দিকে রাইফেল তাক করেছে সৈনিকরা, লাল আলো দপদপ করে জ্বলে উঠছে মাযলের মুখে।

'এবার!' বলে উঠল জলিল।

প্রায় একই সময়ে আরপিজি ছুঁড়ল ওরা। টিউব থেকে বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল চারটে রকেট। সাদা বাষ্পের লেজ বাতাসে রেখে ঘুরতে ঘুরতে চলেছে। ঢিবির গোড়ায় গ্রেনেড ফাটবার আগেই আমাহ্লের ট্রাকগুলোর উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল বিমান। পিছনে ছিটকে উঠেছে বিপুল বালি। উপর থেকে মনে হলো ওই বিশাল ঢিবির কিছুই হবে না। কিন্তু তার কাজ ঠিকই করেছে গ্রেনেড।

উচ্চতা ও অ্যাঙ্গেলের ভারসাম্য ঠিক জায়গায় রেখেছিল দুই ঢিবিকে, কিন্তু এখন প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে বদলে গেল গোটা পরিস্থিতি। খাড়া প্রাচীরের উপর থেকে পড়তে শুরু করল সরু বালির ধারা। ক্রমেই বাড়ছে গতি ও পরিমাণ, সেইসঙ্গে নড়ে উঠল ঢিবি। কয়েক সেকেণ্ড পর দেখা গেল মুখোমুখি দুই বালি-পাহাড় পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে আসছে, মাঝে আটকা পড়ছে সৈনিকদের কনভয়।

বিশাল দুই বালিধস নেমে এল উপত্যকার মেঝের উপর। ডানদিকের ঢিবি অন্যটার চেয়ে দ্রুত নেমেছে, ওটার প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে কাত হয়ে পড়ল কনভয়ের ট্রাকগুলো। ওগুলোর বেড থেকে ছিটকে গেল সবাই, এবং মাত্র এক সেকেণ্ড পর দ্বিতীয় ঢিবির বিশাল ঢেউ ডুবিয়ে দিল তাদেরকে। চাপা পড়েছে সবাই তিরিশ ফুট বালির নীচে।

ওই কবরস্তানের প্রমাণ হিসাবে রইল শুধু ধুলোর ঘন মেঘ।

বিমানের ভিতর অংশে চলে এসেছে রানা, স্বর্ণা ও নিশাত। জলিল র‍্যাম্পের বাটন টিপে দিতেই উঠে এল লোহার পাত। এখন পিছন থেকে আর আসছে না তপ্ত হাওয়া।

'স্বর্ণা, আগেই বলিনি?' হাসল জলিল। 'পানির মত সহজ কাজ।'

'কপাল ভাল যে ওই উপত্যকা ওখানে ছিল,' মন্তব্য করল স্বর্ণা।

'তা মোটেও না,' আপত্তি তুলল জলিল। 'গতরাতে পালাবার সময় ওই জায়গা দেখে গেছি। মাসুদ ভাই আর আমাহ্‌লের লোক ইচ্ছে করেই সৈনিকদের ওখানে নিয়ে গেছে।'

'যাই হোক, কাজের কাজ হয়েছে,' বলল কাশেম।

জলিলের দিকে চাইল রানা। 'সোহেল কি তৈরি?'

'সোয়াকোপমুণ্ড বন্দরে ভিড়েছে মার্ভেল। তারপর আবারও চলে গেছে বারো মাইল দূরে। এদিকে একটা ফ্ল্যাটবেড ট্রাক নিয়ে এয়ারপোর্টে আসছেন সোহেল ভাই। ট্রাকের উপর থাকবে খালি শিপিং কন্টেইনার। ওটার ভিতর তোলা হবে আহতদের, আমরাও তাদের সঙ্গে বন্দরে ফিরব। এক ঘুষখোর কাস্টমস ইন্সপেক্টরের পকেট এখন উপচে পড়ছে ডলারে। সে লোক সই করে দেবে বিল অভ লেডিং-এ, তারপর নামিবিয়ান এক ক্যাপ্টেনের বোটে করে জাহাজে গিয়ে উঠব আমরা।'

'এদিকে আমাহ্‌লের লোক ট্রাক নিয়ে যাবে উইণ্ডহওক-এ। পরে বিমানে করে সরিয়ে নেবে ম্যাথিউস জাস্টাসকে।' দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। 'এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল, কিন্তু বিজ্ঞানী আসিফ হায়দার চৌধুরিকে আনতে পারিনি আমরা। কিডন্যাপাররা এখন তাকে কোথায় সরিয়ে নেবে, বোঝা কঠিন।'

'আসলেই,' মাথা দোলাল স্বর্ণা।

ট্রাকবেডে বেঁধে চারটে খুঁটির সঙ্গে টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে তারপুলিন, ছায়ার ভিতর বসে আছে ডুলি গ্রিন। হঠাৎ একটা গুঞ্জন শুনে চটকা ভাঙল তার। কিশোরী বয়স থেকেই ডায়েরি লিখছে, একটু আগে লিখবার ফাঁকে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল। গত কয়েক বছরে অন্তত তিরিশটা ডায়েরি শেষ

করেছে। সবসময় মনে হয়েছে ওগুলো পরে বায়োগ্রাফির কাজে লাগবে। ওর সন্দেহ নেই যে একদিন বিশাল খ্যাতিমান হয়ে উঠবে। এবং সত্যিই ক'দিন পর তা-ই হবে। এনভায়রনমেন্টাল মুভমেন্টের মস্ত বড় চ্যাম্পিয়ানদের সঙ্গে উচ্চারিত হবে ওর নাম। লোকে বলবে, গ্রিনপিসের রবার্ট হাণ্টার বা পল ওয়াটসনের চেয়ে কম নয় ডুলি গ্রিন।

অবশ্য বর্তমানে যে কাজ করছে, সে বিষয়ে বাইরের কারও কিচ্ছু জানা চলবে না। ছায়ার ভিতরে থেকে কলকাঠি নাড়ছে সে। অভ্যাসবশে লিখছে বটে, কিন্তু পরে একসময় এই জার্নাল পুড়িয়ে ফেলবে। কেউ জানবে না নিকোলাস ক্রিস্টোফারের সঙ্গে ওর কোনওরকম যোগাযোগ ছিল।

নোটবুক বন্ধ করল ডুলি গ্রিন, স্পাইরাল বাইণ্ডিঙের ভিতর রেখে দিল বলপেন। তারপুলিনের নীচ থেকে বেরুনো যেন বড় কোনও শাস্তি, আভেনের মত তপ্ত হয়ে উঠেছে মরুভূমি। উঠে দাঁড়িয়ে প্যাণ্টের পিছন দিক ঝেড়ে নিল সে। কপালের উপর হাত রেখে চোখ বোলাল আকাশে। বোধহয় চলে এসেছে নিকোলাস ক্রিস্টোফারের পাইলট। সানগ্লাসের ভিতর দিয়ে কিছুক্ষণ চাওয়ার পর দেখল আকাশে অলঙ্কারের মত চকচক করছে বিমানটা। ডুলির কয়েকজন বন্ধু বেরিয়ে এল তারপুলিনের নীচ থেকে। তাদের ভিতর রয়েছে ক্যারেন কুম্বস। মরুভূমি পেরিয়ে আসতে গিয়ে প্রত্যেকে ক্লান্ত। তার উপর আসবার সময় যথেষ্ট পানি আনেনি। এরই ভিতর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে সবার।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা আসিফ হায়দার চৌধুরির। হাত-পা বেঁধে ট্রাকের পাশে বসিয়ে রাখা হয়েছে। ওখানে কোনও ছায়াও নেই। জোর করে হেরোইন দেয়ার পর আর জ্ঞান ফেরেনি তার। রোদে ফোস্কা পড়ে গেছে মুখে-হাতে, বুলেটের ক্ষতের উপর

ভনভন করছে অসংখ্য পোকা।

মাটির রানওয়ের উপর দিয়ে উড়ে গেল বিমান। নীচ থেকে হাত নাড়ছে ডুলি ও অন্যান্যরা। কিছুদূর গিয়ে বাঁক নিল পাইলট, একটু পর আবারও ফিরে এল রানওয়ের মুখে। এক শ' ফুট পেরিয়ে মাটিতে নামল বিমান, দ্রুত কমে এল গতি, তারপর ট্যাক্সিইং করে এসে থামল ট্রাকের একটু দূরে। মাত্র তিন শ' গজ দূরে ভুতুড়ে শহর। ভেঙে পড়ছে দালানকোঠা, কয়েক দশক পর ওখানে থাকবে শুধু বালির ধূ-ধূ প্রান্তর।

ধীরে ধীরে খুলে গেল বিমানের পিছনের র‍্যাম্প, ওদিকে চেয়ে ডুলির মনে হলো ওটা কোনও মধ্যযুগীয় ড্র-ব্রিজ। র‍্যাম্প পেরিয়ে নেমে এসেছে এক লোক, তাকে চেনে না ডুলি। সবার দিকে হেঁটে আসছে সে। ইঞ্জিনের গর্জনের উপর দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'ডুলি গ্রিন?'

এক পা সামনে বাড়ল ডুলি। 'আমিই।'

'হ্যালো,' বন্ধুত্বের সুরে বলা হয়েছে। 'নিকোলাস ক্রিস্টোফার আপনাকে একটা কথা জানাতে বলেছেন।'

'কী সেটা?'

'ইউনাইটেড স্টেটসের সরকার এসেলন নামের একটা প্রোগ্রাম তৈরি করেছে। ওটার মাধ্যমে পৃথিবীর বেশিরভাগ ইলেকট্রনিক তথ্য জানা যায়।'

'তো?'

'স্যাটালাইট ফোনে কথা বলার সময় আপনার আরও সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ গতকাল রাতে কেউ শুনেছে।' কথাগুলো বুঝতে শুরু করেছে এনভায়রনমেন্টাল গ্রুপ, হঠাৎ করেই বদলে গেল লোকটার সহজ ভঙ্গি। এতক্ষণ পিছনে ছিল ডান হাত, এবার ঝটকা দিয়ে সামনে এল। হাতের এমপি-৫ তাক করল ডুলি গ্রিনের উপর। সবার উপর থেকে ঘুরে এল মাযল। 'আশা

করি তোমরা এখানে ভালই থাকবে,' বলল রানা। 'খুব তাড়াহুড়োর শিডিউল নিয়ে এসেছি। তোমাদেরকে নিয়ে পুলিশের কাছে যাওয়ার সময় নেই।'

ট্রাক ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে এক ইকোটেরোরিস্ট, বোধহয় অস্ত্র পাওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু রানার গুলি বিঁধল তার পায়ের পাশে। 'মরতে চাও?'

বিমান থেকে নেমে এসে সবাইকে কাভার করেছে নিশাত। কয়েক পা সরে আসিফ হায়দার চৌধুরির বাঁধন খুলতে লাগল রানা। চলে এসেছে স্বর্ণা ও জলিল, কিডন্যাপারদের দুজন দুজন করে প্লাস্টিক ফ্লেক্স কাফ দিয়ে আটকে দিচ্ছে। বিজ্ঞানী এখনও অচেতন, শার্টের বুকে কাদার মত থকথক করছে রক্ত। মার্ভেলে আহতদের চিকিৎসা দেবে ফারা, বিমানে অপারেশন করা সম্ভব নয়। কাশেম ও জলিলের হাতে আসিফ হায়দার চৌধুরিকে তুলে দিল রানা। নিজে বিমান থেকে নিয়ে এল পানির দুটো জেরি ক্যান, ট্রাকের বেডে রেখে বলল, 'তোমরা রেশন করলে এই পানিতে এক সপ্তাহ চলবে।'

এবার ট্রাক সার্চ করে গ্লাভস কমপার্টমেন্টে পাওয়া গেল ডুলি গ্রিনের স্যাটালাইট ফোন ও একটা পিস্তল। এছাড়া বেঞ্চের উপর শুয়ে আছে তিনটে অ্যাসল্ট রাইফেল ।

'এসব নিয়ে বাচ্চাদের খেলা উচিত না,' অস্ত্রগুলো নিয়ে বিমানের দিকে রওনা হয়ে গেল রানা। সব রেখে এসে বলল, 'আরেকটা কাজ তো ভুলেই গিয়েছিলাম।'

মনোযোগ দিয়ে পরিবেশবাদীদের মুখ দেখতে শুরু করেছে ও। যাকে দরকার সে আছে এক দাড়িওয়ালা তরুণের পিছনে, লুকিয়ে থাকতে চাইছে। পাঁচ ফুট সামনে বাড়ল রানা, তারপর হ্যাঁচকা টানে ক্যারেন কুম্বসকে নিয়ে এল বুকের কাছে। যে তরুণ আড়াল দিয়েছিল, সে ডানহাতি ঘুসি মারল। এই ছোকরা

জীবনে মারপিট করেনি, ভাবল রানা। মাথা নিচু করে এড়িয়ে গেল ঘুসি, বদলে নাইন এমএম পিস্তলের নল ঠেসে ধরল ওর কপালে, তৃতীয় নেত্র ঠিক যেখানটায় থাকার কথা। ভীষণ ভয় ফুটে উঠল তরুণের চোখে।

'আবারও চেষ্টা করবে?' জানতে চাইল রানা।

এক পা পিছিয়ে গেল তরুণ। দ্রুত হাতে ক্যারেন কুম্বসের দুই কবজি ফ্লেক্সি কাফ দিয়ে আটকে দিল রানা। ইচ্ছা করেই ব্যথা দিয়েছে। মেয়েটা বুঝতে শুরু করুক সামনে তার কঠিন সময়। বাহু ধরে বিমানের দিকে প্রায় ছেঁচড়ে নিয়ে চলল রানা। জলিল ও কাশেম অন্য কাজে ব্যস্ত। রাবারের ব্লাডার দিয়ে বিমান থেকে ট্রাকের ট্যাঙ্কে ডিজেল দিচ্ছে।

রানা পাশে আসতেই মন্তব্য করল জলিল, 'আমরা মরুভূমির তিরিশ মাইল ভিতরে গিয়ে এদেরকে ছেড়ে দেব। ...এই তো, মাসুদ ভাই?'

'সেক্ষেত্রে নিকোলাস ক্রিস্টোফারের পাইলট এদেরকে পাবে না,' বলল কাশেম।

'ঠিক,' বলল রানা। 'কিন্তু জিপিএস কোঅর্ডিনেট্স্ মনে রেখো, নইলে পরে আর খুঁজে পাব না।'

মাথা দোলাল জলিল। 'এরপর সোজা উইণ্ডহক-এ যাব, কোথাও ট্রাক ছেড়ে দিয়ে ভাড়া নেব হোটেলের রুম।'

'ওখানে পৌঁছেই মার্ভেলের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। অস্ত্র উদ্ধার করতে যাওয়ার আগেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করব।'

বন্দিনীকে নিয়ে বিমানের র‍্যাম্পে উঠে পড়েছে রানা, একবার ঘুরে চাইল পরিবেশবাদীদের দিকে। পা বাড়ানোর আগে বলল, 'এক সপ্তাহ পর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।'

রানার পর পর বিমানে এসে উঠল স্বর্ণা ও নিশাত। কয়েক

মুহূর্ত পর বদলে গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ। ট্যাক্সিইং শুরু করবার নব্বুই সেকেণ্ডের ভিতর আবারও আকাশে উঠল ক্যারিব্যু। নীচে হাঁ করে চেয়ে রইল আট ইকোটেরোরিস্ট, বাজ পড়েছে মাথার উপর।

ছয়

মার্ভেলের বোর্ডিং ল্যাডারের শেষ ধাপে উঠেছে রানা, ডেকে পা রেখেই সোহেলকে বলল, 'গত পনেরো ঘণ্টা আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময়।' নীচে এক ভদ্রলোকের দিকে হাত নাড়ল। উনি মোটর বোট হিল্ডার ক্যাপ্টেন। কয়েক দিন আগে ওই বোট নিয়ে সাগরে গিয়েছিল কার্টা। পরে রানার পরামর্শে টেরেস বে-তে চলে যান ভদ্রলোক, গত কয়েক দিন বোট নিয়ে লুকিয়ে ছিলেন। আশা করা যায় তাঁর জীবনের উপর আর হুমকি আসবে না।

পাল্টা হাত নাড়লেন উনি। মুখে চওড়া হাসি, পকেটে পাঁচশ' ডলার বাড়তি। রানার দল ও আহতদের নামিবিয়ার বারো মাইল আন্তর্জাতিক জলসীমার বাইরে মার্ভেলে পৌঁছে দেয়ায় ওই টাকা দেয়া হয়েছে। তখন থেকে হেসে চলেছেন উনি। বোট সরিয়ে নিলেন মার্ভেলের গা থেকে, রওনা হয়ে গেলেন সোয়াকোপমুণ্ড বন্দরের উদ্দেশে। ধীরে ধীরে উত্তর দিকে বাঁক নিল মার্ভেল, গতি তুলতে লাগল। চিমনি দিয়ে ভক-ভক করে বেরুচ্ছে ধোঁয়া।

একটা মেডিকেল বাস্কেটে করে ডেকে তোলা হয়েছে আসিফ হায়দার চৌধুরিকে। এরই ভিতর তার উপর ঝুঁকে পড়েছে ডক্টর ফারা। তৈলাক্ত ডেকের উপর লুটিয়ে পড়েছে ওর ল্যাব কোট। তার নীচের শার্টে রক্তের অসংখ্য দাগ। সোহেল এয়ারপোর্ট থেকে কন্টেইনার আনবার পর সবাইকে তোলা হয়েছে নামিবিয়ান ক্যাপ্টেনের বোটে। উনি পৌঁছে দিয়েছেন মার্ভেলে। আহতদের মেডিকেল বে-তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখনও বিজ্ঞানীর পাশে আছে ফারা। আরও কয়েক মুহূর্ত ক্ষত দেখল ও, তারপর মাথা নাড়ল। বিজ্ঞানীর বুকে অপারেশন করতে হবে।

আগেই কালো কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে ক্যারেন কুম্বসকে একটা হোল্ডে নিয়ে গেছে স্বর্ণা ও নিশাত। ওদের ধারণা হয়েছে: মেয়েটা ভীষণ ভয় পেয়েছে। এখনও হার মানেনি, কিন্তু ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে।

'ফারা, তোমার কী মনে হয়?' জানতে চাইল রানা। এইমাত্র বিজ্ঞানীর বুক থেকে স্টেথোস্কোপ সরিয়েছে ফারা।

'ফুসফুসে সমস্যা নেই, কিন্তু দুর্বল ভাবে চলছে হৃৎপিণ্ড,' আসিফ হায়দার চৌধুরির হাতের দিকে চাইল সে। পাশে দাঁড়িয়ে স্যালাইন ড্রিপ ব্যাগ উঁচু করে ধরেছে এক আর্দালি। 'এটা নিয়ে তৃতীয় স্যালাইন দেয়া হলো। অপারেশনের আগে রক্ত দিতে হবে, নইলে বাড়বে না প্রেশার। চেতনা নেই, এটাও খারাপ কথা।'

'ডেভিলস ওয়েসিসে ওঁকে হেরোইন দিয়েছে, সেজন্য এমন হতে পারে?'

'এতক্ষণে সিস্টেম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা। তা ছাড়া, জ্বরও এসেছে। ক্ষতটা ইনফেকটেড মনে হচ্ছে। অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করব।'

'অন্যদের কী অবস্থা? ...ম্যাথিউস জাস্টাস?'

গম্ভীর হয়ে গেল ফারা। 'তাঁর দু'জনকে ফেরাতে পারিনি। আরেকজন যমের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। অন্যদের ক্ষত মাংসে, ইনফেকশন না হলে দ্রুত সেরে উঠবে। সুস্থ হতে ম্যাথিউস জাস্টাসের সময় লাগবে। মানুষের পায়ে থাকে ছাব্বিশটা হাড়, কিন্তু এক্স-রে করে দেখলাম তাঁর পায়ের হাড় চুয়ান্ন টুকরো হয়েছে। ওই পা রাখতে হলে কয়েক দিনের মধ্যে স্পেশালিস্ট অর্থোপেডিক লাগবে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা, কোনও কথা বলল না।

'তোমার কী অবস্থা?' জানতে চাইল ফারা।

'দেখতে যেমন লাগছে, তার চেয়ে খারাপ।' হাসল রানা।

'তা হলে সত্যিই তুমি ক্লান্ত হও?'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' ডানহাতে কপাল দেখল রানা, 'হ্যাঁ, জ্বরও এসেছে।' বিজ্ঞানীকে সরিয়ে নেয়ার জন্য ইশারা করল ফারা। ব্যস্ত হয়ে উঠল দুই আর্দালি, স্ট্রেচারে শুইয়ে দিল রোগীকে। চলেছে কাছের একটা হ্যাচের দিকে। 'আমাকে লাগলে কেবিনে পাবে,' ঘুরে রওনা হয়ে আবারও থামল রানা। 'ফারা, আরেকটা কথা, কার্টা কেমন আছে?'

'ভাল। প্রায় ঘাড় ধরে ওকে বের করে দিয়েছি মেডিকেল বে থেকে। আছে এখন গেস্ট কেবিনে। আহতদের জন্য মেডিকেল বে পাল্টে নিতে হয়েছে। ওটাই হবে রিকভারি রুম। কার্টা তোমার সঙ্গে দেখা করতে ডেকে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু ওকে বিছানায় শুয়ে থাকতে বলেছি। আগামী কয়েক ঘণ্টা খুব ব্যস্ত থাকব আমরা। তা ছাড়া ও এখনও দুর্বল।'

'ঠিক আছে, পরে ওর সঙ্গে কথা বলব।'

সুপারস্ট্রাকচারে ঢুকে গেল ফারা।

রানার পাশে সোহেল বলল, 'তুই ভাগ্যিস আলাপ করেছিস।

রায়হান ঠিক সময়ে ওর কাজ শেষ করতে পেরেছে, নইলে এনএসএ-র এসেলনের সাহায্য আমরা পেতাম না।'

বাঙালি বিজ্ঞানীকে খুঁজে না পেয়ে সোহেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল রানা। তখন বলেছিল, দেরি না করে রায়হান রশিদের সঙ্গে আলাপ কর, এনএসএ-র এসেলন প্রোগ্রামের সাহায্য দরকার আমাদের। যেভাবে হোক, ও যেন হ্যাক করে তাদের মেইন ফ্রেম কমপিউটারকে।

প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর বুকে কয়েক শ' মিলিয়ন ইলেকট্রনিক ডেটা ট্রান্সফার চলছে। ব্যবহার করা হচ্ছে: সেল ফোন, সাধারণ ফোন, ফ্যাক্স, স্যাটালাইট ফোন, রেডিও, ই-মেইল ও ওয়েব পোস্টিং। ফোর্ট মিড-এ এনএসএ-র হেডকোয়ার্টারে রয়েছে কয়েক একর জুড়ে লিঙ্কড্ সুপার কমপিউটার। আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স আগ্রহী হবে এমন বিশেষ বক্তব্য বা শব্দ খুঁজে বের করে এরা। কান পাতার জন্য তৈরি করা হয়নি এসেলন, কিন্তু দরকার পড়লে খুব সহজেই ওটাকে ব্যবহার করা যায়। ডেভিলস ওয়েসিসের জিয়োগ্রাফিক লোকেশন খুঁজে নিয়েছে ওই প্রোগ্রাম, তারপর শুরু করেছে প্রশিক্ষিত কুকুরের মত ছোঁক-ছোঁক। যখন ধরতে পেরেছে *আসিফ হায়দার চৌধুরি, নিক,* কিডন্যাপড, *ক্যারেন কুম্বস, ছিনিয়ে নেয়া* এসব শব্দ, সাইবার খড়ের গাদা থেকে খুঁজে বের করেছে নির্দিষ্ট সুঁই। ডুলি গ্রিন ও নিকোলাস ক্রিস্টোফারের আলাপের তিন মিনিট শেষ হওয়ার আগেই লিখিত বক্তব্য মেইল করে পাঠিয়ে দিয়েছে ও সোহেলের কমপিউটারে।

'জানতাম স্বর্ণারা বন্দি হওয়ায় কারাগারের দায়িত্বে যে আছে, সে নিকোলাসের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। নিশ্চয়ই তখন নতুন কোনও নির্দেশ পাবে। এরা একেবারেই অ্যামেচার, এদের কনটিনজেন্সি প্ল্যান থাকার কথা নয়।' বুড়ো আঙুল দিয়ে চোখ

চুলকে নিল রানা। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর।

'অন্য কিডন্যাপারদের কী করলি?' ঠোঁটে সিগারেট তুলে জানতে চাইল সোহেল। বেশ জোরে বইছে হাওয়া, লাইটার জ্বলল না।

বন্ধুর পাশে হ্যাচওয়ের দিকে পা বাড়াল রানা। ঠিক করেছে কেবিনে ফিরেই গরম শাওয়ার নেবে। 'মরুভূমির ভিতর এক সপ্তাহ চলার মত পানি দিয়ে এসেছি। এখন বিশ্রাম নেব, তারপর যোগাযোগ করব ইন্টারপোলের সিলভিও বেনেডিক্টোর সঙ্গে। সে খুশি মনে নামিবিয়ার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবে। পরে কিডন্যাপারদের গ্রেফতার করে পৌঁছে দেবে সুইটযারল্যাণ্ডে। ওই দেশের আইন অনুযায়ী কিডন্যাপিং এবং অ্যাটেম্পটেড মার্ডারের জন্য বিচার হবে ক্যারেন কুম্বসের। অন্যরাও দশ বছরের আগে বেরুতে পারবে না।'

'ওই মেয়েকে নিয়ে এলি কেন, অন্যগুলোর সঙ্গে পচত!'

হাঁটবার গতি কমল রানার। 'বাধ্য হয়ে। এনএসএ-র এসেলন কিন্তু নিকোলাস ক্রিস্টোফারের লোকেশন বের করতে পারেনি। সে কোথায় আছে এটা জানে ওই মেয়ে। লোকটার খেলা এখনও শেষ হয়নি। ভয়ঙ্কর কোনও পরিকল্পনা আছে তার। প্রথম কাজ হিসাবে আসিফ হায়দার চৌধুরিকে কিডন্যাপ করেছে, পরে অন্য কিছু করবে। আমাদের জানতে হবে সেটা কী। ক্যারেন কুম্বসের পেট থেকে টেনে বের করতে হবে সব কথা।'

রানার কেবিনের সামনে পৌঁছে গেল ওরা, দরজা খুলে ঢুকে পড়ল। নোংরা পোশাক খুলতে শুরু করেছে রানা। কোমরে টাওয়েল জড়িয়ে নিয়ে শার্ট-প্যান্ট ফেলে দিল ধোলাই-বাস্কেটের ভিতর। ট্র্যাশের ভিতর গেল বুট জোড়া। তার আগে সরিয়ে নিয়েছে কেল-টেক পিস্তল ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট। ওয়ার্ডরোব

থেকে পোশাক নিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল রানা, খোলা রাখল দরজা।

'গগল ও রায়হান একঘণ্টা আগে যোগাযোগ করেছে,' বিছানায় বসে বলল সোহেল। 'একহাজার বর্গ মাইল ঘুরেছে। এখনও টমাস গাধাধার বা তার অস্ত্রের খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

'টমাস গাধাধার একা উধাও হতে পারে, কিন্তু একইসঙ্গে পাঁচ শ' সশস্ত্র অনুচর হাওয়া হতে পারে না। গগলরা কোথা থেকে খুঁজতে শুরু করেছে?'

'সেই ডক থেকেই। আকাশ থেকে সার্চ বড় করেছে ওরা। কোনও ঝুঁকি না নিয়ে মাত্র বিশ মাইল সরেই রেডিয়ো ট্যাগের সিগনাল খুঁজেছে।'

'ওই নদী একইসঙ্গে রিপাবলিক অভ কঙ্গো ও ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অভ কঙ্গোর সীমান্ত,' বলল রানা। 'ওরা দক্ষিণে সরে যেতে পারে।'

'দুই দেশের নাম কাছাকাছি, কিন্তু সম্পর্ক ভয়ঙ্কর খারাপ। ভুলেও রিপাবলিক অভ কঙ্গোর সীমান্তের ওদিকে যাবে না।'

'টমাস গাধাধার অস্ত্র নিয়ে উত্তর দিকেও যেতে পারে।'

'এটা হতে পারে,' সিগারেট জ্বালল সোহেল। 'লোকটাকে যদি কঙ্গোর ওদিকের প্রতিবেশী আড়াল দেয়, তো সহজেই বোঝা যায় কেন কখনও ধরা পড়েনি সে।'

'হাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা, তারপর শেষ হবে ট্যাগের ব্যাটারি,' বলল রানা। দু' মিনিট পর পরিষ্কার কাপড় পরনে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। এরই ভিতর শেভ করতে পারত, কিন্তু ইচ্ছা করেই তা করেনি। 'এক কাজ কর্, তুই গগলের সঙ্গে কথা বল্। যেভাবে হোক পেরুতে হবে সীমান্ত। ওদিকটা দেখতে হবে। আমার ধারণা অস্ত্রগুলো আছে ওই নদীর দেড় শ' মাইলের ভিতর।'

'ঠিক আছে, কথা বলে দেখি,' বিছানার কিনারা থেকে উঠে দাঁড়াল সোহেল।

আয়নার ভিতর নিজেকে দেখে নিল রানা। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, টকটকে লাল দুই চোখের নীচে ঘন কালো দাগ, পরনে কালো টি শার্ট, কালো কার্গো প্যান্ট— স্বয়ং যম মনে হচ্ছে ওকে। এখন এটাই দরকার। সোহেলকে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা। বন্ধুকে রওনা করিয়ে দিয়ে নিজে চলল মার্ভেলের হোল্ড লক্ষ্য করে।

পাঁচ মিনিট পর নির্দিষ্ট হোল্ডের সামনে পৌঁছে গেল। ওর জন্য অপেক্ষা করছে সানজিদা স্বর্ণা, হাতে ব্ল্যাকবেরি মোবাইল ফোন। ওটা শিপবোর্ড WI-FI নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত।

'আমাদের অতিথি কী করছে?' জানতে চাইল রানা।

'নিজ চোখেই দেখুন।' মোবাইল ফোন বাড়িয়ে দিল স্বর্ণা।

স্ক্রিনে পরিষ্কার দৃশ্য। হোল্ডের মাঝে একটা স্টেইনলেস-স্টিলের লাশ কাটার টেবিল। তার উপর শুইয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে ক্যারেন কুম্বসকে। গতকাল ওখানে প্যারাশুট প্যাক করেছে রানা। এখন টেবিলের উপর তীব্র আলো ফেলেছে হাই ইনটেনসিটি হ্যালোজেন ল্যাম্প। উজ্জ্বল ওই বৃত্তের বাইরে চারপাশ ঘুটঘুটে আঁধার। ব্ল্যাকবেরির দৃশ্য আসছে ল্যাম্পের উপরের ক্যামেরা থেকে।

মরুভূমির ভিতর পানির অভাবে নোংরা অবস্থা মেয়েটির। কয়েক দিনে কর্কশ হয়ে উঠেছে চুলগুলো। হাত-মুখের ত্বকে পোকার কামড়ে দাগড়া-দাগড়া চুলকানি। ফ্যাকাসে মুখ রক্তহীন। যেন ওর সব আশা হারিয়ে গেছে। নীচের ঠোঁট তিরতির করে কাঁপছে। দরদর করে ঘামছে সে।

'হাত-পা বাঁধা, নইলে নখ কামড়ে শেষ করত,' বলল স্বর্ণা।

'তুমি তৈরি তো?' জানতে চাইল রানা। মোবাইল দিয়ে

দিল।

'আবার কয়েকটা নোট পড়ে নিয়েছি। এটা আমার জীবনের প্রথম সত্যিকারের ইন্টারোগেশন।'

'পরে খারাপ লাগবে না তো? মনের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে।'

'চলুন যাই,' বিড়বিড় করে বলল স্বর্ণা।

হোল্ডের দরজা খুলল রানা, ভিতর থেকে ভ্যাপসা গরম এসে হামলে পড়ল ওর উপর। থার্মোস্ট্যাট-এ এক শ' ডিগ্রি তাপ বজায় রাখা হয়েছে। এই ইন্টারোগেশনে একটা কৌশল হিসাবে রাখা হয়েছে উজ্জ্বল আলো এবং তাপ। এর ফলে সহজ হবে ক্যারেন কুম্বসকে ভাঙা। নিঃশব্দে ঘরের ভিতর ঢুকল রানা ও স্বর্ণা। কিন্তু আলোর বৃত্তের ভিতর গেল না।

টিপ টিপ করে এক মিনিট পেরিয়ে গেল। মেয়েটার মানসিক জোর দেখে মনে মনে প্রশংসা করল রানা।

তারপর কাঁপা স্বরে জানতে চাইল ক্যারেন, 'ওখানে কে?'

কোনও জবাব দিল না কেউ। থমথম করছে চারপাশ।

'ওখানে কে?' আগের চেয়ে জোরে বলল ক্যারেন। কণ্ঠে রাগ ও অসহায়তা প্রকাশ পেল। 'আপনারা আমাকে এভাবে আটকে রাখতে পারেন না। আমার আইনগত অধিকার আছে।'

ইন্টারোগেশনে ভয় এবং রাগের সীমা কখনও পেরুতে হয় না। কারও ভয়কে পরিণত করতে হয় না রাগে। সঠিক সময় বেছে নিয়েছে স্বর্ণা। মেয়েটার মুখে রাগ দেখছে ও। থরথর করে কাঁপছে গালের পেশি। ফুলে উঠেছে ঘাড়ের রগ। ক্যারেন কুম্বস চিৎকার শুরু করবার আগেই আলোর বৃত্তে ঢুকল স্বর্ণা। নিজের মত এক মেয়েকে দেখে বিস্ফারিত হয়ে উঠল কুম্বসের চোখ।

'মিস কুম্বস, প্রথমেই বলে রাখিঃ তোমার বুঝতে হবে এখানে কোনও অধিকারই নেই তোমার। এটা একটা জলদস্যু-জাহাজ। আর আমরা আছি আন্তর্জাতিক জলসীমায়। তোমার

জন্য এখানে কোনও উকিল নেই। এটা কোনও আদালত নয়। তোমার সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা। হয় আমার প্রশ্নের জবাব দেবে, নইলে তোমার ছাল তুলে মাস্তুলের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেবে ক্যাপ্টেন।'

'কারা আপনারা? আসিফ হায়দার চৌধুরিকে ফিরিয়ে আনার জন্য আপনাদের ভাড়া করা হয়েছে, ঠিক? আপনারা তো তাকে পেয়েছেন। এবার আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিন, অথবা অন্য কোনও ব্যবস্থা করুন।'

'আমরা পুলিশ নই, কিন্তু সত্যিই অন্য ব্যবস্থা হবে,' বলল স্বর্ণা। 'তুমি বলবে নিকোলাস ক্রিস্টোফার কোথায় আছে, সেই সঙ্গে বলবে সে কী করতে চলেছে।'

'আমি জানি না সে কোথায়,' চট্ করে বলল ক্যারেন।

বড় দ্রুত বলেছে, ভাবল স্বর্ণা। আস্তে করে মাথা নাড়ল ও। ভাব দেখে মনে হলো খুব হতাশ হয়েছে। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি সহযোগিতা করবে, মিস কুম্বস। মিস্টার অ্যালারিকো সেবাস্তিয়ান, আপনি আমার পাশে চলে আসুন।' অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল রানা। 'ইনিই অ্যালারিকো সেবাস্তিয়ান। গত কিছু দিন আগেও উনি ইউএস সরকারের হয়ে টেরোরিস্টদের ইন্টারোগেট করতেন। হয়তো গুজব শুনে থাকবেন, আমেরিকা অন্য দেশের বন্দিদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করে। এই কাজে মিস্টার অ্যালারিকো সেবাস্তিয়ানের তুলনা ছিল না। মাত্র আধঘণ্টার ভিতর সব তথ্য আদায় করতেন। কিন্তু তিনজন টেরোরিস্ট একইসঙ্গে মারা পড়তেই চলে আসতে হলো আমেরিকা থেকে।'

তিরতির করে কাঁপতে শুরু করেছে ক্যারেন কুম্বসের ঠোঁট। বিস্ফারিত চোখে রানার দিকে চাইল সে।

আঙুল দিয়ে মেয়েটার ডান বাহু স্পর্শ করল রানা। খুব

ঘনিষ্ঠ কাউকে এভাবে ছোঁয়া হয়। অত্যাচার করা হচ্ছে না, উল্টে আদর করে স্পর্শ করছে— সারাশরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠল ক্যারেনের। ঝটকা দিয়ে সরে যেতে চাইল। কিন্তু হাত-পায়ের বাঁধন ওকে এক ইঞ্চির বেশি নড়তে দিল না। ব্যথা দেয়ার ভয় দেখালে তা সবসময় সত্যিকারের ব্যথার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করে। এরই ভিতর ক্যারেন ভাবতে শুরু করেছে ওই লোক কী ধরনের অত্যাচার করবে। বাস্তবে নির্যাতন করলে সেটা খুব সুফল বয়ে আনবে না। ক্যারেনের বিরুদ্ধে ওরই মনকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে ওরা।

সঠিক সময়ে আবারও দায়িত্ব নিল স্বর্ণা। নিজের কল্পনার রাশ টেনে ধরতে চাইছে ক্যারেন, কিন্তু পারছে না। আঁচ করতে চাইছে কেমন হবে সেই ভয়ঙ্কর অত্যাচার। নিজেকে সাহস জোগাতে গিয়ে মনে মনে বলছে: *তোর কিচ্ছু হবে না।*

কিন্তু এখানে স্বর্ণার কাজ মেয়েটার মনোবল ভেঙে দেয়া।

'মিস্টার সেবাস্তিয়ান কোনও মেয়েকে কী করবেন, আমি জানি না,' নরম স্বরে বলল স্বর্ণা। 'কিন্তু একটা কথা বলতে পারি, আমি সে সময় ধারে কাছে থাকতে চাই না।' ক্যারেনের মুখের এক ইঞ্চি তফাতে ঝুঁকে এল ও। কিন্তু দেখতে দিচ্ছে রানাকে। 'যা জানতে চাই জানিয়ে দাও, তোমার কিছুই হবে না। সেক্ষেত্রে শপথ করে বলব, তোমাকে একেবারে ছিঁড়ে ফেলবেন না উনি।'

গম্ভীর চেহারায় মেয়েটার দিকে চেয়ে আছে রানা। স্বর্ণাকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে ক্যারেন। এবং একবার ভরসা করলে নিকোলাস ক্রিস্টোফারের বিষয়ে তো বলবেই, জানতে চাইলে অন্যান্য সব বিষয়েই মুখ খুলবে।

'ক্যারেন, নিকোলাস ক্রিস্টোফার কোথায়?' ফিসফিস করল স্বর্ণা। 'আমাকে বলো সে কোথায়।'

থরথর করে কাঁপছে মেয়েটার গাল। একবার ভাবছে: বলে দিই সব। আবার ভাবছে: বিশ্বাসঘাতকতা করব? এবারের মত সামলে নিল সে, থুতু ছুঁড়ল স্বর্ণার মুখ লক্ষ্য করে। 'যদি আমাকে ধর্ষণ করে, তাও কিছু বলব না তোমাকে!'

মনেই হলো না স্বর্ণা রাগ করেছে। বাম হাতে গাল থেকে থুতু মুছে ফেলল। আবার ঝুঁকে এল ক্যারেনের উপর। ফিসফিস করে বলল, 'একটা কথা তোমাকে বুঝতে হবে, আমি চাই না তোমার উপর ভয়াবহ অত্যাচার নেমে আসুক। ...সত্যিই বলছি। সত্যিই প্রকৃতি রক্ষা করা খুবই জরুরি। হয়তো সেজন্য মরতে চাইছ। কিন্তু জানো না তোমার জীবনে কী ঘটতে চলেছে। ওই কষ্টের কোনও তুলনা নেই। তোমার মনে হবে মরতে পারলে বেঁচে যেতে।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল স্বর্ণা। হতাশ হয়ে হাত নাড়ল। 'মিস্টার সেবাস্তিয়ান, আমাকে মাফ করবেন। আপনাকে যন্ত্রপাতি রেখে আসতে বলা উচিত হয়নি। ভেবেছিলাম মেয়েটা বুঝবে। হাড়ে ড্রিল করার মেশিন বা অন্যান্য ইকুইপমেন্ট আনতে আপনাকে সাহায্য করতে চাই। তারপর কিন্তু আপনাদের দু'জনকে রেখে যাব।' ক্যারেন কুম্বসের দিকে চাইল স্বর্ণা। 'বোকা মেয়ে, আজকের দিন শেষ হওয়ার পর থেকে জীবনে যতবার আয়না দেখবে, ভীষণ ভয়ে চমকে উঠবে তুমি।'

'আমার এমন কিছু নেই যেটা নিকোলাস ক্রিস্টোফারের জন্যে ত্যাগ করতে পারি না,' একগুঁয়ে স্বরে বলল ক্যারেন। 'এই জীবনটাও দিয়ে দিতে পারি।'

'নিজেকে শুধু একটা প্রশ্ন করো— ও তোমার জন্যে কী ত্যাগ করেছে?'

'সে শুধু আমার জন্যে নয়, গোটা পৃথিবীর জন্যে কাজ করছে।'

অন্ধকার হোল্ডের দিকে চাইল স্বর্ণা। মনে হলো কী যেন খুঁজছে। 'কই, আমি তো তোমার কাছেপিঠে তাকে দেখছি না, ক্যারেন। তাদের কেউ কিন্তু সীমাহীন নির্যাতন ও অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে পড়বে না। দূরে কোথাও নিরাপদে আরামে আছে নিকোলাস ক্রিস্টোফার। কিন্তু লাশের টেবিলের উপর বেঁধে রাখা হয়েছে তোমাকে। একবার ভেবে দেখো কী হতে চলেছে। এরপর তুমি হয়তো আরও বহু বছর বাঁচবে, পরে বারবার আফসোস করবে, কেন তখন সব বলে দাওনি। যা করেছ, তাতে অন্তত পনেরো থেকে বিশ বছর জেল হবে তোমার। বেছে নাও নামিবিয়ার জেলখানা, অথবা ইউরোপের কোনও আরামদায়ক জেল। ইউরোপের কারাগারে পানির কষ্ট পেতে হবে না। বাঙ্কে পোকা-মাকড়ও থাকবে না, প্রতিদিন পাঁচ-সাতজন নোংরা পুরুষ নিয়মিত রেপ করবে না। এখন কোন্‌টা চাও বুঝে নিতে হবে তোমাকে।'

দাঁত খিঁচিয়ে বলল ক্যারেন কুম্বস, 'যদি আমার উপর অত্যাচার করা হয়, ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেব।'

ডান ভুরু উঁচু করল স্বর্ণা। 'কী বললে? আমাদের উপর প্রতিশোধ নেবে?' মৃদু আওয়াজ তুলে হেসে ফেলল। 'তুমি তো জানোই না আমরা কারা, কী করে প্রতিশোধ নেবে? তুমি এখনও পরিস্থিতি বুঝতে পারোনি, মেয়ে। ধরে নাও, তোমাকে কিনে নিয়েছি আমরা। তোমার ওই শরীর বা মন এখন আমাদের। যা খুশি করতে পারি। তোমার ছাড়া পাওয়ার কোনও উপায় নেই। যখন থেকে তোমাকে বন্দি করা হয়েছে, তোমার কোনও স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই। আর একটু পর বুঝবে পৃথিবীতে কত কষ্ট থাকতে পারে।'

জবাবে কোনও কথা বলল না ক্যারেন কুম্বস।

'বলে ফেলো, নিকোলাস ক্রিস্টোফার কী প্ল্যান করেছে।

সত্যি বলছি, প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তোমার আর কোনও রাস্তা নেই, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে বললে ততক্ষণ যা ক্ষতি হবার হয়ে যাবে। তার চাইতে এখনই বলে দেয়া তোমার জন্য সবদিক থেকে ভাল হবে। সেক্ষেত্রে শুধু কিডন্যাপিঙের দায়ে তোমাকে তুলে দেয়া হবে সুইটযারল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের হাতে। আমরা অনুরোধ করলে আসিফ হায়দার চৌধুরি তোমার বিরুদ্ধে অ্যাটেম্পটেড মার্ডারের কেস করবেন না।' কথার বেত দিয়ে আঘাত করছে স্বর্ণা, এদিকে গাজর ঝুলিয়ে দিয়েছে নাকের কাছে। 'লোকটা কোথায় আছে তাও বলতে হবে না, ঠিক আছে? শুধু অস্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দাও সে কী করতে চলেছে। আর ব্যস, তোমার জীবন হয়ে উঠবে আগের মত সহজ।'

মাছি তাড়ানোর মত করে হাত নাড়ল স্বর্ণা। 'সুইটযারল্যাণ্ডে কয়েক বছর জেল খাটবে, না তৃতীয় বিশ্বের জেলখানায় যৌবন শেষ করবে? মস্ত ভুল কোরো না, ক্যারেন, ঠিকটা বেছে নাও। বলো, নিকোলাস কী করতে চলেছে।'

ইণ্টারোগেশনের এই কৌশলে একটু পর পর লোভ দেখাচ্ছে স্বর্ণা। বুঝিয়ে দিয়েছে: একবার সব বলে দিলে কী পরিমাণ নরক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবে ক্যারেন কুম্বস। ওর কোনও কিছুই হারাবার নেই, কিন্তু সুযোগ আছে লাভবান হওয়ার।

একটু আগের কঠোর চেহারা পাল্টে গেছে ক্যারেন কুম্বসের, ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে অনিশ্চিত। নিজের উপর আস্থা চলে এসেছে প্রায় শূন্যের কোঠায়।

'তুমি বলে দিলে কেউ জানবে না,' নরম স্বরে বলল স্বর্ণা। 'আমাকে বলো, কী করতে চলেছে। নিশ্চয়ই দুনিয়াজোড়া মানুষকে কিছু দেখাতে চাইছে? আসিফ হায়দার চৌধুরিকে সে সময় ওখানে হাজির রাখতে চেয়েছে। ...সে আসলে কী করবে, ক্যারেন? আমার কথা যদি ঠিক হয়, তুমি শুধু মাথা দোলালেই

হবে।'

নড়ল না কুম্বসের মাথা, কিন্তু দুই চোখের পাতা নেমে আবার উঠল।

'বাহ্, কাজটা কঠিন নয়, তা-ই না,' কোকিলের মত মিষ্টি সুর স্বর্ণার। ও যেন দুষ্টু মেয়েকে ওষুধ খেতে বলছে। 'কী দেখাতে চেয়েছে? আমরা জানি, বেঙ্গুয়েলা স্রোত উষ্ণ করার সঙ্গে সেটার সম্পর্ক আছে।'

মুহূর্তের জন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেল ক্যারেনের মুখ, ঝুলে পড়েছে চোয়াল।

'হ্যাঁ, ক্যারেন। আমরা ওয়েভ-পাওয়ার্ড জেনারেটারগুলো পেয়েছি। সাগর তলের হিটারগুলোও। অনেক আগেই সব বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ক্রিস্টোফারের পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। ওসব নিয়ে ভাবছি না। এখন এই গল্পের শেষ অংশটুকু শোনা জরুরি। খুলে বলো সব।'

একদম নড়ছে না ক্যারেন কুম্বস। কিছুক্ষণ পর হতাশ একটা ভঙ্গি নিয়ে হাত নাড়ল স্বর্ণা। 'এখানে এসে সময় নষ্ট করলাম। আমি তোমার উপকার করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি দেখছি নিজেকে সাহায্য করবে না। তুমি যখন একটু চাও, ঠিক আছে, আমার আর কিছুই বলার নেই। ডিস্কার সেবাস্তিয়ান,' বটমট করে চেয়ার থেকে বেরিয়ে গেল স্বর্ণা। ওর পিছু নিল রানা। পিছনে বন্ধ করে দিল ছেলেরা দরজা।

'ভাল ভয় দেখিয়েছ,' মন্তব্য করল রানা।

ব্ল্যাকবোর্ডের স্ক্রিনে চোখ রেখেছে স্বর্ণা। মুখ না তুলে বলল, 'মাসুদ ভাই, যথেষ্ট ভয় পায়নি। ভেঙেচুরিয়ে বেরিয়ে পড়বে।'

'এখন কী করছে?'

'প্যান্ট ভিজিয়ে দিয়েছে।'

'কতক্ষণ অপেক্ষা করতে দাও?'

'কমপক্ষে আধ ঘণ্টা? এই সময়ে ভাবুক কী ধরনের নির্যাতন আসছে।'

'ভাল ট্রেইনিং নিয়েছ। কিন্তু আধঘণ্টা পর মুখ না খুললে?'

'যথেষ্ট নরম করে নেয়ার সময় পাইনি, কাজেই বাধ্য হয়ে ড্রাগের সাহায্য নিতে হবে। কিন্তু ওই পদ্ধতি ব্যবহার করতে চাই না। শুধু যে সত্য বলবে তা নয়, যা শুনতে চাইব, তাই বলবে।' খুদে স্ক্রিনের উপর থেকে চোখ তুলল স্বর্ণা। কান পেতেছে।

কয়েক মুহূর্ত পর বদ্ধ হোল্ডের ভিতর থেকে ভেসে এল চিল চিৎকার। ভয়ে পাগল হয়ে উঠেছে ক্যারেন।

'ফিরে আসুন! প্লিয! আমি বলব! সব বলব!'

মুখ কালো হয়ে গেল স্বর্ণার। খুশি না হয়ে দুঃখ লাগছে ওর। কোনও মানুষের হৃদয় ভাঙবার ভিতর কোনও কৃতিত্ব থাকে না।

'মন খারাপ হয়ে গেল?' নরম স্বরে বলল রানা।

'হ্যাঁ, মাসুদ ভাই,' আস্তে করে মাথা দোলাল স্বর্ণা। 'যা জানতে চাই সেজন্য বহু মিথ্যা বললাম, ভেঙে দিলাম কারও মন। কেমন যেন করে ওঠে বুকটা। আগামী কয়েক ঘণ্টার ভিতর ক্যারেন কুম্বসের সবই জানব। কিন্তু সেসব তো ও তার মন থেকে বলছে না। এটা যেন কারও তথ্য চুরি করার মত।'

'এখন তো জানলাম তোমার এত খারাপ লাগে, ভবিষ্যতে তোমাকে এ ধরনের কাজ দেব না।'

'কাজটা প্রয়োজন হলে আমিই করব, কারণ এই জাহাজে এটা আমার দায়িত্ব, কিন্তু ছোট হবে মন।'

'একা ফিরতে চাও হোল্ডে?'

'জী। আপাতত কয়েক মিনিট চিৎকার করুক, তারপর যাব। কাজ শেষে আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আপাতত কেবিনে ফিরে বিশ্রাম নিন।'

'আগে এত দারুণ কথা কেউ বলেনি,' ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হয়ে গেল রানা। ভাবছে, মার্ভেল জাহাজটা নিয়ে পৃথিবীর কোথায় না ছুটছে ওরা, কত ধরনের কাজ করে চলেছে। শুধু যে মস্ত সব বিপদের মোকাবিলা করছে, তা নয়, মানসিক ভাবেও প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। ওরা সাধারণ সৈনিক নয় যে আদেশ পালন করলেই কাঁধ থেকে নামিয়ে দিতে পারবে দায়। কখনও আইনের ঘেরের ভিতর থাকছে, কখনও বাধ্য হয়ে হাতে তুলে নিচ্ছে আইন।

কেবিনে ঢুকে পোর্টহোলের উপর পর্দা টেনে দিল রানা। চোখ বুজে আসতে চাইছে ক্লান্তিতে। পোশাক ছেড়ে সুতি টি-শার্ট ও প্যান্ট পরে শুয়ে পড়ল বিছানায়, বুকের উপর টেনে নিল চাদর। ঘুমিয়ে পড়ল তিন মিনিট পেরুনোর আগেই।

সাত

পোর্টহোল দিয়ে রোদ ঢুকেছে, ঠিক যেন তাজা রক্তের মত লাল, চোখ বুজে আস্তে করে পাশ ফিরল রানা। গায়ের ব্যথায় কুঁচকে ফেলল মুখ। মনে হচ্ছে কোনও হেভি-ওয়েট মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে পুরো পনেরো রাউণ্ড লড়েছে। এবং হেরেও গেছে। বড়জোর দু'ঘণ্টা ঘুমাতে পেরেছে। এক সেকেণ্ড পর পুরো সচেতন হয়ে উঠল রানা। খুব কাছেই আওয়াজ হয়েছে, নইলে ঘুম ভাঙত না। আবারও শুরু হয়েছে বিপ-বিপ আওয়াজ। হেডবোর্ড থেকে ফোন তুলে নিয়ে বাটন টিপল রানা। হাই চেপে বলল, 'হ্যায়ো-

'তোর সাধের ঘুম ভাঙাতে চাইনি,' বলল সোহেল। 'কিন্তু গত এক ঘণ্টার ভিতর কিছু জরুরি তথ্য পাওয়া গেছে। বোর্ডরুমে আসতে বলেছি সিনিয়রদের। পনেরো মিনিট পর মিটিং।'

'আসছি।' ঘাড় ও গলার ভাঁজে ফোন আটকে বিছানা থেকে নেমে পড়ল রানা, 'বলতে থাক্, আমি রেডি হই।'

'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অয়েল স্পিল তৈরি করবে নিকোলাস ক্রিস্টোফার। সঙ্গে থাকছে আমাদের দেয়া অস্ত্রসহ মার্সেনারিরা।'

চমকে গেল রানা। 'তাই? গাধাধারের সৈনিকরা ওর সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

চোদ্দ মিনিট পেরুনোর আগেই বোর্ডরুমে ঢুকল রানা। শাওয়ার করেছে বলে এখনও চুল ভেজা। বাবুর্চি মোস্তাফা আবুল এরই ভিতর সবার সামনে নামিয়ে দিয়েছে কফির মগ ও কেকের প্লেট। কফিতে চুমুক দিয়ে স্বর্ণার দিকে চাইল রানা। ল্যাপটপের সামনে বসেছে মেয়েটা।

চেয়ারে চুপ করে বসে আছে জলিল, কাশেম ও নিশাত।

এক মিনিট পর ঘরে ঢুকল সোহেল, ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। 'হ্যাঁ, ঠিক। উপকূলে একটা অয়েল ফ্যাসিলিটি। কোথায় জানি না। আপনার পাইলট জানতে পারে।' ওদিকের কথা শুনছে। তিরিশ সেকেণ্ড পর বলল, 'হ্যাঁ, জানি, এরই ভিতর বন্ধ হতে শুরু করেছে রেডিয়ো ট্যাগ। কিন্তু কয়েকটা এখনও চালু থাকার কথা। ওগুলোর কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করুন।'

সোহেল ফোন রাখবার পর জানতে চাইল রানা, 'গগল?'

'হ্যাঁ, বলেছি উপকূলের দিকে খেয়াল দিতে। নবীকে নিয়ে রিসার্চ করে দেখেছি, কঙ্গো নদীর মুখে সাগরে এক সারিতে

আছে বেশ কিছু অয়েল প্রোডাকশন 'প্ল্যাটফর্ম। সেই অ্যাঙ্গোলার ক্যাবিণ্ডা প্রভিন্স পর্যন্ত।'

'অ্যাঙ্গোলা তো কঙ্গো থেকে দক্ষিণে,' বলল নিশাত।

'হ্যাঁ, আপা।' চেয়ারে বসে পড়ল সোহেল। 'তেল পাওয়া গেছে নদীর উত্তর দিকে। কমপক্ষে কয়েক বিলিয়ন ব্যারেল। ইন্টারনেটে জানলাম কুয়েতের চেয়ে অ্যাঙ্গোলা থেকে বেশি তেল সংগ্রহ করে ইউএসএ।'

স্বর্ণার দিকে চাইল রানা। 'আমাদেরকে সব খুলে বলবে?'

পিঠ টানটান করে বসল স্বর্ণা। 'আপনারা সবাই জানেন, নিকোলাস ক্রিস্টোফার নিজ শেয়ার আসিফ হায়দার চৌধুরিকে কিনতে বাধ্য করে। এরপর থেকে ওই বিপুল টাকা খরচ করেছে পরিবেশবাদী দলগুলোর পিছনে। এরা দক্ষিণ আমেরিকায় রেইন ফরেস্ট রক্ষা করতে চেয়েছে, পোচিং-এর বিরুদ্ধে কাজ করেছে। কিন্তু এসব করতে গিয়ে ক্রিস্টোফার বুঝল, এত টাকা খরচ করেও পৃথিবীর সামান্যতম পরিবর্তন আনতে পারেনি। আসলে চট্ করে বদলে দেয়া যায় না মানুষকে, প্রকৃতি-রক্ষার কথাবার্তার থোড়াই পরোয়া করে তারা। নিকোলাস হয়তো এক শ'টা জানোয়ারকে বাঁচিয়েছে, তাদের জন্য সামান্য জমি আদায় করতে পেরেছে, কিন্তু গোটা পৃথিবীর কোনও উপকার হয়নি। অনেকে বলে তারা প্রকৃতির সন্তান, ভালবাসে তাকে, তাকে রক্ষা করতে চায়, কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে, এর পেছনে কেউ এক পয়সা খরচ করবে না।'

'কাজেই চরম সিদ্ধান্ত নিল সে?' বলল রানা।

'আসলে পাগল হয়ে উঠল লোকটা,' এক মুহূর্ত কমপিউটার দেখে নিল স্বর্ণা। 'ক্যারেন কুম্বসের কথা অনুযায়ী ক্রিস্টোফার একদল উন্মাদের সঙ্গে মিশতে লাগল। এদের কাজ ছিল দামি বাড়িঘর ও গাড়ি পুড়িয়ে দেয়া। গাড়ির ট্যাঙ্কের ভিতর রেখে

দেয়া হতো বালি বা গলফ বল।'

'গলফ বল?' বলল নিশাত।

'ধীরে ধীরে ডিজেলের ভিতর গলে যায় গলফ বল। জড়িয়ে পেঁচিয়ে যায় সব রাব্বার। ওটা চিনি বা লবণের চেয়ে বেশি ক্ষতি করে ইঞ্জিনের। ক্রিস্টোফারের কথা অনুযায়ী সে কমপক্ষে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি করেছে মানুষের। কিন্তু তাতে পৃথিবী রক্ষার কাজ এগোয়নি। তখন সে ভেবেছে বড় বড় অয়েল কোম্পানির টপ এগযেকিউটিভদের কাছে চিঠির মাধ্যমে বোমা পাঠাবে। পরে ভেবে দেখেছে, এসব করতে গেলে মরবে শুধু ডাকঘরের নিরীহ কেরানী। সে এ-ও বুঝল, এসব করে কারও জীবন বদলে দিতে পারবে না।

'এমন সময় শুনল সামনের কয়েক বছর একের পর এক হারিকেন বা সাইক্লোন আসবে। এটা প্রকৃতির খেয়াল। কিন্তু মিডিয়া বলতে শুরু করবে এসব হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে। তখন ক্রিস্টোফার ভাবতে লাগল এসব ঝড়কে আরও প্রচণ্ড করে তুললে কেমন হয়?'

'তার মানে আমরা ঠিকই ধরেছি,' বলল কাশেম। 'কাজেই নামিবিয়ার সাগরে হিটার বসাল সে।'

'পরিবেশবাদীদের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করল, নতুন পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে লাগল। পৃথিবীর সেরা ক্লাইমেটোলজিস্ট ও ওশনোগ্রাফারদের চাকরিতে নিল। তাদের কাজ হিটারগুলোর আকৃতি ও লোকেশন বের করা। ক্যারেন কুম্বস বলেছে, এসব বিশেষজ্ঞদের বলা হয়েছিল রিসার্চের কারণে এসব তথ্য দরকার, বাস্তবে ওই ধরনের মেশিনারি তৈরি করা হবে না। তারা হিসাব কষে জানিয়ে দিল সাগরের পানির তাপমাত্রা কত বাড়লে পাল্টে যাবে বেঙ্গুয়েলা স্রোত। আমরা আগেই আলাপ করেছি, সাগরে যত বেশি হিটার কাজ করবে, তত বাড়বে এভাপোরেশন,

আসতে থাকবে একের পর এক বিশাল ঝড়।

'একবার সামুদ্রিক ঝড় তৈরি হলে কখনোই সেটাকে বদলে দেয়া যায় না। এমন কী নিউক্লিয়ার বোমা মেরেও না। ঝড়ের চোখ সব সময় ঠিক থাকে, বাতাসের বেগ বা গতিপথ পাল্টে যায় না। কিন্তু ক্রিস্টোফার ভাবছে এসব ঝড়কে কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করবে। প্রতিটা হয়ে উঠবে স্যাফির-সিম্পসন স্কেলের ফাইভ ক্যাটাগরির চেয়ে বেশি।'

'এসবের সঙ্গে অয়েল ফ্যাসিলিটি উড়িয়ে দেয়ার সম্পর্ক কী?' জানতে চাইল নিশাত।

'মিডিয়াকে কাজে লাগাবে সে। তারা ভয় দেখাবে সাধারণ মানুষকে। কঙ্গো নদীর কাছে যে তেল উত্তোলন চলছে, সেখানে অনেক বেশি বেনযিন আছে, পৃথিবীতে অন্য কোনও তেলক্ষেত্রে এত নেই। আলাস্কার ক্রুড অয়েলে এক হাজার ভাগের এক ভাগ থাকে। কিন্তু কঙ্গো বা অ্যাঙ্গোলার নতুন তেলক্ষেত্রে পাওয়া গেছে এক শ' গুণ বেনযিন। এসব ক্রুডের সঙ্গে থাকে আর্সেনিক। এসবই পরিশোধিত হয় রিফাইনারিতে, কিন্তু যখন মাটির ভিতর থেকে তোলা হয়, সেটার সঙ্গে ঘন ভাবে মিশে থাকে বেনযিন আর্সেনিক অ্যাসিড। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছে ওটার কারণে নানা ধরনের ক্যান্সার হয়।'

'উন্মাদ লোকটা শেষে পশ্চিম আফ্রিকার মানুষের উপর হামলে পড়ছে?' বলল জলিল।

'ঠিক তা করছে না। অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কিন্তু তার মূল উদ্দেশ্য অন্য। সাগরের পানিতে তেল মিশবে সেজন্য সময় পেতে চাইছে।'

'তারপর ঝড়ের হাওয়ায় মিশে সেই বিষ রওনা হবে পশ্চিমে,' মন্তব্য করল রানা। ওর মনে পড়ল, আসিফ হায়দার চৌধুরিকে দু' চোখে দেখতে পারে না নিকোলাস ক্রিস্টোফার।

এরপর আমাদের বঙ্গোপসাগরে প্রচণ্ড ঝড় তৈরি করবে। তার আগেই একে ঠেকাতে হবে।

'ঝড়ের সঙ্গে এত বেশি টক্সিন থাকবে না যে আমেরিকার মানুষ মরবে,' বলল স্বর্ণা। 'কিন্তু ভয় পাবে সবাই। উপকূলের দিকে আসছে বিষাক্ত হারিকেন। আপাতত ক্রিস্টোফার সবাইকে ওই আতঙ্কের ভিতর রাখতে চাইছে।'

'ধরে নিলাম অনেক তেল ফেলল সাগরে,' বলল কাশেম। 'কিন্তু বড় কোনও ক্ষতি হওয়ার আগেই তো তেল ছেঁকে তুলে নেয়া যায়?'

'দুটো কারণে কাজটা কঠিন হবে,' বলল রানা। 'প্রথম কথা, এদিকের দেশে অয়েল স্পিলের জন্য কঠোর কোনও আইন নেই। জাহাজ বা কন্টেইনমেন্ট বুমগুলো নষ্ট হবে। দ্বিতীয় কথা, আমি যদি ভুল বলি, আমাকে ধরিয়ে দিয়ো, লোকটা কয়েকটা রিগ নষ্ট করবে। সেক্ষেত্রে যথেষ্ট ইকুইপমেন্ট থাকলেও অনেক বেশি সময় নেবে ক্লিনআপ ক্রুরা।'

'এককথায় পৃথিবীর আরও ক্ষতি হবে,' সায় দিল স্বর্ণা। 'দুর্ঘটনাবশত কোনও ট্যাঙ্কার থেকে তেল পড়লে সেটা থামাতে পারে স্থানীয় ক্রুরা। কিন্তু রিগ অন্য জিনিস। তার উপর ওগুলোকে পাহারা দেবে মার্সেনারিরা। রিগ নষ্ট করবে, উপড়ে ফেলবে পাইপলাইন। কে ঠেকাবে তাদেরকে?'

'অয়েল এভাপোরেট হওয়ার কতটা সময় পর পরিবেশে মিশবে?' জানতে চাইল নিশাত।

'একেবারে শুরু থেকেই,' বলল স্বর্ণা। 'ধরুন এক সপ্তাহ পর আটলান্টিক পেরুবে বিষাক্ত ঝড়। এ-সময়ে রিগ দখল করে রাখবে মার্সেনারিরা। যদি কয়েক দিন ধরে তেল ফেলে, সেই স্পিল হবে একসন ভালদেজের অয়েল স্পিলের এক শ' গুণ।'

সবার উপর চোখ বুলিয়ে নিল রানা। 'তার মানে আমাদের

কাজ এসব রিগ মুক্ত রাখা। এরই ভিতর যদি দখল করে থাকে, নতুন করে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে হবে।'

'তাতে সমস্যা আছে,' টেবিলের উপর হাত রাখল সোহেল। 'স্বর্ণা বলল, নিকোলাস ক্রিস্টোফার অয়েল ফ্যাসিলিটি দখল করতে ভাড়া নিয়েছে টমাস গাধাধারের লোকজনকে।'

মাথা দোলাল স্বর্ণা। 'হ্যাঁ। ক্যারেন কুম্বস তা-ই বলছে। কয়েক মিলিয়ন ডলার পাবে বলে লোক পাঠিয়েছে গাধাধার।'

'সমস্যা ওখানেই,' বলল সোহেল। 'আমাদের দেয়া একে-৪৭, অ্যামিউনিশন বা আরপিজি থাকবে কমপক্ষে দু' শ' তিন শ' লোকের হাতে। তারা খুশি মনে অয়েল রিগের ক্রুদের বর্ম হিসাবে ব্যবহার করবে। আমরা মার্ভেল নিয়ে হামলা করতে পারব না। নতুন করে প্রোডাকশন প্ল্যাটফর্ম দখল করতে হলে কয়েকটা দল তৈরি করতে হবে। জাহাজে আমরা সবাই লড়তে জানি, কিন্তু গাধাধার যদি পাঁচটা রিগে এক শ' এক শ' করে পাঁচ শ' লোক বসিয়ে দেয়, যুদ্ধে আমাদের তিন ভাগের দুই ভাগ লোক মারা পড়বে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'অ্যাঙ্গোলান আর্মি বা পুলিশ আমাদেরকে সাহায্য করবে না। ওদের অর্গানাইয্ড্ হতেই কয়েক দিন লাগবে। ততক্ষণে কঙ্গো ডেলটা ভরে উঠবে ক্রুড অয়েলে। গাধাধারের লোক স্যাবোটাজও করতে পারে, সেক্ষেত্রে রিগ থেকে তেল ছড়িয়ে পড়া ঠেকানো যাবে না।'

'হয়তো কোনোভাবে ওদেরকে ঠেকালাম, কিন্তু তার পরদিন আমরা সরে যেতেই আবার রিগ দখল করল,' মন্তব্য করল নিশাত।

সবাই চুপ হয়ে যাওয়ায় থমথম করছে বোর্ডরুম।

দশ সেকেণ্ড পর দরজায় টোকা দিল কে যেন। ঘুরে চাইল রানা। এইমাত্র এসেছে কার্টা অস্টিন। ওকে দেখতে বেশ তাজা

লাগছে। মেয়েটির পরনে ব্যাগি শর্টস ও সাদা টি-শার্ট। পেটের পাশে স্লিঙে ঝুলছে হাত। নিতম্ব পেরিয়ে নেমেছে লালচে চুল। এই প্রথম মেকআপ করা কার্টাকে দেখল রানা। মাসকারা ও শ্যাডোর কারণে গভীর মনে হলো সাগর-নীল চোখদুটোকে। ব্লাশ আড়াল দিয়েছে ওর শারীরিক দুর্বলতাকে। টসটস করছে কমলার কোয়ার মত দুই লোভনীয় ঠোঁট।

'আশা করি বিরক্ত করছি না,' বলল কার্টা। হাসিটা জানিয়ে দিল, ও জানে এখানে অনাহূত।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'মোটেই নয়। এসো। কেমন বোধ করছ?'

'থ্যাঙ্কস, ভাল। ডক্টর রাইনার বলেছে কয়েক সপ্তাহের ভিতর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠব। ...বাবুর্চির কাছে শুনলাম কীভাবে সবাইকে উদ্ধার করেছ। শুধু যে দলের সবাইকে রক্ষা করেছ...'

'আমরা সবাই মিলে মিশন সফল করেছি,' বলল রানা।

'এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় গলার আওয়াজ পেয়ে থেমেছি। মনে হলো "হ্যালো" বলে যাই। হ্যালো, এভরিবডি!'

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে ফিরতি পথ ধরল কার্টা।

ও চলে যেতেই সরাসরি আগের প্রসঙ্গে ফিরল সোহেল, 'এই পরিস্থিতিতে স্থির করতে হবে আমরা কী করব।' নিজেই বলল, 'অ্যাঙ্গোলা ও কঙ্গোর সরকারের সঙ্গে কথা বলতে পারি। তাদের জানানো যেতে পারে, যে-কোনও সময়ে তাদের রিগগুলোর উপর টেরোরিস্ট হামলা আসবে।'

'দুই দেশের ভিতর কেমন সম্পর্ক?' বলল লবী।

'খুব ভাল নয়,' বলল সোহেল।

'এসব অয়েল কোম্পানির নিজস্ব সিকিউরিটি ফোর্স নেই?' জানতে চাইল কাশেম। 'থাকার তো কথা।'

'রানা কী ভাবছিস?' জানতে চাইল সোহেল।

'হ্যাঁ?' আকাশ থেকে পড়ল রানা।

'তোর মন এখানে নেই।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, দরজার দিকে রওনা হয়ে বলল, 'একটা কাজ সেরে আসি।'

কেউ কিছু জানতে চাওয়ার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রানা। বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে মাথা। ভাবছে। সব সময় যে-কোনও সিদ্ধান্ত নেয়া ওর জন্য সহজ ছিল, কিন্তু এখন কাজে নামবার আগে অন্যের সঙ্গে আলাপ করে নিতে হবে। কার্টা প্রায় চলে গেছে নিজ কেবিনের কাছে, এমন সময় দ্রুত পায়ে ওর পাশে পৌঁছে গেল রানা।

'রানা, হঠাৎ মিটিং ছেড়ে চলে এলে যে?' ঘুরে চাইল কার্টা।

ভীষণ গম্ভীর রানার মুখ।

'চ্যালেঞ্জার জাহাজে হীরা আছে, তুমি পুরোপুরি নিশ্চিত?'

'ঠিক বুঝলাম না কী বলতে চাও।'

'এইচএমএস চ্যালেঞ্জার। তুমি কতটা নিশ্চিত ওটার ভিতর হীরা আছে।'

'কী করে বলব?'

'তুমি জুয়া খেললে দুই পক্ষের ভিতর কোন্ পক্ষে বাজি ধরতে? হীরা পাওয়ার সম্ভাবনা এক শ' ভাগে এক ভাগ? না এক হাজার ভাগে এক ভাগ?'

দশ সেকেণ্ড কী যেন ভাবল কার্টা, তারপর বলল, 'সে সময়ে জিম উফোর্ড আফ্রিকার সেরা গাইড ছিল। অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি চিনত কালাহারি মরুভূমিকে। আমার ধারণা, সবাইকে নিয়ে মরুভূমি পেরুতে পেরেছিল সে। ওরা যখন উপকূলে পৌঁচেছিল, তখনও তাদের কাছে হীরা ছিল।'

'ঠিক আছে, এটা জানতেই এসেছিলাম।'

রানা ঘুরে রওনা হওয়ার আগেই ওর বাহুর উপর হাত রাখল

কার্টা। 'আসলে কী ভাবছ তুমি? হঠাৎ হীরার প্রসঙ্গ তুললে যে?'

'কারণ, যারা আমাদেরকে সাহায্য করবে, তাদেরকে বলব বিনিময়ে প্রচুর হীরা বা টাকা পাবে।'

'কিন্তু তুমি তো জানো না চ্যালেঞ্জার কোথায়। হয়তো ওটা খুঁজে বের করতে কয়েক বছর লেগে যাবে।'

মৃদু হাসল রানা। 'সাহায্য চাইব এক বন্ধুর কাছে। সে খুঁজে বের করবে ওই জাহাজ।'

'হীরাগুলো কাদেরকে দিতে চাও? এবং কেন?' রানার দৃঢ় কণ্ঠ শুনে কিছুক্ষণের জন্য কার্টা ভুলে গিয়েছিল আসলে ও কোন্ কোম্পানি থেকে এসেছে। 'এক মিনিট, রানা! ওই হীরা তোমার নয়! ওগুলোর আদি মালিক আমার কোম্পানি!'

'কিন্তু হারিয়ে গেছে ওদের কাছ থেকে। মেরিটাইম আইন অনুযায়ী কেউ সাগরে দামি জিনিস পেলে, সেটা নিজের কাছে রাখতে পারবে। ...এবার চলো হাঁটতে হাঁটতে বলি কেন তাদেরকে টাকার ভাগ দিতে চাই।'

কার্টাকে নিয়ে প্রথমে নিজ কেবিনে ফিরল রানা। সিন্দুক থেকে বের করল একটা থলি। ওটা নিয়ে চলে এল গেস্ট সুইটের সামনে। দরজায় টোকা দিল।

ওদিক থেকে ম্যাথিউস জাস্টাস বললেন, 'আসুন।'

ভিতরে ঢুকে মানুষটাকে লিভিং রুমের মেঝেতে পেল রানা। তাঁর সঙ্গে আরও চারজন লোক। প্রত্যেকে আহত, শরীরে পুরু ব্যাণ্ডেজ। মেঝের উপর এলোমেলো ভাবে পড়ে আছে লাঠি ও ক্রাচ। তাদের প্রিয় নেতাকে ফিরে পেয়ে সবাই খুশি।

উঠে দাঁড়াতে চাইলেন ম্যাথিউস জাস্টাস, কিন্তু হাতের ইশারা করে উঠতে মানা করল রানা।

মৃদু হাসলেন জাস্টাস। 'আপনার ডাক্তার বলেছেন নকল পা লাগবে না, এই আসলটাই ঠিক করে দেবেন।'

'শুনে সত্যিই খুশি হলাম।' ঝুঁকে পড়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল রানা। 'আমি আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত কিছু কথা বলতে চাই।'

'নিশ্চয়ই, ক্যাপ্টেন।' অনুচরদের কিছু বললেন জাস্টাস। তারা মেঝে থেকে উঠল, চলে গেল বেডরুমে। পিছনে বন্ধ করে দিল দরজা।

সরাসরি মূল কথায় এল রানা। 'বর্তমান সরকারকে সরিয়ে দিলে যিম্বাবুইয়ের উন্নতির সম্ভাবনা কতটুকু?'

'আপনি পুরুষ-মানুষ, কাজেই দুই পুরুষের ভিতর যেমন আলাপ হওয়া উচিত, ঠিক সেভাবেই কথা হোক। আমাদের হাতে অসংখ্য যোদ্ধা আছে, কিন্তু ভাল অস্ত্র নেই। এখন যদি অস্ত্র ছাড়া বিপ্লব করতে যাই, জান্তা সরকার নিরস্ত্র লোকের উপর গুলি চালাবে। ওই ক্ষমতালিপ্সু লোকগুলো আসলে মানুষ নয়, একেকটা রক্ত-পিশাচ। ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে যে-কোনও কিছু করবে।'

'তাদেরকে গদি থেকে নামাতে আপনার কী কী লাগবে?'

'সমস্যার তো শেষ নেই। প্রথমেই লাগবে টাকা, অস্ত্র ও সময়।'

'সময় আমাদের নেই, কিন্তু আপনাদের বিপ্লব শুরু করার জন্যে বোধহয় বেশ কিছু টাকা দিতে পারব।'

'ক্যাপ্টেন, আমি জানি আপনি সাহসী এবং সৎ মানুষ। কিছু টাকা হয়তো দিতে পারবেন। কিন্তু বিপ্লব শুরু করতে হলে আমাদের কমপক্ষে এক কোটি ডলার লাগবে।'

'মিস্টার জাস্টাস, আমি আপনার এর চাইতে অনেক বেশি টাকার কথা ভাবছি।' রানা চুপ হয়ে গেল। জাস্টাস আগে বুঝে নিন, কী বলা হচ্ছে। দশ সেকেণ্ড পর বলল ও, 'টাকাগুলো আপনাদের হাতে আসতে পারে, কিন্তু বদলে আমাকে কিছু

দেবেন।'

'টাকার কথা আপাতত না-ই বা উঠল,' বললেন জাস্টাস। 'বন্ধুদের ভিতর টাকা নিয়ে কথা না হওয়াই ভাল। ...আপনি আসলে আমার কাছে কী চাইছেন?'

'আপনার সেরা এক শ' যোদ্ধা,' বলল রানা। একটু বিরতি নিয়ে খুলে বলল সামনে কী ঘটতে চলেছে। চুপ করে সব শুনলেন জাস্টাস। রানা যখন হারিকেন ও সাইক্লোনের কথা বলল, বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল কার্টা।

'আমার লোক তাদের সন্তানদের জন্য, দেশের ভবিষ্যতের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত,' একটু ভেবে নিয়ে বললেন জাস্টাস। 'আপনি চাইছেন আমি যেন আমার লোকদের ভিন্ন এক যুদ্ধে পাঠাই। এ থেকে কিছুই পাবে না ওরা, মাঝখান থেকে প্রাণ হারাতে পারে। আমার জন্য যা করেছেন, আপনি চাইলে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে লড়ব আমি। কিন্তু, ক্যাপ্টেন, আমার লোকদেরকে আমি এই ঝুঁকি নিতে বলতে পারি না।'

'আপনারা স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, এখন নতুন করে লড়বেন দেশের গণতন্ত্রের জন্য, সত্যিকার মুক্তির জন্য,' যুক্তি দিল রানা। 'আমি একটু আগে যে লড়াইয়ের কথা বললাম, সেটা লড়লে অস্ত্র কেনার টাকা হবে। তা ছাড়া যত অস্ত্র আমরা দখল করব, সব পাবে তারা। আপনারা সহজেই সরকার উৎখাতের কাজ শুরু করতে পারবেন। আবারও গণতন্ত্র ফিরবে দেশে। আমি আপনাকে মিথ্যা বলব না, লড়াই শেষে কেউ কেউ ফিরবে না। কিন্তু ওই আত্মত্যাগের কারণে তাদেরকে মস্ত বীর বলে মনে করবে আপনার দেশের মানুষ। সবাইকে খুলে বলুন, যুদ্ধে গেলে উপকৃত হবে দেশ, বদলাবে দরিদ্র মানুষের ভাগ্য—জেনে নিন তাদের মতামত।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ম্যাথিউস জাস্টাস। তারপর চোখ

রাখলেন রানার চোখে। 'ঠিক আছে। আমরা একটা ইণ্ডাবা করব। ওই মিটিঙে রাখঢাক না করে সবাইকে সব খুলে বলব।' বেডরুমের দরজা দেখালেন তিনি। 'সব শুনে ওরাই ঠিক করুক কী করবে।'

'আপনার কাছ থেকে এর বেশি কিছু চাই না,' মানুষটার সঙ্গে আবারও হ্যাণ্ডশেক করল রানা। হাতের থলি উপুড় করে ঢেলে দিল জাস্টাসের পাশে কার্পেটের উপর। গাধাধারের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে ওই হীরা পাওয়া গেছে। 'ধরে নিন আপনাদের সবার মঙ্গল কামনায় এটা দিচ্ছে আমার দেশ। যে সিদ্ধান্তই হোক, এগুলো আর ফেরত দিতে হবে না। ডেস্কের উপর ইণ্টারকম পাবেন। কমিউনিকেশন অফিসারকে বললে সে আমাকে ডেকে দেবে।'

করিডোরে বেরিয়ে আসতেই রানার বাহু আঁকড়ে ধরল কার্টা। 'যা বললে সব ঠিক? ওই হীরাগুলো কোথা থেকে পেলে?'

'একটা কথাও মিথ্যে বলিনি। কয়েক বছর ধরে পরিকল্পনা করেছে নিকোলাস ক্রিস্টোফার। তাকে ঠেকাতে হলে এখনই নিজেদের তৈরি রাখতে হবে। ...আর হীরা? সে এক বিরাট লম্বা কাহিনি।'

'তার মানে নতুন এই কাহিনি জানতে হলে আমাকে আরও অপেক্ষা করতে হবে?'

'সরি, কিন্তু ঠিকই ধরেছ। আপাতত মিটিঙে ফিরব। সবাই মিলে পরিকল্পনা তৈরি করব।'

হাত ছেড়ে দিল কার্টা। 'শুধু একটা কথা বলব, আমি তোমার সঙ্গে আছি, রানা। যে-কোনও সাহায্যে আসতে পারলে সত্যিই খুশি হব।'

'ঠিক আছে। হারিয়ে যাওয়া জাহাজটা খুঁজব আমরা, ওটা পেলেই তোমার কাজ শুরু হবে। তুমি তোমার বসদের বোঝাবে:

তোমার পরিচিত একজন পেয়ে গেছে হীরা। এখনই কিনে নিতে হবে সব হীরা, নইলে সব ছড়িয়ে পড়বে বাজারে!'

'এ-ই বলব?' হেসে ফেলল কার্টা। 'বেশ, তোমার জন্য তা-ই করব। খুশি মনে।'

'থ্যাঙ্কিউ,' হাসল রানা। 'বসের সঙ্গে হীরার ব্যাপারে কথা হয়েছে আমার, আমার প্রস্তাবে তিনি রাজি হবেন।'

'কী প্রস্তাব?'

'পরে বলব। শুধু এটুকু জেনে রাখো, ওসব উদ্ধার হলে রক্তচোষা হীরা ব্যবসায়ীদের চাকরি করতে হবে না তোমাকে আর কোনদিন।'

'আর তুমি?'

'আমি আমার দেশের জন্যে কাজ করতে থাকব।'

'তুমি কোন্ দেশের মানুষ, গো?'

'বাংলাদেশ নামে ছোট্ট একটা দেশে আমার জন্ম। যে দেশের মানুষ রক্ত দিয়েছে মাতৃভাষার জন্য। পাকিস্তানি নেকড়েদের বিরুদ্ধে লড়েছে, ছিনিয়ে নিয়েছে স্বাধীনতার সোনালী সূর্য।'

'এইজন্যেই এই বিপ্লবীদের প্রতি তোমার এত সহানুভূতি?'

কার্টার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বোর্ডরুমের উদ্দেশে রওনা হলো রানা। মাঝে একবার কেবিনে থামল। শিপ টু শোর সাত মিনিট কথা বলল বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের সঙ্গে। ফোন রেখে খুশি মনে যোগ দিল মিটিঙে।

মিটিং শেষ হতে রায়হানকে ডেকে নিল রানা একপাশে।

'ভিনাসের সঙ্গে পরিচয় আছে?'

'ওস্তাদ ল্যারি কিং-এর ভিনাস?'

'হুঁ। তার কাছ থেকে একটা খবর জেনে নিতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই পারব। অবশ্য যদি খবরটা তার জানা থাকে।'

'ঠিক আছে। ঘণ্টা দুয়েক পর তুমি আমার সঙ্গে দেখা কোরো। ঠিক আছে?'

'নিশ্চয়ই, মাসুদ ভাই।'

আট

সরাসরি উত্তর দিক লক্ষ্য করে ছুটছে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস, যেন ক্ষিপ্র কোনও গ্রে-হাউণ্ড। আসন্ন যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে সবাই। কাজ চলছে চারপাশে। আর্মারিতে জাহাজের দু'জন ক্রু ব্যস্ত, আনপ্যাক করছে অস্ত্র। এসব তুলে দেয়া হবে ম্যাথিউস জাস্টাসের সৈনিকদের হাতে। আরও পাঁচ ক্রু অস্ত্র থেকে পরিষ্কার করছে তেল ও গ্রিয, লোড করছে কয়েক শ' ম্যাগাযিন। এই দলের কয়েকজন ভেসেলের ডিফেন্সিভ সিস্টেমগুলো পরীক্ষা করছে, নিশ্চিত হচ্ছে অ্যামিউনিশন বিনগুলো পুরোপুরি ভরা রয়েছে। লবণাক্ত পরিবেশে জং ধরেনি মেশিন গান, গ্যাটলিং গান ও অটোক্যাননের ভিতরের অংশে।

জাহাজের গভীরে মুন পুলে সাবমারসিবল দুটো পরীক্ষা করে দেখছে টেকনিশিয়ানরা। জলযান দুটো থেকে সব ধরনের CO_2 স্ক্রাবারগুলো খুলে ফেলা হয়েছে। এখন বাড়তি লোক নেবে সাবমারসিবল। চারপাশে প্রচণ্ড আওয়াজ, কমপ্রেসার দিয়ে ভরা হচ্ছে বারোটা স্কুবা ট্যাঙ্ক। প্রয়োজনে ওগুলো ব্যবহার করবে

ক্রুরা।

কিচেনে মোস্তাফা আবুলের নির্দেশে কমব্যাট রেশন তৈরি করছে তার অ্যাসিস্ট্যান্টরা, তাদের রান্না শেষ হলেই ডাইনিং স্টাফরা এয়ারটাইট প্যাকেটে ভরছে খাবার। এদিকে মেডিকেলে আর্দালিদের নিয়ে অপারেশন থিয়েটার প্রস্তুত রাখছে ফারা রাইনার। ওর ধারণা: সামনের যুদ্ধে অনেকে আহত হবে।

অপারেশন সেন্টারে নিজ সিটে বসে আছে রানা। ওর চারপাশে ব্যস্ত হয়ে যে যার কাজ করছে অফিসাররা। যুদ্ধের জন্য মানসিক ভাবে তৈরি সবাই। ভেসেলের বর্তমান স্ট্যাটাসের বিষয়ে প্রতিটি রিপোর্ট পড়ছে রানা বা সোহেল। ওদের চোখ এড়াচ্ছে না কিছুই।

'সোহেল,' কমপিউটার থেকে চোখ না তুলেই বলল রানা, 'ফায়ার সাপ্রেশন সিস্টেমে পনেরো পাউণ্ড প্রেশার কম।'

'হোল্ডে টেস্ট ট্রিপ করতে বলেছি,' বলল সোহেল। 'এক ঘণ্টা পর আবারও প্রেশার ঠিক হবে।'

'ঠিক আছে। স্বর্ণা, ক্যাপ্টেন আলম সিরাজের ইটিএ কখন?'

'উনি মিস্টার গগল ও রায়হানকে নিয়ে অ্যাঙ্গোলার ক্যাবিণ্ডা থেকে রওনা হয়েছেন। আড়াই ঘণ্টা পর রন্দেভু। দশ মিনিট আগে যোগাযোগ করবেন। তখন জাহাজের গতি কমিয়ে হ্যাঙার খোলা হবে।'

'আর ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসান? উনি কোথায়?'

'যাম্বিয়ায়, তিরিশ হাজার ফুট ওপরে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। বড় তাড়াহুড়ো করে পরিকল্পনা তৈরি করতে হলো। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল ম্যাথিউস জাস্টাসের লোকদের জোগাড় করা। তারা ছিল বতসোয়ানার ফ্রান্সিসটাউনের রিফিউজি ক্যাম্পে। সাব সাহারায় আফ্রিকার বেশির ভাগ দেশের কর্মকর্তারা দুর্নীতিপরায়ণ, কিন্তু

বতসোয়ানায় দুর্নীতি সেই তুলনায় বলতে গেলে নেই-ই। তার পরেও পাসপোর্ট ছাড়া মানুষগুলোকে বিমানে তুলতে গিয়ে যা দিতে হলো, পরিমাণটা চমকে ওঠার মত।

জাহিদ হাসানের বুশ পাইলট বন্ধু নানা দিকের ঝামেলা অনেকটা সামলেছে। অনুমতি মিলেছে ওই বিমান নামতে পারবে ক্যাবিণ্ডায়। আগামী পাঁচ ঘণ্টা পর শহরের প্রধান পিয়ারে ভিড়ে মানুষগুলোকে তুলে নিতে পারবে মার্ভেল।

এরপর আরও উত্তর দিকে ছুটবে মার্ভেল। ওদিকের একটা তেলক্ষেত্রে বিসিআই-এর ট্যাগওয়ালা দশটি রাইফেলের ভিতর তিনটের খোঁজ পেয়েছে গগল ও রায়হান। নতুন একটা বিশাল ট্যাঙ্কার টারমিনাল থেকে পাঁচ মাইল দূরে জলাভূমির ভিতর আছে রাইফেলগুলো। মার্সেনারিরা ওখান থেকে বোটে করে দশ মিনিট গেলেই পৌঁছবে উপকূলীয় অন্তত বারোটা অয়েল রিগে।

এরই ভিতর বিসিআই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে রানা। বাংলাদেশ সরকার থেকে অ্যাঙ্গোলান সরকারের কাছে সতর্কবাণী পৌঁছে গেছে: *আপনাদের তেলক্ষেত্রে টেরোরিস্ট হামলা হতে চলেছে।* কিন্তু কূটনীতির ধীর গতির কারণে এখনও সতর্ক হয়নি অ্যাঙ্গোলার সরকার। বাংলাদেশ সরকারকে কোনও উত্তরও দেয়া হয়নি। পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে তারপর স্থির করবে তারা কী বলবে।

স্লথ গতিতে গৃহযুদ্ধ চলছে ক্যাবিণ্ডা প্রভিন্স জুড়ে। এ কারণে তেলক্ষেত্র লিয নেয়া কোম্পানিগুলো নিজেদের সিকিউরিটি ফোর্স রেখেছে। ট্যাঙ্কার টারমিনাল ও শ্রমিকদের কম্পাউণ্ড ঘিরে দেয়া হয়েছে তারের বেড়ায়। ভিতর থেকে পাহারা দেয় সশস্ত্র গার্ডরা। রানা একবার ভেবেছিল ফোনে কোম্পানির কর্মকর্তাদের সতর্ক করবে, কিন্তু পরে চিন্তাটা বাতিল করেছে। কেউ বিশ্বাস করবে না ওর কথা। আর বিশ্বাস করলেই বা কী? এসব গার্ডদের রাখা

হয়েছে চুরি ঠেকাতে। কোনও আর্মিকে ঠেকানো তাদের সাধ্যের বাইরে। কোম্পানির কর্মকর্তাদের বললে হয়তো সতর্ক হতো তারা, কিন্তু তার মানেই আরও বেশি গার্ড প্রাণ হারাবে।

ইন্টারনেটের প্রোগ্রাম ব্যবহার করে রিকনিস্যান্স করেছে নবী, তাতে দেখা গেছে তেলক্ষেত্রের চারপাশে রয়েছে কয়েক শ' দরিদ্র মানুষের কুঁড়ে ঘর। ওই মানুষগুলোকে যুদ্ধে জড়িয়ে নেয়া ঠিক হবে না, তার চেয়ে ঢের ভাল ফ্যাসালিটির ভিতর লড়াই করা।

অপারেশন্স সেন্টারে ঢুকল সানজিদা স্বর্ণা, ওর পর পর কার্টা অস্টিন। অত্যাধুনিক কমাণ্ড সেন্টার দেখে ওখানেই থমকে গেল ও। সামনের দিকে বালকহেড-এ বিশাল মেইন ভিউ স্ক্রিন, তার ভিতর অন্তত বারোটি দৃশ্য। চারপাশের সবার প্রস্তুতি চোখে পড়ছে। স্ক্রিনে বড় একটা জায়গা নিয়েছে মার্ভেলের বো-র দৃশ্য। সাগর চিরে ছুটে চলেছে জাহাজ।

'স্বর্ণা বলল এখান থেকে ঘুরে যেতে, তাতে ধারণা হবে তোমরা কী ধরনের কাজ করো,' রানার পাশে এসে দাঁড়াল কার্টা। 'কিন্তু এক মিনিট আগে যতটা ছিলাম, এখন তার চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন বোধ করছি। এসব আসলে কী, রানা?'

'এটাই দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসের মগজ,' বলল রানা। 'এখান থেকেই হেলম নিয়ন্ত্রণ করা হয়, ইঞ্জিন, কমিউনিকেশন ও ইন্টিগ্রেটেড ওয়েপন্স সিস্টেম বা সেফটি টিম এখান থেকেই নির্দেশ পায়।'

'তার মানে তোমরা সিআইএ বা এ ধরনের কোনও সংস্থার সঙ্গে জড়িত?'

'ঠিক তা নয়। আমরা প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা রানা এজেন্সির হয়ে কাজ করি। এবার আমাদের কাজ ছিল কঙ্গোর বিদ্রোহীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া। আমরা অস্ত্রগুলো মডিফাই

করি। আগেই ঠিক ছিল এসব অস্ত্র ট্র্যাক করা হবে। এরপর অন্য এক কাজে চলে যাই, বিজ্ঞানী আসিফ হায়দার চৌধুরিকে উদ্ধার করি, কিন্তু তখন জানলাম আমাদের ডবল-ক্রস করা হয়েছে। কাজেই আবারও ফিরতে হলো অস্ত্র ফিরিয়ে নিতে। আর সে সময়েই জানলাম বাঙালি বিজ্ঞানীর এক্স-পার্টনার সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ভয়ঙ্কর প্ল্যান করেছে।'

'এসব অস্ত্রের জন্য পয়সা দিল কারা?'

'কঙ্গোর বৈধ সরকার। বলেছে বিদ্রোহী দলের কাছ থেকে হীরা পেলে সেগুলোও আমরাই পাব।'

'সেই হীরা মিস্টার জাস্টাসকে দিয়ে দিয়েছ সাহায্য পাওয়ার বিনিময়ে?'

'ঠিক ধরেছ।'

'উপার্জনের জন্য এ কাজই করো?' প্রশ্ন করল কার্টা, নিজেই উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, তা-ই করো তুমি!'

'মাসুদ ভাই, আপনার সঙ্গে জরুরি কথা ছিল,' বলল স্বর্ণা।

ওর কণ্ঠস্বর কেমন যেন লাগল রানার কাছে। সিট ছেড়ে উঠে কার্টাকে ওখানে বসতে ইশারা করল। 'জাহাজ চালাও, আমি আসছি।' স্বর্ণার সঙ্গে ঘরের এক কোনায় চলে এল। 'কী হয়েছে, স্বর্ণা?'

'ইন্টারোগেশন নোটগুলো দেখছিলাম, মাসুদ ভাই। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই, তবে মনে হচ্ছে কী যেন লুকিয়েছে কুম্বস।'

'সেটা কী হতে পারে, আন্দাজ করতে পারো?'

'নিকোলাস ক্রিস্টোফারের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। ওর পেট থেকে ওসব বের করেছি। কিন্তু কোথায় যেন কিছু গোপন করেছে।'

'জানলে ভাল হতো,' বলল রানা। 'আমাদের অপারেশনের

বিষয়ে কিছু হতে পারে।'

'পারে। কিন্তু মুখ একেবারেই খোলাতে পারিনি। ...মাসুদ ভাই, হঠাৎ অপারেশনের কথা বললেন?'

'সারা রাত ঘুমের ভিতর দুঃস্বপ্ন দেখেছি। কয়েক বছর ধরে পরিকল্পনা করেছে নিকোলাস, তৈরি করেছে জেনারেটার বা হিটার। তারপর হঠাৎ করেই অয়েল ফ্যাসিলিটির উপর হামলা করছে। কমপক্ষে কয়েক মিলিয়ন টন টক্সিক সাগরে ছাড়বে। ...কিন্তু কেন? ...ঠিক এখন কেন? আটলান্টিক সাগর পার করে বিষাক্ত বাষ্প নামবে জমির উপর। কিন্তু সামুদ্রিক ঝড় তো কখনও নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।'

'আপনি ভাবছেন কোনওভাবে ঝড়কে চালাতে পারবে সে?'

'যতটা জানি কাজটা অসম্ভব। নিজ থেকে তৈরি হয় হারিকেন বা সাইক্লোন। কোনও কোনোটা শক্তিশালী হয় না। আপনা আপনি মিলিয়ে যায়।'

'তা হলে কাউকে চমকে দিতে পারবে না সে।'

'কিন্তু আগেই যদি নিশ্চিত হয় ঝড় হবে প্রবল, এবং তেলের বাষ্প পৌঁছবে তীরে, সেক্ষেত্রে? আমার ধারণা, লোকটা জানে কীভাবে ঝড়কে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।'

'কিন্তু করবে কীভাবে?'

চুল হাতড়াল রানা। 'ঘুমের ভিতর লোকটা বারবার এসেছে। জানি, হারিকেন নিয়ন্ত্রণ করবার সাধ্য কারও নেই, দূরে থাক্ গতিপথ ঠিক করা। কিন্তু লোকটার কথা ভাবলেই মনে হচ্ছে ও এমন কিছু জানে, যেটা আমরা কেউ জানি না। টমাস গাধাধারের লোক শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে হারবে, বন্ধ হবে তেল উৎসরণ, নিকোলাস নিশ্চিত হতে পারবে না হারিকেনের ভিতর তেলের বাষ্প থাকবে— যে-কোনও সময়ে বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে হারিকেন। কিন্তু তা হলে এত নিশ্চিত কেন নিকোলাস

ক্রিস্টোফার? এসবের ভেতর আরও কিছু আছে।'

'আপনি চাইলে ক্যারেন কুম্বসকে আবারও ইন্টারোগেট করতে পারি,' বলল স্বর্ণা। 'তেলক্ষেত্রের টারমিনালে হামলা হবে শুনবার পর তার কাছ থেকে নতুন কিছু জানতে চাইনি।'

ছোট বোনের মত মেয়েটির কথা শুনে গর্ব বোধ করল রানা। সানজিদা স্বর্ণা মনের ভিতর ভীষণ কষ্ট সহ্য করবে, কিন্তু নিজের কাজ শেষ করে তবেই ছাড়বে। এই কষ্ট না দিতে পারলে খুশি হতো ও, কিন্তু নতুন করে আবারও ক্যারেন কুম্বসকে জিজ্ঞাসাবাদ করা জরুরি হয়ে উঠেছে।

'কোনও কিছু সত্যিই গোপন করছে ও,' বলল রানা। 'ওটা খুঁজে বের করো।'

'আমার সাধ্যমত করব, মাসুদ ভাই,' কথা দিল স্বর্ণা।

'কিছু পেলে দেরি না করে আমাকে জানাবে।'

ক্যাবিণ্ডা এয়ারপোর্টে নেমেছে ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসানের বিমান। ভিতরে উৎসাহী এক শ' জন যোদ্ধা। তারা কেউ জানে না, মাত্র দশ মাইল দূরে কঙ্গোলিজ আর্মি অভ রেভোলিউশনের জেনারেল টমাস গাধাধারের সঙ্গে আলাপ করছে নিকোলাস ক্রিস্টোফার। ভোর হতে এখনও দুই ঘণ্টা। একটু আগে জলাভূমির ভিতর গুঞ্জন বন্ধ করেছে কীট-পতঙ্গ। সারাদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছে নিশাচর প্রাণীরা। একটু দূরে উপকূলের কাছে জ্বলছে অয়েল রিগের প্রাকৃতিক গ্যাসের আগুন। এই অত্যাচারের ভিতর জন্তু বা কীট কীভাবে বেঁচে থাকে, জানে না নিকোলাস। ওর চারপাশে বিশ্রাম নিচ্ছে গাধাধারের সৈনিকরা। এদেরকে এককথায় ত্যাগ করেছে লোকটা। আসন্ন মিশনে হয়তো এদের বেশির ভাগই মরবে। সব মিলে পাঁচ শ' জন সৈনিক। তাদের উপর কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে কর্নেল আদি মাধাভ মাধানাকে। দুটো কারণে

তাকে এখানে আসতে হয়েছে। তার প্রথম অপরাধঃ সে কঙ্গো নদীতে অস্ত্র চোরাকারবারীদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারেনি নিজেদের হীরা। দ্বিতীয়ত, টমাস গাধাধার ধারণা করছে তার সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড আদি মাধাভ মাধানা এই ডিল থেকে গোপনে চুরি করেছে হীরা। এই লোক যদি ফিরতে না পারে, মোটেও কষ্ট পাবে না সে।

কঙ্গোর বিদ্রোহী সৈনিকরা লুকিয়ে পড়েছে বিশাল কোম্পানি পেট্রোম্যাক্সের ফ্যাসালিটির চারপাশে। তারা গাধাধারের আর্মির নিয়মিত সৈনিক। পরনে অতি পুরনো পোশাক, দেখলে মনে হবে চাকরি চাইতে এসেছে। তাদের অস্ত্র ও আউটবোর্ড ইঞ্জিন লাগানো বোটগুলো সহজেই লুকিয়ে ফেলেছে ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে। জেলে বা শিকারীরা ফ্যাসালিটির বেশি কাছে এলে গার্ডরা তাদের তাড়িয়ে দেয়।

নিকোলাস ক্রিস্টোফারের কথা শেষ হওয়ার পরও চুপ করে রইল আদি মাধাভ মাধানা।

'কর্নেল,' কর্কশ স্বরে বলল গাধাধার। 'তুমি জানো তোমার কর্তব্য কী।'

বিশাল আকৃতির লোক টমাস গাধাধার, তার সামনে দাঁড়ালে বেশির ভাগ মানুষের বুক কাঁপতে থাকে। এক সময়ে যুদ্ধ করে ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠেছিল তার শরীর-মন, কিন্তু এখন তাকে বলা যায় চর্বির ডিপো। কিন্তু কারও সাধ্য নেই তার কথার এদিক ওদিক করবে। এই লোক ইদি আমিনের ভক্ত, তারই মত সানগ্লাস পরে, হাতে থাকে জলহস্তির চামড়ার চাবুক। বেরেটা কোম্পানির অত্যন্ত দামি কাস্টম-মেড দুটো পিস্তল থাকে কোমরের দুই হোলস্টারে, সেগুলোর গায়ে খোদাই করা সোনার কারুকার্য।

'ইয়েস, স্যর,' দেরি না করে বলল মাধানা। 'উপকূলের

একটু দূরের লোডিং টারমিনালে হামলা করবে এক শ' যোদ্ধা, ওটা দখল করবে। এদিকে আমার ফোর্স সিকিউর করবে এদিকের কম্পাউণ্ড।'

'এটা খুবই জরুরি: তুমি জেনারেটিং স্টেশনের দায়িত্ব নেবে। সে-সঙ্গে পাম্প কন্ট্রোল রুমগুলোরও।' হামলার পরিকল্পনা তৈরি করেছে নিকোলাস ক্রিস্টোফার। 'ওগুলোর ক্ষতি হলে চলবে না।'

'আমার দলের সেরা লোক ওখানে হামলা করবে। দেখতে না দেখতে তারের বেড়া ছিঁড়ে টার্গেটে পৌঁছে যাব আমরা।'

'ভালভাবে বুঝেছেন কন্ট্রোলগুলো কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়?' জানতে চাইল নিকোলাস ক্রিস্টোফার।

'আমাদের অনেকে ওই ধরনের ফ্যাসিলিটিতে চাকরি করত, তারপর আমাদের উপজাতির লোকদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করল সরকার,' বলল মাধানা। 'আমরা এখন আর কঙ্গোর তেলক্ষেত্রে চাকরি পাই না। ভাববেন না, যে মুহূর্তে ওরা বুঝবে টারমিনাল থেকে তেল এসে ভরে উঠেছে ট্যাঙ্কার, ওটার পাম্প চালু করবে। সব তেল গিয়ে পড়বে সাগরে।'

'আর রিগের উপর কী ঘটবে?'

'সাগরের নীচের পাইপগুলো নষ্ট করে দেবে ওরা। তীরের স্টোরেজ ট্যাঙ্কগুলো আর ভরে উঠবে না তেলে।'

বিশাল স্টোরেজ ট্যাঙ্কগুলোর তলি ফাটাতে পারলে খুশি হতো নিকোলাস, কিন্তু সাগরের দিকে জমিতে একটা চড়াই আছে, ওটার কারণে তেল পড়বে না সাগরে। বিশাল এলাকা ধরে তেল ছড়িয়ে না গেলে ভাল করে এভাপোরেট হবে না। গাধাধারকে বলল ক্রিস্টোফার, 'প্রতি ঘণ্টা রিগ আটকে রাখলে, ঠিক ভাবে তেল সাগরে পড়লে, আমি দেব প্রতি ঘণ্টায় এক মিলিয়ন ডলার। সব জমা পড়বে আপনার সুইস ব্যাঙ্কের

হিসাবে।'

'তাতে হঠাৎ করে বিপ্লব সফল হবে না, কিন্তু আমার দলের সবার খাওয়া-পরার কষ্ট কমবে।' নিস্পৃহ শোনাল গাধাধারের কণ্ঠ। ক্রিস্টোফার জানে ওই লোকের পকেটে ঢুকবে সিংহভাগ টাকা। 'আমার সৈনিকদের যুদ্ধে পাঠিয়েছি দেশের ভালর জন্য।'

মার্সেনারি খুঁজতে শুরু করবার পর থেকেই টমাস গাধাধার এবং তার কঙ্গোলিজ আর্মি অভ রেভোলিউশনের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জোগাড় করেছে নিকোলাস ক্রিস্টোফার। এই লোকগুলো সৈনিক নয়, বড়জোর আগ্নেয়াস্ত্র হাতে হিংস্র একদল কসাই। নিরীহ মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার করে তারা, যা পায় ছিনিয়ে নেয়। এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উপজাতীয়দের ভিতরকার সংঘর্ষ। হিউম্যান রাইট্স্ গ্রুপগুলোর ধারণা: সরকারের বিরুদ্ধের লড়বার বদলে নিজ লোক বেশি হত্যা করে কে.এ.আর.। বর্তমান আফ্রিকার রাজনীতিক বা স্বৈরাচারীদের ভাল এক উদাহরণ টমাস গাধাধার।

'ঠিক আছে তা হলে,' বলল নিকোলাস, 'এবার বিদায় নিতে হবে আমাকে।'

আক্রমণ শুরু হওয়ার আগের দিন ক্যাবিণ্ডা থেকে বিদায় নেবে, ঠিক করেছিল সে। কিন্তু এখন আর থাকবার সাহস হচ্ছে না। আশা ছিল এরই ভিতর যোগাযোগ করবে ডুলি গ্রিন। মেয়েটা সবাইকে নিয়ে রন্দেভু সাইটে আসেনি। ফিরে এসেছে বিমান। পাইলটের কাছ থেকে জানা গেছে ওই এয়ারস্ট্রিপে কোনও গাড়ি থেমেছিল। আকাশ থেকে চাকার দাগ অনুসরণ করেছে পাইলট, কিন্তু কয়েক মাইল যাওয়ার পর মিলিয়ে গেছে সেই চিহ্ন। আকাশে চক্কর কাটতে থাকে সে, কিন্তু পরে তেল কমে আসতে ফেরে উইণ্ডহওকে। কোথায় যেন উধাও হয়েছে

ডুলি গ্রিন ও তার দলের সবাই।

পাইলটকে সোজা ক্যাবিণ্ডায় ফিরতে বলেছে নিকোলাস ক্রিস্টোফার। এবার মৌরিতানিয়ার বন্দর-শহর নৌয়াক্‌শটে যাবে, ওখান থেকেই উঠবে এক লাখ টনি প্রাচীন এক সুপারট্যাঙ্কারে। আমেরিকান এক কোম্পানির কাছ থেকে জাহাজটা কিনেছে সে। সুপারট্যাঙ্কারের নাম *মেডিটারেনিয়ান উলফ*, ভূমধ্য সাগরে শেষ করেছে যৌবন, লিবিয়া থেকে তেল নিয়ে গেছে ইউগোস্লাভিয়া ও আলবেনিয়ায়। এখন ওটার অবসর নেয়ার সময় হয়েছে। মালিক পক্ষ ঠিক করেছিল লোহার দামে জাহাজ বিক্রি করবে ব্রেকার্স ইয়ার্ডে।

ক্যারেন কুম্বস বলেছে, অর্গানিক ফ্লোকিউলেন্টের জন্য জাহাজের ট্যাঙ্ক ভাল ইনকিউবেটার হবে। নিকোলাস যে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মকে জাহাজ পরীক্ষার কাজ দেয়, তারা সব দেখে বলেছে, জাহাজের ট্যাঙ্ক এক শ' চল্লিশ ডিগ্রি থার্মাল লোড ঠিকই নেবে। অবশ্য রিপোর্টে আরও বলেছে, তাদের জানা নেই পৃথিবীর কোন্ ক্রুড অয়েল অত উত্তপ্ত হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের টাকা পরিশোধ করবার পর মুচকে হেসেছে নিকোলাস। জাহাজের জন্য লিবিয়ান রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে। সবচেয়ে সহজে ওই দেশ থেকে অনুমতি-পত্র মেলে। জাহাজের নামও পাল্টে নিতে হয়নি তাকে।

হিট জেনারেটিং গ্লু খুব যত্নে রেখেছিল ক্যারেন কুম্বস। ডেভিলস ওয়েসিসের কারাগারে বন্দি হওয়ার অভিনয় করবার সময় সে বলেছে: ঠিক ভাবেই কাজ করছে আঠা। ডুলি গ্রিন বা ওর দল আসতে না পারলেও কিছুই যায়-আসেনি নিকোলাসের, কিন্তু ক্যারেন কুম্বস পাশে থাকলে খুশি হতো সে। মেয়েটাকে ছাড়াও ওই অর্গানিক ফ্লোকিউলেন্ট সাগরে ছাড়তে পারবে, কিন্তু হঠাৎ করেই কোনও সমস্যা তৈরি হলে বিপদ হতে পারে।

ক্যারেনের মগজ থেকেই বেরিয়েছে ওই জিনিস। প্রথম যখন ক্যারেন যোগাযোগ করল নিকোলাসের সঙ্গে, বলেছিল ওটা খুব কাজে লাগবে আপনার। নিকোলাস আগ্রহী হওয়ার পর ক্যারেন বলেছিল, আসিফ হায়দার চৌধুরিকে বিদায় দেয়ার অনুষ্ঠানে নিজেও সে যোগ দিতে চায়।

আসিফ হায়দার চৌধুরিকে ঝড়ের ভিতর ফেলতে চেয়েছিল নিকোলাস। লোকটা দেখত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তুফান কী করতে পারে। তারপর তাকে ফেলে দেয়া যেত উন্মত্ত সাগরে। এত কিছু ঘটছে তো শুধু ওই লোকটার ভুলের কারণেই! আর ওই হারামজাদী মেয়ে? ওই ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসে সোহাগের স্বামীসহ মরবে সে! ডেভিলস ওয়েসিস থেকে বিদায় নেয়ার আগে আসিফ হায়দার চৌধুরিকে নিজ পরিকল্পনা খুলে বলেছে নিকোলাস। লোকটা যদি এখনও বেঁচে থাকে, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে কার সঙ্গে লড়তে গেছে।

সুপারট্যাঙ্কার চালানো কঠিন কাজ, সেজন্য একদল অর্ধ উন্মাদ পরিবেশবাদী দিয়ে চলবে না, বাধ্য হয়েই পেশাদার নাবিক নিয়োগ দিয়েছে নিকোলাস। পয়সা দিয়ে বুজে দিয়েছে তাদের মুখ। জাহাজের ক্যাপ্টেন এক গ্রিক মদ্যপ, পারস্য উপসাগরে এক সুপারট্যাঙ্কার জমিতে গেঁথে দেয়ার পর তার মাস্টার্স লাইসেন্স বাতিল করা হয়। চিফ ইঞ্জিনিয়ারও একজন গ্রিক, কিন্তু মদের বোতল ছাড়া কিছুই বোঝে না। তার জাহাজের ইঞ্জিন রুমে ফাটে স্টিম পাইপ, সেই বিস্ফোরণে মারা পড়ে তার চার অ্যাসিস্ট্যান্ট। বোর্ড অভ ইনকোয়ারি তাকে নির্দোষ ঘোষণা করে। কিন্তু খবর ছড়িয়ে যায়: কাজে অবহেলা করত সে। এরপর থেকে আর কোনও চাকরি হয়নি তার।

জাহাজের নাবিকদের তুলনায় এই দু'জনকে দরবেশ বলতে হবে।

'আপনারা ভোরে আক্রমণ শুরু করবেন?' প্রশ্ন করল নিকোলাস।

'জী, ততক্ষণে আপনি গিয়ে উঠেছেন বিমানে,' কণ্ঠে স্পষ্ট টিটকারির সুর গাধাধারের। তার নিজের যে এখানে লড়তে হবে এমন নয়, অপেক্ষা করছে দ্রুতগামী একটি বোট। ওটাতে করে কঙ্গো নদীর উজানে চলে যাবে সে।

টিটকারির সুর অবহেলা করল নিকোলাস, উঠে দাঁড়াল। 'একটা কথা মনে রাখবেন। প্রতি ঘণ্টায় আপনি পাবেন এক মিলিয়ন ডলার। যদি অয়েল কোম্পানির সিকিউরিটি ফোর্স বা অ্যাঙ্গোলার পুলিশকে আটচল্লিশ ঘণ্টা ঠেকাতে পারেন, বোনাস হিসাবে দেব বাড়তি পাঁচ মিলিয়ন ডলার।' মাধানার দিকে চাইল সে। 'আর আপনার জন্য পাঁচ মিলিয়ন ডলার, কর্নেল।'

'আজ ভোর থেকেই রোজগার করবে আমার লোক,' বলল গাধাধার। 'আপনি বিমানে উঠে নাকে তেল দিয়ে ঘুমান গিয়ে।'

নয়

মার্ভেলের ব্রিজ উইঙে দাঁড়িয়েছে রানা, ক্যাবিণ্ডার প্রধান পিয়ারে উঠছে পুরনো কয়েকটা স্কুল বাস। সবুজ রং চটে গেছে অনেক আগেই, গুঙিয়ে চলেছে ক্লান্ত ইঞ্জিনগুলো, সাইলেন্সার পাইপ দিয়ে বেরুচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়া। নানা কণ্টেইনারের ভিতর দিয়ে আসছে বাসগুলো। মার্ভেলের একটু দূরেই এক রাশান ফ্রেইটার, ওটা থেকে নামানো হচ্ছে ফার্ম ইকুইপমেণ্ট। সবই এসেছে দান হিসাবে।

বড় বেশি অগভীর এই বন্দর, সে কারণে পানি ফেলে দিতে হয়েছে মার্ভেলের ব্যালাস্ট থেকে, উঁচু হয়ে উঠেছে জাহাজ। ব্রিজ থেকে পরিষ্কার চোখে পড়ছে শহরের একাংশ ও দূরের টিলাগুলো। একটু আগে ভোর হয়েছে, আকাশে ফুটেছে ধূসর আলো। ভবিষ্যতে বিপুল তেলের রিজার্ভের কারণে ধনী দেশ হয়ে উঠবে অ্যাঙ্গোলা, কিন্তু শহরের চারপাশের তেলক্ষেত্রে ঠিক ভাবে খনন শুরু হয়নি।

জাহাজের পাশের পাটাতনে এক কাস্টমস অফিশিয়ালের সঙ্গে অপেক্ষা করছে সোহেল ও নিশাত। ওদের পরনে নোংরা পোশাক, ধচাপচা মার্ভেলের সঙ্গে একেবারে মানিয়ে গেছে। পাশে ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসানের বুশ পাইলট বন্ধু। কোনও সমস্যা হলে সেটা সামলাবে সে। আরও রয়েছে ম্যাথিউস জাস্টাসের সার্জেন্ট আমাহ্‌লে। কাস্টম্‌সের লোকটা একটু আগে তার স্ত্রীর হাতে একটা ব্রিফকেস দিয়েছে। মহিলা এসেছিল ঘুষের টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরতে।

অপারেশন্স সেন্টার থেকে ব্রিজে উঠে আসছে এলিভেটার। ওটার দরজা খুলে যেতেই ছিটকে বেরুল স্বর্ণা, জরুরি স্বরে বলল, 'মাসুদ ভাই, আপনার ফোন অফ করা। এদিকে হামলা শুরু হয়েছে। পেট্রোম্যাক্সের ফ্যাসিলিটি থেকে দেলাওয়্যারের হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করেছে সিকিউরিটির চিফ। তার কথা ইন্টারসেপ্ট করেছে রায়হান। ফ্যাসিলিটির গেটে হামলা করেছে চার শ' সশস্ত্র লোক। সাগরের প্ল্যাটফর্ম থেকে জানানো হয়েছে কিছু বোট তাদের দিকে যাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে ওরাও সশস্ত্র এবং যে-কোনও সময়ে হামলা করবে।'

রানা আশা করেছিল হাতে দুই-এক দিন সময় পাবে। সেক্ষেত্রে ম্যাথিউস জাস্টাসের লোকগুলোর ট্রেনিং কেমন বোঝা যেত। কিন্তু ওর মন এটাও বলছিল, মোটেই সময় পাবে না।

এখন আশা করতে হবে লোকগুলোর রণকৌশলে জং ধরেনি। ভাবতে গেলেই কেমন যেন লাগে, তারা লড়েছে কমপক্ষে তিরিশ বছর আগে!

দুই হাত দিয়ে মাইক তৈরি করে গলা ছাড়ল রানা। উপর দিকে মুখ তুলে চাইল সোহেল। বন্ধুকে হাত নাড়তে দেখে আমাহ্‌লেকে কী যেন বলল। প্রথম বাস এসে থেমেছে পিয়ারের মাঝে। দরজা খুলে যেতেই লাফিয়ে নামতে লাগল মধ্যবয়স্ক লোকগুলো। তাদের সামনের লোকটা জড়িয়ে ধরল আমাহ্‌লেকে। উত্তেজিত হয়ে কী যেন বলছে। বোধহয় ম্যাথিউস জাস্টাসকে উদ্ধার করায় প্রশংসা করছে। হাতের ইশারা করে জাহাজ দেখাল আমাহ্‌লে। সে রওনা হয়ে যাওয়ায় পিছনে লাইন করে মার্ভেলে উঠতে লাগল সবাই। অন্যান্য বাস এসে থামছে জাহাজের পাশে।

ফোনে ক্যাপ্টেন আলম সিরাজের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। ভদ্রলোক আছেন হ্যাঙারে। 'ক্যাপ্টেন সিরাজ?'

দ্বিতীয়বার রিং হওয়ার পর ধরলেন উনি। 'কিছু বলবেন, মেজর রানা?'

'নিকোলাস ক্রিস্টোফারের লোক হামলা শুরু করেছে। আমরা বন্দর থেকে বেরুলেই একটা ইউএভি আকাশে তুলবেন।' ওই আনম্যান্‌ড্ এয়ারিয়াল ভেহিকেল আসলে কমার্শিয়াল মডেলের, সঙ্গে রয়েছে মিনিয়েচার ক্যামেরা ও ইনফ্রারেড ডিটেক্টার।

'প্রস্তুতি শুরু করেছি,' বললেন সিরাজ। 'কিন্তু সেক্ষেত্রে কপ্টার চালাতে পারব না।'

'বাধ্য হলে ওয়েপন্স ছেড়ে ইউএভি চালাবে নবী,' বলল রানা। 'তা ছাড়া, ম্যাথিউস জাস্টাসের লোকদের নিয়ে এসেছেন জাহিদ হাসান। উনি ওটা চালাতে পারবেন। আপনি শুধু ইউএভি

তৈরি রাখুন।'

'কাজ করছি ওটার উপরই।'

রেলিঙের উপর দিয়ে বাইরে চাইল রানা। গ্যাংওয়ে ধরে উঠে আসছে দুই সারিতে একদল লোক। কেউ মোটা নয়, ছিপছিপে শরীর। এমনই হওয়ার কথা, এই মানুষগুলো ছিল রিফিউজি ক্যাম্পে। তাদের ভিতর কয়েকজন রীতিমত দানবাকৃতির। বেশির ভাগ লোকের চুলে পাক ধরেছে। একটু হতাশই হলো রানা। অবশ্য মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াকু মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। কারও কাঁধ ঝুঁকে পড়েনি, চিতার মত পা ফেলে আসছে। রানার কোনও ভুল না হলে, নিজ ডিউটি তারা ভাল ভাবেই বুঝবে।

কখন যেন ব্রিজ থেকে বিদায় নিয়েছে স্বর্ণা। এখন আছে গ্যাংওয়ের মুখে। হাতের ইশারা করে সৈনিকদের দেখিয়ে দিচ্ছে কোন্ হোল্ডে যেতে হবে। গুহার মত ওই ঘরে অপেক্ষা করছেন ম্যাথিউস জাস্টাস, সবার সামনে বক্তৃতা দেবেন। এবং ওখানেই সবার হাতে তুলে দেয়া হবে অ্যাসল্ট রাইফেল, অ্যামিউনিশন ও অন্যান্য গিয়ার।

হামলা শুরু হওয়ার কথা ছড়িয়ে যেতেই মার্ভেলের সবাই আরও তৎপর হয়ে উঠেছে। নিখুঁত ভাবে কাজ করে চলেছে সবাই। অপারেশন্স সেন্টার থেকে ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশনে প্রতিটি দৃশ্য দেখছে খোরশেদ নবী ও গগল। শেষ সৈনিক জাহাজে উঠতেই পিছু নিল নিশাত ও সোহেল। ওদের পিছনে উঠে আসতে লাগল গ্যাংপ্লাঙ্ক। জাহাজের চিমনির দিকে চাইল রানা। ভকভক করে বেরুতে শুরু করেছে কালো ধোঁয়া। ব্রিজ উইঙে ভাঙা ইন্টাকম বেজে উঠল।

রানা রিসিভার তুলতেই গগল বলল, 'আমরা তৈরি।'

বাইরেটা দেখে নিল রানা। জাহাজের পিছনে দড়িদড়ার

সামনে দাঁড়িয়েছে এক স্টিভাডোর। তাকে ইশারা করতেই বোলার্ড থেকে খুলে দিল পাকানো দড়ি। ভারী জিনিসটা ঝপাস্ করে পানিতে পড়ল। একইসঙ্গে উঠে আসতে লাগল নোঙর। জাহাজের বো-র কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লংশোরম্যানদের ইশারা করল রানা। গগল বুঝবার আগেই দড়িদড়া খুলে দেয়া হয়েছে। পাঁচ সেকেণ্ড পর মার্ভেল ও ডকের মাঝে বলকে উঠল পানি, চালু করা হয়েছে অথওয়ার্টশিপ থ্রাস্টারগুলো। রাশান ফ্রেইটারের পিছন থেকে সরে এল মার্ভেল, ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইনামিক ইঞ্জিন চালু করা হয়েছে। গতি এখনও অনেক শ্লথ। অগভীর বন্দর থেকে এক মাইল সরবার পর গতি বাড়ল।

আরও কয়েক মুহূর্ত ফ্লাইং ব্রিজে দাঁড়িয়ে রইল রানা। ভাবছে: নতুন করে লড়তে হবে। যুদ্ধ আসলে আগেই শুরু হয়েছে। ঠিক যখন হামলার সংবাদ দিল স্বর্ণা, তখন থেকেই রক্তে মিশছে অ্যাড্রেনালিন। আগের মিশন থেকে ফিরে যথেষ্ট ঘুমাতে পারেনি, এখনও পিঠ ও উরুতে টনটনে ব্যথা, কিন্তু এখন কিছুই ওকে বিরক্ত করছে না। বিড়বিড় করে বলল: 'ঠিক ভাবে কাজ শেষ করতে হবে।'

আবারও ব্রিজে এসে ঢুকেছে স্বর্ণা। ওর দিকে চাইল রানা। 'তৈরি, স্বর্ণা?'

'জী, মাসুদ ভাই।'

পাশের দেয়ালে একটা সুইচ টিপতেই ব্রিজের এলিভেটারের দরজা খুলে গেল। ছোট কফিনের মত চেম্বারে ঢুকল ওরা। এক মিনিট পেরুনোর আগেই পৌঁছবে অপারেশন্স সেন্টারে। রানা জানতে চাইল, 'ক্যারেন কুম্বস নতুন কিছু জানাল?'

'না, অন্য কাজে আটকা পড়ায় ওর সঙ্গে কথা হয়নি।'

'আশা করি সমস্যা হবে না,' ভুশ্ আওয়াজ তুলে এলিভেটারের দরজা খুলে যেতেই অপারেশন্স সেন্টারে ঢুকল

রানা। 'রায়হান, নতুন খবর কী?'

চট্ করে একবার স্বর্ণাকে দেখল রায়হান, তারপর বলল, 'বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে পেট্রোম্যাক্স, বোঝাতে চাইছে তাদের ফ্যাসিলিটির উপর হামলা হয়েছে। কিন্তু সরকার থেকে কোনরকম আশ্বাস দেয়া হয়নি। কর্মীদের কম্পাউণ্ডে কিছুই ঘটেনি। আক্রমণ এসেছে টারমিনাল ও উপকূলীয় রিগে। সম্ভবত দুটো প্ল্যাটফর্ম চলে গেছে টেরোরিস্টদের হাতে। আরও দুটো রিগের সিকিউরিটি ফোর্স ঠেকাতে চাইছে আক্রমণকারীদের। অস্ত্র বলতে তাদের কাছে ফায়ারফাইটিং ওয়াটার ক্যানন। একটা রিগের টুল পুশার রেডিয়ো করেছে। গোলাগুলিতে মরেছে তার দলের দু'জন। লোকটা বলছে, আর বেশিক্ষণ দখলে রাখতে পারবে না রিগ।'

'গগল, ওখানে আমাদের ইটিএ কখন?'

'কমপক্ষে এক ঘণ্টা।'

'নবী, ওয়েপন্স-এর স্ট্যাটাস?'

ঘুরে চাইল ক্যাপ্টেন নবী। 'আমরা তৈরি, মাসুদ ভাই।'

'গুড।' রানা এক পলক দেখল গগল ও রায়হানকে। জাহাজে ফিরেছে ওরা অনেক আগেই। 'গগল, রায়হান, গুড জব। তোমরা খুঁজে বের করেছ অস্ত্র। এবার কেড়ে নিতে হবে। নইলে মরবে বহু মানুষ।'

কেবিনে ফিরবে বলে দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। হঠাৎ চোখ পড়ল পিছনের এক কমপিউটারের উপর। ওখানে বসে আছে ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসান। এদিকে লড়াই হবে শুনেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল আসতে। থাকবার জন্য একটা কেবিন দেয়া হয়েছে তাকে। এখন কমপিউটার স্ক্রিনে দেখছে ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ তাঁর এরিয়াল ড্রোনের নাকের ক্যামেরা-লেন্স পরিষ্কার করছেন।

'ক্যাপ্টেন, দারুণ জিনিস মনে হচ্ছে,' মাইকে বলল জাহিদ হাসান। কমপিউটারের কি বোর্ডে কয়েকটা টোকা দিল। 'এক পা পিছিয়ে আসুন, ক্যাপ্টেন। আমি ইঞ্জিন চালু করছি।'

খুদে বিমানের মোটর চালু হতেই থরথর করে কাঁপতে লাগল ক্যামেরার দৃশ্য।

'এবার রওনা হতে পারেন।'

লঞ্চ র‍্যাম্প ধরে এগুতে শুরু করেছে ড্রোন, পিছনে পড়ল মার্ভেলের সামনের দিকের ডেরিক, তারপর রেলিঙের আগে আকাশে ভেসে উঠল বিমান। জয়স্টিক দিয়ে ড্রোনের মাথা নিচু করে নিল জাহিদ হাসান। অল্টিচ্যুড বাড়ল না, কিন্তু বাড়তে লাগল গতি। কিছুদূর যাওয়ার পর উপরের দিকে উঠতে লাগল ড্রোন।

অপারেশন্স সেন্টার থেকে বেরিয়ে কেবিনে ফিরল রানা। কালো কমব্যাট ফেটিগ পরে নিয়ে বসল কমপিউটারের সামনে। স্ক্রিনে নিয়ে এল ইউএভির লাইভ ফিড। অনেক উপর থেকে নীচের সব দেখিয়ে চলেছে ক্যামেরা। মনিটরের উপর চোখ রেখেছে রানা, দুই হাত ব্যস্ত সিন্দুক থেকে অস্ত্র বের করতে।

চার ফুট দৈর্ঘ্যের এয়ারোপ্লেন ছুটে চলেছে এক হাজার ফুট উপর দিয়ে। নীচে বিশাল পেনিনসুলা। ওটা এড়িয়ে মার্ভেলকে পৌঁছুতে হবে পেট্রোম্যাক্সের অয়েল টারমিনালে। কিছুদিন আগে জাহাজে শক্তিশালী ট্র্যান্সমিটার বসানো হয়েছে। ওটার কারণে ড্রোনের রেঞ্জ পনেরো মাইল থেকে বেড়ে চল্লিশ মাইলে পৌঁচেছে। এখন আর জাহাজের কাছে থাকতে হয় না খুদে প্লেনকে। চলেছে খামার ও জঙ্গলের উপর দিয়ে। কিছুক্ষণ পর পৌঁছে গেল ম্যানগ্রোভ জলাভূমির উপর। একটু দূরে জঙ্গলের ওপাশে বন্দর। ওখানে পৌঁছবার একমাত্র উপায় ক্যাবিণ্ডা থেকে আসা সরু এক পথ।

খেলনা বিমান চালাতে গিয়ে মজা পেয়েছে জাহিদ হাসান, এখন চলেছে সরু সড়কের, পাঁচ শ' ফুট উপর দিয়ে। টারমিনালের দুই মাইল দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে কয়েকটা ট্রাক, ইঞ্জিন চলছে। কারণটা আন্দাজ করেছে রানা। কয়েক মুহূর্ত পর বাস্তবে পরিণত হলো ওর চিন্তা। করাত দিয়ে কাটা অসংখ্য গাছ ফেলে দেয়া হয়েছে সড়কের উপর। দু' পাশের জমি কাদার মত নরম। আটকা পড়বে সে ভয়ে এগুতে পারবে না বিশাল ট্যাঙ্কার ট্রাক। পথ খুলতে হলে লাগবে দানব আর্থমুভার, অথবা এক সপ্তাহ ধরে চেইন স'ও দিয়ে কাটতে হবে গাছ। অ্যাঙ্গোলান সরকার সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তাদের কোনও যুদ্ধযান টার্গেট পর্যন্ত পৌঁছবে না।

নিঃসঙ্গ ওই বন্দরের স্যাটালাইট ছবি দেখছে রানা। নিজে ও যা করত, ঠিক তা-ই করেছে গাধাধারের অফিসার। আবারও উপরে উঠছে খুদে বিমান, টারমিনালের কাছে পৌঁছতেই উচ্চতা দাঁড়াল এক হাজার ফুটে। এত উপর থেকে কোনও অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ল না। উপকূলে বিছিয়ে রয়েছে ফ্যাসিলিটির দুই শ' একর জমি। দক্ষিণে একের পর এক বিশাল ট্যাঙ্ক ফার্ম। কর্মীদের কম্পাউণ্ড থেকে ওটাকে আলাদা করা হয়েছে। ফ্যাসিলিটির উত্তর দিক একদম ফাঁকা। দক্ষিণ দিকের জমি ও উত্তর দিকের জমির মাঝে নানা সাইজের হাজারো পাইপ। জায়গাটা যেন ধাতুর তৈরি গোলক-ধাঁধা। ওটার ব্যাখ্যা দিতে পারবে শুধু স্বয়ং ডিজাইনার। একদিকে বিশাল সব ওয়্যারহাউস, আগে এত প্রকাণ্ড দালান দেখেনি রানা। বন্দরে ভাসছে বেশ কিছু টেণ্ডার ও ওয়র্কবোট। রিগে যাওয়া ও ফিরবার জন্য ব্যবহার করা হয়। ফ্যাসিলিটি থেকে একমাইল গেছে এক কযওয়ে, শেষ মাথায় সুপারট্যাঙ্কার রাখবার বার্থ। ওখানেই লোডিং হয় ক্রুড অয়েলের, ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর নানা দেশে।

এখন বার্থে থেমেছে এক হাজার ফুটি এক সুপারট্যাঙ্কার। ওয়াটারলাইনের অনেক উপরে, লাল অ্যান্টিফাউলিং রং। ওটা দেখে রানা আন্দাজ করল, জাহাজের পেট এখন খালি।

দুরমুজ করা জমির উপর তৈরি করা হয়েছে বিশাল এক দালান। পাশেই টারমিনালের সুউচ্চ ভেন্ট টাওয়ারগুলো। রানা জানে, সোহেলের নেতৃত্বে ওই কম্পাউণ্ডের বিষয়ে বিশদ রিসার্চ করেছে নবী, রায়হান ও স্বর্ণা। প্রকাণ্ড দালানের ভিতর আছে তিনটি জেনারেল ইলেকট্রিক জেট ইঞ্জিন। ওখান থেকেই আসে ফ্যাসিলিটির সমস্ত বিদ্যুৎ। বন্দরের প্রতি কোণে পৌঁচেছে হাই-টেনশান পাওয়ার লাইন।

সাগরে তিন মাইল দূরে উত্তর দিকে কমপক্ষে বারোটা অয়েল রিগ, একেকটা যেন ছোটখাটো দ্বীপ। প্রতিটা রিগের তেলের পাইপ পানির নীচ দিয়ে বন্দরের সঙ্গে যুক্ত। এই রিগগুলো নর্থ সি বা গালফ অভ মেক্সিকোর রিগের মত প্রকাণ্ড নয়। সাগর সমতল থেকে বড়জোর বিশতলা উঁচু। অবিরত ঢেউয়ের ভিতর গোটা সুপারস্ট্রাকচার ধরে রাখছে বিশালাকার সাপোর্ট পিয়ারগুলো।

রানার মনে হলো এদিকের সবই স্বাভাবিক, কাজেই আরও মনোযোগ দিল। ক' সেকেণ্ড পরই বুঝল, সব চিমনির আগুন প্রাকৃতিক গ্যাসের কারণে জ্বলছে না। লেলিহান আগুন পুড়িয়ে চলেছে কয়েকটা দানবীয় ট্রাক। একটা দালান থেকে ঘন কালো ধোঁয়া উঠছে। চওড়া উঠানে পড়ে আছে নিথর দেহ, যেন এখানে ওখানে ম্যাচের কাঠি। গাধাধারের কসাইরা খুন করেছে কর্মী ও সিকিউরিটি ফোর্সের সবাইকে। প্রথমে রানার মনে হয়েছিল লোকগুলো আছে ছায়ার ভিতর, কিন্তু এক সেকেণ্ড পর বুঝল, মৃতদেহ পড়ে আছে রক্তের পুকুরে।

সৈকতের উপর দিয়ে বিমান নিয়ে চলেছে জাহিদ হাসান,

তারপর চলে এল কযওয়ের উপর। পাইপগুলো গিয়ে মিশেছে ভাসমান ডকে, জায়গাটা বিশাল বগির চেয়েও বড়। বিড়বিড় করে কাকে যেন অভিশাপ দিল রানা। লোডিং গ্যাংওয়েগুলোর উপর পিলপিল করছে একদল সশস্ত্র লোক। এরই ভিতর ট্যাঙ্কার থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে পাইপ, কালো ক্রুড অয়েলের চারটে ভারী ধারা পড়ছে সাগরে। থকথকে তেল ভাসছে পিয়ারের চারপাশে, ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। কেউ নীচ থেকে দেখেছে খুদে বিমান। এক সেকেণ্ড পর অনেকে মুখ তুলে চাইল। কেউ কেউ আঙুল তাক করেছে, অন্যরা গুলি শুরু করল ড্রোন লক্ষ্য করে।

বিমানে গুলি লাগবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ, কিন্তু হঠাৎ বাঁক নিয়ে সরে যেতে লাগল জাহিদ হাসান, চলেছে সাগরে সবচেয়ে কাছের রিগের দিকে। আধ মাইল দূর থেকেও রানা দেখল রিগের পায়ের কাছে ছড়িয়ে পড়ছে তেলের ঘন আস্তরণ। ঢেউগুলো চাপা পড়ছে ভারী তেলের নীচে। ধীরে ধীরে নড়ছে ওদিকের সাগর, যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে কালো সিল্ক দিয়ে। স্রোতের সঙ্গে উত্তর দিকে চলেছে তেলের চাদর। এদিকে রিগ থেকে ঝরঝর করে পড়ছে তেলের কালো বৃষ্টি। দ্বিতীয় রিগের কাছে পৌঁচেছে ড্রোন, নীচে দেখা গেল প্ল্যাটফর্ম দখল করে নিয়েছে বিদ্রোহীরা। প্রথম রিগের চেয়ে দ্বিগুণ জোরে পড়ছে তেল।

রানার মনে হলো নাকে এসে লাগছে কাঁচা ক্রুড অয়েলের তীব্র রাসায়নিক গন্ধ। গলা শুকিয়ে যেতেই বাস্তবে ফিরল। এই নিষ্ঠুর ধ্বংসের খেলা ওকে রাগিয়ে দিয়েছে। আজ পর্যন্ত যত ইকোটেরোরিজম হয়েছে, তার ভিতর নিকোলাস ক্রিস্টোফারের ধ্বংসলীলা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। অথচ, এই লোক মনে করে সে রক্ষা করছে পৃথিবী!

মার্ভেলের সবাই মিলে যদি ঠেকাতে না পারে পিশাচটাকে,

গোটা পৃথিবী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সব গিয়ার জড় করেছে রানা, ওগুলো নিয়ে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে, চলেছে হোল্ডের দিকে। তিন মিনিট পর পৌঁছে গেল গন্তব্যে। জড় হয়েছে এক শ'র বেশি লোক। মার্ভেলের অনেকেও হাজির। ম্যাথিউস জাস্টাসের সঙ্গে যারা জাহাজে উঠেছিল, তারাও আসতে ভুল করেনি। এরই ভিতর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে অস্ত্র ও গুলি। পরনের পোশাক বা বুট যাদের ছিল না, তাদেরকে জাহাজের স্টোর থেকে সেসব দেয়া হয়েছে। এখন প্রত্যেকে বসে আছে হোল্ডের মেঝেতে, নিষ্পলক চোখে চেয়ে আছে সামনের দিকে, শুনছে নেতার বক্তব্য। বাক্স দিয়ে তৈরি স্টেজের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন জাস্টাস, আহত পা মুড়িয়ে দেয়া হয়েছে সার্জিকাল গয দিয়ে। বালকহেডের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখেছেন দুটো ক্রাচ। হোল্ডে ঢোকেনি রানা, থমকে গেছে দরজার চৌকাঠের উপর। যিম্বাবুইয়ের ভাষা ওর জানা নেই, কিন্তু তাতে কোনও সমস্যা হলো না। ম্যাথিউস জাস্টাসের কণ্ঠে ঝরছে আবেগ। নেতার প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনছে কালো মানুষগুলো। স্পষ্ট স্বরে সুন্দর উচ্চারণে বলে চলেছেন জাস্টাস, একে একে সবার উপর থামছে তাঁর দৃষ্টি, কয়েক সেকেণ্ড সময় দিয়ে পরের মানুষটার উপর মনোযোগ দিচ্ছেন। সবার শেষে রানার উপর স্থির হলো তাঁর চোখ। হঠাৎ রানার মনে হলো হৃৎপিণ্ডের উপর হাত রেখেছে কেউ। জবাবে হাত নাড়ল ও।

পাল্টা মাথা দোলালেন জাস্টাস।

তাঁর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর হোল্ডের ভিতর নামল থমথমে নৈঃশব্দ্য। কিন্তু তা এক সেকেণ্ডের জন্য, তারপর বজ্রপাতের মত হাততালির আওয়াজ শুরু হলো। সেই সঙ্গে চলেছে অভিনন্দন। যেন কাঁপতে লাগল হোল্ডের চার দেয়াল। পুরো দুই মিনিট

লাগল ওই আওয়াজ কমে আসতে।

'ক্যাপ্টেন রানা,' ম্যাথিউস জাস্টাস শুরু করতেই থেমে গেল সব আওয়াজ। 'আমার লোকদের বলেছি, আমার পাশে যেভাবে লড়ত, ঠিক সেভাবে আপনার পাশে লড়বে ওরা। আমার জন্য আপনি যা করেছেন, সেজনে আপন ভাই বলে মনে করি আপনাকে। আমি ওদেরকে বলেছি: আপনি পুরুষ-হাতির মতই শক্তিশালী, চিতাবাঘের মত বুদ্ধিমান, এবং সিংহের মত দুর্জয় সাহসের অধিকারী। আমি আরও বলেছি, আজ আমরা অন্য এক দেশের মাটিতে লড়ব, কিন্তু এই লড়াই থেকেই শুরু হবে আমাদের দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ।'

'চমৎকার বলেছেন, অন্য কেউ এভাবে বলতে পারত না,' বলল রানা। যোদ্ধাদের উদ্দেশে নিজে কিছু বলবে কি না ভাবল। এক মুহূর্ত পর বুঝল, তার কোনও দরকার নেই। লোকগুলোর জ্বলজ্বলে চোখ বা চাহনি বলছে মরতেও দ্বিধা করবে না। রানা শুধু সহজ ভঙ্গিতে বলল, 'আমাদের যুদ্ধকে নিজের মনে করেছেন, সেজন্য আপনাদের সবাইকে অনেক, অনেক ধন্যবাদ।'

একটু দূরে নিশাতকে দেখে হাতের ইশারা করল রানা। ক্যাপ্টেন কাছে চলে আসতেই বলল, 'আপা, ডিউটি রোস্টার তৈরি হয়েছে?'

'জী, স্যর,' ইলেকট্রনিক ক্লিপবোর্ডে টোকা দিল নিশাত। 'রোস্টার ঠিক করতে সাহায্য করেছেন আমাহ্‌লে। সবাই পৌঁছবার আগেই কাজ শেষ হয়েছে। আমরা এখন জানি তারা কী ধরনের দক্ষতা পেয়েছে। এরই ভিতর অ্যাসল্ট ভেসেলে কে কোথায় বসবে সেটাও ঠিক করা হয়েছে।'

'প্ল্যানে শেষ সময়ে নতুন কোনও পরিবর্তন এনেছে সোহেল?'

'না, স্যর।'

'ঠিক আছে। এবার তা হলে কাজে নামতে হবে।'

মার্সেনারিদের হটিয়ে একটা অয়েল রিগ দখল করবে রানা, অন্যটার দায়িত্ব কমাণ্ডো কাশেমের উপর। এই দুই দলে থাকছে কয়েকজন করে যিম্বাবুইয়ান মুক্তিযোদ্ধা। যার যার সৈনিক নিয়ে মুন পুলের দিকে রওনা হয়ে গেল রানা ও কাশেম। জাস্টাসের অন্য যোদ্ধারা জাহাজের লাইফবোট ও অন্যান্য বোট ব্যবহার করবে। একই সময়ে লোডিং পিয়ার ও ফ্যাসিলিটির উপর আক্রমণ হবে। সোহেলের নির্দেশে মার্ভেল থেকে কাভার ফায়ার দেবে নবী।

মুন পুলের দিকে যাওয়ার পথে অপারেশন্স সেন্টার থেকে যোগাযোগ করল সোহেল। 'আমরা মার্ভেল নিয়ে পজিশনে থাকছি। দশ মিনিট পর লঞ্চ হবে সাবমারসিবল দুটো।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। আগেই গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছে গগল। 'নীচের দরজা খোলার পর আরও বিশ মিনিট লাগবে রিগে উঠতে, আমি যোগাযোগ না করলে তীরের দিকে যাবি না।'

'মনে আছে। তোরা কাউন্টার-অ্যাটাক শুরু করলে টারমিনাল লক্ষ্য করে রওনা হব, কিন্তু গতি থাকবে কম। লাইফবোট নামিয়ে দেয়া হবে। অন্য দুই রিগে হামলা এলে ঠেকাব। এরপর ডকে পজিশন নেবে আপা ও জলিল। ওদের কাভার দেব আমরা। ওরা লোডিং পিয়ার দখল করবে।'

'আশা করা যায় স্বর্ণার কথা ফলবে। গাধাধারের লোক টারমিনাল দখল করতে জান দিতে চাইবে না। আক্রমণ শুরু হলে দেরি না করে আত্মসমর্পণ করবে।'

'আর যদি স্বর্ণার কথা না ফলে? তারা যদি প্রাণপণ লড়াই শুরু করে?'

'তা হলে তোকে খুব বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি গাল দেব। শুভ কাজে ওসব কথা বলে না।'

'আশা করি সারাদিন লড়তে হবে না, নইলে সত্যি অনেক রক্ত ঝরবে।'

মার্ভেল এখনও এগিয়ে চলেছে, কাজেই মুন পুলের নীচের দরজা বন্ধ। কিন্তু সরিয়ে নেয়া হয়েছে মেঝের গ্রেইটিং, ওই জায়গায় লিফটিং ক্রেডল থেকে ঝুলছে মার্ভেলের পঁয়ষট্টি ফুট লম্বা সাবমারসিবল ডিসকভারি-১০০০। ওটা এক হাজার ফুট গভীরে নামতে পারে। ভোঁতা নাকের কাছে বেশ কিছু বাতি। পাশেই ম্যানিপুলেটার বাহু, ওটা দিয়ে কাটতে পারে স্টিল। ডিসকভারি-১০০০ নেমে যাওয়ার পর লঞ্চ করা হবে ডিসকভারি-৯৯৯।

রানার সঙ্গে চলেছে বাংলাদেশ নেভির লেফটেন্যান্ট সানজিদা স্বর্ণা। ওদিকের দ্বিতীয় রিগে উঠবে কমাণ্ডো কাশেম, সঙ্গে নেভির লেফটেন্যান্ট মুর্তোজা। তীর আক্রমণে নেতৃত্ব দেবে ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা। সে আর কমাণ্ডো জলিল খান এরই ভিতর নিজ নিজ লোকদের তুলে ফেলেছে লাইফবোটে। এদিকে সাব-মারসিবল পরীক্ষা করেছে টেকনিশিয়ানরা, কোথাও কোনও সমস্যা নেই। রানা চুরুট সদৃশ জলযানের সামনে থামতেই অ্যাটেনশন হলো খালাসি, ঠিকভাবে ধরল মই।

খোলে একটা চাপড় দিয়ে উঠতে শুরু করল রানা। সামান্য দুলে উঠল সাবমারসিবল। হ্যাচ দিয়ে নেমে যাওয়ার আগে একবার কাশেম ও মুর্তোজার দিকে চাইল। মই বেয়ে ভিতরে ঢুকে চলে এল ককপিটে। বদ্ধ একটা জায়গা ওটা, চাপাচাপি করে বসানো হয়েছে সিটগুলো। সামনে নানান কন্ট্রোল প্যানেল ও বারোটা কমপিউটারের মনিটর। দু' পাশে খুদে তিনটে পোর্টহোল। যদিও ছোট বোন ডিসকভারি-৯৯৯-এর চেয়ে

আকারে বেশ বড় ডিসকভারি-১০০০, কিন্তু ভিতরে জায়গা অনেক কম। খোল পুরু করতে গিয়ে এমন হয়েছে। তা ছাড়া, প্রচুর ব্যাটারি বহন করে, সে কারণেই টানা ষাট ঘণ্টা চলতে পারে। এখন ডাইভ চেম্বার খুলে নেয়া হয়েছে, নইলে আটজন যাত্রী নিতে পারত না। ছোট দুটি দল নিয়ে রিগ আক্রমণ করবে ওরা, এবং সেজন্য ম্যাথিউস জাস্টাসের সেরা লোকদের নেয়া হয়েছে।

দলনেতা সাবমারসিবলে ঢুকে যেতেই মই বেয়ে ভিতরে নামল স্বর্ণা, সিটে না বসে যিম্বাবুইয়ানদের দেখিয়ে দিল কোথায় বসতে হবে। এক মিনিটে তারা শিখে নিল কীভাবে খুলতে হবে সিট বেল্ট। ততক্ষণে প্রি-ডাইভের চেকলিস্ট দেখল রানা, কমিউনিকেশন প্যানেলে আটকে নিল হেডফোনের জ্যাক। 'ডিসকভারি-১০০০ টু মার্ভেল। দিস ইয কমিউনিকেশন টেস্ট। হাউ ডু ইউ রিড?'

'ফাইভ বাই ফাইভ, ডিসকভারি-১০০০,' জবাব দিল রায়হান। 'আমাদের গতি কমেছে। একমিনিট পর খুলবে মুন পুল ডোর।'

'ঠিক আছে।'

কাঁধের উপর দিয়ে স্বর্ণার দিকে চাইল রানা। হামাগুড়ি দিয়ে নিজ সিটে চলে এল মেয়েটি, পাশে রাখল মেশিন পিস্তল। 'সবাই ঠিক ভাবে বসেছেন?' কয়েকজন উসখুস করছে। বাইরের লোকগুলো ওদেরকে আটকে দিয়েছে এই মুড়ির টিনের ভিতর। অবশ্য প্রত্যেকে বুড়ো আঙুল তুলে জানিয়ে দিল কোথাও কোনও সমস্যা নেই। 'আমাহ্লে? আপনি ঠিক আছেন?'

ম্যাথিউস জাস্টাসকে উদ্ধার করতে গিয়ে সামান্য আহত হয়েছে লোকটা, কিন্তু রানাকে বলেছে সে-ও ওর পাশে লড়বে। 'এখন বাইবেল বা কোরআনের অনেক কিছু বুঝতে পারছি,'

গম্ভীর মুখে মন্তব্য করল সে। 'যেমন জোনাহ্-র কেমন লেগেছিল তিমির পেটে থাকতে!'

'কিছুক্ষণ পর ভেসে উঠব। পঞ্চাশ ফুটের বেশি গভীরে যাব না,' ভরসা দিল স্বর্ণা।

বাইরে তিনতলা উঁচু ঘরে দপদপ করছে উজ্জ্বল বাতি, বেজে উঠেছে সাইরেন। ওটা শুনল না সাবমারসিবলের ভিতরের কেউ। পোর্টহোল দিয়ে বাইরে চাইল রানা। মার্ভেল আগেই থেমে গেছে, ধীরে ধীরে খুলছে কিলের দরজা। নিয়ন্ত্রিতভাবে জাহাজে ঢুকতে দেয়া হয়েছে সাগরের পানি। কিছুক্ষণের ভিতর ভরে উঠল মুন পুল।

জোরালো ধাতব আওয়াজ তুলল ক্রেডল, সাগরে নামাতে শুরু করেছে সাবমারসিবল। কয়েক মুহূর্ত পর পোর্টহোলের কাঁচের ওপাশে উঠে এল পানি। আঁধার হয়ে গেল ডিসকভারির ভিতরের অংশ। এখন আলো বলতে শুধু কমপিউটারের স্ক্রিনের নীলচে আভা। সাবমারসিবল ভাসতে শুরু করতেই সরে গেল ক্রেডল, উপরের দিকে উঠতে লাগল।

'আপনাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে,' রানার হেডসেট-এ জানিয়ে দিল এক ক্রু।

'অ্যাফারমেটিভ।' ব্যালাস্ট কন্ট্রোল সুইচ টিপল রানা। কয়েক সেকেণ্ডে ভরে উঠল ট্যাঙ্ক। নামতে শুরু করেছে সাবমারসিবল, মুন পুলের নীচ দিয়ে বেরিয়ে এল সাগরে। 'ডিসকভারি-১০০০ রওনা হয়েছে। এবার ডিসকভারি-৯৯৯ লঞ্চ করতে পারো।'

মোটর চালু করেছে রানা, শুরু হয়েছে যান্ত্রিক হুঁই-হুঁই আওয়াজ। তরতর করে পানি কাটছে প্রপেলার। কমপিউটারকে নির্দেশ দিতেই আধ মিনিটের ভিতর পঞ্চাশ ফুট গভীরতায় স্থির হলো সাবমারসিবল। সাগর-সমতল থেকে কেউ দেখতে পাবে

না কালো জলযানটা। এরই ভিতর সাব-এর কমপিউটারকে কোর্স জানিয়ে দিয়েছে মার্ভেলের মাস্টার কমপিউটার। আর কিছু করবার নেই, চুপ করে বসে রইল রানা ও স্বর্ণা।

পাঁচ মিনিট পর লেফটেন্যান্ট মুর্তোজা জানাল, ডিসকভারি-৯৯৯ রওনা দিয়েছে। তারা চলেছে দ্বিতীয় অয়েল রিগ-লক্ষ্য করে।

বড়জোর দশ নট গতি তুলতে পারে সাবমারসিবল, রানার মনে হলো উপকূলীয় রিগে কোনদিন পৌঁছবে না। বিরক্ত হয়ে উঠছে। গন্তব্যে যেতে যত দেরি, তত তেল পড়বে সাগরে। যদি পারত, সাবমারসিবল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে ঠেলা দিতে শুরু করত রানা।

'মার্ভেল, ডিসকভারি-৯৯৯ বলছি,' অ্যাকুস্টিক লিঙ্কে বলল মুর্তোজা। 'আমরা পৌঁছে গেছি রিগে, সমতল থেকে কয়েক ফুট নীচে। কমপক্ষে তিন মাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে তেল।'

'নাইন-নাইন-নাইন, আমি থাউজেণ্ড থেকে বলছি,' বলল রানা। 'কমপিউটার অনুযায়ী তিন মিনিট পর রিগের' নীচে থামব। কিছুক্ষণ হলো মাথার উপর কালো হয়ে গেছে সাগর। এদিকেও ছড়িয়ে পড়েছে তেল।'

অয়েল রিগের দুটো সাপোর্ট পায়ার মাঝ দিয়ে জিপিএস সিস্টেম নিয়ে চলেছে সাবমারসিবলটাকে। তৃতীয় পায়ার তিন ফুট আগে থেমে গেল জলযান। ইউএভি থেকে নীচের এই পায়া লক্ষ করেছে ওরা, এটার সঙ্গে একটা মই আছে, উঠে গেছে নীচের প্ল্যাটফর্মে।

'থাউজেণ্ড থেকে বলছি, রায়হান, আমরা পৌঁছে গেছি।'

'ঠিক আছে,' জবাব দিল পাকা হ্যাকার। 'এখন আমাদের একমিনিট সময় দিতে হবে। ডাবল-চেক করবেন মিস্টার হাসান। কেউ নীচে না থাকলে সারফেসে উঠবেন আপনারা।'

পার্সোনাল রেডিয়োর সঙ্গে হেডসেট আটকে নিল রানা, গদি মোড়া সিট থেকে উঠে চলে এল পিছনে। কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে এমপি-৫। সিট-বেল্ট খুলে ফেলেছে আমাহ্‌লে ও তার সঙ্গীরা। সবাই চেয়ে আছে হ্যাচের দিকে।

'মাসুদ ভাই,' জলযানের সামনে থেকে বলল স্বর্ণা। 'রায়হান বলছে আকাশ পরিষ্কার। নীচে কেউ নেই। কিন্তু মিস্টার হাসান বলছেন, প্ল্যাটফর্মের উপর কমপক্ষে তিরিশজন টেরোরিস্ট।'

'সাবধানে ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক খালি করো,' সতর্ক করল রানা।

কখনও কখনও হরর সিনেমার দৃশ্যে দেখা যায় সাগরের বুকে মাথা তুলেছে ভয়ঙ্কর প্রাণী, সেভাবেই ভেসে উঠল সাবমারসিবল। ওটার পিঠ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ক্রুড অয়েল। হ্যাচের রাবার ও কোমিঙের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে থকথকে তেল।

'মুখোশ,' গলা উঁচু করল রানা। নাকে-মুখে পরে নিয়েছে সার্জিকাল মাস্ক। টক্সিক ক্রুডের কারণে মানব দেহে কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে, তা পই-পই করে বলে দিয়েছে ডাক্তার ফারা। এ পরিবেশে দু' ঘণ্টা থাকলে বড় ক্ষতি হবে না, কিন্তু তার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করতে চাইলে অবশ্যই পরতে হবে গ্যাস মাস্ক।

হ্যাচ খুলবার বাটন টিপল রানা, সঙ্গে সঙ্গে ভক্ করে নাকে এসে লাগল কেমিকেলের কটু গন্ধ। অপরিশোধিত তেলের কারণে জ্বলে উঠল দুই চোখ। মিনিসাবের পিঠে উঠে এল ও, খোলের সঙ্গে ঝালাই করা আইহোলের নাইলন লাইন নিয়ে পাশের সাপোর্ট কলামের মইয়ের সঙ্গে বেঁধে ফেলল। চারদিকে চারটে প্রকাণ্ড পায়া উঁচু করে ধরেছে উপরের প্ল্যাটফর্মকে। ওখান থেকে নেমেছে তেলের পাইপ, চলে গেছে সাগর-সমতল থেকে অনেক গভীরে। সেখানে রয়েছে ড্রিল স্ট্রিং। ক্রুড অয়েল আবিষ্কার করবার সময় এই রিগের ড্রিলগুলো তেল তুলেছে, পরে পাইপের মাধ্যমে পাম্পগুলো তরল সোনা পৌঁছে দিয়েছে

তীরে। এদিকের অয়েল ফিল্ড অন্যান্য তেলক্ষেত্রের মত নয়, পৃথিবীর গভীর থেকে যথেষ্ট প্রেশার আসছে, ফলে অনেক তেল মেরে তেল তুলতে হচ্ছে না। বলকে বলকে উঠে আসছে ক্রুড অয়েল। টেরোরিস্টরা বোধহয় পাইপওঅর্ক বিনষ্ট করেছে, অথবা খুলে দিয়েছে ভালভ। সকালের রোদে চিকচিক করছে কালো ক্রুড অয়েল, জলপ্রপাতের মত ঝরঝর করে পড়ছে। এত উপর থেকে নামছে বলে বজ্রপাতের মত আওয়াজ তুলছে।

অদ্ভুত ওই দৃশ্য থেকে চোখ সরিয়ে নিল রানা। মিনিসাব থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রায় সবাই। উপকূলের দিকে চলেছে মার্ভেল। কুৎসিত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল জাহাজের মত লাগছে ওটাকে। ডেকের উপর একের পর এক ক্রেন ও ডেরিক। নানা রঙের প্রলেপ পড়েছে খোলে, দেখতে বিশ্রী লাগছে। কিন্তু রানার মনে হলো এত সুন্দর জাহাজ খুব কম দেখেছে। তৃতীয় রিগের দিকে ছুটে চলেছে সোহেল। পেট্রোম্যাক্সের কর্মচারীরা এখনও ঠেকিয়ে রেখেছে টেরোরিস্টদের। অবশ্য হেডঅফিসে রিপোর্ট পাঠিয়েছে, যে-কোনও সময়ে এখন রিগ ছেড়ে লাইফবোট নিয়ে সরে পড়বে। চতুর্থ রিগ থেকে জানানো হয়েছে, তারা প্রাণ থাকতে হাল ছাড়বে না।

সবাই নেমে যেতেই মিনিসাবের হ্যাচ বন্ধ করল স্বর্ণা, সবার শেষে উঠল নীচের প্ল্যাটফর্মে।

তেল পড়বার বিকট আওয়াজের উপর দিয়ে রানা বলল, 'ঠিক আছে, এবার চলুন সবাই!'

দশ

সুইফ্‌ট্ আউটবোর্ড বোট নিয়ে তৃতীয় রিগের চার পায়ার চারপাশে কুকুরের মত ঘুরছে টমাস গাধাধারের সৈনিকরা। এরা মোটেই পাত্তা দেয়নি দিগন্তের ওপাশ থেকে হাজির হওয়া ধচাপচা এক পুরনো ফ্রেইটারকে। সৈনিকদের একমাত্র ইচ্ছা মই বেয়ে উঠে দখল করবে প্ল্যাটফর্ম। উপর থেকে বাধা দিয়ে চলেছে তেল-কর্মীরা। ওয়াটার ক্যাননগুলো সাগরে ছিটকে ফেলছে টেরোরিস্টদের। অবশ্য এক তরফা লড়াই চলছে না। বোট থেকে যাচ্ছে অজস্র গুলি। কখনও দু'একজন পেট্রোম্যাক্স কর্মী আহত বা নিহত হচ্ছে। বেশিরভাগ থাকছে ডেকের উপর। কিন্তু কেউ প্ল্যাটফর্ম থেকে গড়িয়ে পড়লে অনেক নীচের সাগরে হারিয়ে যাচ্ছে। তেমনটি হলে হৈ-হৈ করে উঠছে মার্সেনারিরা। এটা অসম লড়াই, এক দলের হাতে পানির কামান, অন্য দলের হাতে অটোমেটিক রাইফেল— যে-কেউ বুঝবে ফল কাদের পক্ষে যাবে।

মার্ভেলের অপারেশন্স সেন্টারে ওয়েপন্স স্টেশনে বসে আছে খোরশেদ নবী, একইসঙ্গে ছয়টা ক্যামেরার ফিড দেখছে, আবার নজর রাখছে জাহাজের ইন্টিগ্রেটেড আরসেনালের স্ট্যাটাস বোর্ডের উপর। সামনের স্টেশনে বসেছে গগল, জয়স্টিক হাতে নিয়ন্ত্রণ করছে রাডার ও ডিরেকশনাল পাম্প জেট। থ্রটলের উপর আলতো ভাবে পড়ে আছে অন্য হাত।

'গগল, প্ল্যাটফর্ম থেকে পাঁচ শ' গজ দূরে থামুন,' নিজ সিট থেকে বলল সোহেল। 'গ্যাটলিং গান তাক করার জন্য বো ঠিক করুন। ...নবী, গ্যাটলিং গানের সামনে থেকে হাল প্লেট সরিয়ে নাও। গুলি করার জন্যে তৈরি থাকো, বললেই শুরু করবে।'

রিগের চারপাশ দিয়ে অলসভাবে এক চক্কর ঘুরে এল জাহিদ হাসানের ইউএভি। ওটার ক্যামেরা নবীকে জানিয়ে দিল কোথায় রয়েছে টার্গেট। চারটে রোট ঘুরছে রিগের নীচে। কমপিউটারের কি-বোর্ডের কারণে জাহাজের ইলেকট্রনিক মগজ জেনে গেল শত্রুদের উপর নজর রাখতে হবে। বো-র অনেক উপরে ঘুরছে জিই এম৬১এ১-এর ছয় ব্যারেলের অস্ত্র, মার্ভেলের গতির সঙ্গে পাল্টে চলেছে লক্ষ্যপথ।

'ডিসকভারি-১০০০ থেকে মার্ভেল, আমরা প্ল্যাটফর্মে পৌঁচেছি,' গোপন স্পিকারে গমগম করে উঠল রানার কণ্ঠ।

'ঠিক আছে,' বলল সোহেল। 'মুর্তোজা আর কাশেমও তৈরি।'

'গুড। এখন তোদের পজিশন কী?'

'ঠিক জায়গায় হাজির হয়েছি। তুই বললে লাইফবোট লঞ্চ করব।'

'আমরাও তৈরি।'

'কমিউনিকেশন কন্সোলে চ্যানেল পাল্টে নিল সোহেল। 'অপারেশন্স সেন্টার থেকে লাইফবোট। আপা, শুনতে পাচ্ছেন?'

'জী,' জবাব দিল নিশাত।

'তা হলে লাইফবোট নিয়ে রওনা হয়ে যান।'

অয়েল রিগ থেকে আড়ালে উঁচু ডেকে রয়েছে লাইফবোট, তার ভিতর বসেছে ম্যাগিউস জাস্টাসের ষাটজন মুক্তিসেনা। ক্রেডল থেকে তুলে নেয়া হয়েছে লাইফবোট, একটা ক্রেন ওটাকে রেলিঙের বাইরে নিয়ে গেল। খুব ধীরে নামিয়ে দেয়া

হলো সাগরে। দড়িদড়া খুলে দিয়েছে নিশাত, ওদিকে ইঞ্জিন চালু করেছে জলিল। দু' সেকেণ্ডেই রওনা হয়ে গেল ওরা, হাইড্রোফয়েলগুলো উঁচু করে ধরেছে লাইফবোটকে। দ্রুত বাড়ছে গতি। কুৎসিত চেহারার ওয়াটার-ক্রাফট ছুটতে শুরু করেছে উড়ুক্কু মাছের মত। টেরোরিস্টদের রেঞ্জের বাইরে থাকতে চাইছে ওরা। নির্দেশ এলে পুবে রওনা হবে, উপকূলে পেট্রোম্যাক্স টারমিনালের ট্যাঙ্ক ফার্মের কাছে থামবে। ওখান থেকেই শুরু হবে নিশাতদের কাউন্টার-অ্যাটাক, গাধাধারের সৈনিকদের হটিয়ে ফ্যাসালিটি দখল করবে।

যে রিগে মার্ভেল থেকে আক্রমণ হবে, হঠাৎ সেখানে বিকট আওয়াজে বিস্ফোরণ হলো। জাহিদ হাসান ইউএভির ক্যামেরা যুম করতেই দেখা গেল অ্যালিউমিনিয়ামের আউটবোর্ড বোটে দুই টেরোরিস্ট রিলোড করছে রকেট লঞ্চার। উপরের ক্যাটওয়াকে লাফিয়ে উঠেছে কমলা আগুন ও ঘন কালো ধোঁয়া। কয়েক মুহূর্ত আগে ওখানে ছিল দু'জন তেল-কর্মী, শত গ্যালন সাগরের পানি ছুঁড়ছিল আক্রমণকারীদের দিকে, এখন তারা নেই। মুচড়ে পড়ে আছে বিধ্বস্ত ওয়াটার ক্যানন।

'রিগ থেকে আবার যোগাযোগ করা হয়েছে দেলাওয়্যারের পেট্রোম্যাক্স হেডকোয়ার্টারে,' বলল রায়হান, শুনবার ফাঁকে এক আঙুল তুলেছে ঠোঁটের উপর। 'ওরা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করবে।'

'ওদেরকে যেতে দেয়া চলবে না,' বলল সোহেল। 'নবী?'

'বুঝতে পেরেছি, সোহেল ভাই।'

গ্যাটলিং গান থেকে সেফটি সরিয়ে নিল নবী, গুলি শুরু করতে নির্দেশ দিল কমপিউটারকে। প্রতি মিনিটে ছয় হাজার ২০এমএম ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়াম গুলি চালাতে পারে এই অস্ত্র। কিন্তু ব্যারেলের রোটেশন স্পিড কমিয়ে নিয়েছে নবী, মাত্র দুই

সেকেণ্ড কর্কশ গুঞ্জন ছাড়ল গ্যাটলিং গান, লোডিং ফিড থেকে পেল মাত্র আটটি গুলি।

প্ল্যাটফর্মের নীচে খুশিতে হৈ-হৈ করছিল টেরোরিস্টরা, তারা বুঝলই না কী খুন করল তাদেরকে। নাচতে নাচতে ছুটছিল চারটে বোট, পরের দুই সেকেণ্ডে মিলিয়ে গেল দুটো বোট। ওখানে লাফিয়ে উঠল ছেঁড়াখোঁড়া অ্যালিউমিনিয়াম ও বাষ্প হয়ে যাওয়া হাড়-মাংস।

অবশিষ্ট দুই বোটের একটার ড্রাইভার দেখতে পেয়েছে কোথা থেকে আসছে গুলি। রিগের এক পায়ার ওপাশে চলে গেল সে, আর বেরুল না আড়াল থেকে। মার্ভেলের কমপিউটার অপেক্ষা করছে, আবারও বেরুবে বোট, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল। গ্যাটলিং গানের অটোমেটিক ফায়ার কণ্ট্রোল ওভাররাইড করল নবী, মনে মনে নোট নিল: পরে চেক করব সিস্টেমের প্রোগ্রাম।

এখন মেইন ফ্ল্যাট প্যানেল দেখিয়ে চলেছে গ্যাটলিং কোথায় ব্যারেল তাক করেছে। দূরের ওই ধূসর সাপোর্ট লেগের উপর ক্যামেরা যুম করল নবী, পরক্ষণে দেখল চতুর্থ আউটবোর্ড বোট ছুটতে শুরু করেছে পরের রিগ লক্ষ্য করে। জয়স্টিক সামান্য নেড়ে বোটের উপর লক্ষ্য-স্থির করল নবী, দুই সেকেণ্ড গুলিবর্ষণ করল। তৃতীয় সেকেণ্ডে দেখা গেল ওখানে কোনও বোট নেই।

অস্ত্র রিসেট করল নবী, আবারও আগের অবস্থানে পৌঁছে গেল ব্যারেলগুলো, খুঁজতে শুরু করেছে শেষ বোটকে। রিগের একটা পায়ার এদিকে সামান্য বেরিয়ে এসেছে বোটের রুপালি রং। বোধহয় স্টার্নের অংশ। বড়জোর এক বর্গফুট জায়গা। কিন্তু দুলন্ত কোনও জাহাজ থেকেও পাঁচ শ' গজ দূরে লক্ষ্যভেদ এই অস্ত্রের জন্য মোটেই কঠিন কিছু নয়। আরেকবার কর্কশ গুঞ্জন তুলল গ্যাটলিং গান। বিস্ফোরিত হলো আউটবোর্ডের

মোটর, পানি থেকে স্রেফ উড়ে গেল বোট, চারদিকে ছিটকে পড়ল আটজন মার্সেনারি। কয়েকজনের লাশ সাগরে ডুবল, একটা লাশ গিয়ে পড়ল কলামের স্টিলের পাতের উপর। গুলির বিস্ফোরণে হাওয়া হয়ে গেছে দু'জন।

'তৃতীয় রিগ সিকিউর করা হয়েছে,' বলল নবী। আস্তে করে শ্বাস ফেলল।

'চতুর্থ রিগে হামলা হয়েছে, ওখানে চলুন, গগল,' বলল সোহেল। বুঝতে পারছে ওদের কাজ সোজা ছিল, সে তুলনায় অনেক বেশি কঠিন দায়িত্ব নিয়েছে রানা বা কাশেম।

সোহেলের মত করে রানাও ভাবছে কাজটা কঠিনই হবে, হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে প্ল্যাটফর্মের পাশে, ঝুলন্ত খোলা স্টেয়ারওয়েলে। নীচে প্রবল বেগে পড়ছে ক্রুড অয়েল, মেরে ফেলছে চারপাশের সাগরকে। কালো একটা হাতের মত করে ছড়িয়ে পড়েছে তেল, ভুল না হলে এতক্ষণে পৌঁছে গেছে পেট্রোম্যাক্সের টারমিনালের কংক্রিট ব্রেকওয়াটারে। এইমাত্র দক্ষিণ থেকে ঝিরঝিরে হাওয়া ছেড়েছে, এখানে প্ল্যাটফর্মের নীচের বদ্ধ পরিবেশ নেই, কিন্তু বাতাসে এখনও ভাসছে পেট্রোকেমিকেলের বদগন্ধ।

নর্থ সি বা গালফ অভ মেক্সিকোর বিশাল রিগে এক শ'র বেশি কর্মী থাকে, সেইসঙ্গে থাকে তাদের একমাস চলবার মত খাবার, কোনও কোনোটা হয় অনেক স্কাইস্ক্র্যাপারের চেয়ে অনেক উঁচু, তেমনি বড়— কিন্তু এই রিগ তেমন প্রকাণ্ড নয়, বড়জোর চার শ' বর্গফুটের। মাকড়সার জালের মত ড্রিল টাওয়ারটা সবচেয়ে উঁচু। উজ্জ্বল হলুদ রঙা মোবাইল ক্রেনটা টেণ্ডার থেকে তোলে বা নামায় সাপ্লাই।

লোহার তৈরি কয়েকটা দালান চোখে পড়ছে। সবই ডেকের

সঙ্গে বল্টু দিয়ে আটকানো। রিগের ডেকের বাইরে ক্যান্টিলেভার করে তৈরি করা হয়েছে। দালানগুলোর একটা হবে কন্ট্রোল সেন্টার, অন্যগুলোর ভিতর থাকবে মেশিনারি। ওগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে সাগর-তলের কূপের তেল তুলবার গতি। ডেকের উপর সারি সারি নানান সাইজের পাইপ, এখানে ওখানে ইকুইপমেন্ট— ভাঙা ড্রিল স্ট্রিং, খুঁড়বার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। একদিকে স্টোরেজের জন্য রয়েছে ছোট কয়েকটা কন্টেইনার। মাত্র কয়েক বছর হলো চালু হয়েছে এই রিগ, কিন্তু চারপাশে পড়ে আছে ময়লা ও আবর্জনা, কোনও যত্ন নেয়া হয় না এ রিগের। চারপাশে কোনও লাশ নেই বলে একটু স্বস্তি পেল রানা।

সাগরের বুক থেকে উঠে এসে ড্রিল টাওয়ারের পায়ে হুমড়ি দিয়েছে ক্রুড অয়েল, যেন ভয়ঙ্কর কোনও আগ্নেয়গিরির লাভা। ভূ-গর্ভের প্রচণ্ড প্রেশারের কারণে ডেক থেকে পনেরো ফুট উপরে ছিটকে উঠছে তেল, তারপর নিজ ওজন সামলাতে না পেরে লুটিয়ে পড়ছে কালো দৈত্য, সেই জায়গা নিচ্ছে নতুন ক্রুড অয়েল। ডেকের নানা ফাঁকা জায়গা দিয়ে আটলান্টিকের বুকে ফিরছে সব। যে পরিমাণ তেল পড়ছে, এ থেকে বুঝবার উপায় নেই স্থায়ী ভাবে স্যাবোটাজ করা হয়েছে, না স্রেফ খুলে দেয়া হয়েছে সেফটি ভালভ।

রানার মাথায় বারবার ঢুঁ দিচ্ছে একটা চিন্তা। যদি আগুনের ফুলকি তৈরি হয়, ফস্ করে জ্বলে উঠবে তেল। এবং সেই বিস্ফোরণ উপকূলের আশপাশের সমস্ত গাছকে আকাশে উড়তে বাধ্য করবে।

সবাইকে নিয়ে যখন প্ল্যাটফর্মের পাশে উঠল রানা, দেখেছে চারপাশে ঘুরছে টেরোরিস্টরা। কোনও দিকে বিশেষ মনোযোগ ছিল না তাদের। মাত্র দু'একজন কিনারা থেকে দেখেছে কেউ

আসছে কি না। তাদেরকে সন্তুষ্ট মনে হয়েছে। সবাই ধরে নিয়েছে পরিস্থিতি হাতের মুঠোতেই আছে।

কিন্তু তারপর সব পাল্টে গেল। তৃতীয় রিগের দিকে ছুটে এল মার্ভেল, উড়িয়ে দিতে লাগল মার্সেনারিদের সঙ্গীদেরকে। এরপর নতুন করে শৃঙ্খলা ফিরল সবার ভিতর। পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করল তিরিশজনের কনটিনজেন্টের নেতা। ঠিক হলো কোনও জাহাজ রেঞ্জের ভিতর এলেই আরপিজি ফেলবে ওটার উপর। এর কিছুক্ষণ পর চারজন প্রহরী চক্কর কাটতে এল। বাধ্য হয়ে দলের সবাইকে নিয়ে দুই ডেক নীচে একটা চেইন লকারে লুকিয়েছে রান্যা।

কিন্তু এখন উপকূল থেকে দূরের এক রিগের দিকে চলেছে মার্ভেল। আবারও সতর্কতা হারাচ্ছে গাধাধারের লোকরা। এখন আর চারপাশে নজর রাখছে না প্রহরীরা, অনেকে চলে গেছে দূরে, নিজেদের ভিতর গল্প চলছে, সবার চোখ দূরের জাহাজের উপর। টমাস গাধাধারের ফোর্সের বেশির ভাগের বয়স পনেরো থেকে উনিশের ভিতর। নিকোলাস ক্রিস্টোফারের কাছ থেকে যত টাকাই নিক লোকটা, ট্রেইন্ড্ সৈনিকদের পাঠায়নি। এরা কতটা গরীব এবং খেতে না পেয়ে বাধ্য হয়েই গাধাধারের দলে যোগ দিয়েছে, এসব মন থেকে মুছে ফেলল রানা। আসল কথা হলো: এরা হাত মিলিয়েছে টেরোরিস্টের সঙ্গে, এবং এসেছে অন্যের ক্ষতি করতে।

আমাহ্লের কাঁধে টোকা দিল রানা। বুঝিয়ে দিল সে যেন সিঁড়ির উপর অংশে পজিশন নেয়। নিজে নেমে গেল স্বর্ণার সঙ্গে আলাপ সেরে নেয়ার জন্য। 'এটা প্রথম আক্রান্ত রিগ, মনে হয় না এখানে কোনও প্রতিরোধের মুখে পড়েছে এরা,' নিচু স্বরে বলল রানা। জোরে বললেও সমস্যা হতো না, প্রবল বেগে পড়ছে ক্রুড অয়েল। 'যখন দ্বিতীয় রিগে হামলা হলো, তখন

থেকে পাল্টা জবাব দিতে শুরু করেছে ক্রুরা।'

'মাসুদ ভাই, আপনি ভাবছেন এই রিগের ক্রুদের কোনও ঘরে আটকে রেখেছে?'

'এদের বুকে দয়া বলতে কিছু নেই, কিন্তু খামোকা এক শ' লোক খুন করে কী পাবে?'

'আপনি চান, আমি যেন তাদেরকে খুঁজে বের করি?'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'আমরা একবার রিগ দখল করলে তেল বন্ধ করতে তাদেরকে লাগবে। আর যদি কাশেমদের রিগে সবাই মারা পড়ে, এদের একদলকে ওখানে পাঠাতে হবে। ...তোমার সঙ্গে তিনজন লোক নাও, নীচের ডেক খুঁজে দেখো। ওখানে ডাইনিং রুম থাকতেই হবে। আমার ধারণা, ওখানেই আটকে রেখেছে সবাইকে।'

তর্জনী দিয়ে তিনজন মুক্তিসেনাকে ইশারা করল স্বর্ণা। ছোট দলটি নিয়ে রওনা হয়ে গেল। পিছন থেকে হেসে ফেলল রানা। স্বর্ণার প্রায় দ্বিগুণ উঁচু তিন যোদ্ধা বাধ্য শিশুর মত পিছু নিয়েছে, একটা ডোরওয়ে দিয়ে রিগের ভিতর ঢুকে পড়ল ওরা। আবারও সিঁড়ির মাঝে আমাহ্‌লের পাশে থামল রানা, নতুন করে চোখ বোলাতে শুরু করেছে চারপাশে। গুলির অ্যাঙ্গেলগুলো হিসাব কষে দেখছে, বুঝে নিচ্ছে কাভার পজিশন, কখনও পিছাতে হলে কোথায় থামবে। ওর দিকে চেয়ে আছে আমাহ্‌লে, টের পেল রানা।

'আপনি বোধহয় তেড়ে যেতে চান?' জানতে চাইল।

'এটাই আমার একমাত্র পরিকল্পনা,' চওড়া হাসল আমাহ্‌লে। 'আগেও তাই করেছি। এখনও মরিনি।'

মাথা নাড়ল রানা, সংক্ষেপে বলল কী করতে হবে। সার্জেন্ট তার লোকদের ব্যাখ্যা করে জানালো। চুপচাপ সিঁড়ির উপর ধাপে থামল কালো মানুষগুলো, তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে

কোথায় কোথায় অ্যাম্বুশ করবে রানা। দক্ষ যোদ্ধা তারা, প্রত্যেকে বুঝল তাদের মগজ থেকে এমন দাবার চাল বেরুতো না।

গভীর জঙ্গলে লড়তে অভ্যস্ত তারা, অপরিচিত পরিবেশেও নিজেদের ভালই মানিয়ে নিয়েছে। নিঃশব্দে ডেকের উপর দিয়ে চলেছে, বোঝা গেল প্রত্যেকে তুখোড় শিকারী— কিশোর বয়স পার করেছে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণী মারতে, তাদের কাজই ছিল মানুষ-শিকার করা! প্রায় দশ মিনিট লাগল তাদের নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে, তারপর আবারও ডেকে চোখ বোলাল রানা। নিশ্চিত হয়ে নিল সবাই কোথায় ঘাঁটি গেড়েছে। এখন বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে সেম-সাইড গোলাগুলি শুরু হলে।

সন্তুষ্ট হয়ে সিঁড়ির উপরের ধাপে থামল রানা, তারপর এক দৌড়ে চলে গেল কাছের এক কন্টেইনারের আড়ালে। ধাতব দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দেখে নিল অ্যাসল্ট রাইফেলের সেফটি অফ করা আছে কি না। টেরোরিস্ট নেতা আছে এক শ' গজ দূরে, বড় এক রেডিয়োতে কথা বলে চলেছে। মাথার দোল দেখে মনে হচ্ছে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার কাছে রিপোর্ট দিচ্ছে। এবং তার বস আছে তীরে। কাঁধে এমপি-৫ তুলে নিল রানা, লোকটার বাম বুকে তাক করল লেসার সাইট।

এক সেকেণ্ড পর লেসারের লাল বিন্দু মিলিয়ে গেল, সে জায়গা দখল করল দু' টাকার কয়েনের মত একটা বুলেটের গর্ত। কাত হয়ে কলাগাছের মত ডেকে পড়ল লাশ, মনে হলো কোনদিন ওই দেহে কোনও হাড় ছিল না। সাইলেন্সারের কারণে ছড়িয়ে পড়েনি গুলির আওয়াজ, কিন্তু কয়েকজন দেখতে পেয়েছে তাদের নেতা মারা পড়েছে। ওই দলের সবার চেতনা যেন একইসঙ্গে ফিরল, সতর্ক হয়ে উঠেছে সবাই। অস্ত্রের গ্রিপ শক্ত করে ধরেছে, ছুটতে শুরু করেছে কাভার নেয়ার জন্য।

মার্ভেলের স্টোর থেকে দেয়া সাইলেন্সারহীন একটা একে-৪৭ গর্জে উঠল। জবাব দিল তিরিশটা রাইফেল। ডেকের উপর দিয়ে নানান দিকে ছুটছে অসংখ্য বুলেট। কিন্তু এক দিকে গুলি গেল না। রানা নিশ্চিত করেছে ড্রিলিং ডেরিকের কাছ থেকে দূরে থাকবে ওর লোক, ভুলেও গুলি করবে না ওদিকে। ওখানে বলকে উঠছে ক্রুড অয়েল।

প্রথম পাঁচ সেকেণ্ডে গুলি খেল ছ'জন টেরোরিস্ট। হঠাৎ করেই কন্টেইনার ঘুরে বেরিয়ে এল দু'জন, রানা কোমরের কাছ থেকে গুলি করে ফেলে দিল তাদের। দুই পক্ষ হিংস্র হয়ে উঠেছে, শুরু হয়েছে প্রচণ্ড গোলাগুলি। রানার এক যোদ্ধা দ্বিতীয় কাভারে যেতে গিয়ে পায়ে গুলি খেল, ছিটকে পড়ল রানার দশ ফুট দূরে। দ্বিতীয়বার ভাবল না রানা; লোকটার উপর দিয়ে এক পশলা গুলি পাঠিয়ে দিয়েই এক লাফে বেরিয়ে এল আড়াল থেকে, কন্টেইনারের এপাশে টেনে আনল আহত মানুষটাকে।

দুই হাতে রক্তাক্ত উরু চেপে ধরেছে লোকটা, হিসহিস শ্বাসের ফাঁকে বলল, 'নগেয়াবোঙ্গো।'

'আপনাকেও ধন্যবাদ,' জবাবে বলল রানা, বুঝতে পেরেছে মানুষটার মনোভাব। পরের সেকেণ্ডে আকাশ ভেঙে পড়ল ওর মাথার উপর, কন্টেইনারের পাশে বিস্ফোরিত হয়েছে আরপিজি!

রিগের এই স্তরের প্ল্যাটফর্ম অন্ধকার থাকলে বেশি খুশি হতো স্বর্ণা, সেক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারত নাইট ভিশন গগলস। কিন্তু একের পর এক করিডোরে জ্বলছে অতি উজ্জ্বল বাতি।

নীচের লেয়ারে মেশিনারি দিয়ে ভরা চারটে বিশাল ঘর, কিন্তু ওখান থেকে এক স্তর উঠতেই শুরু হয়েছে গোলকধাঁধার মত প্যাসেজওয়ে ও ইন্টারকানেকটেড রুম। দেখা গেল ছোট কিছু ডরমিটরি। ওখানে কাজের শেষে বিশ্রাম নিত কর্মীরা। এ ছাড়া

রয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফদের অফিস সুইট।

এক এক করে সব ঘর সার্চ করতে গিয়ে বাড়তি সময় ব্যয় হচ্ছে, কিন্তু এ ছাড়া কোনও উপায়ও নেই। দ্রুত কাজ শেষ করতে হবে, মনের ভিতর তাড়া বোধ করছে স্বর্ণা। ওর ফিরতে দেরি হলে অর্ধেক যোদ্ধা ছাড়াই লড়তে বাধ্য হবেন মাসুদ ভাই।

একটা বাঁকে পৌঁছে উঁকি দিল স্বর্ণা। একটু দূরে দরজা। দু'পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই মার্সেনারি, কাঁধ থেকে ঝুলছে একে-৪৭। ঝট্ করে মাথা পিছিয়ে আনল স্বর্ণা। ওকে চমকে উঠতে দেখে থমকে গেছে দলের সবাই। আঙুল দিয়ে নিজের চোখ দেখাল স্বর্ণা, হাতের ইশারা দিয়ে বুঝিয়ে দিল ওদিকে আছে দু'জন মার্সেনারি। যারা যুদ্ধ করেছে, তাদের ভিতর এই ইশারা গোটা দুনিয়া জুড়ে প্রচলিত। আস্তে করে মাথা দোলাল তিন যোদ্ধা। তাদের একজনকে মেঝের উপর বসতে ইশারা করল স্বর্ণা। কিন্তু লোকটা ঘন ঘন মাথা নাড়ল। বাম দিকের সঙ্গীকে দেখিয়ে দিল। হাতের ইশারা দেখে মনে হলো গুলি করে চলেছে। এবার ডানহাতের তর্জনী তুলে বোঝাতে চাইল: ও আমার চেয়ে ভাল নিশানা করে। বামের লোকটাকে ইশারা করল স্বর্ণা, চট্ করে পজিশনে এসে বসল স্নাইপার।

সিলিঙের উপর রক্তিম কাটাকাটি খেলছে এইচ অ্যাণ্ড কে'র লেসার সাইট, বাঁকের পাশে পৌঁছে গেল স্বর্ণা, সাবধানে উঁকি দিল। ওর দুই গুলি ছিটকে ফেলল দূরের মার্সেনারিকে। কাছের লোকটার বুকে গুলি করেছে যিম্বাবুইয়ান স্নাইপার। লাশ দুটো দরজার পাশেই পড়েছে। বদ্ধ পরিবেশে মেশিন পিস্তলের আওয়াজকে চাপা দিল রাইফেলের বিকট হুঙ্কার।

দরজা লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করেছে স্বর্ণার দলের সবাই। এদিকে দূরের বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এসেছে তৃতীয় মার্সেনারি, সে কোনও সুযোগ পাওয়ার আগেই চারটে অস্ত্র গর্জে উঠল। বুকে

কয়েকটা গুলি খেয়ে ছিটকে গেল লাশ, একটা বালকহেডের সঙ্গে ঠোকর খেয়ে মেঝের উপর পড়ল। এদিকে দরজার ওপাশে গুলি শুরু হয়েছে। ব্যথা ও আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠছে একদল লোক।

অন্যদের আগেই দরজার কাছে পৌঁছে গেল স্বর্ণা, পেটের পাশ থেকে তিন রাউণ্ড গুলি করল। দৌড় থামায়নি, দরজা পেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেঝের উপর। কাঁধের হাড়ে ব্যথা পেয়ে কুঁচকে গেল মুখ, মেঝেতে পিছলে চলে গেছে দুই ফুট, তারপর হাঁটুর জোরে উঠে বসল। কাঁধে তুলেছে এমপি-৫, প্যাসেজওয়েতে গোলাগুলি হতেই আতঙ্কিত তেল-কর্মীদের উপর গুলি ছুঁড়ছে দুই মার্সেনারি।

ভীষণ হুলুস্থুল চলছে ঘরের ভিতর। এদিক-ওদিক দৌড়াতে শুরু করেছে অনেকে, প্রাণের ভয়ে চেঁচিয়ে চলেছে, একে অপরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। মেঝেতে পড়ে গেছে গুলিতে আহত কয়েকজন। দু'জন লোক দরজার দিকে ছুটছে। একই সময়ে গুলি করেছে স্বর্ণা, তাদের পাশ কাটিয়ে গেল তিনটি গুলি, বিঁধল কিচেনের স্টেইনলেস-স্টিলের ভেণ্ট ডাক্টে। মার্সেনারিদের গুলিতে আহত হয়ে পড়ে গেল আরও দুই তেল-কর্মী, তারপর নতুন করে টার্গেট স্থির করল স্বর্ণা, ওর গুলি উড়িয়ে দিল প্রথম মার্সেনারির কপালের বেশিরভাগ অংশ।

ডাইনিং রুমের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে স্বর্ণার সঙ্গীরা, যেন তেল-কর্মীরা মেঝেতে শুয়ে পড়ে, তাই গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করেছে। খুঁজছে তারা শেষ মার্সেনারিকে। সঙ্গী মারা পড়তেই গুলি বন্ধ করেছে সে, এখন মিশে যেতে চাইছে সবার মাঝে। ধাক্কাধাক্কি করে বেরিয়ে পড়বে দরজা দিয়ে।

'কেউ দরজা দিয়ে বেরুবে না,' চিৎকার করে নিষেধ করল স্বর্ণা। চিল-কণ্ঠ চিরে দিল বাতাস। ওর দলের স্নাইপার শুনতে

পেয়েছে, সে সঙ্গীদের নিয়ে আড়াল করে দাঁড়াল দরজা। ধাক্কা দিয়ে বেরুতে গিয়ে থমকে গেল তেল-কর্মীরা, সামনের গম্ভীর লোকগুলোর হাতে অস্ত্র!

উঠে দাঁড়াল স্বর্ণা, একে একে প্রত্যেকের চেহারা দেখতে শুরু করেছে। এক পলকের জন্য গাধাধারের লোককে দেখেছে, এখন কোথাও তাকে দেখতে পেল না। তারপর বামে নড়াচড়া চোখে পড়ল। সামান্য দুলছে কিচেনের দরজা। এক দৌড়ে ঘর পেরিয়ে ওখানে পৌঁছে গেল স্বর্ণা। অস্ত্র দেখে ঝট্ করে সরে গেছে সামনের লোকগুলো।

গন্তব্যে পৌঁছে পায়ের জোরে দরজা ঠেলল স্বর্ণা, অর্ধেক খুলতেই বাধা পেল কবাট। কীসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেয়েছে, ফিরতি পথ ধরল ওটা। ওদিক থেকে কোনও পাল্টা জবাব নেই। সাবধানে সামনে বাড়ল স্বর্ণা, দরজা এড়িয়ে ঢুকে পড়ল কিচেনের ভিতর। বামে একটা ডিশওয়াশার মেশিন, একটু দূরে ছোট এক করিডোর, ওদিকে স্টোরেজ এরিয়া বা কিচেনের অন্য অংশ।

দরজার ডানে চোখ পড়ল স্বর্ণার, এবং ঠিক তখনই শক্তিশালী একটা হাত খপ্ করে ধরল ওর ঘাড়। মেঝে থেকে উঠে গেল ওর দুই পা। কিডনির উপর ঠেসে ধরা হয়েছে অ্যাসল্ট রাইফেলের তপ্ত মাযল। স্থানীয় কোনও ভাষায় কথা বলে উঠেছে মার্সেনারি। একটা কথাও বুঝল না স্বর্ণা। কিন্তু বুঝতে দেরি হলো না ওকে বন্দি করা হয়েছে। এখন যদি জোরাজুরি করে, ছিটকে বেরুবে ওর মেরুদণ্ডের হাড়, দুই সেকেণ্ড পেরুনোর আগেই মরবে।

চতুর্থ অয়েল রিগে পৌঁছুতে দশ মিনিটও লাগল না মার্ভেলের, খুঁজতে শুরু করেছে শত্রু বোট। কয়েক মুহূর্ত পর বোঝা গেল

দূর-সাগরে বোট বহর ধ্বংস হওয়ার দৃশ্য দেখেছে তিনটে বোটের ড্রাইভার, এখন প্ল্যাটফর্মের আশপাশে রয়েছে শুধু একটা বোট। ওটা মাত্র দুই সেকেণ্ডে উড়ে গেল যাত্রীসহ। জাহিদ হাসান ইউএভি দিয়ে চোখ রেখেছে সাগরের উপর, দেখা গেল পালাচ্ছে তিনটে বোট, তাদের লক্ষ্য ট্যাঙ্কার লোডিং পিয়ার। লোকগুলো তীরে উঠলে সঙ্গীদের হাত জোরালো করবে, কাজেই তাদের শেষ করতে নবীকে নির্দেশ দিল সোহেল। দুই বোট উড়ে যাওয়ার পর তৃতীয় বোট রেঞ্জের প্রায় বাইরে চলে গেল। বাধ্য হয়ে ওটার দিকে পাঁচ সেকেণ্ডের গুলিবর্ষণ করল নবী। প্রতি সেকেণ্ডে আটটা করে গুলি গিয়ে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলল বোট। চরকির মত আরেক দিকে ছুটল আবর্জনা, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড নেচে তলিয়ে গেল ঢেউয়ের নীচে।

হঠাৎ বাঁক নিতেই গুঙিয়ে উঠল মার্ভেলের খোল, একইসঙ্গে থ্রাস্টার ও ড্রাইভ টিউব ব্যবহার করেছে গগল। গতি আরও বাড়তে লাগল, ডক লক্ষ্য করে চলেছে জাহাজ।

'মার্ভেল থেকে মুক্তিসেনা,' রেডিয়ো করল সোহেল।

'মুক্তি থেকে মার্ভেল,' সাড়া দিল নিশাত।

'চতুর্থ রিগ শত্রুমুক্ত, আপনাদেরকে কাভার দিতে পজিশনে আসছি।'

ডকের প্রতিরক্ষা খুবই ভাল, লাইফবোট নিয়ে ওখানে যাওয়া মানেই মৃত্যুবরণ করা। কিন্তু মার্ভেল কাভার দিলে ওখানে নামা সম্ভব। রানা ও সোহেল পরিকল্পনা করেছে নিশাত, জলিল ও আলতাফ মৃধার জন্য, তাতে সব কূল রক্ষা হবে।

'সোহেল ভাই, আপনাদেরকে আসতে দেখছি, কিন্তু পাঁচ মিনিট লাগবে আমাদেরকে কাভার দিতে।'

'আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন না, ঠিক সময়ে হাজির হব,' হেলম থেকে জানিয়ে দিল গগল। থ্রটল খুলে দিল।

'আপনারা সৈকতের এক মাইলের ভিতর চলে যান।'

একবার কমপিউটারের স্ক্রিন দেখে নিল সোহেল। কঙ্গো নদীর সেই কাদা নেই ড্রাইভ টিউবের ভিতর, পূর্ণোদ্যমে ছুটছে মার্ভেল। 'আমরা পৌঁছে যাব,' জানিয়ে দিল নিশাতকে।

তীর থেকে দু' মাইল আগে হাইড্রোফয়েলের গতি কমিয়ে দিয়েছে নিশাত, আপাতত বড় বৃত্ত তৈরি করছে, সময় এলেই তীরের দিকে রওনা হবে। সোহেলের কথা শুনেই পুবে ঘুরিয়ে দিল লাইফবোট, বিশাল স্টোরেজ ট্যাঙ্কগুলোর টারমিনালের দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করেছে। মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল ইউএভি। ওদিকে রয়েছে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক শত্রু। কিন্তু লাইফবোটকে ঠিকই দেখবে তারা আসতে, ঠেকাতে পাঠাবে মার্সেনারিদের।

অয়েল স্পিল এড়াতে গিয়ে বাঁক নিল নিশাত। কালো তেলের বাহু চারদিকে কতটা ছড়িয়ে গেছে, আন্দাজ নেই। কিন্তু ওর মনে হলো প্রিন্স উইলিয়াম সাউণ্ডের একসন ভালদেজের অয়েল স্পিলের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হয়েছে এদিকের সাগরের।

পিছনের রিয়ার ককপিটে দাঁড়িয়েছে নিশাত, ওখান থেকে চারপাশ দেখছে। হাইড্রোফয়েলের ইঞ্জিনের উপর দিয়ে শুনতে পেল না মাথার উপর দিয়ে গেছে ইউএভি। মাথার মাত্র বিশ ফুট উপর দিয়ে বাঁধের দিকে গেল খেলনা বিমান। ওটা কিছু দূর যেতেই খেয়াল করল নিশাত, বিড়বিড় করে বলল, 'লোকটা বিমান ফেলে দেবে, তবে নিজে মরবে না।' গতরাতে তাড়াহুড়ো করে ফিট করা ফ্ল্যাটস্ক্রিন ডিসপ্লে দেখল ও।

প্রথমবার ফ্যাসালিটির উপর দিয়ে ইউএভি যেতে যেমন দেখিয়েছে চারপাশ, এখনও ঠিক তেমনই লাগছে ওদিক। এখনও ট্যাঙ্ক ফার্ম বা পাওয়ার প্লান্টের আশপাশে কেউ নেই।

ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসান উত্তর দিকে বিমান নিয়ে যেতে দেখা গেল ওদিকে তৎপর হয়ে উঠেছে মার্সেনারিরা। তাদের একদল পাহারা দিচ্ছে মেইন গেট, ছোট ক্লোনও গেটও বাদ পড়েনি, অন্যরা আঠারো চাকার ট্যাঙ্কার ট্রাকগুলো খালি করছে। প্রতিটি ট্রেইলারের পিছন থেকে গলগল করে পড়ছে ক্রুড অয়েল, সবই চলেছে সাগরের বাঁধের দিকে। লোকগুলোর আরেক কনটিনজেন্ট উঠেছে ভাসমান পিয়ারে, দ্বিতীয় সেট লোডিং গ্যাণ্ট্রিগুলো তৈরি রেখেছে, এবার পাম্প দিয়ে তেল ফেলবে সাগরের বুকে। ওখানে আক্রমণ করবে নিশাত ও জলিল, কিন্তু তার আগে ওদেরকে কাভার দেয়ার জন্য সঠিক পজিশনে পৌঁছুতে হবে আলতাফ মৃধা ও যোদ্ধাদেরকে।

কিছুক্ষণ পর মাত্র একমাইল দূরে রইল ট্যাঙ্ক ফার্ম। ডিজিটাল আপলিঙ্কে নিশাত দেখল, ওদের দেখতে পেয়েছে গাধাধারের সৈনিকরা। কযওয়ে থেকে ছুটে আসছে তারা, অনেকে দ্রুত আসতে গিয়ে চেপে বসেছে পেট্রোম্যাক্সের ভেহিকেলে। আসছে তারা ট্রাকে, ফোর্কলিফটে, এমনকী বড় এক ক্রেনও বাদ পড়েনি। ভেহিকেল না পেলেও অন্যরা ছুটে আসছে দৌড়ে। টারমিনাল যেন মৌচাক, ওখানে ঢিল পড়তেই ছড়িয়ে পড়ছে মৌমাছি।

'স্যর, আমি যা দেখছি আপনারা তা-ই দেখছেন?' জানতে চাইল নিশাত।

'দেখেছি,' সংক্ষেপে জানিয়ে দিল সোহেল।

হালের প্লেট আবারও সরিয়ে দিয়েছে নবী, কিন্তু এবার বেরিয়ে এসেছে জাহাজের ৪০এমএম বোফোর্স অটোমেটিক ক্যানন। হাইড্রোলিকস অ্যাক্টিভেট হতেই ফায়ারিং পজিশনে চলে এল অস্ত্রটা। আপনা-আপনি নবীর কমপিউটার স্ক্রিন দুই টুকরো হয়ে গেল, সেখানে দেখা দিল দুটো আলাদা দৃশ্য। একটা

দেখিয়ে চলেছে গ্যাটলিং গান, অন্যটা পম-পম ক্যানন। দ্রুত হাতে টার্গেট স্থির করছে নবী, জয়স্টিক দিয়ে সরাতে শুরু করেছে রেটিকল। একটা ভেহিকেলের উপর সাইট থামতেই কমপিউটার বলে দিল নিশানা লক করতে হবে। পরক্ষণে বুম্ করে উঠল হাই এক্সপ্লোসিভ শেলগুলো। মার্ভেলের খোলের পাশ থেকে পনেরো ফুট কমলা আগুনের শিখা ছিটিয়ে দিল গ্যাটলিং গান। প্রথম টার্গেট বিধ্বস্ত হওয়ার আগেই দ্বিতীয় টার্গেট খুঁজতে শুরু করেছে নবী।

একটা ডাম্প ট্রাকের পাশে গিয়ে লেগেছে গ্যাটলিঙের রাউণ্ড, হাইপারভেলোসিটি বুলেট গোটা ইঞ্জিন ছিঁড়ে ফেলেছে মাউন্ট থেকে, ক্যাবের ভিতরের সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে। এক ইঞ্চি পুরু ডাম্প বেডে মুঠোর মত গর্ত তৈরি হয়েছে। প্রচণ্ড শক্তি কাত করে দিল বারো টনি প্রকাণ্ড ট্রাককে, এক সেকেণ্ড টলমল করে দড়াম করে পড়ল ওটা পিচের উপর।

একটা ট্রাকের দশ ফুট সামনে নামল দুটো ৪০এমএম রাউণ্ড, অ্যাসফল্টের ভিতর তৈরি হলো গভীর গর্ত। ট্রাকের সামনের দরজা ও রানিং বোর্ডে দাঁড়িয়ে ছিল কয়েক সশস্ত্র মার্সেনারি, তাদেরকে চমকে দিয়ে তীক্ষ্ণ বাঁক নিতে শুরু করেছে ড্রাইভার, কিন্তু বামদিকের চাকা গিয়ে পড়েছে ধোঁয়াভরা বিশাল গর্তে, এবং ঠিক তখনই সামনের ডানদিকের চাকার উপর লাগল তৃতীয় রাউণ্ড— ছুঁড়ে দেয়া ঢিলের মত আকাশে উঠল ট্রাক, ওটা থেকে ঝরঝর করে পড়ছে লোকগুলো, মনে হলো কোনও দুষ্টু ছেলে ছোট বোনের পুতুলগুলো ছিটাচ্ছে চারদিকে।

'মিস্টার গগল,' কমপিউটার থেকে চোখ না তুলেই বলল নবী, 'এক পাশে সরে যান। আমরা রেঞ্জে পৌঁছে গেছি। এবার ব্যবহার করব ডেকের মেশিনগান।'

.৩০ ক্যালিবারের এম-৬০ মেশিনগান অন্য ওয়েপন্স

স্টেশনের মত নয়, এ জিনিস আলাদা ভাবে টার্গেট করা যায়। অত্যন্ত শক্তিশালী এই অস্ত্র প্রাথমিকভাবে ব্যবহার করা হয় জাহাজে কাউকে উঠতে না দেয়ার কাজে, কিন্তু দরকার পড়লে ব্যবহার করা যায় তীরের যুদ্ধে। ডেকে তেলের ড্রামের ভিতর লুকিয়ে রাখা হয়েছে মেশিনগান, ঢাকনি খুলে যেতেই দিগন্তের দিকে নাক উঁচু করে বেরিয়ে এসেছে। প্রতিটি অস্ত্রের সঙ্গে রয়েছে আলাদা লো-লাইট ও ইনফ্রারেড ক্যামেরা। অস্ত্র তাক হতেই অন্য ওয়েপন্স সিস্টেমের দিকে মনোযোগ দিল নবী। অন্য গানাররা ব্যবহার করবে .৩০ ক্যালিবার। দুই সেকেণ্ড পর অন্য অস্ত্রের সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠে আলাপে যোগ দিল মেশিনগান।

পাঁচ মিনিট পেরুনোর আগেই ট্যাঙ্ক ফার্মের পিয়ার লক্ষ্য করে ছুটে আসা বন্ধ হলো মার্সেনারিদের। ওদিকে হাইড্রোফয়েল গুটিয়ে নিয়েছে নিশাত, প্রস্তুতি নিচ্ছে তীরে ভিড়বার। মেশিনগান অন্যদিকে ব্যস্ত থাকলে উঠান পেরিয়ে আসতে চাইছে মার্সেনারিরা, এক কাভার থেকে ছুটছে আরেক কাভারের দিকে। গোটা টারমিনালের আড়াল নিয়ে পেরিমিটার বেড়ার দিকে ছুটে আসছে ভ্যান ভরা মার্সেনারিরা।

সামনের পথ অনেকটা পরিষ্কার করে দিয়েছে নবী, কিন্তু তীরে নামলে এখনও লড়তেই হবে। বাংলাদেশ আর্মির লেফটেন্যান্ট গেরিলা আক্রমণে মৃধা মুক্তিসেনাদের নিয়ে দখল করবে প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড, নইলে পরে নিশাত ও জলিল গিয়ে উঠতে পারবে না ট্যাঙ্কার পিয়ারে। ওখানে প্রতি মিনিটে সাগরের বুকে পড়ছে চার শ' টন টকটকে ক্রুড অয়েল।

এগারো

সাগরের গভীর থেকে উঠে আসা তেলের ধারা দেখছে কাশেম বক্স। একটু আগে আত্মসমর্পণ করেছে শেষ পনেরোজন শত্রু, তাদের দিকে চেয়ে ওর মনে হলো লোকগুলোকে গুলি করে মারা উচিত। পেট্রোম্যাক্সের কর্মীরা থামাতে চাইছে তেলের বিপুল ধারা, কিন্তু মনে হচ্ছে সফল হবে না। কীভাবে প্রকৃতি এবং নিজেদের সর্বনাশ করছে মানুষ, ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠতে হয়।

প্ল্যাটফর্মের কিনারায় হাঁটু গেড়ে বসেছে মার্সেনারিরা, হাতগুলো পিছমোড়া করে আটকে দেয়া হয়েছে ফ্লেক্স কাফে। কাশেমদের কাছে যথেষ্ট হাতকড়া ছিল না, লোকগুলোকে বাঁধবার জন্য ইলেকট্রিকাল তার দিয়েছে তেল-কর্মীরা। গাধাধারের মার্সেনারিদের বয়স বড়জোর বিশ থেকে পঁচিশ। কাশেমের শীতল চাহনির সামনে একজনও চোখ তুলতে পারছে না। মার্ভেল টিমের হামলার শুরুতেই মারা পড়েছে ছ'জন মার্সেনারি। লাশগুলো এখন তারপুলিন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।

কয়েক মিনিটের ভয়ঙ্কর খণ্ড যুদ্ধে আহত হয়েছে কাশেমের এক যোদ্ধা, দেয়াল থেকে ছিটকে গুলি গিয়ে লেগেছে তার দেহে, কয়েক দিনের ভিতর সুস্থ হয়ে উঠবে। যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে চমকে গেছে অবশিষ্ট মার্সেনারিরা, যখন বুঝেছে মৃত্যু অনিবার্য, অস্ত্র ফেলে দু'হাত মাথার উপর তুলে আত্মসমর্পণ

করেছে। ততক্ষণে কয়েকজন শিশুর মত কাঁদতে লেগেছে। এদের সবাইকে বন্দি করবার পর প্ল্যাটফর্মের নীচের স্তরে গেছে কাশেম, ওখানে কোনও প্রহরা ছাড়াই আটকে রাখা হয়েছিল তেল-কর্মীদেরকে। তাদের কাছে জানা গেছে, মার্সেনারিরা এসেই কোনও সুযোগ না দিয়েই হত্যা করেছে আটজন কর্মীকে।

মার্সেনারিরা প্ল্যাটফর্ম দখল নেয়ার সময় খুন হয়েছে রিগের টুল পুশার, এখন তেলের ধারা থামাতে চাইছে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট। কূপের মাথা ঘিরে কাজ করছে লোকগুলো, তাদের কাছ থেকে কাশেমের দিকে সরে এল সে। তেলে চুপচুপে হয়ে গেছে উপমহাদেশীয় লোকটার কভারল ও গ্লাভস, কালো মুখে চটচটে গ্রিজ।

'আমরা তেল বন্ধ করতে পারব,' অদ্ভুত উচ্চারণে ইংরেজি বলল সে। কাশেম বুঝল এই মাল এসেছে রয়্যাল ডিস্ট্রিক্ট খাস নোয়াখালি থেকে।

'তো বন্ধ করুন,' বাংলায় বলল কাশেম।

বাংলা ভাষা শুনে চমকে গেল মানুষটা, মুহূর্তে খুশি হয়ে উঠেছে। 'আঁই আঁর কী কমু, আমনে অইলেন আমার দ্যাশের লোক।' কে জানে কত দিন বেচারা দেশে ফিরতে পারেনি। চট্ করে পাল্টে ফেলল উচ্চারণ, স্পষ্ট শুদ্ধ বাংলায় বলল, 'ওরা ক্রিসমাস ট্রির মাথা সরিয়ে বারো ইঞ্চির শাট ভালভ বসিয়েছে। তেল তুলতে খুলেছে ভালভ, কিন্তু ভেঙে ফেলেছে হ্যাণ্ডেল। পাশ থেকে ফেলে দিয়েছে ক্রিসমাস ট্রি।'

কাশেম আন্দাজ করল ক্রিসমাস ট্রি বলতে তেল-কর্মী বোধহয় কূপের ক্যাপকে বোঝাতে চাইছে। ওটাই সম্ভবত পাইপ দিয়ে তেল পাঠিয়ে দেয় তীরে। 'ঠিক করতে কতক্ষণ লাগবে?'

'আমাদের স্টোরে আরেকটা ট্রি আছে। আগেরটার মত অত পোক্ত না, কিন্তু প্রেশার নিতে পারবে। ধরুন, তেল পুরোপুরি

থামতে তিন ঘণ্টা।'

'তা হলে কাজে নেমে পড়ুন।'

গভীর কূপ থেকে তীব্র গতিতে উঠে আসছে তেল, আওয়াজটা শুনলে মনে হয় পাশ দিয়ে ছুটছে মেইল ট্রেন, কাশেম শুনতে পেল এক মাইল দূর থেকে গোলাগুলির আওয়াজ। ওদিকের ওই রিগে উঠেছেন মাসুদ ভাই। ওর বুঝতে দেরি হলো না ওখানে কঠিন লড়াই চলছে।

ভীষণ চমকে গিয়ে এক মুহূর্তে রানা ভুলে গেল ও কে, এবং কোথায় আছে। ঝনঝন করছে মাথার ভিতর মগজ, কানে ঢুকল দূরের গোলাগুলির আওয়াজ। এক সেকেণ্ড পর মনে পড়ল এইমাত্র কী ঘটেছে। চট্ করে চোখ মেলল রানা, পরক্ষণে শিউরে উঠল ভয়ে। বুদ্বুদ তোলা তেলের প্রশ্রবণ গলগল করে নামছে রিগের পায়া বেয়ে, সেখান থেকে চল্লিশ ফুট দূরে আছে ও। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আকাশে উড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু আপার ডেক ঘিরে রাখা সেফটি নেটের ভিতর জড়িয়ে রয়ে গেছে। যে কণ্টেইনারের পিছনে লুকিয়ে পড়েছিল, সেটা এখন ক্রুড অয়েলে ছাওয়া সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। কিন্তু আরপিজি ডেটোনেট হওয়ার সময় যে লোককে সরিয়ে এনেছিল, তার কোনও চিহ্ন নেই কোথাও।

এখনও থরথর করে কাঁপছে নেট, চট্ করে উপুড় হলো রানা, মাকড়সার মত তিরতির করে রওনা হয়ে গেল। এক চোখ রেখেছে ডেকের উপর, ওর এই বেকায়দা অবস্থায় মার্সেনারিরা দেখলে সঙ্গে সঙ্গে মরবে। কিছুক্ষণ পর প্ল্যাটফর্মের পাশে পৌঁছে গেল ও, খুব সাবধানে উঁকি দিল ওদিকে। রিগের নিয়ন্ত্রণ এখনও বজায় রেখেছে মার্সেনারিরা, ওর নিজের লোকরা পিছিয়ে পড়েছে, কমে আসছে তাদের গোলাগুলি। এখনও লড়ছে মাত্র

কয়েকজন। তারা আবার সিঙ্গল শট নিচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে তাদের কাছে গুলির কমতি আছে। মার্সেনারিদের অ্যামিউনিশনের অভাব নেই, অনায়াসে খরচ করছে অজস্র গুলি।

কিছুক্ষণ চারপাশে নজর রাখল রানা, যখন দেখল এদিকে কেউ চেয়ে নেই, নেট থেকে গড়িয়ে এল ডেকে, ক্রল করে ঢুকে পড়ল মোবাইল ক্রেনের ক্রওলার ট্রেডের নীচে। ওখানে শুয়ে পরীক্ষা করল অস্ত্র, আধ খালি ম্যাগাযিন বদলে নিল। ওর বুঝতে দেরি হয়নি এখান থেকে গোটা যুদ্ধের চিত্র পাবে না, স্নাইপিং করাও সম্ভব নয়, ভুল করে মনোযোগ আর্কষণ করলে ঘাড়ে এসে পড়বে আরেকটা আরপিজি। কিছুই করতে পারবে না বুঝে বাঁক নিয়ে রওনা হয়ে গেল রানা, ক্রেনের পিছনে গিয়ে থামল, ভাল কাভারের আশায় চারপাশ দেখল।

হঠাৎ এক ক্রেটের পিছন থেকে লাফিয়ে উঠল এক মার্সেনারি, উদ্যত হাতে গ্রেনেড। বিশাল এক ভালভের পিছনে আড়াল নিয়েছে আহত এক যিম্বাবুইয়ান, তার উপর গ্রেনেড ফেলবে সে। এক গুলিতে টেরোরিস্টের কপাল ফুটো করে দিল রানা, পরক্ষণে বিস্ফোরিত হলো লাশের হাতের বোমা। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে আকাশে উঠল দেহটা, একটু দূরে আরেকটা ক্ষত-বিক্ষত লাশের কাপড়ে ধরে গেল আগুন।

গুলি কোথা থেকে এসেছে সেটা কেউ বুঝবার আগেই ধড়মড় করে ক্রেনের নীচ থেকে বেরিয়ে গেল রানা, ডেকের উপর দিয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল। অর্ধেক ডেক যেতেই সামনে পড়ল ছয় ইঞ্চির ড্রিল পাইপের একটা বড় স্তূপ, ওপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। থামল না ওখানে, বাঁক নিয়ে আবারও পাইপের টিলার পাশ দিয়ে উঁকি দিল। মন দমে গেল ওর। তেলের কূপের মুখ থেকে কয়েক ফুট দূরে লোহার টাওয়ারের ভিতর দিয়ে আসছে এক মার্সেনারি।

একটা পাইপ বেছে নিল রানা, ওটার ভিতর ঢুকিয়ে দিল এমপি-৫-এর ব্যারেল, পরপর তিনটা গুলি করল। পাইপের ভিতর পাগল হয়ে উঠল দুটো গুলি, কিন্তু তৃতীয়টা লাগল মার্সেনারির তলপেটে। বেতাল হয়ে কয়েক পা পিছাল সে, জোর হ্যাঁচকা টান খেয়ে ঢুকে পড়ল তেলের গিয়ারের ভিতর, পরক্ষণে দেখা গেল অদৃশ্য হয়েছে সে কালো দেয়ালের গভীরে। তাকে নিয়ে গলগল করে সাগরে গিয়ে নামল ক্রুড অয়েলের স্রোত।

বাঁক ঘুরে তিন লাফে পাইপের স্তূপের সামনে চলে এল রানা, আর ঠিক তখনই পিছনের পাইপগুলোতে এসে লাগল অন্তত পঞ্চাশটা গুলি। ঠং-ঠঙাৎ আওয়াজ তুলে তাল তুলছে বুলেট। রানা বুঝতে শুরু করেছে, যে-কোনও সময়ে এবার ওদের হার হবে। স্বর্ণা যদি নীচের কাজ শেষ করে ফিরে না আসে, বাধ্য হয়ে সবাইকে নিয়ে পিছাতে হবে। ওদের কোনও সাহায্যে আসবে না মার্ভেল। গোলাগুলি বাড়লে উল্টে বিস্ফোরিত হবে গোটা রিগ।

মার্সেনারিরা সংখ্যায় অনেক, মিনিসাবে নেমে যেতে চাইলে তা হবে স্রেফ আত্মহত্যা করা। মই বেয়ে চার ভাগের এক ভাগ নামবার আগেই মরবে ওরা। এখন ভাল কোনও পরিকল্পনা দরকার, রানা ভাবতে শুরু করেছে প্ল্যাটফর্মের লাইফবোট কাজে লাগবে কি না। ওটা রিইনফোর্সড্ ফাইবারগ্লাস এস্কেপ পড, অটোমেটিকালি নেমে যেতে পারে সাগরে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে লাইফবোটের ডেভিট আছে ডেকের একমাথায় একদম ফাঁকা এক জায়গায়— ওখানে পা রাখলেই একগাদা গুলি মোরব্বা করে দেবে ওদেরকে।

ওপাশে এক পশলা গুলি লাগতেই স্বর্ণার রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সিতে ট্যাপ করল রানা। 'স্বর্ণা, মাসুদ ভাই। কর্মীদের কথা ভুলে যাও। যত দ্রুত সম্ভব উঠে এসো।' ওই প্রান্ত থেকে

কোনও জবাব নেই। আবারও ডাকল রানা, 'স্বর্ণা, তুমি কোথায়?'

গত কয়েকটি মিশনে সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রতিদিন তিন ঘণ্টা করে মার্ভেলের ফিটনেস সেণ্টারে চায়নিজ ইণ্টেলিজেন্সের তুখোড় স্পাই লিউ ফু-চুঙের কাছে মার্শাল আর্ট শিখেছে সানজিদা স্বর্ণা। ফু-চুং ওকে বলেছে, যাঁর কাছে শিখেছিল, তিনিই ছিলেন দুনিয়ার সর্বকালের সেরা প্রশিক্ষক। বয়স্ক মানুষটি খুব কম কথা বলতেন, কিন্তু এক পর্যায়ে বলেন, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ফু-চুংই সেরা। সেই ফুচুং স্বর্ণাকে বলেছে, 'আমি ভাল ছাত্র ছিলাম কি না জানি না, কিন্তু আমি যাদের শিখিয়েছি তাদের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে ভাল ছাত্রী।'

মার্সেনারির হাতে বন্দি হওয়ার প্রথম মুহূর্তে ভয় পেয়েছে স্বর্ণা, কিন্তু যেই মাসুদ ভাইয়ের কণ্ঠ শুনল, দেরি না করে তৎপর হয়ে উঠল। এক পা বামে ও পিছনে সরল ও। কিছু বুঝে ওঠার আগেই খুনি মার্সেনারির অস্ত্রের মাঝখানটা চলে এসেছে স্বর্ণার কোমরের পাশে। ওর চোখা কনুই ঘ্যাঁচ্ করে লাগল লোকটার পাঁজরে, প্রচণ্ড ব্যথা পেয়ে ভোঁশ করে দম ছাড়ল লোকটা—ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ তার শ্বাসে। এক মুহূর্ত বিরতি নেয়নি স্বর্ণা, মুঠো চালিয়ে দিয়েছে লোকটার দুই উরুর সংযোগস্থলে। ওর মনে পড়েছে লিউ ফু-চুঙের বাণী: 'তুমি যদি টের পাও তোমার পিঠে ভর করেছে, আছড়ে ফেলো প্রতিপক্ষকে। তা যদি না করে, শক্ত করে ধরবে তার পিংপং বল, তাকে হারতেই হবে।'

কিন্তু লোকটা হুমড়ি খেয়ে ওর পিঠে পড়তে যাচ্ছে টের পেয়ে খপ্ করে তার বাহু ধরল স্বর্ণা, পরক্ষণে কাঁধের উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল তাকে। তখনও টেনে রেখেছে শত্রুর হাত, দড়াম করে আছড়ে পড়ল মার্সেনারি ডেকের উপর। পিঠ

দিয়ে পড়ায় আচমকা ব্যথা পেয়েছে, আটকে গেছে দম, পানি থেকে তোলা মাছের মত খাবি খেতে লাগল। স্বর্ণার লাথি পড়ল তার খোলা গলার প্রেশার পয়েন্টে, চোখ দুটো বার কয়েক ঘুরে বেরিয়ে পড়ল চোখের সাদা অংশ। আগামী এক ঘণ্টার ভিতর জ্ঞান ফিরবে না আর।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্বর্ণা দেখল ওর দলের স্নাইপার দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। কাঁধে একে-৪৭, কিন্তু এতক্ষণ ওর গায়ে গুলি লাগার ভয়ে ট্রিগার টিপতে পারেনি। এবার অস্ত্রটা নামিয়ে ফেলল সে। তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল স্বর্ণা, জবাবে চওড়া হাসি দিল লোকটা। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'যে বেমক্কা আছাড় দিলেন, আমি হলে তিনদিনের ভিতর বিছানা থেকে উঠতাম না!'

কাছের স্টোভের পায়ার সঙ্গে ফ্লেক্স কাফের একটা কড়ি আটকাল স্বর্ণা, অন্যটা আটকে দিল মার্সেনারির ডান কবজিতে। ওরা মেস হলে বেরিয়ে এসে দেখল, এখনও সদর দরজা পাহারা দিচ্ছে অন্য দুই যিম্বাবুইয়ান। তাদের কারণে ঘর থেকে বেরিয়ে ডেকে গিয়ে মরেনি তেল-কর্মীরা।

মেঝের উপর পড়ে আছে আট-দশটা দেহ। গুলি খেয়ে মারা গেছে কয়েকজন, অন্যরা বেশ গুরুতর আহত— হঠকারী মার্সেনারিদের শিকার সবাই। এরই ভিতর তেলকর্মীরা কাজে নেমে পড়েছে, আহতদের শুইয়ে দিচ্ছে, কাপড় বা রুমাল দিয়ে চেপে ধরছে ক্ষত। এদের একজনকে নেতা মনে হলো, সে-ই সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে। বয়স্ক লোক সে, মাথার চারপাশে ধূসর চুল, কিন্তু মাঝে ফর্সা ফাঁকা স্টেডিয়াম। আগে কখনও এত বড় হাত অন্য কারও দেখেনি স্বর্ণা। এক আহত কর্মীর ক্ষত পরীক্ষা শেষ করে উঠে দাঁড়াল মানুষটা, অস্ত্র হাতে স্বর্ণাকে খেয়াল করেছে, দীর্ঘ কয়েক পদক্ষেপে চলে এল সামনে।

'মিষ্টি মেয়ে, আমি জানি না তুমি কে বা কোথা থেকে এসেছ, কিন্তু স্রষ্টাকে ধন্যবাদ, উনি তোমাকে পাঠিয়েছেন।' হাত বাড়িয়ে দিল মানুষটা। 'আমি টমসি ক্ল্যান্স, এই রিগের টুল পুশার।'

স্বর্ণার মনে পড়ল অফশোর প্ল্যাটফর্মের বসের টাইটেল ওটাই হয়। হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল ও। 'আমার নাম সানজিদা স্বর্ণা, মিস্টার ক্ল্যান্স, এক মিনিট পর আপনার সঙ্গে কথা বলছি।' ঝাঁকি খেয়ে সরে গিয়েছিল রেডিয়োর ইয়ারপিস, ওটা ঠিক করে নিল ও। 'মাসুদ ভাই, স্বর্ণা বলছি।'

'ঠিক সময়ে যোগাযোগ করেছ। এখনই দলের সবাইকে নিয়ে উঠে এসো। লোকের অভাবে মার খাচ্ছি আমরা। পরে ভাবা যাবে কর্মীদের বিষয়ে।' ওদিকে গোলাগুলির আওয়াজ, তার ভিতর দিয়ে রানার উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল।

'ওদের সিকিউর করা হয়েছে, আমরা উঠে আসছি, মাসুদ ভাই।' বয়স্ক ভদ্রলোকের দিকে চাইল স্বর্ণা। 'মিস্টার ক্ল্যান্স?'

'টমসি বলে ডাকলে খুশি হব।'

'টমসি, আমি চাই আপনার লোক এখানেই থাকুক। উপরের প্ল্যাটফর্মে টেরোরিস্টরা রয়ে গেছে। কী যেন করেছে, গলগল করে তেল গিয়ে পড়ছে সাগরে। আমরা যখন তাদেরকে বন্দি করব, আপনারা ক্রুড অয়েল বন্ধ করতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই পারব। আসলে ওখানে কী ঘটছে?'

মেশিন পিস্তলে নতুন ম্যাগাযিন ভরল স্বর্ণা, তার ফাঁকে বলল, 'এক বদমাস লোক এসব প্ল্যাটফর্ম এবং মেইন ট্যাঙ্কার টারমিনাল দখল করতে চেয়েছে, সেজন্য ভাড়া নিয়েছে কঙ্গোর একদল মার্সেনারিকে।'

'রাজনৈতিক কোনও চাল?'

'এখন ব্যাখ্যা দিতে পারব না। পরে বলব কী ঘটেছে।

আপাতত আমাদেরকে যুদ্ধে ফিরতে হবে।'

'সব সমস্যা শেষে তোমাকে ডিনারের দাওয়াত দিয়ে রাখলাম, ক্যাবিগ্রা সিটির দারুণ এক পর্তুগিজ রেস্টুরেন্টে বসতে পারি।'

'লিসবনে ওটার চেয়ে ভাল একটা আছে,' ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করেছে স্বর্ণা, কাঁধের উপর দিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনাকেই পয়সা খরচ করতে হবে।'

'তো কথা হয়ে গেল, বাছা,' পিছন থেকে সস্নেহে বলল ক্ল্যান্স। 'কাজ শেষ করে এসো, তোমার জন্য জমজমাট পার্টি দেব।'

সমুদ্র-প্রাচীরের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে মার্ভেলের লাইফবোট—মুক্তিসেনা। কিছুক্ষণের ভিতর পৌঁছে গেল তীরের পাশে। ফয়েল আগেই গুটিয়ে নেয়ায় পানিতে গভীর ভাবে বসে পড়েছে খোল, পাকা ডকে আস্তে করে ভিড়ল বোট। পানিতে ভেজা সিমেন্টে সেঁটে থাকা কোনও শামুক ছিটকে গেল না।

সামনের হ্যাচ খুলে যেতেই একে একে বেরিয়ে এল যোদ্ধারা, ডকে উঠে সাধ্য অনুযায়ী কাভার নেবে। টারমিনালের দিক থেকে হালকা আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ আসছে। জোরালো হামলা করত মার্সেনারিরা, কিন্তু মার্ভেল থেকে তাদেরকে দমিয়ে দিয়েছে নবী ও গগল। ঠিক সময়ে হাজির হয়েছে নিশাত। এখনও এদিকে আসতে পারেনি বেশির ভাগ মার্সেনারি।

সমস্ত গিয়ার গুছিয়ে নিয়েছে বাংলদেশ আর্মির লেফটেন্যান্ট আলতাফ মৃধা, উঁচু দেয়ালের উপর লাফ দিয়ে উঠল। ওর কাছে বিশেষ .২২ ক্যালিবারের পিস্তল দেয়া হয়েছে, ওটা সিমেন্টের ভিতর গেঁথে দিতে পারে ছয় ইঞ্চি স্টিলের রড। পর পর দুটো রড ব্যবহার করল সে, ডকে বিঁধল নতুন হুক। মুক্তিসেনার দড়ি

বেঁধে দিল হুকের সঙ্গে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা ভোলেনি যিম্বাবুইয়ান মুক্তিযোদ্ধারা, দেরি না করে ছড়িয়ে পড়েছে তারা। দু' পাশের যোদ্ধাদের কাভার দিয়ে সামনে বাড়ছে। প্রথম অ্যাকশন শুরু হবে মাত্র এক শ' গজ দূরেই। মৃধার জ্যাকেটের বাম কবজির উপর ধাতব পাত আছে, ওপাশে ছোট একটা স্ক্রিন। ওদিকে চেয়ে মনে মনে কাকে যেন অভিশাপ দিল ও। চারপাশের দৃশ্য হারিয়ে গেছে।

চারদিক বুঝবার উপায় নেই, কিন্তু সবাইকে নিয়ে চার্জ শুরু করল আলতাফ মৃধা। একেকটা পজিশন থেকে সামনের কোনও পজিশনে গিয়ে থামছে। পিছন থেকে কাভার দিচ্ছে অন্যরা, চট্ করে সামনে থেকে হামলা আসবে না। আপাতত ওদিকে আছে মাত্র দু'চারজন মার্সেনারি। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখা গেল হাজির হতে শুরু করেছে অনেকে। মার্ভেলের নিখুঁত গোলাগুলির কারণে এদিকে আসা কঠিন হয়ে উঠছে তাদের জন্য।

ষাটজনের কনটিনজেন্টে হঠাৎ আহত হলো কয়েকজন। ছোট একটা ইউটিলিটি শেডের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে এক মার্সেনারি, হলিউডি ভঙ্গিতে ব্রাশ ফায়ার করছে কোমরের পাশ থেকে। একে-৪৭-এর ট্রিগার থেকে আঙুল তুলল না সে, চারপাশে ছড়িয়ে গেল এক পশলা গুলি। লোকটা বোধহয় আত্মহত্যা করতে চেয়েছে। কাউন্টার-ফায়ার শুরু হতেই ধুপ্ করে পড়ল লাশ। কিন্তু তার আগেই মাটিতে ফেলে দিয়েছে মৃধার চারজন যোদ্ধাকে। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে একজন।

একবারের জন্য বিরতি দিচ্ছে না কেউ, এঁকেবেঁকে ছুটছে। কোনও কাভার পেলে মুহূর্তের জন্য থামছে। সামনের জনকে সুবিধা দেয়ার জন্য গুলি করছে। মাফিয়া দল যেভাবে রাস্তার উপর গোলাগুলি শুরু করে, প্রায় তা-ই করতে হচ্ছে ওদেরকে। যে-কোনও সময়ে হাজির হবে শত্রু।

কড়কড় করে উঠল মৃধার রেডিয়ো। ভালভাবে শুনবার জন্য বিধ্বস্ত এক টো ট্রাকের পাশে থামল সে। 'মুক্তিসেনা, আমি ঈগলের চোখ বলছি, আসতে দেরি হলো বলে দুঃখিত। আপনার স্ক্রিনের দৃশ্য আবারও ফিরেছে।' মাথার উপর দিয়ে চলেছে জাহিদ হাসানের ইউএভি।

চট্ করে কবজির চৌকো স্ক্রিন দেখল মৃধা। ছবিটা ট্যাঙ্কার টারমিনালের। প্রতি দশ সেকেণ্ডে বদলে চলেছে দৃশ্য। জাহিদ হাসান জেনে নিয়েছে মৃধার অবস্থান। এবার দেখা গেল একটু দূরে ওয়্যারহাউসের পাশে জড় হয়েছে তিন মার্সেনারি, যে-কোনও সময়ে পাশ থেকে হামলা করবে মুক্তিসেনাদের উপর। মৃধা কাউকে ব্যাখ্যা দিতে গেল না কীভাবে এসব জানছে, টো ট্রাকের পাশ থেকে ছিটকে বেরুল ও, এক দৌড়ে পৌঁছে গেল ওয়্যারহাউসের সামনের অন্য প্রান্তে। উল্টো দিকের কোণে জড়সড় হয়ে বসেছে তিন মার্সেনারি। মৃধার মেশিন পিস্তলের তলে যুক্ত গ্রেনেড লঞ্চারের নীচে রয়েছে একটা ডায়াল, ওটার কারণে প্রায় যে-কোনও রেঞ্জে গ্রেনেড ফেলতে পারে। ওদিকের কোনার দূরত্ব হিসাব কষল মৃধা, ওদিকটা হবে কমপক্ষে চল্লিশ গজ, কাজেই ডায়াল ঘুরিয়ে লক্ষ্যস্থির করল। বাটন টিপে দিতেই ফাঁপা ব্লুপ আওয়াজ তুলল অস্ত্রটা, কিন্তু হাস্যকর হলো না ফলাফল। ওয়্যারহাউসের কোনার এক ফুট দূরে পড়ল গ্রেনেড, সঙ্গে সঙ্গে ডেটোনেট হলো। বোমাটা পাতলা করাগেটেড ধাতব দেয়াল ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে দিল তিন মার্সেনারিকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর স্ক্রিনে দেখতে পেল মৃধা, ঘন ধোঁয়ার ভিতর পড়ে আছে তিনটে লাশ।

মুক্তিসেনারা ধরে নিল আকাশ থেকে ওদের উপর চোখ রেখেছে কোনও স্বর্গের দেবতা, আর তরুণ মৃধা আসলে মস্ত কোনও পীর। কয়েক মিনিটে দলটির এগুবার গতি দ্বিগুণ হলো।

মৃধা আগে থেকেই বলে দিচ্ছে কোথায় অ্যাম্বুশ পাতা হয়েছে। টেরোরিস্টরা বুঝবার আগেই তাদের উপর অন্য কোনও দিক থেকে চড়াও হচ্ছে ওরা।

আর একজন যোদ্ধাও না হারিয়ে টারমিনালের পাওয়ার প্লান্টে পৌঁছে গেল মৃধা। দালানটা সাউণ্ডপ্রুফ, কিন্তু থরথর করে কাঁপছে জেট ইঞ্জিনের কারণে। তৈরি হচ্ছে বিপুল বিদ্যুৎ। সবার মাঝ থেকে পাঁচজন যোদ্ধাকে বেছে নিল মৃধা, এদের নিয়ে ভিতরে ঢুকবে ও। অন্যদের বলে দিল সামনের জমি দখল করতে হবে, নইলে ক্যাপ্টেন নিশাত ও কমাণ্ডো জলিল ট্যাঙ্কার পিয়ারে হামলা করতে পারবে না।

পাওয়ার প্লান্টের একটা সাইড দরজার তালা উড়িয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল মৃধা, ভীষণ ভাবে চমকে গেছে। শুরু হয়েছে জেট ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজ। ওদের কাছে ইয়ার প্লাগ নেই, ফেটে যেতে চাইল দুই কানের পর্দা। বেশিক্ষণ এখানে থাকতে পারবে না। বিশাল ঘরে ছুটবার ফাঁকে মৃধার এইচ অ্যাণ্ড কে'র লেসার সাইট খুঁজছে শত্রু। কংক্রিট ও স্টিলের সাপোর্টের উপর ভর করে সারি দিয়ে বসে আছে তিনটে জেনারেল ইলেকট্রিক জেট ইঞ্জিন। চকচকে রুপালি ডাক্ট দিয়ে ঢুকছে ভাজা বাতাস, ওদিকে দালানের পিছন দিয়ে বেরুচ্ছে কুটকুটে কালো কার্বিউটের প্রচণ্ড উত্তপ্ত বিষাক্ত বাতাস।

এখন মাত্র একটা ইঞ্জিন চলছে। ব্রিফিঙের সময় সেরেল জানিয়েছে, এসব ফ্যাসালিটির ভিতর তিনটে ইঞ্জিন থাকে। প্রথমটাকে বিশ্রাম দেয় দ্বিতীয়টা, এবং তৃতীয়টা থাকে ব্যাকআপ হিসাবে। অনেক বেশি কাজের চাপ পড়লে ওটা চালু করা হয়। সবাই ঠিক করেছে মার্ভেলের ১২০এমএম কামান দিয়ে পাওয়ার হাউস ধ্বংস করবে না, বদলে থামিয়ে দেবে চলন্ত জেট ইঞ্জিনটা। পরে সাগরে তেল ক্লিনআপ ক্রুদের বিপুল

ইলেকট্রিসিটি লাগবে।

দালানের সামনের দিকে কন্ট্রোল রুম, ওদিকে ছুটে গেল মৃধা। আগেই ওদিক কাভার করেছে ওর দলের যোদ্ধারা। দরজার পাশে তিন স্তরের স্লাইডিং কাঁচের ভিতর দিয়ে ওপাশে দুই ইঞ্জিনিয়ারকে দেখা গেল। তারা নজর রাখছে পাওয়ার স্টেশনের উপর। কিন্তু তাদের উপর আবার চোখ রেখেছে তিন মার্সেনারি। জ্বলজ্বলে একটা দীর্ঘ ডিসপ্লে বোর্ড পড়ছে পেট্রোম্যাক্সের কর্মীরা। মার্সেনারি এবং ইঞ্জিনিয়াররা বড় বেশি কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। গুলি করলে যে-কারও গায়ে লাগতে পারে। বাধ্য হয়ে সবার মাথার উপর দিয়ে গুলি করল মৃধা। আট-দশটা গুলি চুরচুর করে দিল তিনটে কাঁচ। ওই ঘর থেকে ছিটকে বেরুল প্রচণ্ড আওয়াজ। মৃধার মন চাইল ঘুরেই এক দৌড়ে ভাগবে। কোমরের পাউচ থেকে কনকাশন গ্রেনেড নিল ও, পিন খুলেই ফেলে দিল ঘরের ভিতর।

চট্ করে বসে পড়েছে নিজে, দুই সেকেণ্ড পর ফাটল ফ্লাশ-ব্যাং গ্রেনেড। ওর উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল বিস্ফোরণের গরম হলকা। লাফ দিয়ে উঠেই ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল মৃধা, তখনও কেউ উঠে দাঁড়াতে পারেনি। এক মার্সেনারির মাথার উপর নামিয়ে আনল মেশিন পিস্তলের বাঁট। ওর দলের অন্যরা ঢুকে পড়েছে ঘরে, অন্য দুই মার্সেনারিকে একে-৪৭ দিয়ে কাভার করল তারা। এক যোদ্ধার হাতে কয়েকটা ফ্লেক্স কাফ দিল মৃধা, নিজে চলে গেল মেঝে থেকে ইঞ্জিনিয়ারদেরকে টেনে তুলতে। কাঁচের আঘাতে কেটে গেছে একজনের কপাল, তবে গুরুতর কিছু নয়। দ্বিতীয়জন মেঝেতে বসে ঝিমিয়ে চলেছে, মনে হলো অনেক দিন ডিম দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মুরগি।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল মৃধা, কিন্তু জেটের প্রচণ্ড আওয়াজ ওকে হার মানিয়ে দিল। বাধ্য হয়ে কপাল কাটা

লোকটার কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচাল, 'আপনি ওটা বন্ধ করতে পারেন?' তর্জনী দিয়ে দেখিয়ে দিল ইঞ্জিনটা।

ফাঁকা চোখে ওর দিকে চাইল ইঞ্জিনিয়ার। আবারও ইঞ্জিন দেখাল মৃধা, তারপর হাত দিয়ে গলা কেটে ফেলবার ইশারা করল। এবার বুঝতে পারল লোকটা, আস্তে করে মাথা দোলাল। উঠে দাঁড়িয়ে একটা কন্ট্রোল স্টেশনের সামনে চলে গেল, একটা মাউস দিয়ে স্ক্রিনগুলোতে স্ক্রল করছে। একের পর এক আইকন বন্ধ করছে। মৃধার মনে হলো দোজখের এই আওয়াজ কখনও থামবে না। কিন্তু এক মিনিট পর হঠাৎ করেই কমতে লাগল তীক্ষ্ণ আওয়াজ। দশ সেকেণ্ড পর মনে হলো এবার বাঁচলে বাঁচতেও পারে। কমপ্রেসারের পাখাগুলো থেমে আসছে। আরও দশ সেকেণ্ড পর একদম নীরবতা নামল। কিন্তু তখনও ঝনঝন করছে সবার কান।

যোদ্ধাদের নেতার দিকে চাইল মৃধা। 'আপনারা এখানে থাকবেন। কাউকে চালু করতে দেবেন না ইঞ্জিন।' লোকটার হাতে একটা ওয়াকি-টকি ধরিয়ে দিল সে। 'মার্সেনারিদের দেখলে সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।'

'ঠিক আছে, নিকোসি,' বলল লোকটা। কণ্ঠ শুনে বোঝা গেল লড়াই থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে বলে তার ভাল লাগছে না। 'এদের কী হবে?' রাইফেল দিয়ে বন্দি মার্সেনারিদের দেখাল।

দরজার দিকে ছুটতে শুরু করে মৃধা বলল, 'ওরা যদি গোলমাল করে, গুলি করে মেরে ফেলবেন।'

এবার উৎসাহ দেখা দিল লোকটার কণ্ঠে, 'এ তো অতি উত্তম কথা!'

ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে মাসুদ রানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সানজিদা স্বর্ণা।

উপর থেকে পরিস্থিতি জানিয়েছে রানা। কাছের কোনও হ্যাচ দিয়ে উপরের প্ল্যাটফর্মে উঠতে মানা করেছে। বলে দিয়েছে নীচের স্তর পেরিয়ে রিগের দূরের এক হ্যাচ দিয়ে উঠে আসতে হবে। সেক্ষেত্রে ওরা সামনে পাবে এদিকে পিঠ দেয়া বেশ কয়েকজন মার্সেনারিকে।

স্বর্ণাকে আড়ালে থাকতে বলেছে রানা, নিজে ইশারা করে যোদ্ধাদেরকে বুঝিয়েছে, এবার কী করতে হবে। ওর ধারণা, এবার দু'পাশ থেকে আক্রমণ এলে ভেঙে পড়বে মার্সেনারিদের মনোবল। শেষবারের মত জুয়া খেলতে তৈরি হচ্ছে রানা, ওর অ্যামিউনিশন পাউচে আছে মাত্র দুটো ম্যাগাযিন।

'মাসুদ ভাই, আমরা পজিশনে,' বলল স্বর্ণা। 'আমি ওদের চারজনকে দেখছি। বড় স্টোরেজ ট্যাঙ্কের পিছনে। আরেকজন চলেছে ক্রেনের পাশে লুকাতে।'

'ক্রওলার ট্রেড থেকে এক গজ দূরে থাকতে আমাকে জানাবে। আমি ওকে ফেলে দেব। যে চারজনকে দেখছ, তাদের শেষ করবে। আমার ধারণা রিগের চারপাশের নেটে আরও কয়েকজন আছে। জানি না হাল ছেড়ে দিয়েছে কি না। চারপাশে চোখ রেখো।'

'জী। ওকে আরও দশ গজ এগুতে হবে।'

তপ্ত পাইপে পিঠ ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে রানা। এত গোলমাল এবং অতিরিক্ত অ্যাড্রেনালিন মগজকে বিক্ষিপ্ত করবার কথা, কিন্তু ওর মন পড়ে আছে নিকোলাস ক্রিস্টোফারের উপর। লোকটা আজই হামলা করল কেন? ভাবতে গেলে মনে হয় কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠছে ও, কিন্তু বারবার ওর অন্তর বলছে, ওই লোক যেভাবেই হোক, বের করে ফেলেছে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় হারিকেন। নিকোলাস ক্রিস্টোফার সত্যিকারের ইঞ্জিনিয়ারিং জিনিয়াস। তার আবিষ্কারের কারণেই অত কম বয়সে পেয়েছে

বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। সোহেল বলেছিল: 'ব্যাটার স্ক্রু ঢিলা, কিন্তু ইঞ্জিন এখনও খুব জোরেই চলছে।'

'পাঁচ গজ, মাসুদ ভাই,' রেডিয়ো করল স্বর্ণা।

চারপাশ দেখে নিল রানা। যে পরিকল্পনাই করে থাকুক নিকোলাস, সে বিশাল কিছু করতে চাইছে। কিন্তু তা কী? জানার উপায় নেই এ মুহূর্তে। হারিকেনের ফর্মেশনের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে। তীব্রতা বাড়াবে, বা গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করবে। বুকের ভিতর চাপা রাগ টের পাচ্ছে রানা। লোকটা যদি কোনও টেকনোলজি আবিষ্কার করে থাকে, তো এভাবে মানুষের অমঙ্গল করতে চাইছে কেন? হারিকেন ও সাইক্লোন দুই মহাসাগরের দুই খালাত ভাই, কিংবা সুনামি বা টাইফুন— প্রতি বছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয় প্রাকৃতিক এসব বিপদে; তার চেয়ে বড় কথা, মারা পড়ে হাজার হাজার মানুষ, শেষ হয়ে যায় বহু মানুষের ভবিষ্যৎ। নিকোলাস ক্রিস্টোফার যদি সত্যিই পৃথিবীর ভাল চাইত, মানুষের কষ্ট কমাতে কাজ করত। ঝড় ঠেকাতে পারলে, বা গতিপথ পাল্টে দেয়া গেলে মস্ত উপকার হতো মানব-জাতির। কিন্তু লোকটা এসব কিছুই করবে না, সর্বার্থে হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর এক পিশাচ, পৃথিবীতে এসেছে লাখ লাখ মানুষের চরম ক্ষতি করতে।

'আর দুই গজ, মাসুদ ভাই।'

আরও সতর্ক হলো রানা। পাঁচ সেকেণ্ড পর কানের ভিতর স্বর্ণার কণ্ঠ শুনতে পেল: 'এবার ওকে শেষ করুন।'

পুরো মনোযোগ ফিরে পেয়েছে রানা, ঝড়ের মত উঠে গেল ড্রিল পাইপের স্তূপের উপর, ক্রল করা লোকটার উপর চোখ পড়তেই তিনবার গুলি করল বুকে-মাথায়। বাম দিক থেকে এল এক পশলা গুলি। রানাকে দেখে ফেলেছে মার্সেনারিরা। কিন্তু দ্বিতীয় কোনও গুলি এল না, আগেই লোকগুলোকে ঝাঁঝরা করে

দিয়েছে স্বর্ণা এবং ওর দলের যোদ্ধারা। পাইপের উপর থেকে লাফ দিয়ে নামল রানা, ঝেড়ে দৌড় দিল। ইচ্ছা করেই গুলি করতে উৎসাহী করছে মার্সেনারিদের। কাজটা করতে গিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে তাদেরও। যিম্বাবুইয়ান যোদ্ধারা অপেক্ষা করছিল, দ্বিতীয়বারের মত ডেকের উপর দিয়ে নানা দিকে ছুটতে লাগল অজস্র গুলি। যেন বিকট আওয়াজে খুলে গেছে নরকের দরজা। রানা বেশ কয়েকবার টের পেল ওর গায়ের উপর দিয়ে বয়ে গেছে বুলেটের তপ্ত হাওয়া। দূরের এক মার্সেনারির বুকে গুলি করল ও, তারপর ডান দিকে শত্রু দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল তেলে ভরা এক ড্রামের ওপাশে। কাত হয়ে ধুপ্ করে পাশেই পড়ল ড্রাম, ওটার ওপাশে এসে লেগেছে কমপক্ষে পঞ্চাশটা গুলি।

রানার দিকে একজনকে গুলি করতে দেখেছে স্বর্ণা, পাল্টা গুলি করল ও, কিন্তু মিস করেছে। লোকটা হারিয়ে গেছে এক দঙ্গল পাইপের পিছনে। পজিশন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল স্বর্ণা, ধেয়ে গেল লুক্কায়িত লোকটার দিকে। কয়েক সেকেণ্ড পর টের পেল, ঢুকে পড়েছে ধাতব গাছের তপ্ত অরণ্যে। গোলকধাঁধার ভিতর বাড়তি সুবিধা পাবে লোকটা। যেদিকে চোখ যায়, সামনে-নীচে-উপরে শুধু পাইপের পর পাইপ। যে-কোনও সময়ে গুলি খেয়ে ছিটকে পড়বে। পাইপের জটলা থেকে পিছিয়ে আসতে শুরু করল ও। কোথাও এক সেকেণ্ডের বেশি চোখ থামছে না, সুযোগ দেবে না লোকটাকে গুলি করবার।

মোটা এক পাইপ ঘুরে সামনে বাড়ল স্বর্ণা, এবং ঠিক তখনই ওর মেশিন পিস্তলের নল ধরে হ্যাঁচকা টান দিল কেউ। পিছলে হুড়মুড় করে ডেকের উপর পড়ল স্বর্ণা। এক পলকের জন্য ভাবল, এবার কী করব? একবার গড়ান দিয়ে চিত হলো ও, পাশে দেখতে পেল লোকটাকে। চওড়া হাসি ফুটে উঠেছে তার

মুখে। কোমর থেকে তাক করেছে রাইফেল। পাল্টা হাসতে চাইল স্বর্ণা, ওর বাম হাত খপ্ করে ধরেছে কোমরের থ্রোয়িং নাইফের হাতল। লোকটা ট্রিগারের উপর আঙুল বসাল, কিন্তু তার আগেই ঝট্ করে বেরিয়ে এল স্বর্ণার ড্যাগার। একটা ঝাঁকি খেয়েই রওনা হলো ওটা, ঘ্যাঁচ করে বিঁধল মার্সেনারির কণ্ঠার ভিতর।

বিকট হাঁ করল লোকটা, হাত থেকে পড়ে গেছে রাইফেল। দুই হাতে চেপে ধরেছে গলা ও ড্যাগার, এক সেকেণ্ড পর কিনারা উপচে বেরিয়ে এল চটচটে রক্তের স্রোত। কাত হয়ে ডেকে পড়ল লোকটা, আছাড়ি-পিছাড়ি শুরু করেছে, মনে হলো পাকা কোনও কুস্তিগীরের সঙ্গে লড়ছে। গলার ভিতর থেকে বেরুচ্ছে গা শিউরানো ঘড়ঘড় আওয়াজ।

উঠে দাঁড়াল স্বর্ণা, টান দিয়ে গলা থেকে বের করল ড্যাগার, খাপে রেখে দিল, তুলে নিল মেশিন পিস্তল, রওনা হয়ে গেল ফিরতি পথে। এক মিনিট পেরুনোর আগেই পৌঁছে গেল যেদিক দিয়ে ঢুকেছে। এই প্রথমবারের মত টের পেল এখন আর কোনও গুলির আওয়াজ নেই।

সাবধানে পাইপগুলোর ভিতর থেকে বাইরে চাইল স্বর্ণা, একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে পাঁচ টেরোরিস্ট, মাথার উপর তুলে ফেলেছে দুই হাত। দশ সেকেণ্ড পর তাদের সঙ্গে যোগ দিল আরও দুই মার্সেনারি, তারা লুকিয়ে ছিল সেফটি নেটে।

'মাসুদ ভাই, খেলা বোধহয় শেষ,' থ্রোট মাইকে বলল স্বর্ণা।

ব্যারেলের ওপাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, লোকগুলোর দিকে তাক করেছে মেশিন পিস্তল। দ্রুত পায়ে চলে গেল তাদের পাঁচ ফুট দূরে, কঠোর স্বরে বলল, 'শুয়ে পড়ো! এক্ষুণি!'

সাহায্য করবার জন্য এক দৌড়ে রানার পাশে পৌঁছে গেল স্বর্ণা। পিস্তল তাক করেছে বন্দিদের উপর। লোকগুলো শুয়ে

পড়েছে ডেকে। যিম্বাবুইয়ানরা আহত এবং মৃতদের খুঁজে বের করছে। সুস্থ বন্দিদের হাতে হ্যাণ্ড-কাফ আটকে দিল রানা। কাজ শেষে যোগাযোগ করতে চাইল মার্ভেলে।

'আমরা প্রথম রিগের হতভাগারা, সোহেল। টার্গেট সিকিউর করা হয়েছে।'

রেডিয়োতে বড় একটা ফোঁস আওয়াজ শোনা গেল, স্বীকার করবে না সোহেল, কিন্তু এতক্ষণ বন্ধুর জন্য ভীষণ দুশ্চিন্তা করছিল। সামলে নিয়ে বলল, 'সামান্য এক কাজে তোদের এতক্ষণ লাগে, গাধা?'

'চোপ শালা! ওদিকের সিচুয়েশন জানা!'

'পাওয়ার প্লান্ট বন্ধ করে দিয়েছে মৃধা। লোডিং গ্যান্ট্রি দিয়ে তেল পড়ছে, কিন্তু পাম্প থামতেই গতি কমেছে। এখন গ্র্যাভিটির কারণে ট্যাঙ্ক ফার্ম থেকে ক্রুড বেরুচ্ছে, কিন্তু সবই থামবে।'

'আপা আর জলিল তৈরি?'

'মৃধা জেনারেটার বন্ধ করবার পাঁচ মিনিট পর রওনা হওয়ার কথা তাদের। যে-কোনও সময়ে গন্তব্যে পৌঁছবে।'

লাইফবোটের পিছন থেকে মোটরওয়ালা ডিঙি নিঁয়ে রওনা হয়েছে নিশাত ও জলিল, পরনে ওদের ইউটিলিটি ইউনিফর্ম, তার নীচে পরেছে ফ্ল্যাক জ্যাকেট। সাগরের ঢেউয়ের ভিতর দিয়ে তীর ঘেঁষে চলেছে নৌকা। পাশাপাশি বসে আছে নিশাত ও জলিল, পায়ের কাছে পড়ে আছে দুটো কালো কেস। ভিতরে রয়েছে ব্যারেট এম১০৭ .৫০ ক্যালিবারের রাইফেল। প্রতিটি অস্ত্রের ওজন মাত্র তেত্রিশ পাউণ্ড, কিন্তু রেঞ্জ কমপক্ষে এক মাইল। আজ পর্যন্ত তৈরি সব স্নাইপার রাইফেলের ভিতর ওটাই সেরা বলা হয়।

তেলের কারণে নষ্ট হতে পারে ড্রাইভ টিউব, কাজেই লোডিং টারমিনালের আশপাশে মার্ভেলকে আনতে রাজি হয়নি গগল। এদিকে লোডিং গ্যাণ্ট্রির কাছে গোলাগুলি হোক তা চায়নি সোহেল। টারমিনালের কোনও ক্ষতি হবে না এমন নিশ্চয়তা দিতে পারেনি নবী। শেষে নিশাত ও জলিলের উপর দায়িত্ব পড়েছে, যেভাবে হোক মুক্ত রাখতে হবে কযওয়ে, এবং সেই সুযোগে আক্রমণ হানবে আলতাফ মৃধা।

বন্দরের ভিতর অংশে ভিড়েছে এক সুপারট্যাঙ্কার, ওটার কয়েক শ' গজ দূরে পৌঁছে গেছে ডিঙি, থকথকে তেল চিরে সামনে বাড়ছে। অন্তত ছ' ইঞ্চি পুরু তেল জমেছে বন্দরে। কপাল ভাল যে টক্সিক ক্রুডের তিন ইঞ্চি নীচে চলছে ডিঙির প্রপেলার, নইলে আটকা পড়ত।

দূরে নতুন করে নড়তে শুরু করেছে মার্ভেল, ফ্যাসিলিটির বিশেষ কিছু জায়গা কাভার করছে। কিন্তু সরাসরি কযওয়ে বা এক একর ফ্লোটিং পিয়ারের দিকে গুলি করবে না। বড় একটা বিনকিউলার দিয়ে সুপারট্যাঙ্কার লক্ষ্য করছে জলিল। ওদিকে কোনও টেরোরিস্ট নেই। জাহাজটাকে অভজারভেশন প্ল্যাটফর্ম করা হয়নি। জলিল ও নিশাত ঠিক করেছে কোনও ঝুঁকি নেবে না, জাহাজে উঠবে বো'র কাছে। তখন এক হাজার ফুট পিছনে থাকবে সুপারস্ট্রাকচার। কেউ ওখান থেকে নজর রাখলে বিপদে পড়তে পারে ওরা।

প্রকাণ্ড সুপারট্যাঙ্কারের এক শ' গজ দূরে অফ লিমিট যোন, ওখানে ভাসছে একের পর এক বয়া। এখনও কোনও গুলি আসেনি জাহাজ থেকে।

'বলেছি না আপা, শালারা গবেট মার্কা?'

'আগে জাহাজে উঠি, তার আগে মন্তব্য করব না,' বলল নিশাত।

কাছ থেকে জাহাজের খোল দেখে মনে হলো ওটা খাড়া একটা ধাতব দেয়াল। নীচের অংশ লাল অ্যান্টিফাউলিং পেইন্ট দিয়ে লেপে দেয়া। ট্যাঙ্ক প্রায় খালি। উপর দিকে চাইল ওরা। ওদের ষাট ফুট উপরে ডেক।

বো-র কাছে পৌঁছে গেছে নৌকা, এবার আস্তে করে ওটাকে ভিড়িয়ে দেবে নিশাত। তার আগেই গ্র্যাপলিং গানের রাবারে মোড়া আঁকশি নিয়ে তৈরি হলো জলিল। আকাশের দিকে ছুটল হুক। পিছনে চলেছে দুটো ন্যানোফাইবারের লাইন। রেলিঙের ওপাশে গিয়ে পড়ল হুক, কয়েক ফুট টেনে নিতেই রেলিঙের সঙ্গে আটকে গেল। জাহাজের গায়ে শক্তিশালী একটা চুম্বক লাগিয়ে দিল নিশাত, ওটার সঙ্গে বেঁধে দিল ডিঙি নৌকার দড়ি।

ন্যানোফাইবার বেয়ে ওঠা অসম্ভব, কিন্তু জিনিসটা স্টিলের চেয়ে পোক্ত। ডিঙির উইঞ্চের ভিতর দিয়ে লাইন নিল জলিল, ভাল ভাবে বেঁধে নিল। কাজটা শেষ করে জলিল দেখল কালো কেসের ভিতর থেকে রাইফেল বের করেছে নিশাত। দশ রাউণ্ডের একটা করে ম্যাগাযিন লাগিয়ে দিয়েছে রিসিভারে, প্রত্যেকের কাছে আছে আরও দশটা করে ম্যাগাযিন।

'আমাদের দোলনা তৈরি, আপা,' স্টিরাপের উপর বসল জলিল।

ওর পাশে উঠে বসল নিশাত, বাটন টিপে দিতেই চালু হলো উইঞ্চ। পুলির ভিতর সরতে শুরু করেছে ন্যানোফাইবার। জলিলের স্টিরাপ টানটান হয়ে উঠল, তারপর ওকে তুলে নিল ডিঙির পাটাতন থেকে। এক হাতে ধরেছে রাইফেল, অন্য হাতে লাইন। জলিল নৌকা থেকে আট ফুট উপরে উঠতেই নিশাতের ওজন নিল লাইন। সুপারট্যাঙ্কারের পাশ দিয়ে উঠে চলেছে ওরা।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে ফুরিয়ে গেল ষাট ফুট। স্টিরাপ থেকে রেলিঙের ওপাশে নামল জলিল। কাঁধে তুলে ফেলেছে রাইফেল,

চোখে স্কোপ। ডেক এবং সুপারস্টাকচারের দিক লক্ষ্য করছে, কোনও নড়াচড়া দেখলে গুলি করবে। স্টিরাপ আটকে গেল ছোট পুলির সঙ্গে, থেমে গেছে ন্যানোফাইবার। লাফ দিয়ে রেলিঙের ওপাশে নামল নিশাত।

ওর দিকে না চেয়েই বলল জলিল, 'আশপাশে কেউ নেই।'

স্টার্নের দিকে রওনা হয়ে গেল ওরা, প্রতি পঞ্চাশ ফুট গিয়ে থামছে নিশাত, পিছন থেকে সুপারস্ট্রাকচার কাভার করছে জলিল। জাহাজে এখনও কারও দেখা নেই। লিপফ্রগ টেকনিক ব্যবহার করে সামনে বাড়ছে দু'জন। হুইল হাউসে পৌঁছে যেতে লাগল তিন মিনিট। প্রথমবারের মত পোর্ট সাইডে সরে গেছে ওরা, উঁকি দিল লোডিং পিয়ারের উপর। জাহাজের চেয়ে উঁচু জোড়া গ্যান্ট্রি, কিন্তু অবহেলায় ঝুলছে হোসগুলো। এখন মাত্র বিশ ফুট দূরে গিয়ে পড়ছে তেল, ডক থেকে নামছে সাগরে।

এক পলকে মনে হলো ওদিকে আছে কমপক্ষে এক শ' জন মার্সেনারি। এদের কাজ ডক পাহারা দেয়া। যথেষ্ট সময় পেয়েছে, নানা দিকে তৈরি করেছে ব্যারিকেড। নিশাত ও জলিল যদি এদেরকে থামাতে না পারে, ওর দল নিয়ে মস্ত বিপদে পড়বে আলতাফ মৃধা।

'আপনার কী মনে হয়, আপা?' বলল জলিল। 'উচ্চতা যথেষ্ট, না কি আরও উপরে উঠব আমরা?'

'উচ্চতা ঠিকই আছে, কিন্তু জাহাজে কেউ উঠলে একদম খোলা জায়গায় পড়ব। চলো সুপারস্ট্রাকচারের ছাতে উঠি।'

জাহাজের দালানের ভিতর ঢুকে পড়ল ওরা, একের পর এক কাঁচি সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। সোহেলের কাছে বর্তমান পরিস্থিতির রিপোর্ট দিল নিশাত। শুনতে পেল মৃধার লোক টারমিনালে ঢুকে নানা দিকে পজিশন নিয়েছে।

উপরের এক সিঁড়িতে খুলে গেছে একটা দরজা, কালো

প্যান্ট ও এপিউলেটসহ সাদা শার্ট পরনে বেরিয়ে এসেছে এক লোক। কোনও সুযোগ পেল না সে, তার দুই চোখের মাঝে পিস্তলের নল ঠেসে ধরল নিশাত।

'না, দয়া করে গুলি করবেন না,' ফিসফিস করে বলল অফিসার।

'একদম চুপ,' চাপা ধমক দিল নিশাত। 'আমরা হলাম গিয়ে ভাল দলের লোক।'

'আপনি কোন্ দেশি?' উচ্চারণ শুনে মনে হলো সে ইংলিশ।

'অত কথা বলে না, ক্যাপ্টেন,' লোকটার কাঁধে চারটে সোনালী স্ট্রিপ খেয়াল করেছে নিশাত। 'আমরা পরিস্থিতি সামলে নেয়ার জন্য এসেছি। ছাতে উঠব।'

'নিশ্চয়ই উঠবেন, ম্যাম, আমার পিছু নিন।' ঘুরে দাঁড়াল অফিসার, নিশাতের সামনে হাঁটতে শুরু করেছে। আবার ঢুকে পড়ল ঘরে। 'বলতে পারেন এখানে কী ঘটছে? আমরা তেল তুলছিলাম, তারপর হঠাৎ কোন্ এক গাধা খুলে নিল হোসগুলো। মেরিন অফিসে যোগাযোগ করতে চাইলাম, কিন্তু কেউ রিসিভার তুলল না। তারপর আমার লুক আউট জানাল, পিয়ারে অস্ত্র হাতে উঠেছে একদল লোক। তারপর শুরু হলো গোলাগুলি।'

'শুধু জেনে রাখুন, আপনার ক্রুদের কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু কাউকে ডেকে উঠতে দেবেন না। লুকিয়ে থাকুক।'

'সকাল থেকেই সবাইকে একই কথা বলছি,' বলল ক্যাপ্টেন। 'এই যে পৌঁছে গেছি।'

স্টেয়ারওয়েলের শেষে হাজির হয়েছে ওরা, সামনে কোনও দরজা নেই, কিন্তু মাথার উপর আছে একটা হ্যাচ। দেয়ালে ঝালাই করা মই। কোনও কথা না বলে মই বেয়ে উঠতে শুরু করেছে জলিল।

ক্যাপ্টেনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল নিশাত। 'ধন্যবাদ,

ক্যাপ্টেন। এবার উপরে উঠব আমরা।'

হাতটা ঝাঁকিয়ে দিল ক্যাপ্টেন। 'ঠিক আছে, ভাল থাকুন।'

হ্যাচ খুলে ফেলেছে জলিল, স্টেয়ারওয়েলে এসে পড়ল উজ্জ্বল সোনালী রোদ। হ্যাচ পেরিয়ে উপরে উঠে গেল জলিল, ওর পাঁচ সেকেণ্ড পর ছাতে উঠল নিশাত। উপর থেকে হ্যাচ বন্ধ করবার উপায় নেই। ওদিকে এক চোখ রাখতে হবে। মার্সেনারিরা উঠে আসতে পারে।

পাইলট হাউসের ছাতে কিছুই নেই। জাহাজের চিমনি ও অ্যান্টেনাগুলোর ছায়া এসে পড়েছে। কিনারার কাছে গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল নিশাত ও জলিল। ওদেরকে নীচ থেকে দেখবে না কেউ, কিন্তু ওরা দেখছে ডক। কযওয়ের শেষে আলতাফ মৃধার বাহিনী অপেক্ষা করছে, সিগনাল পেলেই আক্রমণ শুরু করবে। দূরের আকাশে ইউএভি দেখা গেল।

'সোহেল ভাই, নিশাত বলছি,' রেডিও করল নিশাত। 'আমরা পজিশনে। দু'মিনিট লাগবে টার্গেট খুঁজে নিতে।'

'ঠিক আছে। আমরা অপেক্ষা করছি।'

ছাতের কিনারায় রাইফেল রেখেছে ওরা, একটু দূরে দূরে ভরা ম্যাগাযিন। চট্ করে সরে গিয়ে নতুন পজিশনে যেতে পারবে। স্কোপ দিয়ে শত্রুদেরকে দেখতে শুরু করেছে ওরা। এই বাহিনীর অফিসারদের খুঁজছে। তাদেরকে শেষ করে দিলে নেতৃত্ব দেয়ার কেউ থাকবে না।

'আশ্চর্য,' বিড়বিড় করে বলল নিশাত।

'কী হয়েছে, আপা?'

'বামে দেখো। এক লোক কমবয়সী এক সৈনিককে ঝাড়ছে।'

রাইফেল সরিয়ে স্কোপের ভিতর দিয়ে ওদিকে চাইল জলিল। 'হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছি। তো কী, আপা? লোকটা কে?'

'আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কর্নেল আদি মাধাভ মাধানা, ওই লোকই আমাদের ঠকাতে চেয়েছিল। জেনারেল টমাস গাধাধারের ডান হাত।'

'তা হলে কপাল পুড়েছে ব্যাটার। ঘাড় ধরে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।' নিশাতের দিকে চাইল জলিল। 'আগে ওকে শেষ করতে চান, আপা?'

'না। আগে বুঝুক কী ঘটছে, বা কারা এসব করছে। জলিল, তুমি রেডি?'

'আমার ডানদিকের ডকে কমপক্ষে চারজন অফিসার। আরও ছয়জনকে দেখে মনে হচ্ছে ওরা কাজ জানে। অন্যরা ফালতু।'

'ঠিক আছে, কাজ শুরু করা যাক। ...সোহেল ভাই, আমরা রেডি।'

'আপা, আমরা চার্জ শুরু করতে পারি?' ট্যাকটিকাল নেটে বলল মৃধা।

সোহেলের তরফ থেকে কোনও কথা এল না, কিন্তু দেখা গেল মার্ভেল থেকে আগুন ঝরাতে শুরু করেছে গ্যাটলিং গান। কযওয়ের দশ গজ দূরে তেলের সুপের ভিতর পড়ল গুলি, গোটা ডকের এক পাশে ছিটকে লাগছে নোংরা পানি। কাছের মার্সেনারিরা ভিজে গেল। চমকে পিছিয়ে গেছে সবাই। কযওয়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা এক মার্সেনারি আড়াল নিতে চাইল ভাসমান ডকে।

মার্সেনারিদের রাইফেলের উপর দিয়ে ভেসে এল গ্যাটলিং গানের আওয়াজ। কাজে মন দিল নিশাত ও জলিল। যত দ্রুত সম্ভব গুলি করছে। প্রতি গুলিতে মারা পড়ছে একজন করে। দু'জনের দশটা গুলি বেরিয়ে যাওয়ার পর ভীষণ দ্বিধার ভিতর পড়ল মার্সেনারিরা। তাদের নেতারা মরছে। কিন্তু গুলি আসছে কোথা থেকে? ছাতের কিনারা থেকে পিছিয়ে গেল নিশাত ও

জলিল। একটু সরে নতুন করে গুলি শুরু করেছে। স্কোপের ভিতর দিয়ে মাধানার দিকে চাইল নিশাত। লোকটা গলা ফাটিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে, কিন্তু চেহারায় ফুটে উঠেছে ভীষণ ভয়। কেউ শুনছে না তার কথা। দূরে কযওয়ের উপর উঠে পড়েছে আলতাফ মৃধা এবং তার সৈনিকরা।

আরও দুই গুলিতে দুই অফিসারকে পরপারে পাঠিয়ে দিল নিশাত ও জলিল। মার্সেনারিদের নেতৃত্ব দেয়ার লোক কমে এসেছে। হঠাৎ এক লোক টের পেল গুলি আসছে উপর থেকে। সুপারট্যাঙ্কারের দিকে চাইল সে। সবাইকে সতর্ক করবার জন্য হাঁ করল, আর ঠিক তখনই তার কপাল ফাটল জলিলের গুলিতে।

'মৃধা, আপনাদের আশি ফুট দূরে প্রথম অ্যাম্বুশ,' রেডিয়োতে জানিয়ে দিল জাহিদ হাসান।

'দেখতে পাচ্ছি না ওরা কী করছে। আমার সফ্‌ট্‌স্ক্রিন আবারও বিকল হয়েছে।'

'যদি বাজি ধরতাম, বলতাম ওরা হাল ছেড়ে দিচ্ছে। না, এক মিনিট, ভুল বলেছি। একজন তাদেরকে উৎসাহ দেয়ার চেষ্টা করছে। না, ভুল বললাম। গুলি খেয়ে পড়ে গেছে সে। চমৎকার টার্গেট করেছে জলিল।'

'গুলিটা আমার,' আপত্তি জানাল নিশাত।

'হাল ছেড়ে দিয়েছে লোকগুলো,' বলল জাহিদ হাসান। 'হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দিয়েছে। মাথার উপর হাত তুলছে।'

একদল মার্সেনারি পরাজয় মেনে নিতেই অন্যরা হার মেনেছে। কযওয়ে বা লোডিং ডকে অস্ত্র ফেলে দিচ্ছে সবাই। শুধু কর্নেল মাধানা এখনও লড়তে চাইছে। পিস্তল বের করে ঝাঁকাতে শুরু করেছে। তারপর পিস্তলের বাঁট নামিয়ে আনল

কাছের এক তরুণের মাথার উপর। আশপাশের সবাইকে হুমকি দিয়ে চলেছে মাধানা— এখনই রাইফেল তুলে নে, নইলে মেরেই ফেলব তোদেরকে। লোকটা নিরস্ত্র মার্সেনারিদের দিকে গুলি করবার আগেই তার একটা হাঁটু উড়িয়ে দিল নিশাত।

পরাজিত মার্সেনারিদের ভিতর দিয়ে সামনে বেড়েছে মৃধা এবং তার দল। সরিয়ে নিচ্ছে একে-৪৭, রাইফেলের বড় একটা স্তূপ তৈরি হয়ে গেছে। মার্সেনারিদের সার্চ করে দেখছে ওরা।

ঈগলের বাসার মত উঁচু অবস্থান থেকে সবাইকে কাভার দিচ্ছে নিশাত-জলিল, নিশ্চিত করছে এদিকের এলাকা নিরাপদ থাকবে।

'আর কারও কাছে অস্ত্র নেই,' কিছুক্ষণ পর বলল মৃধা। ডকে কর্নেল মাধানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে। লোকটা মুখ কুঁচকে বসে পড়েছে। 'কে গুলি করতে ভুল করল?' জানতে চাইল মৃধা।

'ভুল নয়, বাছা,' বলল নিশাত। 'গাধাটা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই ওর পেট থেকে সবই বেরুবে। জানা যাবে গাধাধার আর ক্রিস্টোফার আরও কী করছে।'

দশ মিনিট পর ডকে নেমে এল নিশাত ও জলিল। মাধানার পাশে পৌঁছে গেল নিশাত। লোকটা তীব্র ব্যথার কারণে কিছুই দেখছে না। তার গালে হালকা কয়েকটা চড় দিল নিশাত। এবার মাথা তুলে ওর দিকে চাইল মাধানা। বিড়বিড় করে কী যেন বলল, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ।

'মনে পড়ে আমাকে?' জানতে চাইল নিশাত। বিস্ফারিত হলো লোকটার দুই চোখ। 'হ্যাঁ, সেই আমিই। কঙ্গো নদী। এক সপ্তাহের একটু বেশি। ভেবেছিলে ডবল-ক্রস করবে। কিন্তু কী হলো পরিণতি? আর লাগবে আমাদের সঙ্গে?'

অ্যাঙ্গোলান আর্মি যখন পেট্রোম্যাক্সের টারমিনালে হাজির হলো, ততক্ষণে সমস্ত ইকুইপমেন্ট, ক্রু এবং জাস্টাসের আহত-নিহত-সুস্থ সৈনিকদের নিয়ে দিগন্তের ওপাশে হারিয়ে গেছে মার্ভেল।

আর্মি এসে দেখল লোডিং পিয়ারে থেমে গেছে তেল পড়া। দুটো অফশোর কূপের মাথা বন্ধ করে দিয়েছে ক্রুরা। তারা আরও দেখল, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দালানের সামনে শুইয়ে রাখা হয়েছে সাতাশিটা লাশ। কারা যেন দালানের ভিতর বেঁধে রেখে গেছে প্রায় চার শ' ভীত মার্সেনারিকে। তাদের অনেকেই আহত। এদের একজনের হাঁটু ছিঁড়ে পড়েছে, ভালভাবে তার ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করা। গলা থেকে ঝুলছে মাঝারি একটা বোর্ড, সেটার সঙ্গে সেঁটে দেয়া কাগজে লেখা:

আমার নাম আদি মাধাভ মাধানা। আমি টমাস গাধাধারের আর্মি অভ রেভ্যুলেশনের কর্নেল। আমাদেরকে ভাড়া করেছিল আসিফ হায়দার চৌধুরির প্রাক্তন পার্টনার নিকোলাস ক্রিস্টোফার। আমাকে বলে দেয়া হয়েছে, যদি আপনাদেরকে মিথ্যা বলি, আজ যারা আমাদেরকে টার্মিনালগুলো ধ্বংসের কাজে বাধা দিয়েছে, তারা এসে খুঁজে বের করবে আমাকে। তখন আর রক্ষা নেই আমাদের।

খোদা হাফেজ।

বারো

বাজে অবস্থা দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসের। যে-কেউ দেখলে বলবে

যে-কোনও দিন স্ক্র্যাপ আয়ার্ন হিসাবে বিক্রি হবে জাহাজটা। এভাবেই ক্যামোফ্লেজ করা হয়েছে মার্ভেলকে। কিন্তু সুপারট্যাঙ্কার মেডিটারেনিয়ান উলফের অবস্থা আরও অনেক বেশি খারাপ। গত বিশ বছর ভূমধ্য সাগরে গাধার খাটনি খেটে তেল টেনেছে ওটা, কখনও কোনও যত্ন নেয়নি মালিকপক্ষ। কিছু নষ্ট হলে পুরনো পার্টস লাগানো হয়েছে। বেশিরভাগ সময়ে ব্যবহার করেছে ডাক্ট টেপ বা বেইলিং তার। এসব দিয়ে কাজ না হলে জিনিসটা ফেলে দেয়া হয়েছে। যখন সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নষ্ট হলো, ওটাকে বাইপাস করা হলো, পরবর্তীতে প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে সাগরে ফেলা হয়েছে ময়লা। সুপারস্ট্রাকচারের ভিতর বড়জোর হাওয়া দিতে পারে এয়ার-কণ্ডিশনিং সিস্টেম, তাতে মোটেও শীতল হয় না বাতাস। গ্যালির কুলার বা ফ্রিযার কাজ করে না।

জাহাজের কালো খোলে বিশ্রী দাগড়া জং ধরেছে, অনেক আগেই খসে পড়েছে সুপারস্ট্রাকচারের রং। চিমনির ভিতর-বাইরে থকথকে ময়লা ও জং, বুঝবার উপায় নেই ওটা এক সময়ে ছিল সবুজ-হলুদ রঙের। এই জাহাজে একমাত্র নতুন ও আধুনিক ইকুইপমেন্ট বলতে একটা এস্কেপ পড, ওটা ঝুলছে স্টার্নে। জাহাজ নিয়ে কোথায় যেতে হবে শুনে জোর দাবি করে জিনিসটা আদায় করেছে ক্যাপ্টেন।

সুপারট্যাঙ্কারের খোলের বিম এক শ' বিশ ফুট, দৈর্ঘ্যে তিনটে ফুটবল মাঠের চেয়েও বড়। সন্দেহ নেই প্রকাণ্ড জাহাজ, কিন্তু পেট্রোম্যাক্সের টারমিনালের বার্থে রয়েছে সাড়ে তিন লাখ টনি সুপারট্যাঙ্কার। ওটার আধুনিক ডিজাইনের দিক থেকে অনেক বেশি পুরনো মেডিটারেনিয়ান উলফ, সাত হোল্ডে বহন করে বড়জোর এক লাখ চার হাজার টন ক্রুড অয়েল।

কিছুদিন হলো ওই জাহাজ দেখা দিয়েছিল মৌরিতানিয়ার

নোয়াক্‌শট বন্দরের বাইরে, নোঙর ফেলে অপেক্ষা করেছে। পশ্চিম দিগন্তে ঝিম মেরে পড়ে ছিল। কিন্তু যখন জাহাজটা গা ঝাড়া দিয়ে রওনা হয়ে গেল, প্রায় কেউ ওটার দিকে মনোযোগ দিল না। নিকোলাস ক্রিস্টোফার অ্যাঙ্গোলা থেকে ফিরতেই রওনা হয়েছে জাহাজ, পিছনে ফেলেছে প্রাচীন শহর। এরপর আর কোথাও না থেমে চলে গেছে উপকূল থেকে দুই শ' মাইল দূরে।

আটলান্টিকের মাঝে শুরু হয়েছে একটা ডিপ্রেশন, ওটা হয়ে উঠতে পারে প্রবল হারিকেন। জাহাজটা এখন ধাওয়া করছে অস্থির এক জটিল পরিবেশকে। এজন্যেই অপেক্ষা করেছে নিকোলাস, এখন মহাসাগরের বুকে সঠিক হয়ে উঠছে পরিস্থিতি, দুনিয়া সেরা মিটিওরোলজিকাল ব্রেন ও সবচেয়ে সফিসটিকেটেড কমপিউটারের মডেল জানিয়েছে: যে-কোনও সময়ে শুরু হবে ভয়ঙ্কর ঝড়।

ওর কেবিনের ভিতর তাপমাত্রা কমপক্ষে এক শ' ডিগ্রি, বাধ্য হয়ে বেশির ভাগ সময় উইং ব্রিজে বসছে নিকোলাস। জাহাজ সতেরো নট গতি তুলে ছুটছে বলেই ওখানে হাওয়া আসে।

একটু আগে দিলোয়ারসি ওয়ায়ারলেস সার্ভিসের মাধ্যমে জানা গেছে, অ্যাঙ্গোলার সেনাবাহিনী ঠেকিয়ে দিয়েছে কঙ্গোর বিদ্রোহী নেতা টমাস গাধাধারের হামলা। দ্রুত কাউন্টার-অ্যাটাকের কারণে মারা পড়েছে প্রায় এক শ' গেরিলা, বন্দি হয়েছে চার শ'জন। নিকোলাস ক্রিস্টোফার ভাবতে শুরু করেছে: কর্নেল মাধানা একমাত্র লোক যে ওকে ফাঁসিয়ে দিতে পারে। সে এখনও বেঁচে আছে না মরেছে, কে জানে! নিকোলাস মনে মনে বলল: আসলে আমার কোনও বিপদ হবে না। যদি ওই হামলার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে নেয়া হয়, আদালতে হাজির হব, তাতে বরং আমার নামটা আরও ছড়িয়ে পড়বে। দুনিয়ার সেরা উকিল

ভাড়া নেব, সে লোক মামলা সরিয়ে নেবে হেগের ওয়ার্ল্ড কোর্টে। শেষে দেখা যাবে ওকে সসম্মানে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

নিকোলাস ক্রিস্টোফারের খারাপ লাগছে অন্য কারণে। ব্যর্থ হয়েছে হামলা, এবং মাত্র বারো হাজার টন ক্রুড অয়েল পড়েছে সাগরে। এটাও মস্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কিন্তু ও যা চেয়েছিল তার ধারে-কাছেও না। ওর আশা ছিল সাগরে পড়বে কমপক্ষে দশ লাখ টন ক্রুড অয়েল। হলো না, তারমানে ঝড়ের ভিতর বেনযেন আর্সেনিক অ্যাসিডের মেঘ তৈরি হবে না। উপকূলে হামলে পড়বে ভয়াবহ হারিকেন, কিন্তু তাতে ভীষণ ভয় পাবে না কেউ।

নিকোলাস ঠিক করেছে, মিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। সাংবাদিকদের জানাবে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর হতো ঝড়, কিন্তু দুনিয়ার আরেক প্রান্তে একটা লড়াইয়ের কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয় কম হয়েছে। এতেই প্রমাণ হবে পৃথিবীর নানা মানব-সভ্যতা পরস্পরের সঙ্গে কতটা জড়িত, কত অনিশ্চিত মানুষের ভবিষ্যৎ।

জাহাজের ব্রিজ থেকে বেরুল ক্যাপ্টেন ক্লয়েটাস ট্রিনডার, খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা চেহারা তার, ইঁদুরের মত চোখদুটো রক্তের মত লাল। একবার নাক ভেঙেছিল, তা ঠিক ভাবে মেরামত হয়নি, এক ফুটো দিয়ে সবসময় সর্দি গড়িয়ে নামে। ভাঙা নাকের কারণে চশমার ডাঁটি কানের উপর বাঁকা হয়ে থাকে।

'এক শ' মাইল দূরে এক কন্টেইনার শিপ থেকে রিপোর্ট পেলাম,' সূর্যাস্তের অনেক দেরি, কিন্তু ক্যাপ্টেনের মুখ থেকে ভকভক করে আসছে সস্তা জিনের গন্ধ। জড়িয়ে যাচ্ছে না গলা, যদিও সামান্য দুলছে সে। 'ক্যাপ্টেন বলল, ওদিকে চার নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেয়ার মত পরিবেশ। উত্তর-পুব থেকে

আসছে ঝোড়ো হাওয়া।'

'ঝড় তৈরি হচ্ছে,' বলল ক্রিস্টোফার। 'ঠিক যেখানে চেয়েছি, সেখানেই পাব ওটাকে। বেশি দূরে যায়নি, গতিপথ ঠিক করছে। এখন উপকূলের এত কাছে মিলিয়ে যাবে না।'

'আপনাকে ওখানে পৌঁছে দেব,' বলল ক্লয়েটাস, 'কিন্তু পরিস্থিতি ভাল লাগছে না আমার।'

আবার শুরু করলি তুই? মনে মনে ধমক দিল নিকোলাস। এমনিতেই টমাস গাধাধার ডুবিয়েছে, বিফল হয়েছে মিশন—মেজাজ খিঁচড়ে আছে তার। এখন মাতালটা নালিশ শুরু করলে ভাল লাগবে কেন!

'এই জাহাজ অনেক বেশি পুরনো। পচে যেতে শুরু করেছে খোল। হোল্ডে যা রেখেছেন, ওটা অনেক বেশি গরম। খোলের পাত দুর্বল করে দিচ্ছে।'

'আমি তো আপনাকে ইঞ্জিনিয়ারদের রিপোর্ট দেখিয়েছি, ওই থার্মাল লোডের তাপ নিতে পারবে জাহাজের খোল।'

'ওটা কোনও রিপোর্ট হলো?' হাত ইশারা করে কথাটা উড়িয়ে দিল ক্যাপ্টেন। 'দামি সুট পরা লোক, সাগরের কী বোঝে ওরা? আপনি আমাদেরকে একটা হারিকেনের ভিতর নিচ্ছেন, আর আমি আগেই বলেছি, ফোর্স সিক্স ঝড় এলে দুই টুকরো হয়ে যাবে এই জাহাজ।'

ক্যাপ্টেনের সামনে দাঁড়িয়ে গেল নিকোলাস, লোকটার চেয়ে কমপক্ষে সাত ইঞ্চি উঁচু সে। মার খাওয়ার ভয় লাগিয়ে দিয়েছে তার মনে। 'আমার কথা কান খাড়া করে শুনে নাও, নির্বোধ মাতাল। তুমি সারাজীবনে যত আয় করেছ, তার চেয়ে বেশি পেয়েছ আমার কাছ থেকে। ওই পয়সায় বিশ বছর দামি মদ গিলতে পারবে। কাজেই নিজের কাজ ঠিক ভাবে করোগে যাও। আর একবারও বিরক্ত করবে না। তোমার ভবিষ্যদ্বাণী নিজের

মনেই রাখবে। ...কানে ঢুকেছে কথাটা?'

'আমি শুধু বলছিলাম...'

'কিছুই না!' ধমকে উঠল ক্রিস্টোফার, 'তুমি কিছুই বলছিলে না! এবার আমার সামনে থেকে দূর হও। তোমার মুখের দুর্গন্ধের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ছি।'

কঠোর মুখে দাঁড়িয়ে আছে সে, কয়েক মুহূর্ত পর চোখ নামিয়ে নিল ক্যাপ্টেন। ক্রিস্টোফার জানে, লোকটাকে হার মানতেই হবে। ওর জানা আছে, বেশির ভাগ অ্যালকোহলিক মনে মনে দুর্বল চরিত্রের হয়। এই লোকও ব্যতিক্রম নয়। এমন এক পর্যায়ে পৌঁচেছে, এখন নির্দেশ দিলে তা না-মেনে তার উপায় নেই। নির্দিষ্ট বিরতিতে মদ গিলতেই হবে। লোকটার দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়েছে বলে কোনও মানসিক চাপ নেই নিকোলাসের মনে। এর আগে ডুলি গ্রিন বা তার ইকো-ক্রুসেডারদের বোকামি বা টমাস গাধাধারের লোভকে পুঁজি করে নিজের কাজ করিয়ে নিয়েছে। আর এসব করেছে বলেই মানুষ বুঝবে, তারা কীভাবে ধ্বংস করছে পৃথিবীর প্রকৃতি। জগৎ আসলে এভাবেই চলে। ওকে ঠকিয়েছে আসিফ হায়দার চৌধুরি। এক্সপেরিমেন্টের বেশির ভাগ কাজ করেছে ও, কিন্তু সমস্ত প্রশংসা চুরি করেছে ওই লোক।

সবাই ভেবেছে ও লাইমলাইটে থাকতে চায় না, লুকিয়ে থাকে ছায়ার ভিতর। মানুষ যে কত মস্ত ভুল করতে পারে! কে না চায় তার কাজের কারণে প্রশংসা আসুক! চেয়েছে সে, কিন্তু বাধ্য হয়ে দেখেছে ওর সহকর্মী লুটে নিচ্ছে সব বাহাবা। সাংবাদিকরা মুগ্ধ হয়েছে আসিফের মিষ্টি কথা এবং আন্তরিক হাসিতে। নিজে ও বক্তৃতা দিতে গেলে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে, শুকিয়ে আসে গলা, টিভি ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালে কাঁপতে থাকে বুক, এগুলো আসিফের দোষ নয়, কিন্তু এটা তার দোষ যে ওকে

পাশে রাখেনি সে। ওই আসিফের ছায়ার ভিতর আড়াল হয়ে গিয়েছিল ও। খুব কষ্ট হয়েছে তখন, বুক ফেটে যেতে চেয়েছে। তারপর যখন সুন্দরী মেয়েটাও মুখ ফিরিয়ে নিল, মিশতে লাগল আসিফের সঙ্গে... মনে মনে অভিশাপ দিল নিকোলাস, 'হারামজাদি! মেইনে তোর স্বামীসহ নিজ বাড়িতে মরবি তুই! সামনের ঝড় তোদেরকে শেষ করবে! আর আসিফের শখের বাড়িটা? ওটাও উড়ে যাবে!'

বিড়বিড় করে আসিফ চৌধুরিকে গালি দিল নিকোলাস। ওই হারামজাদা বাড়িটায় থাকলে ভাল হতো। হাড়ে হাড়ে বুঝত কুকুরের মত মরতে কেমন লাগে। যদি ওই শালার চোখে চোখ রেখে বলতে পারত, 'সব দোষ তোর, কুত্তার বাচ্চা! যারা পরিবেশ নষ্ট করছে তাদের সঙ্গে মিশে পয়সা লুটছিস, এবার নিজ চোখে দ্যাখ্ তার ফল কত ভয়ঙ্কর হয়!'

জাহাজের রেলিঙের পাশ থেকে সাগরে থুতু ফেলল নিকোলাস ক্রিস্টোফার। ওটাই তো এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ডাস্টবিন। সাগরের দিকে চেয়ে রইল সে। একসময় অনেক প্রশংসা চেয়েছে, পায়নি কিছুই। সামান্যতম মনোযোগও জোটেনি। আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তার। কিন্তু এখন কিছুদিনের ভিতর সব পাল্টে যাবে।

আর সাধারণ মানুষ থাকবে না সে।

ভবিষ্যতের মানুষ বলবে, 'বিজ্ঞানী নিকোলাস ক্রিস্টোফার আমাদের সত্যিকারের মাসিহা!'

দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসে ফিরেই মাসুদ রানা নির্দেশ দিয়েছে, দেরি না করে এখনই উত্তর দিকে রওনা হতে হবে। আফ্রিকা যেখানে আটলান্টিকের দিকে সামনে বেড়েছে, সেখানে সাহারা মরুভূমি থেকে আসছে তপ্ত হাওয়া, ওটাই এভাপোরেট করছে বিপুল

পানি, ফলে তৈরি হচ্ছে ভয়ঙ্কর হারিকেন। জাহাজে ফিরে কেবিনে আর যায়নি রানা, নানা দিকে তদারকি করেছে। লাইফবোট মুক্তিসেনার খোল ভাল করে পরিষ্কার করে ফিউয়েল ভরা হয়েছে ট্যাঙ্কে, তারপর নাবিকরা তুলে রেখেছে ডেভিটে। ক্রুরা দুই সাবমারসিবল থেকে সাবান দিয়ে মেজে তুলেছে তেল, তারপর রিচার্জে বসানো হয়েছে ব্যাটারি। প্রতিটি ইকুইপমেন্ট তুলে রাখা হয়েছে ঠিকঠাক মত। গ্যাটলিং, ৪০এমএম ও .৩০ ক্যালিবারের অস্ত্র পরীক্ষার পর পরিষ্কার করা হয়েছে ব্যারেল ও রিসিভার। গুলি ভরে রাখা হয়েছে অ্যামিউনিশন বিনে। মার্ভেলের ক'জন আর্মারার এখন ম্যাথিউস জাস্টাসের লোকদের ব্যবহৃত একে-৪৭ রাইফেল প্যাক করছে। ট্যাগ করা হচ্ছে প্রায় পাঁচ শ' রাইফেল। ওগুলো পাওয়া গেছে গাধাধারের সৈনিকদের কাছ থেকে। ওগুলো পাবেন ম্যাথিউস জাস্টাস তাঁর দেশটাকে জল্লাদদের হাত থেকে রক্ষার কাজে ব্যবহারের জন্য।

রানা খুবই ব্যস্ত, কিন্তু ডক্টর ফারার মত নয়। মেডিকেলে একের পর এক অপারেশন করছে মেয়েটি। মোটমাট তেইশজন আহত হয়েছে। তাদের দেহ থেকে বের হয়েছে বত্রিশটা বুলেট। কাটাছেঁড়া প্রত্যঙ্গে অপারেশন করতে গিয়ে শ্বাস নেয়ার সময় নেই ফারার। একজনের অপারেশন শেষ হলেই রক্তাক্ত গ্লাভস খুলছে সে, মুহূর্তে আর্দালি এগিয়ে দিচ্ছে নতুন গ্লাভস। পরের রোগীকে শুইয়ে দেয়া হচ্ছে টেবিলে। পাশে অ্যানেস্থেশিয়োলজিস্ট কাজ করে যাচ্ছে মুখ বুজে।

ষোলো ঘণ্টা অপারেশন করার পর দেখা গেল আর মাত্র একজন রোগী বাকি। আলতাফ মৃধার কাঁধের মাংস নিয়ে গেছে বুলেট। সামান্য ক্ষত, কিছুক্ষণের ভিতর সেলাই করে ফেলবে ফারা। মৃধা অপারেশন টেবিলে উঠেই বলল, 'লড়াইয়ের সময় বুঝিইনি গুলি লেগেছে।'

'পাঁচ মিনিট লাগবে সেলাই করতে,' জানাল ফারা।

সেলাই শেষ হলো আড়াই মিনিট পর। লাফ দিয়ে টেবিল থেকে নামল মৃধা, ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিয়ে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল। কিন্তু দরজা পর্যন্ত যাওয়ার আগেই ভিতরে ঢুকল রানা। থমথম করছে ওর চেহারা।

ফারা বুঝে ফেলল জেনে গেছে রানা।

'আমি ওকে দেখতে চাই।'

আস্তে করে মাথা দোলাল ফারা, টেবিল থেকে সরে রওনা হয়ে গেল মেডিকেল বে-র আরেক দিক লক্ষ করে। ছোট এক শীতল ঘরের মাঝে রয়েছে মাত্র একটি টেবিল। একদিকের দেয়ালে স্টেইনলেস-স্টিলের বেশ কিছু ড্রয়ার। কোনও কথা না বলে একটা ড্রয়ার খুলল ফারা। বেরিয়ে এসেছে অনুজ্জ্বল প্লাস্টিকের ব্যাগ, ভিতরে উলঙ্গ দেহ। মাথার কাছের চেইন খুলল রানা, এক পলক চেয়ে রইল ক্যারেন কুম্বসের দিকে, তারপর এক পা পিছিয়ে গেল।

'কাজটা কীভাবে করল?'

'খুব করুণ মৃত্যু বেছে নিয়েছে,' বলল ফারা। আগের চেয়ে অনেক বেশি ক্লান্ত বোধ করছে। 'যতটা পারে বের করেছে জিভ, তারপর চেয়ারে ঝাঁকি দিয়ে সামনের ডেকের উপর আছড়ে পড়েছে। ওর সামনের দাঁত কেটে আলাদা করে দিয়েছে জিভ। তারপর আবারও চেয়ার নিয়ে কাত হয়েছে। আসলে নিজের রক্তের ভিতর ডুবে মরেছে মেয়েটা। কতটা অসহায় বোধ করলে এভাবে মরতে চায়? দুই হাতের জোরে সরে যেতে পারত।'

'ওর দুই হাতে হ্যাণ্ড কাফ ছিল।'

'পড়বার সময় সরিয়ে নিতে পারত মাথা।' মৃতদেহের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফারা। 'কিন্তু নেয়নি...'

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রানা। ওর মনে পড়ছে দাদু

এবেলের কথা। মানুষটা মারা যাওয়ার পর লাইফবোট নিয়ে স্পিডবোটকে ধাওয়া করে ও। বোটের ড্রাইভার বন্দি হতে চায়নি, জেনেশুনে আত্মহত্যা করেছিল। ওর মনে হয়েছিল লোকটা ভয়ের চোটে কাজটা করেছে, আফ্রিকার জেলে যেতে চায়নি; কিন্তু আসল কথা হচ্ছেঃ নিজের জীবন নিজ হাতেই শেষ করেছে লোকটা। ঠিক ক্যারেন কুম্বসের মত।

'হ্যাঁ, ও মরতেই চেয়েছে, এবং প্রথম চেষ্টায় পেরেছে,' গম্ভীর মুখে বলল রানা।

'ওর সেলের সিকিউরিটি টেপ দেখেছ?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'দরকার নেই। আমি চিনি এই জাতের মানুষ।'

'ফ্যানাটিক,' নিচু স্বরে বলল ফারা।

'হ্যাঁ।'

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হারা-কিরি করত জাপানি সৈনিক, তাদের মতই আত্মহত্যা করেছে এই মেয়ে। তফাৎ হচ্ছে ছুরি দিয়ে নয়, নিজের দাঁত দিয়ে জিভ কেটে মরেছে। মার্ভেলের সবাই আলাপ করছে, ওর কাছে জরুরি কোনও তথ্য ছিল।'

'আসলেই ছিল,' ফারার চোখে চোখ রাখল রানা। 'আসিফ হায়দার চৌধুরিও জানে সেটা। এবার তাকে জাগাতে হবে।'

'ভুলে যাও।' এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল ফারা। 'তার ব্লাড প্রেশার এখনও অনেক কম। জানি না ক্ষতের ভিতর গুলির ভাঙা টুকরো রয়ে গেল কি না। তা ছাড়া, সবে মাত্র নিয়ন্ত্রণে এসেছে ইনফেকশন। স্বীকার করছি আগের চেয়ে হালকা কোমার ভিতর আছে, কিন্তু এখনও জ্ঞান ফেরেনি।'

'ফারা, উপায় নেই। আজ সকালে নির্দিষ্ট কোনও কারণে হামলা করতে বলেছে নিকোলাস ক্রিস্টোফার। তার অন্য কোনও পরিকল্পনা আছে। অস্বাভাবিক বা আশ্চর্য কিছু দেখাতে আসিফ

সাহেবকে কিডন্যাপ করেছিল। স্বর্ণা যখন ক্যারেন কুম্বসকে জিজ্ঞাসাবাদ করল, মেয়েটি বলেছিল ডেভিলস ওয়েসিসে আসিফ হায়দার চৌধুরির সঙ্গে দুই ঘণ্টা কথা বলে নিকোলাস। আমার ধারণা, সে-সময় সবই জানিয়েছে তাকে।'

'কাজেই আসিফ হায়দার চৌধুরির জ্ঞান ফেরাতে চাইছ। কিন্তু মানুষটা মারাও যেতে পারে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ?'

নিষ্ঠুর শোনাল রানার কণ্ঠ, 'বুঝেছি। কিন্তু আর কোনও উপায় নেই। ...যে কারণেই হোক নিকোলাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে হারিকেন। আমার ধারণা ঝড় তৈরি করছে সে। তার মানেই ভয়ঙ্কর বিপদে পড়বে একজন নয়, বহু মানুষ; জীবন হারাবে, আশ্রয় হারাবে, রুজি-রোজগার বন্ধ হবে। নিশ্চয়ই তোমাকে সব ব্যাখ্যা করতে হবে না, তুমি তো সিডর বা আইলার সময় ছুটি নিয়ে চলে গিয়েছিলে আমাদের দেশে। বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেছ দরিদ্র মানুষের।'

'তোমরাও তো ছুটে গিয়েছিলে। আমি শুধু আমার সাধ্যমত করেছি।'

'ওটা আমাদের প্রাণ-প্রিয় দেশ, ওখানে জন্ম নিয়েছি, বড় হয়েছি ওই সবুজ দেশে। নিজ মাকে ভালবাসে না কে! আমরা আজ ভিন কোনও দেশের মানুষকে রক্ষা করতে চাইছি। ...এই জাহাজে মেডিকেল সমস্ত সিদ্ধান্ত তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। কিন্তু আজ যদি বাধ্য হয়ে কঠোর নির্দেশ দিতে হয়, আমি তা-ই করব।'

দ্বিধার ভিতর পড়েছে ফারা। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'ঠিক আছে, আমি ওঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করব।'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'তা হলে চলো।'

সামনের ঘর থেকে কিছু সাপ্লাই নিল ফারা, তারপর রানার

আগে হাঁটতে শুরু করল, ঢুকে পড়ল পাশের এক ঘরে। আগে এই ঘরে একা ছিল বিজ্ঞানী, কিন্তু এখন কট্ পেতে শুইয়ে রাখা হয়েছে ছয়জন আফ্রিকান যোদ্ধাকে। রোদে পুড়ে ঝলসে গেছে বিজ্ঞানীর মুখ, এখনও ভীষণ ফ্যাকাসে। মানুষটার ভাইটাল সাইন দেখে নিয়ে হাতের আইভি ড্রিপে স্টিমুলেন্ট ইনজেক্ট করল ফারা।

কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে জেগে উঠতে লাগল বিজ্ঞানী। চোখ বোজা, জিভ দিয়ে ভেজাতে চাইছে ঠোঁট। চ্যাপস্টিক দিয়ে ঠোঁটদুটো ভিজিয়ে দিল ফারা। আস্তে করে চোখ মেলল বিজ্ঞানী। এক পলক ফারাকে দেখল, তারপর তার চোখ স্থির হলো রানার উপর। আবার চাইল ফারার দিকে। বুঝতে পারছে না কোথায় আছে।

'ডক্টর চৌধুরি, আমার নাম মাসুদ রানা। আপনি এখন নিরাপদ। যারা কিডন্যাপ করেছিল, তাদের কাছ থেকে আপনাকে সরিয়ে আনা হয়েছে। আপনি আছেন এখন আমাদের জাহাজে।'

বিজ্ঞানী কিছু বলবার আগেই বলল ফারা, 'কেমন বোধ করছেন?'

'বড় তেষ্টা,' খসখসে স্বরে বলল আসিফ।

মুখের সামনে পানিভরা গ্লাস ধরল ফারা, স্ট্র গুঁজে দিল ঠোঁটে। কয়েক ঢোক পানি গিলে হাঁফিয়ে গেল মানুষটা।

'আপনার বুকের ব্যথা কমেছে?'

জবাব দেয়ার আগে ভাবতে হলো বিজ্ঞানীকে, তারপর বলল, 'অবশ লাগছে।'

'আপনার গুলি লেগেছে,' বলল রানা।

'মনে পড়ে না তো!'

'আমরা আপনাকে উদ্ধার করতে যেতেই গুলি করে ক্যারেন

কুম্বস।'

'ওকে পেটানো হয়নি,' মনে পড়তে শুরু করেছে সব। 'আমি ভেবেছি কত অত্যাচার করেছে। সবই মিথ্যা। মেকআপ নিয়েছে।'

'তারপর একদিন মরু কারাগারে হাজির হলো আপনার পুরনো বন্ধু নিকোলাস ক্রিস্টোফার, আপনার মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ, মনে পড়ে।'

'আপনাদের ভিতর বেশ কিছু কথা হয়।'

আসিফ হায়দার চৌধুরি জানতে চাইল, 'ক্যারেন কুম্বস এখন কোথায়?'

'আত্মহত্যা করেছে, ডক্টর।' রানার দিকে অপলক চেয়ে আছে বিজ্ঞানী। 'আমরা যাতে সব জেনে নিতে না পারি, সেজন্য। ভয়ঙ্কর কোনও পরিকল্পনা করেছে নিকোলাস ক্রিস্টোফার।'

'অয়েল রিগ,' বিড়বিড় করল আসিফ। জ্ঞান হারাতে শুরু করেছে, এখন আর কাজ করছে না ড্রাগ্‌স্।

'ঠিকই বলেছেন। অ্যাঙ্গোলার উপকূলে অয়েল রিগে হামলা করে। অনেক তেল ফেলেছে সাগরে। ...আরও কী করতে চেয়েছে সে? আপনাকে কিছু বলেছে?'

'তাকে ঠেকাতে হবে। ওই ক্রুড অয়েল ভয়ঙ্কর বিষাক্ত।' কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

'ক্রুড অয়েল পড়া থেমেছে,' বলল রানা। 'ওর লোকেরা হেরে গেছে।'

যেন স্বপ্নের ভিতর ফিসফিস করল বিজ্ঞানী, 'ওই জাহাজ।'

'টারমিনালে একটা জাহাজ ছিল। কিন্তু ওটার উপর হামলা হয়নি।'

'না। নিকের একটা জাহাজ আছে।'

'ওটা দিয়ে কী করবে?'

'জিনিসটা আবিষ্কার করে ক্যারেন। আমাকে দেখিয়েছে। তখন আমার মনে হয়, ওটা সাধারণ একটা টেস্ট। কিন্তু তা নয়, ওই মেয়ে সত্যিই জিনিসটা তৈরি করে ফেলে।' বিজ্ঞানীর চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

'ক্যারেন কী তৈরি করে, ডক্টর?'

কোনও সাড়া নেই। পাঁচ সেকেণ্ড পর বলল, 'একটা অর্গানিক জেল। ওটা আঠালো করে তোলে সাগরের পানিকে।'

'এর ফলে কী হয়?' মরিয়া হয়ে উঠছে রানা। মানুষটার মুখের কাছে নিয়ে গেছে কান। যে-কোনও সময়ে জ্ঞান হারাবে বিজ্ঞানী। 'জিনিসটা কী কাজে লাগে, ডক্টর?'

দশ সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, কোনও জবাব নেই। তারপর ফিসফিস করল বিজ্ঞানী, 'উত্তাপ। অনেক তাপ...'

নিকোলাস ক্রিস্টোফার আসলে কী করতে চলেছে ঝট্ করে বুঝে ফেলল রানা। হ্যারিকেন তৈরি করতে প্রচুর তাপ লাগে, আর সেই তাপ জোগান দেবে লোকটা। ঝড়ের এপিসেন্টারের ভিতর জাহাজ ভরা ক্যারেন কুম্বসের জেল সাগরে ফেলবে সে। নিজের তৈরি পথ দেখিয়ে খ্যাপা প্রকৃতিকে নিয়ে যাবে যেদিকে খুশি। লোকটা জানত কোন্ সময়ে পেট্রোম্যাক্সের টার্মিনালে হামলা করতে হবে। বিষাক্ত তেলের বাষ্প নিয়ে উত্তর দিকে ছুটবে হাওয়া, সব মিশবে লোকটার তৈরি ভুমুল ঝড়ের ভিতর।

আফ্রিকার পশ্চিম তীরের সাগরে জেল ফেলবে লোকটা, কিন্তু ওই বিশাল এলাকা সার্চ করবার সময় ওদের নেই। বাধ্য হয়ে কমিয়ে আনতে হবে পেরিমিটার। 'নিকোলাস ক্রিস্টোফার কী ধরনের জাহাজ ব্যবহার করছে?' সম্ভবত কোনও ট্যাঙ্কার। কিন্তু প্রায় বেহুঁশ বিজ্ঞানীকে কোনও ভুল তথ্য দিতে চাইছে না রানা।

চুপ হয়ে গেছে আসিফ হায়দার চৌধুরি। একটু ফাঁক হয়ে

আছে দুই ঠোঁট। মনিটর দেখছে ফারা। চোখে-মুখে আপত্তি। যা দেখছে, তাতে বিচলিত হয়ে উঠছে।

বিজ্ঞানীর কাঁধে হাত রাখল রানা। 'আসিফ, ওটা কোন্ ধরনের জাহাজ?'

'রানা,' সাবধান করবার সুরে বলল ফারা।

রানার দিকে কাত হয়ে গেল বিজ্ঞানীর মাথা, কিন্তু চোখ খুলল না। 'একটা ট্যাঙ্কার— মেডিটারে... উল্‌ফ্। একটা সুপারট্যাঙ্কার কিনেছে।'

অনেক কমে গেছে হৃৎপিণ্ডের গতি, বিপ-বিপ আওয়াজ শুরু করেছে মনিটর। প্রায় ধাক্কা দিয়ে রানাকে সরিয়ে দিল ফারা। চেঁচিয়ে উঠল, 'হার্ট বিট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে! আর্দালি, এক্ষুণি কার্ট নিয়ে আসুন!' রোগীর বুক থেকে চাদর সরিয়ে দিয়েছে ও। দৌড়ে ঘরে ঢুকেছে আর্দালি, সঙ্গে পোর্টেবল ডেফিব্রিলেটার।

হুলুস্থুলের ভিতর চোখ মেলেছে বিজ্ঞানী, তীব্র ব্যথায় ঝাপসা দৃষ্টি। তারই ভিতর খপ্ করে ধরল রানার হাত, শব্দ উচ্চারণ করবার সাধ্য নেই, মুখ হাঁ করে নিঃশব্দে কী যেন বলতে চাইল।

একটানা আওয়াজ শুরু করেছে মনিটর।

'সরে যাও, রানা!' বিজ্ঞানীর বুকে প্যাডল বসিয়েছে ফারা, রানা সরে যেতেই হৃৎপিণ্ড চালু করতে ইলেকট্রিকাল ইমপাল্‌স্ দিল ও। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল আসিফের দেহ। মনিটরে দেখা দিল একটা সুই, তারপর শুরু হলো সমতল লাইন।

'এপে...,' ফারা শুরু করতেই ওর হাতে সিরিঞ্জ ভরা এপেনেফ্রিন ধরিয়ে দিল আর্দালি। সুইটা অনেক বেশি দীর্ঘ। ওটা আসিফের দুই পাঁজরের মাঝে ঢুকল। সরাসরি বিঁধেছে হৃৎপিণ্ডের ভিতর। 'আপ ইট টু টু-হাণ্ড্রেড জুল্‌স্।'

'চার্জিং, চার্জিং, অ্যাণ্ড চার্জিং,' মেশিনের দিকে চেয়ে রয়েছে আর্দালি। 'গো!'

প্যাডেলদুটো দ্বিতীয়বার ব্যবহার করল ফারা। বিছানার উপর ঝাঁকি খেয়ে উঠল বিজ্ঞানী। মনিটরে আবারও শুরু হয়েছে একটা সরু লাইন।

'কাম অন, কাম অন,' কাতর শোনাল ফারার কণ্ঠ। তারপর আবারও ফিরল হার্টবিট। প্রথমে খুব ধীরে, তারপর গতি বাড়তে লাগল। 'ভেন্টিলেটার আনুন।' কড়া চোখে রানার দিকে চাইল ফারা। 'এতে কোনও লাভ হয়েছে তোমার?'

সুন্দরী ডাক্তারের চোখে চোখ রাখল রানা। 'বুঝব, যখন মেডিটারেনিয়ান উলফ নামের কোনও সুপারট্যাঙ্কার পাব।'

তেরো

ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে আবহাওয়া, তারই ভিতর দিয়ে উত্তর দিক লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে মার্ভেল। আহত মানুষগুলোর কারণে পূর্ণ গতি তুলছে না, তা হলে আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে সবাই। এক শ' বছর আগের এক বইয়ে পড়েছে ফারা, রোগীকে হ্যামকে শুইয়ে দিলে তাদের কষ্ট কম হয়। সেই জ্ঞান এখন কাজে লাগছে। হ্যামকে তোলা হয়েছে গুরুতর আহতদেরকে। ঢেউয়ের দুলুনির সঙ্গে দুলছে তারা, এতে ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা কম। আসিফ হায়দার চৌধুরির হৃৎপিণ্ড চালু হওয়ার পর তার পাশ থেকে একবারের জন্য সরেনি ফারা।

রানার কাছ থেকে সুপারট্যাঙ্কারের নাম জানবার পর রায়হান ও নবী আধঘণ্টা ঘাঁটাঘাঁটি করেছে ইন্টারনেট, তারপর জেনে গেছে একমাস ধরেই জাহাজটা ছিল মৌরিতানিয়ার উপকূলে,

বন্দর ছেড়ে রওনা হয়েছে গতকাল। জাহাজটা ছিল এক আমেরিকান কোম্পানির, কিন্তু কিছুদিন আগে বিক্রি করে দিয়েছে লিবিয়ান এক ফার্মের কাছে। ফার্মের নাম এন.সি. কোং। রায়হান আবিষ্কার করেছে, নিকোলাস ক্রিস্টোফার তার নাম সংক্ষিপ্ত করে তৈরি করেছে ওই কোম্পানি।

এসব তথ্য পাওয়ার পর হিসাব-নিকাশ করেছে রায়হান ও নবী, বুঝতে চেয়েছে কোথায় থাকতে পারে জাহাজটা। ক্রমেই বড় করেছে বৃত্ত। কমপিউটারের স্ক্রিনে এক পর্যায়ে চলে গেছে এক ট্রপিকাল ডিপ্রেশনের কাছে। ওটা আছে আফ্রিকার উপকূল থেকে প্রায় ছয় শ' মাইল দূরে। এরপর বুঝতে দেরি হয়নি ওই ঝড়ের ভিতর থাকবে সুপারট্যাঙ্কার মেডিটারেনিয়ান উলফ। রানাকে এ তথ্য দেয়ার পর ওইদিকে রওনা হয়েছে মার্ভেল।

এদিকে নুমার চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে আলাপ করেছে রানা। ভদ্রলোক দেরি না করে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছেন। কোস্ট গার্ড ও নেভিকে সতর্ক করা হয়েছে। নুমা ও ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস নজর রাখছে হারিকেনের গতি-পথের উপর। একটা গাইডেড মিসাইল ক্রুজার ফিরছিল রেড সি থেকে, ওটাকে বলে দেয়া হয়েছে মাঝ পথে ঠেকাতে হবে সুপারট্যাঙ্কারকে। ভূমধ্য সাগর এলাকায় রয়েছে আরও দুটো নিউক্লিয়ার অ্যাটাক সাবমেরিন, তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যত দ্রুত সম্ভব হারিকেনের দিকে যেতে হবে। তারা জানিয়েছে ঝড়ের এলাকায় পৌঁছুতে বিশ ঘণ্টা লাগবে তাদের।

আমেরিকান কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে তারা সহযোগিতা করতে চেয়েছে। জিব্রাল্টার ও পোর্টসমাথ থেকে রওনা হয়েছে তাদের দুটো ডেস্ট্রয়ার। অবশ্য আমেরিকানদের পুরো এক দিন পর পৌঁছুবে তারা। রানা বুঝতে

পারছে, ব্রিটিশ বা আমেরিকান জাহাজ অকুস্থলে পৌঁছবার আগেই ক্ষতি যা হবার হয়ে যাবে।

পারুক বা না পারুক, এসব জাহাজ ছুটে চলেছে সুপার-ট্যাঙ্কারটাকে ঠেকাতে; কিন্তু মার্ভেলের সবাই জানে, ফুলস্পিড তুলে তাদের অনেক আগেই ওই ঝড়ের ভিতর ঢুকতে পারবে মার্ভেল। এবং তার মানে, ওদের কাঁধেই বর্তাচ্ছে নিকোলাস ক্রিস্টোফারকে ঠেকানোর দায়িত্ব।

প্যাসেজওয়ের গোলকধাঁধার ভিতর দিয়ে চলেছে কার্টা অস্টিন, একহাতে মোস্তাফা আবুলের দেয়া ডিনারের ট্রে। অন্য হাত ঝুলছে স্লিঙে। কিছুদূর যাওয়ার পর একবার পাশের দেয়ালে হেলান দিল কার্টা। ভীষণ দুলছে জাহাজ। রাত এখন এগারোটা। যেন কেউ নেই জাহাজে। নির্দিষ্ট কেবিনের সামনে থামল কার্টা, পা দিয়ে মৃদু আওয়াজ তুলল কবাটে। ওদিক থেকে কোনও সাড়া নেই। আগের চেয়ে একটু জোরে পা ঠুকল ও। ওদিক থেকে শোনা গেল না কারও কণ্ঠ।

পঁচিশ সেকেণ্ড পর কার্পেট ছাওয়া মেঝের উপর ট্রে রাখল কার্টা, সামান্য ফাঁক করল দরজা। ভিতর থেকে আলো এসে পড়েছে দেয়ালে ও কার্পেটে, নানা নকশা তৈরি করছে।

'রানা,' আস্তে করে ডাকল কার্টা। 'তুমি ডিনারে আসোনি, তাই মোস্তাফা আবুলের কাছ থেকে সামান্য ডিনার এনেছি।'

চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে কার্টা, এখনও ভাবছে না অনাহূতের মত ঢুকে পড়েছে অন্যের কেবিনে। রানার ডেস্কের আধাআধি জায়গা জুড়ে ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলো। অন্য অংশে কমপিউটারের মনিটরের নীলচে আলো। চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দেয়া, মনে হলো হঠাৎ করেই কাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা। কিন্তু ফাইল কেবিনেট বা অ্যান্টিক সিন্দুকের সামনে নেই।

অন্ধকার এক পোর্টহোলের নীচে সোফা, সেখানেও নেই রানা।

ডেস্কে ট্রে রাখল কার্টা, চলে গেল প্রায়ান্ধকার বেডরুমের দরজায়, উঁকি দিল। বিছানায় গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে রানা। খালি গা, কিন্তু কোমর থেকে সুতির প্যান্ট। এই প্রথমবারের মত মনোযোগ দিয়ে রানার শরীর দেখল কার্টা। তারপর লজ্জা পেয়ে চট্ করে সরিয়ে নিল দৃষ্টি। তার আগেই দেখেছে ওই সিংহহৃদয় যুবকের দেহে অনেক ক্ষতের দাগ। সোহেলের কাছে কয়েকটা অভিযানের কথা শুনেছে কার্টা। বারবার বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রানা, এবং এসব করেছে শুধু মানুষের মঙ্গলের জন্য।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কার্টা, জানে না কখন যেন চোখ আবারও ফিরে গেছে রানার উপর। রানা যেন দুষ্টু একটা বাচ্চা, খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়েছে। এত সুন্দর কেন ও, ভাবল কার্টা। তড়িঘড়ি করেই সিদ্ধান্ত নিল, কেবিন থেকে বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। ওর অন্তর বলছে, ওকে বাঁধতে পারবি না তুই। আর যদি পারিসও, একদম বদলে যাবে ও, এবং সেই মানুষটাকে হয়তো ভালবাসতে পারবি না। তোর আগে অনেকে ওকে চেয়েছে, কিন্তু ফিরে যেতে হয়েছে তাদেরকেও। কখন যেন জল চলে এসেছে চোখে, ডেস্কের কাছে ফিরে এল কার্টা, ট্রে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে।

প্যাসেজওয়ের কোনা ঘুরে বেরিয়ে এসেছে স্বর্ণা। অপ্রস্তুত হয়ে দরজাটা বন্ধ করল কার্টা। বিব্রত বোধ করছে। 'হাই,' বলল স্বর্ণার দিকে চেয়ে। 'ডিনারে এল না রানা, তাই খাবার নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'সেজন্যে কাঁদছ?' মৃদু হাসল স্বর্ণা।

'না, আসলে...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ভেবো না, আজকের ব্যাপারটা আমাদের ভিতরেই থাকুক। কারও জানার দরকার নেই।

...মাসুদ ভাই আমার জানা সেরা মানুষ, কিন্তু তাঁর যোগ্য কোনও মেয়ে আমি আজও দেখিনি।'

'তুমিও কি ওর প্রেমে...'

'না।' আস্তে করে মাথা নাড়ল স্বর্ণা। 'উনি আমার ক্যাপ্টেন। তার চেয়ে বড় কথা, উনি সত্যিকারের বড় ভাইয়ের মত একজন মানুষ। সবসময় তাঁর উপর ভরসা রাখি। এই জাহাজের সবাই তা-ই করে। ...মোস্তাফা আবুল লোকটা মেয়েদের মত গুজব ছড়ায়। তোমাকে যাই বলুক, কোনও কথা কানে নিয়ো না। মাসুদ ভাই ভালবাসে এক মেয়েকে, কিন্তু তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে কখনও জিতবে না তুমি।'

'দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস?'

আস্তে করে মাথা দোলাল স্বর্ণা।

'জেনে নিলাম, ভাল হলো। তোমাকে ধন্যবাদ।'

প্যাসেজওয়ে ধরে রওনা হয়ে গেল ওরা। পিছনে সামান্য খুলে গেছে ক্যাপ্টেনের কেবিনের দরজা। মেয়েদুটো চলে যেতেই কবাট বন্ধ করল রানা, বুকের ভিতর কেমন একটা চাপা ব্যথা।

গেস্ট সুইটের লিভিং রুমে রানা কথা বলছে ম্যাথিউস জাস্টাসের সঙ্গে। ভদ্রলোকের বেশিরভাগ সঙ্গী সি-সিকনেসে আক্রান্ত হয়েছে, শুয়ে পড়েছে যে যার কটে। ম্যাথিউস জাস্টাস কতটা বুদ্ধিমান ও ধৈর্যশীল তা বুঝতে পেরে খুশি হয়েছে রানা। যিম্বাবুইয়ের সরকার তাঁর উপর ভয়াবহ অত্যাচার করেছে, কিন্তু তাঁর ভিতর প্রতিশোধ নেয়ার কোনও ইচ্ছা নেই। বেশির ভাগ লোক ক্ষমতা পেলেই নিজেকে সব কিছুর উর্ধ্বে মনে করে, উনি তেমন নন। ক্ষমতা ও টাকার পিছনে ছুটবার মানুষ নন জাস্টাস, যেটা দেশের জন্য ভাল সেটাই করতে চান। রানার সঙ্গে তাঁর

কথা হয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়ে। তিনি দেশের কৃষি সেক্টরকে আবারও চাঙ্গা করে তুলতে চান। তাঁর ধারণা, উপজাতিগুলোর ভিতর সঠিক ভাবে ক্ষমতা বণ্টন হলে দেশ ঘুরে দাঁড়াবে। ক্ষমতাবানরা অন্যায় ভাবে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের তোষণ করে বলেই দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্র হচ্ছে আফ্রিকার বেশির ভাগ দেশ। তিনি শপথ করেছেন, তাঁর দেশে এমনটা হতে দেবেন না।

নিজ দেশের সরকারকে যেন কেউ ভয় না পায়, সেটা নিশ্চিত করবেন তিনি।

রানার ধারণা হয়েছে: সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেনি ও। হীরা বিক্রির টাকা হাতে পেয়ে মাথা গরম হয়ে উঠবে না এঁর। নতুন করে আবারও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবেন জাস্টাস। আগামী কয়েক বছরের ভিতর গতি পাবে সাব-সাহারান আফ্রিকার যিম্বাবুইয়ে, আবারও হয়ে উঠবে মহাদেশের সেরা দেশ। কিন্তু তা করতে হলে এক শ' বছরের বেশি আগে হারিয়ে যাওয়া এক জাহাজ চাই। রানা আঁচ করছে, ওটা আছে সাগরে এক হাজার বর্গ মাইলের ভিতর।

হঠাৎ কাত হয়ে গেল মার্ভেল। রানা টের পেল কমপক্ষে পনেরো ডিগ্রি বাঁক নিয়েছে জাহাজ। উঠে দাঁড়াল ও, আর ঠিক তখনই প্যান্টের পকেটে বেজে উঠল মোবাইল ফোন।

'ওই জাহাজ পেয়ে গেছে ওরা,' বলল রানা। অনেকক্ষণ হলো এই সংবাদের জন্য অপেক্ষা করছে। জাস্টাসের দিকে চেয়ে মৃদু মাথা দোলাল ও, নীরবে দুঃখ প্রকাশ করে বেরিয়ে এল গেস্ট সুইট থেকে।

'মেগা-স্টার নামের এক স্যাটালাইট ওটাকে খুঁজে পেয়েছে,' রানা কিছু বলবার আগেই ওদিকের প্রান্ত থেকে বলল সোহেল। 'নতুন একটা মিলিটারি স্যাটালাইট। রায়হান হ্যাক করেছে ওটার

তথ্য: পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভিতর বিশাল এক লোহার জাহাজ।'

টেকনোলজিটার নাম শুনেছে রানা। 'ওটা থেকে কতটা দূরে আমরা?'

'আরও দেড় শ' মাইল। তোর পরের প্রশ্ন আসার আগেই জবাবটা জানিয়ে দিই, আমরা ওটার সবচেয়ে কাছের জাহাজ।'

গতি ও দূরত্বের হিসাব কষে বলল রানা, 'সূর্যাস্তের সময় ওটার দেখা পাব। কিন্তু আবহাওয়া যেমন, রোদ দেখব না।'

সেই ভোর থেকে ঘন কালো মেঘের নীচ দিয়ে ছুটে চলেছে মার্ভেল। উন্মাতাল হয়ে উঠেছে সাগর, একেকটা ঢেউ পনেরো ফুট উঁচু, আছড়ে পড়ছে জাহাজের খোলের উপর। সবই নীরবে হজম করছে মার্ভেল, এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে এই জাহাজ যে, এর চেয়ে ঢের খারাপ আবহাওয়াও হজম করবে অনায়াসে। এ পরিবেশেও অনেক বেশি দ্রুতগতি তুলতে পারে। কিন্তু ফারা বলে দিয়েছে, আরও জোরে গেলে তা হবে আহতদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। একটানা তিরিশ মাইল বেগে বইছে হাওয়া, এবং দমকা হাওয়া মাঝেমধ্যেই ছুঁয়ে দিচ্ছে বিউফোর্ট স্কেলের আট নম্বর মাত্রাকে। ফোরকাস্ট করা হয়েছে: আরও দুই ঘণ্টা পর শুরু হবে তুমুল বৃষ্টি।

'এই ঝড়ের ভিতর মেডিটারেনিয়ান উলফে ওঠা কঠিন হবে,' বলল সোহেল। 'তার উপর চারপাশ থাকবে অন্ধকার।'

ফোন রেখে দিল রানা, পৌঁছে গেছে অপারেশন্স সেন্টারে। দরজা খুলে চলে গেল নিজ সিটে। সাধারণ ওয়াচারদেরকে দেখতে পেল না। মার্ভেলের সেরা টিম কাজ করছে এখন। ঝাঁকির পর ঝাঁকি খাচ্ছে জাহাজ। প্রায় সবাই একহাত রেখেছে কাউন্টার বা বালকহেডে। হেলম-এ রয়েছে গগল। রায়হান ও নবী একই ডিজাইনের গেঞ্জি পরেছে। কমিউনিকেশন ও ওয়েপন্স

কন্সোলে বসে আছে ওরা। স্বর্ণা দেখছে সোনার। ঘরের পিছন দিকে বসেছে নিশাত ও জলিল। কমপিউটার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ইঞ্জিন দেখছে নেভির ইঞ্জিনিয়ার আফতাব। রানার পাশেই বসেছে সোহেল।

মেইন মনিটরে আটলান্টিক মহাসাগরের স্যাটালাইট ছবি ঝুলছে। পাক খেয়ে উঠছে মেঘ, দেখেই বোঝা যাচ্ছে তৈরি হচ্ছে ভয়ঙ্কর হারিকেন। একটু পর পর পাল্টে যাচ্ছে ইমেজ। এর ফলে জানা যাচ্ছে গত কয়েক ঘণ্টায় কতটা তীব্র হয়ে উঠেছে ঝড়। তৈরি হতে শুরু করেছে ঝড়ের চোখ।

'আমরা কোথায়, এবং কতটা দূরে মেডিটারেনিয়ান উলফ?' জানতে চাইল রানা।

কমপিউটার ট্যাপ করল গগল, মনিটরে জ্বলজ্বল করে উঠল দুটো আইকন। ডানদিকে দেখানো হয়েছে মেডিটারেনিয়ান উলফকে, এবং ওখানেই জন্ম নিচ্ছে ঝড়ের চোখ। দক্ষিণ-পুব থেকে সেদিকে ছুটে চলেছে মার্ভেল।

এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে স্ক্রিনে চেয়ে রইল রানা। একটু পর পর আমেরিকার ন্যাশনাল রেকনিসান্স অফিস থেকে ডেটা হ্যাক করছে রায়হান, সব ফুটে উঠছে স্ক্রিনে। বেশ কিছু ইউএস স্পাই স্যাটালাইট তথ্য পাঠিয়ে চলেছে রায়হানকে। ক্রমেই সাধারণ ঝড় হয়ে উঠছে প্রবল হারিকেন, তার ভিতর ঢুকেছে নিকোলাস ক্রিস্টোফারের সুপারট্যাঙ্কার, ঝঞ্ঝার চোখের একটু সামনে ছুটছে।

'মাসুদ ভাই, সিআইএ থেকে সামান্য তথ্য,' কমপিউটারের দিকে চেয়ে বলল রায়হান। 'টার্গেটের বিষয়ে অ্যাডিশনাল ডেটা দিয়েছে ন্যাশনাল রেকনিস্যান্স অফিস। আগের লগ পরীক্ষা করে নতুন কোর্স কী হতে পারে তা বুঝতে পেরেছে তারা। এটা জানা গেছে দুই ঘণ্টা আগে কোথায় ছিল ওই জাহাজ। মিস্টার গগলের

কাছে পাঠিয়ে দিলাম ডেটা।'

ঘরের আরেক দিক থেকে ই-মেইল পেতেই কমপিউটারে কোঅর্ডিনেটস টাইপ করল গগল, কি-বোর্ডে এন্টার টিপে বলল, 'দেখা যাক কী পাওয়া যায়।'

স্ক্রিনে ফুটে উঠল দুই ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের মেডিটারেনিয়ান উলফ। দেখা গেল জাহাজের গতিপথ থেকে পিছনে তৈরি হচ্ছে ঝড়ের চোখের মণি।

'লোকটা এ কাজ কীভাবে করছে?' বিড়বিড় করে বলল রানা।

'আমি যা বলেছি!' জোরে বলে উঠল রায়হান।

'হ্যাঁ, তুই তো জিনিয়াস, তাই না?' ঠাট্টা করে বলল নবী। ঘুরে চাইল সে রানার দিকে। 'ওর কেবিনে বসে এই নিয়ে ভাবছিলাম আমরা, তখন আসিফ হায়দার চৌধুরি-নিকোলাস ক্রিস্টোফার ল্যাবোরেটরিজের মেইনফ্রেম সামান্য হ্যাক করি। তার কমপিউটারে কোনও তথ্য রাখেনি ক্যারেন কুম্বস। যা করার গোপনে করেছে। হয়তো হাতে লিখেছে সব। যাই হোক, আমরা খুঁজে পেলাম তার প্রজেক্টের প্রথম মূল প্রস্তাব, বেশি কিছু লেখা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে সে একটা অর্গানিক ফ্লোকিউলেন্ট তৈরি করতে চায়।'

'ওটা কী কাজে লাগবে সেটা বল্,' তাগাদা দিল রায়হান।

'এমন একটা কম্পাউণ্ড, যেটা পানির ভিতর মাটি বা অন্য শক্ত কিছুকে গুচ্ছবদ্ধ করবে,' বলল নবী। 'ওটা সিউয়েজ ট্রিটমেণ্ট প্লান্টে ব্যবহার করা হতে পারে। যেমন ধরুন, টয়লেটের দোজখি মাল... ইয়ে...' ঘরে মেয়েরা চেয়ে আছে দেখে চুপ হয়ে গেল সে।

'মেয়েটা চেয়েছে সাগরের অর্গানিক মেটারিয়ালকে আটকে ফেলবে পানির ভিতর, সব মিলে তৈরি হবে শক্ত একটা জেল,

বলল রায়হান।

'তাতে কী হবে?' জানতে চাইল সোহেল।

'সেটা লেখেনি,' বলল নবী। 'অবাক ব্যাপার, কেউ তার প্রজেক্ট রিভিউ করেনি। কেউ জানতে চায়নি ওরকম একটা জেল তৈরি করে লাভ কী!'

'কিন্তু মাসুদ ভাই বাঙালি বিজ্ঞানীর কাছে শুনেছেন ভীষণ উত্তাপ তৈরি করে ওই জেল,' বলল রায়হান। 'এ থেকে ধারণা করতে পারি, জিনিসটা শেষ পর্যন্ত টিকবে না। ওই উত্তাপ মেরে ফেলবে অর্গানিক প্লান্টগুলোকে, তার ফলে থকথকে আঠা আবারও হয়ে উঠবে সাধারণ সাগরের পানি।'

'বলতে থাকো,' বলল রানা। 'অবশ্য জানি না এর ফলে কী ঘটতে পারে।'

'এখন যদি এক সারিতে ফ্লোকিউলেন্ট ছড়িয়ে যেতে পারে নিকোলাস ক্রিস্টোফার, এরপরও এক সময়ে ওই আঠা হয়ে উঠবে স্বাভাবিক পানি,' জোর দিয়ে বলল রায়হান। 'চলার পথে হারিকেন প্রচণ্ড তাপ পাবে ওই উত্তপ্ত আঠা থেকে, কিন্তু ঝড়ের বেগ খুব বেশি বাড়বে না, বা গতি-পথ পাল্টে যাবে না।'

মাথা নাড়ল নবী। 'আমার তা মনে হয় না। যদি ঝড়ের চোখ ঘিরে ফ্লোকিউলেন্ট ছড়িয়ে দেয়া যায়, পাক খেতে শুরু করবে হারিকেন। লোকটা আসলে ইচ্ছে মত ঠিক জায়গায় ঝড়ের চোখ তৈরি করবে। ওটা কত বড় হবে সেটাও ঠিক করবে সে। আর যত ছোট হবে চোখ, ওটাকে ঘিরে তত বেশি তীব্র গতি পাবে পাগলা হাওয়া।'

'কিছু দিন আগে মায়ামিতে একটা হারিকেন আঘাত হানে, ওটার চোখের পরিধি ছিল এগারো মাইল,' বলল গগল। 'শুধু প্রকৃতি বলতে পারে চোখ কতটা ছোট, বা বড় হবে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল নবী। 'কিন্তু হারিকেনকে যদি

সাহায্য করে নিকোলাস ক্রিস্টোফার, সে অনায়াসে স্যাফির-সিম্পসন স্কেলের পাঁচ মাত্রার হারিকেন বা সাইক্লোন তৈরি করতে পারবে। লোকটা বোধহয় জানে কীভাবে গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উপকূলের যেখানে খুশি আঘাত হানবে সে।'

আবারও মনিটরে চোখ রাখল রানা। ওর মনে হলো নবীর কথাই ঠিক, সত্যিই ঝড়ের চোখের আগে আগে ছুটছে সুপারট্যাঙ্কার। ক্যারেন কুম্বসের তৈরি জেল দিয়ে তৈরি করতে চাইছে ঘূর্ণি। ওর যদি ভুল না হয়ে থাকে, ওই জাহাজের পাম্প পানিতে ফেলছে ফ্লোকিউলেন্ট, ছোট করে আনছে ঝড়ের চোখকে। এর ফলে হারিকেন হয়ে উঠবে ভয়ঙ্কর প্রলয়ঙ্করী।

'লোকটা যদি বৃত্ত তৈরি করতে পারে, আমরা কিছুই করতে পারব না,' মন্তব্য করল নবী। 'মাসুদ ভাই আগেই বলেছেন, চোখ তৈরি হয়ে গেলে এমন কোনও শক্তি নেই যা ওটাকে ঠেকাতে পারে।'

'তোমাদের কী মনে হয়, ঝড়টা কোথায় নিয়ে যেতে চায় ও?' জানতে চাইল সোহেল।

'আমি হলে নিউ অর্লিন্সে আঘাত হানতাম,' বলল রায়হান। 'কিন্তু আমরা জানি না লোকটা সত্যিই অতটা নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে কি না। সহজ হয় যদি ফ্লোরিডার উপকূলে আছড়ে ফেলে। ওদিকের গরম পানি দুর্বল করবে না হারিকেনকে। ওদিকে আছে মায়ামি বা জ্যাকসনভিল, হাজার হাজার লোকের সর্বনাশ হবে।'

সায় দিল নবী, 'অ্যাণ্ড্রুর কারণে নয় বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছিল। আর ওই ঝড়টা ছিল মাত্র চার নম্বর ক্যাটাগরির। সত্যিই যদি ছয় নম্বর ক্যাটাগরির হারিকেন আঘাত হানে, যে-কোনও শহরের সমস্ত দালান-কোঠা তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে।'

'গগল,' গম্ভীর মুখে ডাকল রানা, 'আমাদের গতি কত?'

'পঁয়ত্রিশ নট থেকে সামান্য কম।'

'চল্লিশে তোলো।'

'ফারা খেপে যাবে,' নিচু স্বরে বলল সোহেল। 'আমার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাবে।'

'আমি বিজ্ঞানীর চেতনা ফিরিয়ে আনতে বলেছি, কাজেই এমনিতেই খেপে আছে,' শুকনো গলায় বলল রানা। 'গতি বাড়াও, গগল।'

'ওই ঝড় আমরা দু'জন মিলে মোকাবিলা করব, আগে শেষ হোক এই ঝড়,' বিড়বিড় করে বলল সোহেল।

জাহাজের গতি বাড়তে শুরু করেছে। সাগরের বুক থেকে আরও ইলেকট্রিসিটি তুলছে ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিন, সমস্ত শক্তি যাচ্ছে পাম্প জেট-এ। একের পর এক ঢেউয়ের ভিতর আগের চেয়ে অনেক বেশি ঝাঁকি খেতে শুরু করেছে মার্ভেল্। বাইরে ফিট করা একটা ক্যামেরার মাধ্যমে দেখা গেল: বো পেরিয়ে উঠে আসছে মস্ত সব ঢেউ। সাগরের গভীর থেকে জাহাজ উঠে আসবার সময় ডেকের উপর দিয়ে হুড়হুড় করে বইছে তিন ফুটি প্লাবন।

কমিউনিকেশন কন্সোলের বাটন টিপল রানা, ডায়াল করেছে হ্যাঙারে। জবাব দিল এক টেকনিশিয়ান, রিসিভার দিল ক্যাপ্টেন আলম সিরাজকে। 'আপনি যোগাযোগ করার আগেই মন কু ডাকছে আমার,' বললেন দুঃসাহসী মানুষটা।

'কাজটা পারবেন, সিরাজ?'

'ব্যাপারটা প্রায় দুঃস্বপ্নের মত হবে,' জবাবে বললেন এয়ারফোর্সের ক্যাপ্টেন। 'বৃষ্টি হঠাৎ শুরু না হলে পারব বলেই মনে করি। অবশ্য একটা ব্যাপার, কপ্টারের ল্যাণ্ডিং স্ট্রাট ভেঙে যেতে পারে।'

'ভাঙলে আমরা কেউ কিচ্ছু বলব না। দশ মিনিটের নোটিসে যেন উড়াল দেওয়া যায়, সে-প্রস্তুতি রাখুন। যে-কোনও সময়ে যোগাযোগ করব আমি।'

'ঠিক আছে, মেজর।'

কানেশন কেটে দিল রানা, ওয়েপন্স কন্সোলের দিকে চোখ ফেরাল। 'নবী, আমাদের মাছের অবস্থা কী?'

মার্ভেলের দু'পাশের প্রাউ-এর নীচে রয়েছে দুটো টিউব। তার ভিতর দিয়ে সাগরে নামতে পারে আমেরিকান এমকে-৪৮ অ্যাডক্যাপ টর্পেডো। কেনা হয়েছে এক ভয়ঙ্কর ঘুষখোর অ্যাডমিরালের কাছ থেকে। অস্ত্রগুলো দারুণ কাজের, রেঞ্জ অন্য সব টর্পেডো থেকে বেশি। গতি তুলতে পারে চল্লিশ নটের অনেক বেশি। মাথার ভিতর নিয়ে রওনা হতে পারে হাই এক্সপ্লোসিভ বা নিউক্লিয়ার বোমা— পৃথিবীর বেশির ভাগ জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারে কয়েক মিনিটের মধ্যে।

'মাসুদ ভাই, আপনি কি সুপারট্যাঙ্কার ডুবিয়ে দিতে চান?' জানতে চাইল নবী। 'তা করলে নির্দিষ্ট একটা বিন্দুতে পড়বে সমস্ত গদ্দের আঠা। এত তাপ ছড়িয়ে গেলে ওই জাহাজ যে কাজ করছিল, ঠিক একই কাণ্ড হতে পারে। ঝড়ের চোখের বৃত্ত তৈরি হয়ে যেতে পারে।'

'জানি, আমি শুধু বিবেচনার জন্যে আমাদের সব অপশন খোলা রাখছি,' বলল রানা।

টর্পেডোর ডায়েগনস্টিক দেখতে শুরু করেছে নবী। 'তিন দিন আগে রুটিন ইন্সপেকশনের জন্য টিউব থেকে বের করা হয়েছিল। এক নম্বর টিউবের মাছের ব্যাটারি বদলে দেয়া হয়েছে। দুটোই পুরো চার্জ করা।'

'কী করতে চাস্, রানা?' জানতে চাইল সোহেল।

'সহজ বুদ্ধি বলে কোনও দল নিয়ে কপ্টারে করে ওখানে

নামা উচিত, সুপারট্যাঙ্কার দখল করে নেয়া দরকার। সব পাম্প বন্ধ করে দিলেই ফ্লোকিউলেন্ট সাগরে পড়বে না।'

'মাসুদ ভাই,' খুশি হয়ে ডাকল রায়হান। 'আমরা যদি ওই জাহাজ নিয়ে ঝড়ের চোখ ছেড়ে দূরে যাই, তারপর সাগরে ফেলতে শুরু করি জেল, তা হলে নতুন করে এভাপোরেশন শুরু হবে। আবার তৈরি হবে আরেকটা শক্তিশালী লো প্রেশার যোন। আগের ঝড়ের বারোটা বাজিয়ে দেবে ওটা। শেষে পরিবেশ হয়ে উঠবে স্বাভাবিক, আমরা পাব ফকফকা সোনালী দিন।' চওড়া একটা হাসি দিল রায়হান, পরক্ষণে আঁৎকে উঠল।

'কী হলো, রায়হান?' একইসঙ্গে জানতে চাইল রানা ও সোহেল।

'হায় আল্লাহ্!' প্যানেলে একটা সুইচ টিপল সে, গমগম করে উঠল ঘরের ভিতর কর্কশ একটা কণ্ঠ।

'আমি আবারও বলছি, এটা মেডিটারেনিয়ান উলফ, আমি এই সুপারট্যাঙ্কারের ক্যাপ্টেন ক্লয়েটাস ট্রিনডার— ঝড়ের কারণে আমাদের জাহাজের খোলে বড় ফাটল ধরেছে। আমাদের ব্যালাস্ট পূর্ণ, কিন্তু তেল দিয়ে ভরা নয়, কাজেই অয়েল স্পিল হবে না। জাহাজ ভেঙে পড়ার আগেই আমাদেরকে সরে যেতে হবে।' ক্যাপ্টেন তার কোঅর্ডিনেটস দিল। 'এটা জরুরি বিজ্ঞপ্তি। দয়া করে শুনুন, আপনারা কি আমার সিগনাল শুনছেন? ...মেডে, মেডে, মেডে!'

'তোর কী মনে হয়, কী করা উচিত?' বন্ধুর দিকে চাইল সোহেল।

পাথরের মূর্তির মত বসে আছে রানা। তারপর আস্তে করে মাথা দোলাল। 'ঘামতে থাকুক। কেউ শুনুক বা না শুনুক, লোকটা বারবার জানান দেবে। গগল, আমাদের এস্টিমেটেড টাইম অভ অ্যারাইভাল কত?'

'ইটিএ... এই ধরো... কম-বেশি তিন ঘণ্টা, রানা।'

'খেপা সাগরের ভেতর ততক্ষণ টিকবে না ওই জাহাজ, আবার ফাটলও ধরেছে,' বলল সোহেল।

'বিশেষ করে যদি কিল ফাটতে শুরু করে,' তথ্য দিল গগল। 'কে জানে, হয়তো তিন মিনিটের মধ্যেই ডুবে যাবে।'

তর্কে গেল না রানা, বুঝতে পারছে দ্রুত কিছু করতে হবে। কিন্তু ওদের সামনে খুব বেশি অপশন নেই। জাহাজটা ভেঙে তলিয়ে গেলে ডেকে আনতে পারে আরও বড় বিপদ। সেক্ষেত্রে ঝড় ঠেকাতে পারবে না ওরা। সবচেয়ে ভাল হয়, কম পরিমাণের জেল নিয়ে সাগরের গভীরে ডুবে যাক জাহাজ। এ কাজটা করতে পারে টর্পেডো, কিন্তু তাতে তলিয়ে যেতে কয়েক ঘণ্টা লাগিয়ে দেবে সুপারট্যাঙ্কার। তার মানেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সাগরে মিশতে থাকবে ফ্লোকিউলেন্ট।

অন্য একটা চিন্তা এল রানার মনে। যখন মিসাইলের আঘাতে উড়ে গেল মার্ভেলের লাইফবোট, ছুটবার ভিতর ওটার বো ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছিল। এখন অদ্ভুত এক চিন্তা খেলছে ওর মনে, গুছিয়ে নিতে চাইছে পরিকল্পনা।

'আপা, জলিল, আপনারা স্টোরে চলে যান, আমার জন্য দু' শ' ফুট হাইপারথার্ম এনে দিন। ওই যে, যেটার কেসিঙের সঙ্গে ইলেকট্রোম্যাগনেট আছে।' ওটা আসলে ম্যাগনিয়িয়াম বেইযড একটা কম্পাউণ্ডের মত প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, জ্বলে উঠলে উত্তাপ ছাড়ে কমপক্ষে দুই হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই জিনিস পানির নীচে স্যালভেজ অপারেশনের সময় স্টিল কাটবার জন্য কাজে লাগে। 'আপা, জলিল, মন দিয়ে শুনুন। আপনারা হ্যাঙারে চলে আসবেন। ...স্বর্ণা, উঠে পড়ো, কাজ আছে। মেডিটারেনিয়ান উলফে কী ধরনের পরিস্থিতির ভিতর পড়ব জানি না, কাজেই সঙ্গে অস্ত্র নেবে।'

'আমি যাব না, স্যর?' দরজার কাছ থেকে আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল নিশাত।

'না, আপাতত নয়। ঝড়ের ভিতর কপ্টারে আমাদের ওজন একটা বড় সমস্যা হয়ে উঠতে পারে।'

রানার কাঁধে হাত রাখল সোহেল। 'তুই কোনও ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা করেছিস, সেটা কী?' সংক্ষেপে জানাল রানা। এবার আস্তে করে মাথা দোলাল সোহেল। 'এমন কিছু করবি ভাবতে পারিনি! কাজটা জুয়াচুরি করার মতই।'

'আর কোনও উপায় আছে?'

'না, নেই। আমি হলেও তাই করতাম, যদি মাথায় আসত!'

চোদ্দ

গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করছেন ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ, একটু হাঁ হয়ে আছে মুখ, ডান হাতের আঙুলগুলো শক্ত করে ধরেছে এমডি-৫২০এন কপ্টারের কন্ট্রোল। তুমুল হাওয়ার ভিতর ডেকে উঠে এসেছে হেলিপ্যাড, যে-কোনও সঠিক মুহূর্তে উড়াল দেবে কপ্টার।

সাগরের বিশাল এক দুলুনির ভিতর গভীর অংশে রয়েছে মার্ভেল, হঠাৎ সামনে দেখা গেল বো পেরিয়ে উঠে আসছে প্রকাণ্ড ঢেউয়ের প্রাচীর, ওটার মাথার উপর সাদাটে ফেনা। এখন এক পলকে জলোচ্ছ্বাস ভাসিয়ে নিতে পারে কপ্টার এবং ওটার তিন আরোহীকে।

'গগল, আমাকে অবস্থা জানান,' বললেন সিরাজ, পরের

ঢেউয়ের উপর চড়তে শুরু করেছে জাহাজটা।

'এক মিনিট, ঢেউ ছাড়িয়ে উঠে গেছে ক্যামেরা। ওকে, ওদিকে বড় গভীর খোঁড়ল। উঠে যেতে সময় পাবেন।'

জাহাজটা আবারও উঠে গেছে নতুন এক ঢেউয়ের মাথায়, কয়েক সেকেণ্ড পর পতন শুরু হবে। কপ্টারের ইঞ্জিনকে আরও সামান্য শক্তি দিলেন সিরাজ। তাঁর জানা আছে মার্ভেল নীচের দিকে রওনা হতেই ভেসে উঠতে হবে, সেক্ষেত্রে সামনের ঢেউ এসে আছড়ে পড়বে না কপ্টারের উপর। এক সেকেণ্ড পর নাক নিচু করল মার্ভেল, এবং ঠিক তখনই আকাশে উঠলেন সিরাজ। কপ্টারের এয়ারস্পিড বাড়ানোর জন্য নাক নিচু করে নিয়েছেন। কয়েক মুহূর্ত পর ক্ষিপ্ত সাগরের উপর থেকে তুমুল হাওয়ার দেশে উড়াল দিল কপ্টার। দামাল হাওয়ার সঙ্গে সন্ধি করে গতি তুলছেন সিরাজ, উচ্চতা পাওয়ার পর বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়লেন পাগলা ঝড়ের ভিতর। পিছন থেকে তেড়ে এল পঞ্চাশ নট গতির ঝঞ্ঝা। সাগরের উপর দিয়ে মাত্র ষাট মাইল গতি তুলে চলেছে কপ্টার। প্রায় একই গতি নিয়ে ছুটছে মার্ভেল। কিন্তু মেডিটারেনিয়ান উলফে আগেই পৌঁছুতে চাইছে রানা।

ওর যদি কোনও ভুল না হয়, স্বর্ণা এবং ওর কাজ শেষ হতে না হতেই টর্পেডো ছুঁড়বার রেঞ্জে পৌঁছে যাবে মার্ভেল। তার আগেই হাইপারথার্ম চার্জ বসাতে হবে ওদেরকে।

'যে হিসাব কষলাম, তাতে ওখানে পৌঁছুতে লাগবে আশি মিনিট,' এক মিনিট পর বললেন সিরাজ। দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে কপ্টার।

'রানা?' রেডিয়োতে যোগাযোগ করল সোহেল।

'বল্।'

'আরেকবার এসওএস পাঠিয়েছে সুপারট্যাঙ্কারের ক্যাপ্টেন ক্লয়েটাস ট্রিনডার।'

'তার সঙ্গে আলাপ কর্, আগেই তো সব ঠিক করেছিস।'

চ্যানেল খোলাই রাখল সোহেল, যাতে সব শুনতে পায় রানা। 'মেডিটারেনিয়ান উলফ্, এটা দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস, আমি ক্যাপ্টেন সোহেল আহমেদ বলছি। আপনার ডিসট্রেস কল পেলাম। আপনাদের লোকেশন লক্ষ্য করে আসছি। কিন্তু এতে কমপক্ষে দুই ঘণ্টা সময় লাগবে।'

'দয়ালু ঈশ্বর, আপনাকে ধন্যবাদ!'

'আপনি ভুল ভাবছেন, আমি ঈশ্বর নই, সামান্য এক ক্যাপ্টেন ...খুলে বলুন আপনার পরিস্থিতি।'

'পোর্টে অ্যামিডশিপে খোলের ভিতর ফাটল ধরেছে, জাহাজে পানি ঢুকছে। পুরোপুরি কাজ করছে পাম্প, আপাতত ডুবছি না আমরা। কিন্তু ফাটল আরও বেড়ে গেলে জাহাজ ত্যাগ করতে হতে পারে।'

'ফাটল আগের চেয়ে বড় হয়েছে?'

'না। বাতাসের ঝাপটার সঙ্গে এল বড় এক ঢেউ, ওটাই চিড় ধরিয়ে দিল প্লেটিঙে। তারপর থেকে বড় হচ্ছে না ফাটল।'

'আপনারা যদি পুব দিকে আসতে শুরু করেন, অনেক আগেই আমাদের দেখা হতে পারে।' মিথ্যা বলেছে সোহেল, কিন্তু জাহাজ ওদিকে গেলে হারিকেনের চোখ থেকে বেরিয়ে আসবে, নতুন করে ফ্লোকিউলেন্ট ছড়িয়ে পড়বে না ঝড়ের ভিতর। ফাঁদ পেতেছে সোহেল, দেখতে চাইছে আসলে ক্যাপ্টেন ক্লয়েটাস ট্রিনডার না নিকোলাস ক্রিস্টোফারের হাতে জাহাজের নিয়ন্ত্রণ।

পুরো এক মিনিট স্ট্যাটিকের আওয়াজ চলল। তারপর যোগাযোগ করল ক্লয়েটাস ট্রিনডার, কণ্ঠে আতঙ্কের ছাপ: 'আ.., কাজটা সম্ভব নয়, মার্ভেল। এইমাত্র আমার ইঞ্জিনিয়ার জানাল আমাদের স্টিয়ারিং গিয়ার নষ্ট হয়েছে।'

'ওর কপালে পিস্তলের মাযল ধরেছে,' সোহেলকে বলল

রানা।

এক পলক ভাবল সোহেল, তারপর কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে বলল, 'জানলাম আপনাদের স্টিয়ারিং গিয়ারে সমস্যা। কিন্তু সেক্ষেত্রে এই ঝড়ের ভিতর আপনাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে পারে। সে ঝুঁকি নিতে পারি না। আমরা যখন দশ মাইল দূরে থাকব, আপনি আপনার লোক নিয়ে লাইফবোটে নামবেন।'

'কীহ্! আপনি চাইছেন, পরে আমার জাহাজ স্যালভেজের জন্য নিয়ে যাবেন?'

হেসে ফেলল রানা। 'ব্যাটা মরতে বসেছে, কিন্তু এখনও ভাবছে ওর জাহাজ চুরি করব আমরা।'

'ক্যাপ্টেন, মার্ভেল এক হাজার টন কমার্শিয়াল ফিশিং বোট,' মসৃণ মিথ্যা বলল সোহেল। 'সুপারট্যাঙ্কারকে শান্ত সাগরে টেনে নিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, আর এমন ভয়ঙ্কর ঝড়ের ভিতর ওসব চিন্তাই করা যায় না। আমি চাই না আপনার জাহাজ ডুবিয়ে দিক মার্ভেলকে।'

'আঁ... হ্যাঁ... বুঝতে পেরেছি,' কয়েক সেকেণ্ড পর বলল ট্রিনডার।

'জাহাজে কতজন আছে?'

'তিনজন অফিসার, বারোজন ক্রু, আর এক ভদ্রলোক। সব মিলিয়ে ষোলোজন।'

শেষের ওই লোকটা নিকোলাস ক্রিস্টোফার, বুঝল রানা। সুপারট্যাঙ্কারে এত কম ক্রু থাকে না। অবশ্য আজকাল বেশির ভাগ নতুন জাহাজে স্কেলিটন ক্রু রাখা হয়। তবে এটা তো আর আজকালকার জাহাজ না— মোগল আমলের। নিজের সুবিধার জন্য কম লোক রেখেছে বদমাশটা।

'বুঝলাম,' জবাব দিল সোহেল। 'ষোলোজন। আমরা রেঞ্জে পৌঁছে গেলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। মার্ভেল আউট।'

'অ্যাফারমেটিভ, ক্যাপ্টেন আহমেদ। আমাদের পরিস্থিতি বদলে গেলে রেডিয়ো করব। মেডিটারেনিয়ান উলফ আউট।'

'রানা, তোর কি মনে হয়, ওদের সঙ্গে জাহাজ ছাড়বে নিকোলাস?'

'বলা কঠিন। একটা সমস্যার ভিতর পড়েছে। হয়তো মিশন শেষ করতে পারবে না। বিশেষ করে ক্রুরা চলে গেলে। লাইফবোট নামাতে হলে জাহাজের গতি কমাতে হবে। ট্রিনডার যদি নিকোলাসকে দেখিয়ে দেয় কীভাবে আবারও গতি তোলা যায়, সেক্ষেত্রে হয়তো ঝড়ের চোখ তৈরি করতে পারবে সে। হয়তো ছয় মাইলের চেয়েও ছোট বৃত্ত তৈরি করবে।'

'তুই তা-ই করতি?'

'তার বদলে আমি হলে, হ্যাঁ, তাই করতাম। শেষ না দেখে ছাড়তাম না।'

'তা হলে দুটো ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। প্রথম কথা, জলাতঙ্কে ধরা ইঁদুরের মতই পাগল ওই লোক। দ্বিতীয় কথা, কাটিং চার্জ বসানোর সময় স্বর্ণা আর তোকে খুব সাবধান থাকতে হবে।'

'আমরা সতর্ক থাকব।'

এক ঘণ্টা পর আবারও মার্ভেলে যোগাযোগ করলেন আলম সিরাজ, জানিয়ে দিলেন তাঁরা গন্তব্যের কাছে পৌঁছে গেছেন। এবার মেডিটারেনিয়ান উলফে যোগযোগ করে ক্রুদেরকে নামিয়ে দেবার জন্য বলতে পারে মার্ভেল।

'ক্যাপ্টেন ট্রিনডার, এটা মার্ভেল,' রেডিয়ো করল সোহেল।

'ট্রিনডার বলছি, মার্ভেল।'

'আমরা পজিশন থেকে দশ মাইল দূরে। আপনারা জাহাজ ত্যাগ করতে তৈরি?'

'আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না, ক্যাপ্টেন,' জবাবে

বলল ক্যাপ্টেন ট্রিনডার। 'কিন্তু আমার রেইডার বলছে আপনারা আছেন আমাদের থেকে তিরিশ মাইল দূরে।'

'বিশ ফুটি ঢেউয়ের সাগরে রেইডারকে বিশ্বাস করছেন?' ভুরু কুঁচকে ফেলল সোহেল। 'আমার রেইডার তো আপনার জাহাজই ধরছে না। আমি নির্ভর করছি জিপিএস-এর উপর। আমার ধারণা আপনারা আছেন আমাদের থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে।' সুপারট্যাঙ্কারের পুবের দশ মাইল দূরের লংগিচ্যুড ও ল্যাটিচ্যুডের হিসাব জানিয়ে দিল ও। 'এটা আমাদের বর্তমানের লোকেশন।'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। আপনার কথাই ঠিক, আপনারা আমাদের দশ মাইল দূরে।'

'আপনাদের রাডার মেরামত হয়েছে? সেক্ষেত্রে আমরা কাছে আসতে পারি।'

'না, ঠিক করতে পারিনি। এবার ক্রুদের নিয়ে লাইফবোটে নামব। অবশ্য জাহাজে থাকছেন এক ভদ্রলোক, বলছেন হাল মেরামত করবার চেষ্টা করবেন।'

বিচলিত নাবিকের ভঙ্গিতে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল সোহেল, 'বাকি সবাইকে নিয়ে জাহাজ ত্যাগ করছেন?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ট্রিনডার। 'আর এই ভদ্রলোক জাহাজের মালিক, তা ছাড়া কী ধরনের ঝুঁকি নিচ্ছেন সেটা তাঁর ভালই জানা আছে।'

'বুঝলাম,' অস্বস্তির ভিতর পড়েছে এমন ভঙ্গি নিল সোহেল। 'আপনাদের বোট সাগরে নামার পর ট্যাঙ্কার থেকে সরে টোয়েন্টি সিক্স ডিগ্রি ধরে চলবেন। ইমার্জেন্সি ফ্রিকোয়েন্সিতে ট্রান্সমিট করবেন।'

'টোয়েন্টি সিক্স ডিগ্রি অনুযায়ী আসব, ১২১.৫ মেগাহার্টয-এ ডিসট্রেস সিগনাল দেব। কয়েক মিনিট পর বোট লঞ্চ হবে।'

'গুড লাক, ক্যাপ্টেন, গড বি উইথ ইউ।' গম্ভীর শোনাল

সোহেলের কণ্ঠ। এই অস্থির সাগরে বোট নিয়ে নেমে পড়া সত্যিই ভীষণ বিপজ্জনক।

পনেরো মিনিট পর অপারেশন্স সেন্টারের স্পিকারের মাধ্যমে ১২১.৫ মেগাহার্টয-এ মেরিন ডিসট্রেস ব্যাণ্ড বাজতে লাগল। তীক্ষ্ণ আওয়াজে কান ধরে গেল ঘরের সবার। ওটা ডিরেকশনাল টোন।

'শুনেছিস, রানা?' জানতে চাইল সোহেল।

'হ্যাঁ। ওদিকে চলেছি এখন।'

মেঘের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে কপ্টার, পাঁচ শ' ফুট নীচে সাগর। দেখা গেল এক মাইল দূরে সুপারট্যাঙ্কার। মার্ভেলের চেয়ে নব্বুই হাজার টন বেশি ওজন ওটার, সাগরে বড় ঢেউয়ের ভিতর অনেক স্থির ভাবে ভাসছে। কখনও কখনও নাক থ্যাবড়া বো-র উপর এসে লাগছে প্রকাণ্ড ঢেউ, চারপাশে ছিটকে পড়ছে জলকণা। দেখা গেল লাল ডেকের বিশাল জাহাজ থেকে সরে যাচ্ছে ছোট্ট হলুদ এক বিন্দু। ওটাই লাইফবোট, নির্দেশ মত পশ্চিমে চলেছে ক্যাপ্টেন ট্রিনডার। এর ফলে মার্ভেলের কাজে কোনও বাধা দিতে পারবে না সে। লাইফবোট নামিয়ে দেয়ার পর আবারও রওনা হয়েছে সুপারট্যাঙ্কার।

'ওদিকে লক্ষ করুন,' উইণ্ডস্ক্রিনের দিকে আঙুল তাক করলেন ক্যাপ্টেন সিরাজ।

মেডিটারেনিয়ান উলফের স্টার্নের পিছনে ও দু'পাশের রেলিঙের আট ফুট নীচে কী যেন গলগল করে পড়ছে। জাহাজের সি-সাকশান ইনটেক থেকে ডিসচার্জ চলছে। অসংখ্য পাইপ দিয়ে পেটের ভিতর রাখা ব্যালাস্ট বের করে দিচ্ছে পাম্পগুলো।

কিন্তু পাম্প করে পানি বের করা হচ্ছে না। তিন ফুট বৃত্তের গর্ত থেকে বেরিয়ে নীচে পড়ছে ক্যারেন কুম্বসের ক্রোকিউলেন্ট। অ্যাঙ্গোলায় পেট্রোম্যাক্সের টারমিনালে এভাবেই সাগরে পড়েছিল বিষাক্ত ক্রুড অয়েল। কিন্তু এখন যেটা পড়ছে সেটা স্বচ্ছ, জাহাজ

থেকে বেরিয়ে দেখতে না দেখতে ছড়িয়ে পড়ছে সাগরে।

'নীচে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে চাদরের মত কী যেন,' পিছন সিট থেকে বলল স্বর্ণা। ওর পাশে রাখা হাইপারথার্মের মোটা দড়ি। 'চারপাশের সাগরকে থকথকে করে তুলছে ওই জেল।'

প্রকাণ্ড জাহাজের পোর্ট সাইডের ক্ষতি দেখবার জন্য এক চক্কর ঘুরে এলেন সিরাজ। সাগর-সমতলে খোলে সত্যিই ধরেছে ফাটল, উঠে এসেছে রেলিং পর্যন্ত। ঢেউয়ের সঙ্গে উঠছে-নামছে জাহাজ, ফাটলের সামনের সাগর গলগলে ফ্লোকিউলেন্ট দিয়ে ভরে উঠছে। জিনিসটা দেখতে পুরু চামড়ার মত লাগছে।

'বলুন, কোথায় নামিয়ে দেব?' জানতে চাইলেন সিরাজ।

'যতটা পারা যায় বো-র কাছে,' বলল রানা।

'ঢেউয়ের জলকণার ঝটকার ভিতর পড়তে চাই না, এক শ' ফুট পিছনে নামছি।'

'নিকোলাস ক্রিস্টোফারকে খুঁজবার সময় নেই, আবার যখন তুলে নিতে আসবেন, এমন জায়গা বাছাই করবেন, যাতে সহজেই কপ্টারে উঠতে পারি।'

'এই ঝোড়ো হাওয়ার ভিতর এক মুহূর্ত বাড়তি সময় নেব না, মেজর।'

আরেক চক্কর কাটল কপ্টার, দামাল হাওয়ার তাড়া খেয়ে পিছন থেকে সুপারট্যাঙ্কারের দিকে চলেছে। অল্টিচ্যুড এক শ' ফুটে নামিয়ে এনেছেন সিরাজ। ওদের মনে হলো কপ্টারের স্কিড ছুঁয়ে দিতে চাইছে উন্মাতাল সাগরকে। জাহাজের রেলিং পেরিয়ে এল ওরা, কিছু দূর যাওয়ার পর তুমুল হাওয়ার ভিতর কপ্টার দাঁড় করিয়ে ফেললেন সিরাজ, উচ্চতা আরও কমাতে শুরু করেছেন। ডেকের বিশ ফুট উপর থেমে গেলেন। বিশাল সব ঢেউয়ের নাচের কারণে উঠে আসছে ডেক।

'স্বর্ণা, নেমে পড়ো।'

বামদিকের দরজা খুলে ফেলল সানজিদা স্বর্ণা, বাম পা দিয়ে খুলে রেখেছে কবাট। অন্য পায়ে লাথি মেরে কপ্টার থেকে ফেলে দিল কয়েল করা হাইপারথার্ম। অজস্র সাপের মত ডেকের উপর ছড়িয়ে পড়ল বিস্ফোরক। শেষ দড়ি নীচে পড়তেই দরজায় দাঁড়াল স্বর্ণা, কিন্তু দমকা হাওয়া দড়াম করে বন্ধ করে দিল কবাট।

'এবার সবচেয়ে কঠিন কাজ,' বিড়বিড় করলেন সিরাজ। দিগন্তের দিকে চোখ রেখেছেন, খেয়াল রাখছেন সাগরের দুলুনির উপর। এক পশলা বৃষ্টি এসে আছড়ে পড়ল উইণ্ডস্ক্রিনে। এতে সামান্যতম মনোযোগ নষ্ট হলো না তাঁর।

রানা ও স্বর্ণা দু'দিকের দুই দরজার হ্যাণ্ডেলের উপর হাত রেখে অপেক্ষা করছে। ওদের পিঠে ঝুলছে মেশিন পিস্তল।

সুপারট্যাঙ্কারের বো থেকে শুরু হয়েছে একটা দুলুনি, পরের ঢেউ অকল্পনীয় প্রকাণ্ড। ওটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উপরে উঠছে জাহাজ, এদিকে কপ্টারের উচ্চতা আরও কমিয়ে এনেছেন সিরাজ। নিখুঁত হিসাব কষেছেন, কপ্টারের স্কিড থেকে মাত্র পাঁচ ফুট নীচে রইল ডেক। আবারও সমতল হতে শুরু করেছে জাহাজের ডেক।

'আপনাদের সঙ্গে পরে দেখা হবে,' জানিয়ে দিলেন সিরাজ।

দু'পাশের দরজা খুলে ফেলল স্বর্ণা ও রানা, এক সেকেণ্ডও দ্বিধা না করে লাফ দিল। এবং ঠিক তখনই আকাশের দিকে উঠে যেতে লাগল কপ্টার। পরের ঢেউ আরও বড়, ওটা আসবার আগেই এক শ' ফুট উপরে উঠে গেলেন সিরাজ।

ডেকের উপর পড়েই শরীর গড়িয়ে দিয়েছে রানা ও স্বর্ণা। চমকে গেছে ওরা, ভীষণ উত্তপ্ত ডেকের প্লেটিং। পরনে পুরু পোশাক না থাকলে ফোস্কা পড়ত গায়ে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা-স্বর্ণা, ওদের মনে হলো রাবারের জুতোর সোলের ভিতর দিয়ে ঢুকছে গনগনে আগুন।

'পুড়ে না মরি,' বলল স্বর্ণা।

'পানির কণা বো-র দিকে লাগছে, ওদিকটা একটু কম গরম হবে,' বলল রানা। পৌঁছে গেছে ওরা হাইপারথার্মের স্তূপের সামনে। একবার উপরে চাইল রানা, পাঁচ শ' ফুট উপরে ভাসছেন আলম সিরাজ, নিকোলাস ক্রিস্টোফারকে দেখলে রেডিয়ো করবেন।

ক্রুরা সবাই সুপারট্যাঙ্কার মেডিটারেনিয়ান উলফ ত্যাগ করায় রানা ভেবেছে, এবার পাল্টে দেবে কোর্স, বা পুরো রিভার্সে চালিয়ে দেবে ইঞ্জিন। কিন্তু পরে বুঝেছে, এসবে বিশেষ সুবিধা হবে না। সাগরে ঠিকই পড়বে ফ্লোকিউলেন্ট, গতিময় করবে ঝড়কে। পরে ঠিক করেছে, ক্রিস্টোফারকে থামাতে হলে যত দ্রুত সম্ভব ডেকে বিছাতে হবে হাইপারথার্ম।

ধাতু কাটা বিস্ফোরকের সঙ্গে রয়েছে বিশ ফুটি ইলেকট্রিসিটি-কনডাক্টিং ক্লিপ, সেসবের কারণে দড়িগুলোকে যুক্ত করে একটা লম্বা চার্জ তৈরি করতে পারবে ওরা। দুই সেগমেন্টের ভিতর সেট করা যায় ডেটোনেটার ও ব্যাটারি, কিন্তু সফল হতে হলে ওগুলোকে যত বেশি সম্ভব মাঝ বরাবর রাখতে হবে।

হাইপারথার্মের দড়িগুলো কাঁধে তুলে নিল রানা, এত ওজন নিতে গিয়ে আরেকটু হলে হাঁটু গেড়ে বসেই পড়ত। উত্তাপের কারণে দরদর করে ঘামছে ও, টের পেল ভিজে গেছে মোজা।

'তৈরি, স্বর্ণা?' জানতে চাইল।

'জী, মাসুদ ভাই।'

দেড় শ' পাউণ্ড ওজন নিয়ে বো-র দিকে রওনা হয়ে গেল ওরা, ওদের পিছনে ঝুলছে ধূসর বিস্ফোরক। তুমুল হাওয়া এবং জাহাজের পাগলা দুলুনির ভিতর মাতালের মত টলতে টলতে চলেছে দু'জন। যখন লোনা জলকণার এলাকায় ঢুকল, পায়ের দিকে চেয়ে দেখতে পেল ডেক থেকে চুইয়ে চুইয়ে উঠছে ধোঁয়া।

রানার মনে পড়ল একবার ইয়েলোস্টোনে উষ্ণ এক প্রস্রবণ দেখেছিল, এখানে ঠিক সেভাবে ভাপ উঠছে। প্রাউ থেকে তিরিশ ফুট দূরে কাঁধ থেকে বোঝা নামাল ওরা। আর সামনে বাড়া ঠিক হবে না, নইলে যে-কোনও সময়ে পানির ঝটকা এসে ওদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে সাগরে।

'পরিস্থিতি কেমন, ক্যাপ্টেন সিরাজ?' শোঁ-শোঁ ঝড়ের ভিতর জানতে চাইল রানা।

'একবার ঘুরে এসেছি ব্রিজের পাশ দিয়ে, কাউকে দেখতে পাইনি। ডেকে একের পর এক পাইপ ও ম্যানিফোল্ড। কোথাও নিকোলাস ক্রিস্টোফারকে দেখিনি।'

'তোদের কী অবস্থা, সোহেল?'

'টর্পেডো রেঞ্জে পৌঁছে গেছি, তোর সিগনালের জন্য অপেক্ষা করছি।'

'ঠিক আছে।'

বিশাল ঢেউয়ের জলকণা এসে আছড়ে পড়ছে জাহাজের বো-র উপর, কিন্তু এক সেকেণ্ড পর রানা টের পেল চারপাশ আঁধার করে দিয়েছে বৃষ্টির ভারী চাদর। কয়েক মুহূর্ত পর কমে গেল বৃষ্টির তোড়, কিন্তু একেবারে থেমে গেল না। এখন ওদেরকে একই সঙ্গে দুটো বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। প্রথম কথা, জাহাজ দিয়ে ঝড়ের চোখের বৃত্ত তৈরি হওয়ার আগেই তা ঠেকাতে হবে। দ্বিতীয় কথা, যত দ্রুত সম্ভব বিস্ফোরক বসাতে হবে, এবং বৃষ্টি বাড়তে শুরু হওয়ার আগেই ফিরতে হবে মার্ভেলে। তা যদি না পারে, এই ঝোড়ো আবহাওয়ায় কপ্টার নিয়ে ভেসে থাকা সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে মরবে ওরা তিনজনই।

জাহাজের পোর্টসাইড থেকে শুরু করে স্টারবোর্ডে বিস্ফোরক বসাতে শুরু করেছে স্বর্ণা। খোলের একটা প্লেটিঙের জোড়া লক্ষ করে পাতিয়ে চলেছে দড়ি। ডেটোনেটার নিয়ে ব্যস্ত রানা, পকেট

থেকে বের করেছে রিমোট কন্ট্রোল, ওটা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখছে, তারপর প্রথম সারি হাইপারথার্মের সঙ্গে জ্যাক লাগিয়ে দিচ্ছে। জাহাজের বিম কাভার করতে খরচ হলো ছয়টা বিশ ফুটি সেগমেন্ট। প্রতিটির সঙ্গে রয়েছে একটা করে ব্যাটারি, যখন অ্যাকটিভেট করা হবে, ওগুলো মিলে একটা চৌম্বকীয় ফিল্ড তৈরি করবে। এর ফলে ঝাঁকি যতই লাগুক, ডেকে আটকে থাকবে বিস্ফোরক।

একই সঙ্গে কাজ করে চলেছে রানা ও স্বর্ণা, ওরা জাহাজের দু' পাশের সাগরে নামিয়ে দিয়েছে হাইপারথার্মের দড়ি। খোলের সঙ্গে আটকে গেছে ইলেকট্রোম্যাগনেট ক্ল্যাম্প। জাহাজের ঝালাই করা এক জায়গার উপর বসে গেছে ওগুলো। ওদের কাজ শেষে জাহাজের সামনে তৈরি হয়ে গেল বিস্ফোরকের বড় একটা দড়ি, ছুঁয়ে রয়েছে সাগরের পানিকে। বাড়তি দড়িগুলোকে ডেকের উপর স্তূপ করে রাখল ওরা।

শেষ কানেশনগুলো যুক্ত করছে স্বর্ণা, ক্যাপ্টেন সিরাজের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। আবারও বাড়তে শুরু করেছে বৃষ্টি। দিগন্ত থেকে কাত হয়ে আসছে ফোঁটা, একেকটা বর্শার মত এসে লাগছে গায়ে। বৃষ্টি-বুলেটের কারণে দৃষ্টিসীমা কমে গেল ওদের। দূরে আবছা দেখা গেল সুপারস্ট্রাকচার। এদিকে সিরাজ তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ হাতে নিয়েছেন। নামতে শুরু করেছে কপ্টার।

রানা যোগাযোগ করল মার্ভেলে। 'সোহেল, চার্জ বসানো শেষ। এবার টর্পেডো ছাড়তে হবে। ওদুটো আসার আগেই কপ্টারে উঠব আমরা।'

'ঠিক আছে, চলে আয়,' বলল সোহেল।

অপারেশন্স সেন্টারে দুই টিউবের মুখ খুলে ফেলেছে নবী, কমপিউটারের স্ক্রিনে নিয়ে এসেছে টর্পেডো কন্ট্রোল প্রোগ্রাম।

জাহাজের রেইডার ও সোনার সিস্টেম দিয়ে তৈরি একটা থ্রি-ডিমেনশনাল ওয়ায়ার ফ্রেমের মাধ্যমে ট্যাকটিকাল ছবি আসছে স্ক্রিনে। সে-কারণেই মার্ভেলের সাত হাজার গজ দূরে দেখা গেল মেডিটারেনিয়ান উলফকে। খুব সহজেই ওটাকে বিদ্ধ করবে টর্পেডো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাবমেরিনাররা বলত ওটা টার্কি শুটিং।

'নবী, আমি বললেই টিউব ওয়ান খালি করবে,' নির্দেশ দিল সোহেল। সাত সেকেণ্ড পর বলল, 'এবার!'

বাটন টিপে দিল নবী, ওর স্ক্রিনে দেখতে পেল রওনা হয়েছে টর্পেডো, আপাতত শুধু ছুটে চলেছে ওটা। যখন দরকার পড়বে, একটা জয়স্টিক দিয়ে গতিপথ ঠিক করে দেবে নবী।

'ফায়ার টু।'

দ্বিতীয় টর্পেডো লঞ্চ করল নবী, জাহাজের ভিতর ফাঁপা কাশির মত আওয়াজ হলো। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল ও, 'দুটোই রওনা হয়েছে, ঠিক দিকেই চলেছে।'

'রানা,' জানাল সোহেল। 'মাছদুটো রওনা হয়েছে, এবার আকাশে উঠে পড়।'

'সে চেষ্টাই করছি এখন,' জবাব দিল রানা।

ঝড়ের ভিতর আকাশের দিকে চেয়ে আছে ওরা, অনেক নেমে এসেছে কপ্টার। এখনও ধীরে ধীরে নামছেন সিরাজ, তৃতীয়বার আবারও ডেকে নেমে আসতে চাইলেন। গত দু'বার দমকা হাওয়ার কারণে পঞ্চাশ ফুট থাকতেই সরে যেতে হয়েছে। এবারও বাতাসের ঝটকা উড়িয়ে নিতে চাইল কপ্টার। কয়েক মুহূর্ত পর সামলে নিলেন সিরাজ, এখন জাহাজের সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন সতেরো নট গতি তুলে।

'নেমে আসুন, ক্যাপ্টেন সিরাজ,' বিড়বিড় করে বলল স্বর্ণা। প্রচণ্ড তাপের কারণে ডেকের উপর পা রাখা কঠিন হয়ে উঠেছে।

'আমি জানি আপনি পারবেন।'

আরও নেমে এসেছে কপ্টার, বৃষ্টির পানি চার দিকে ছিটকে দিচ্ছে পাখাগুলো। প্লেক্সিগ্লাসের ওপাশে আলম সিরাজকে দেখতে পেল ওরা। আড়ষ্ট হয়ে আছে মানুষটার মুখ। ডেকের দশ ফুট উপরে চলে এল স্কিডদুটো। নতুন করে ঢেউয়ের উপর উঠে আসছে মেডিটারেনিয়ান উলফ, কপ্টার ও ডেকের মাঝের দূরত্ব কমে আসছে। তৈরি হয়ে নিল রানা ও স্বর্ণা, কপ্টার আরও একটু নামলেই ঝটপট পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়বে।

একই জায়গায় পনেরো সেকেণ্ড ভেসে থাকল কপ্টার, ঢেউয়ের সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ে উঠে আসছে সুপারট্যাঙ্কার, তারপর আবারও নামতে শুরু করল। ঠিক তখনই এমডি-৫২০এন কপ্টার নামিয়ে আনলেন সিরাজ, এক ফুট উপর থেকে ধুপ করে নামল ডেকে। দু'পাশ থেকে দুই দরজা খুলে ফেলল রানা ও স্বর্ণা, প্রায় ঝাঁপিয়ে উঠে গেল ভিতরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উড়াল দিল কপ্টার। অর্ধেক পাক খেয়ে ঘুরে গেল যান্ত্রিক ফড়িং, সরে যেতে শুরু করেছে সুপারট্যাঙ্কার থেকে।

'দারুণ ফ্লাইং, ক্যাপ্টেন,' সিটে উঠে বসল রানা, দ্রুত হাতে আটকে নিচ্ছে সেফটি বেল্ট।

'এখনই প্রশংসা করবেন না, আগে মার্ভেলে নেমে নিই,' শুকনো স্বরে বললেন সিরাজ। 'ও, আরেকটা কথা, অ্যামিডশিপের ফাটল অনেক বড় হয়ে উঠেছে। ডেক ফাটতে শুরু করেছে।'

'তাতে এখন আর কোনও সমস্যা নেই,' রেডিয়ো চালু করল রানা। 'সোহেল, আমরা সরে গেছি। টর্পেডো কোথায়?'

'দুই হাজার গজ দূরে, তোদের দিকে আসছে। চার মিনিট পর ইমপ্যাক্ট।'

আটলান্টিক মহাসাগর এতই খেপে উঠেছে, ঢেউয়ের ভিতর দিয়ে চোখে পড়বে না টর্পেডো। আট শ' ফুট উঠে এসেছে

কপ্টার, উপর থেকে পরিষ্কার চোখে পড়বে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

'ইমপ্যাক্টের দশ সেকেণ্ড আগে হাইপারথার্ম ট্রিগার করব,' বলল রানা। 'পোর্ট ও স্টারবোর্ডে দু' পাশ থেকে টর্পেডো লাগলে নীচের খোল বিধ্বস্ত হবে, এদিকে উপরের সব পোড়াতে শুরু করেবে বিস্ফোরকগুলো। আশা করা যায় পাউরুটির টুকরোর মত খসে পড়বে বো।'

ট্যাকটিকাল নেটে কথা বলে উঠল নবী, 'আমি রেঞ্জ বলব। পঞ্চাশ গজ আগেই ব্যবহার করবেন হাইপারথার্ম।'

টানটান তিন মিনিট পেরুল, এদিকে নবী পথ দেখিয়ে চলেছে দুই টর্পেডোকে। রানা আগেই নির্দেশ দিয়েছে, জাহাজের বো-র দু'পাশে যেন লাগে মাছ দুটো। এদিকে ডেকের উপর প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি করবে হাইপারথার্ম, ধাতু পুড়িয়ে নীচের দিকে নামতে থাকবে। রিমোট ডেটোনেটার হাতে অপেক্ষা করছে রানা, যে-কোনও সময়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে দেবে বাটন।

'আর এক শ' গজ,' জানাল নবী।

সুপারট্যাঙ্কারের কাছে পৌঁছে সাগর-সমতলে উঠে আসছে টর্পেডো, ওগুলোর তৈরি ঢেউ এবং স্রোত আবছা দেখা গেল। একেবারে ঠিক দুই দিকেই অস্ত্রদুটো নিয়ে এসেছে নবী।

'পঁচাত্তর গজ।'

কপ্টারের সামনে থেকে দৃশ্যটা প্রথম দেখলেন সিরাজ। 'ওটা কী?' চমকে গিয়ে বললেন।

'কী? কোথায়?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'ডেকের উপর নড়াচড়া।'

এবার রানাও দেখল, লিলিপুটের মত দেহটা সুপারট্যাঙ্কারের বো-র দিক থেকে ছুটে ফিরছে। পরনে রেইন কোট, জাহাজের ডেকের মতই লাল রঙের। সে-কারণে আগে দেখা যায়নি তাকে। অসংখ্য পাইপের ভিতর লুকিয়ে চলে গেছে বো-র কাছে।

'নিকোলাস ক্রিস্টোফার!'

ডেটোনেটার বাটন টিপে দিল রানা। পরক্ষণে চোখ ঢেকে ফেলল। এবার হাইপারথার্মের অত্যুজ্জ্বল সাদা আলো চারদিকে ছিটিয়ে পড়বে। কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, কিন্তু চোখের পাতার উপর পড়ল না কোনও আলো। চোখ খুলে জাহাজের দিকে চাইল রানা। হাইপারথার্ম ঠিক জায়গায় আছে, কিন্তু জ্বলতে শুরু করেনি।

'নবী, অ্যাবোর্ট! অ্যাবোর্ট! অ্যাবোর্ট!'

টর্পেডোর সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট বাটন টিপতে পারত নবী, কিন্তু তা না করে সিগনাল দিয়ে কমিয়ে দিল গতি, দুই জয়স্টিক নাড়তে শুরু করেছে। ডুব দিল অস্ত্রদুটো। স্ক্রিনে দেখতে পেল নাক নিচু করে নীচের দিকে রওনা হয়েছে ওগুলো। সুপারট্যাঙ্কারের নীচের প্রচণ্ড টান দেখে মনে হলো খোলের নীচ দিয়ে পেরুবে না টর্পেডো, কিন্তু এখন আর কিছুই করবার নেই। জাহাজের এত কাছে চলে গেছে, এখন অটোডেস্ট্রাক্ট অর্ডার দিলে মেডিটারেনিয়ান উলফের খোল বিধ্বস্ত হবে। তার মানেই, গলগল করে বেরিয়ে আসবে সমস্ত জেল।

'ডাইভ দে, দে ভাই ডাইভ,' বিড়বিড় করে বলছে নবী।

শ্বাস আটকে ফেলেছে সোহেল। মেইন স্ক্রিনে দেখছে দুই টর্পেডোর গতিপথ। জাহাজের খোলের ঠিক ছয় ফুট নীচ দিয়ে বেরিয়ে গেল দুই বোমা, এগারো ফুট দূরত্ব রেখে পরস্পরকে পাশ কাটিয়ে গেল। ফোঁস করে শ্বাস ফেলল অপারেশন্স সেন্টারের সবাই।

'আমাকে আবার নামিয়ে দিন,' সুপারট্যাঙ্কারের দিকে আঙুল তাক করেছে রানা।

প্রায় খাড়া ডাইভ শুরু করলেন সিরাজ, তারই ফাঁকে বললেন,

'কোনও কথা দিতে পারব না যে আবারও আপনাকে তুলে নিতে পারব। এদিকে ফুরিয়ে আসছে ফিউয়েল।'

'আমাকে ঝুঁকি নিতেই হবে, ফিউয়েল আরও কমে যাওয়ার আগেই ফিরবেন মার্ভেলে,' বলে দিল রানা।

নাক নিচু করে সুপারট্যাঙ্কারের বো-র উপর দিয়ে চলেছে এমডি-৫২০এন কপ্টার, ওটার স্কিডের মাত্র দশ ফুট নীচে ডেক। নিকোলাস ক্রিস্টোফারের পিছু নিয়ে তেড়ে চলেছে। আগেই সেফটি বেল্ট খুলে ফেলেছে রানা, দরজার পাশে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলল এমপি-৫, রাখল সিটের উপর। আগেরবার যখন লাফিয়ে নেমেছে, অস্ত্রটা ওর পিঠে ভীষণ খোঁচা দিয়েছে। এবারের লাফ হবে আগের চেয়ে অনেক কঠিন।

বোধহয় কপ্টারের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে নিকোলাস, কাঁধের উপর দিয়ে চাইল। বড় বড় হয়ে উঠল চোখ, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আগের চেয়ে জোরে দৌড়াতে শুরু করেছে। লোকটার হাতে কালো কী যেন। ওটা চিনল রানা, ডেটোনেটার ব্যাটারি না হয়েই যায় না! ডানদিকে বাঁক নিতে শুরু করেছে নিকোলাস, চাইছে একটা ম্যানিফোল্ড টাওয়ারে বিধ্বস্ত হোক কপ্টার। জিনিসটা ডেক থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু। এদিকে সে পৌঁছে যাবে রেলিঙে, সাগরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে ব্যাটারি।

অন্তত দশ মাইল গতি তুলে চলেছে কপ্টার, দুই হাতের জোরে দরজা খুলল রানা, লাফিয়ে পড়ল দশ ফুট উপর থেকে। বেকায়দা ভাবে পড়েছে, তপ্ত ডেকের উপর গড়িয়ে গেল শরীর, ঠেকল গিয়ে একটা পাইপ সাপোর্টের সঙ্গে। ব্যথা পাত্তা না দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, পরক্ষণে ঝেড়ে দৌড় দিল। হোলস্টার থেকে বের করে ফেলেছে পিস্তল।

কপ্টার থেকে রানাকে লাফিয়ে পড়তে দেখেছে নিকোলাস, দ্বিগুণ জোরে দৌড়াতে শুরু করেছে সে। লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটে

চলেছে ক্ষিপ্র গ্যাজেলের মত। তার একমাত্র উদ্দেশ্য সাগরে ফেলবে ব্যাটারি, কিন্তু পিছনের মানুষটার তাড়া তার চেয়ে অনেক বেশি। কাঁধের উপর দিয়ে রানার দিকে চাইল নিকোলাস, দ্রুত কমে আসছে দু'জনের দূরত্ব।

সুপারট্যাঙ্কারের নীচে নতুন ঢেউ ঢুকেছে; ঠেলে তুলছে জাহাজকে। প্রচণ্ড চাপের মুখে করুণ গোঙানি শুরু করেছে ডেক ও খোল। পোর্ট সাইডের ফাটল বাড়ছে। ঢেউ পেরিয়ে যেতেই গর্তের মত সাগরে নেমে এল জাহাজ, তাতে আরও বাড়তে লাগল ফাটল। ওটা লক্ষ্য করেছে নিকোলাস, রেলিং থেকে বেশ দূরে জায়গাটা। নতুন উদ্যমে রেলিঙের দিকে ছুটে চলেছে সে। কিন্তু জোরালো ঠাস-ঠাস আওয়াজ তুলে বাড়তে শুরু করেছে চিড়। লোকটা একবারও ভাবেনি এভাবে ফাটতে পারে ডেক।

ফাঁক হয়ে গেল সামনের ডেক। দৌড়ের ফাঁকে দিক পরিবর্তন করতে চাইল নিকোলাস। কিন্তু পা গেল পিছলে, রেইন কোটের কাপড় নিয়ে ডান পা ঢুকে গেল এবড়োখেবড়ো ফাটলের ভিতর। আছড়ে পড়তেই হাত থেকে ছুটে গেল পেপারব্যাক বই আকৃতির ব্যাটারি, পিছলে চলে গেল আরেক দিকে। ব্যথা ও আতঙ্কে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল নিকোলাস, তার দ্বিতীয় পা-ও ঢুকে গেছে ফাটলের ভিতর। উরু থেকে নীচের অংশ ঝুলছে ফ্লোকিউলেন্টের গদগদে আঠার একটু উপরে। অতিরিক্ত গরম ধাতুর ডেক পোড়াতে শুরু করেছে শরীর। দুই হাতের জোরে উঠে আসতে চাইছে নিকোলাস, দুই তালুতে গজিয়ে উঠল বড় বড় ফোস্কা। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে, ফাটলের দুই দিক আবারও আটকে যাওয়ার আগেই উঠতে হবে তাকে।

ছয় ফুট দূর থেকে ঝাঁপ দিল রানা, এবং ঠিক তখনই আবারও ঢেউয়ের উপর উঠতে লাগল জাহাজ। ফাটলের দুই দিক কাঁচির মত পরস্পরের উপর চেপে বসল। নিকোলাসের কোমর

জড়িয়ে ধরে ফাটল পেরিয়ে গেল উড়ন্ত রানা। চমকে গেল তীব্র আর্তনাদ শুনে।

আরও কয়েক ফুট গিয়ে থামল রানা, চট্ করে উঠে বসেই দেখতে পেল বিজ্ঞানীকে। লোকটার উরু থেকে শুরু করে নীচের অংশ কাটা পড়েছে, হারিয়ে গেছে ট্যাঙ্কের ভিতর। কাটা পড়া দুই উরু থেকে গলগল করে পড়ছে রক্ত, ডেকে পড়েই লালচে হয়ে উঠছে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো।

প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে গেল রানা, উপুড় হয়ে পড়ে আছে লোকটা, তাকে চিত করল ও। ভূতের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে নিকোলাস, নীলচে হয়ে উঠেছে দুই ঠোঁট। হঠাৎ আর্তচিৎকার বন্ধ হলো, আর কোনও ব্যথা সইবে না তার মগজ। শকের ভিতর চলে গেছে।

লোকটার ট্রমা শুরু হওয়ার আগেই জানতে চাইল রানা, 'কেন এ কাজ করলে?'

'করতেই হতো,' ফিসফিস করে বলল নিকোলাস। 'আরও ক্ষতি হওয়ার আগেই সবাইকে বোঝাতে হবে।'

'তোমার মনে হয়নি নিজের দেখভাল ভালই জানে পৃথিবী?'

'ওই মেয়েটা... আর... আর ওই আসিফ...' গাল দুটো ঘৃণায় কুঁচকে উঠতে গিয়েও সমান হয়ে গেল। মরে গেছে লোকটা।

উঠে দাঁড়াল রানা, এক দৌড়ে গিয়ে তুলে নিল ব্যাটারি, ছুটতে শুরু করেছে বো-র দিকে। রেডিয়ো করল, 'সোহেল?'

'হাতে মাত্র তিন মিনিট, তারপর টর্পেডোর চার্জ ফুরিয়ে যাবে,' বলল সোহেল।

আরও টর্পেডো থাকলে ভাল হতো, কিন্তু মাত্র এক চালানে দুটোই পাওয়া গেছে। এখন যদি হাইপারথার্ম কাজে লাগাতে না পারে রানা, জাহাজ ডুবতে অনেক দেরি হবে, ততক্ষণ ধরে সাগরে পড়তে থাকবে ফ্লোকিউলেন্ট।

'আমার জন্যে অপেক্ষা করবি না, সোহেল,' বলল রানা। 'আমি যদি হাইপারথার্ম ডেটোনেট করতে না-ও পারি, টর্পেডো ব্যবহার করবি। কপাল ভাল হলে বিস্ফোরণের সময় জ্বলে উঠবে চার্জগুলো।'

'টর্পেডো মারা সম্ভব না, রানা,' করুণ শোনাল সোহেলের কণ্ঠ, কান্না উপর যেন খেপে উঠছে। 'ওই জাহাজে তোকে রেখে...

'আমার কথা শোন্,' প্রায় ধমকে উঠল রানা। 'যা বলছি তাই কর্! লাখ লাখ মানুষের জীবনের বদলে একজন হারিয়ে গেলে কী হয়!'

'আমার অনেক কিছু হয়। আমি পারব না,' কাতর শোনাল সোহেলের কণ্ঠ।

'তুই জানিস না, বিড়ালের মত নয়টা জান আমার?' হাসল রানা। 'তুই যদি না পারিস তো নবীকে লাইনে দে।'

'আমি লাইনে আছি, মাসুদ ভাই,' বলল নবী। 'এটা আমাদের নিজেদের কোনও লড়াই নয়, আমি আপনার আদেশ না-ও মানতে পারি।'

'আমি মার্ভেলে ফিরলে কান ছিঁড়ে নেব তোমাদের,' ধমক মারল রানা। 'বোকা ছেলে, যা বলছি তাই করো।' ছুটে চলেছে ও, জাহাজটা বড্ড দীর্ঘ মনে হচ্ছে ওর কাছে। যেন দিগন্তের কাছে বো। ডেক থেকে ভাপ উঠছে। পায়ের তলা থেকে উঠছে তাপ।

কিছুক্ষণ পর হাইপারথার্মের দড়ির সামনে পৌঁছে গেল রানা।

'আর দুই মিনিট পর টর্পেডোর চার্জ শেষ হবে,' রেডিয়ো করল সোহেল।

নিকোলাস ক্রিস্টোফার যখন ডেটোনেটার থেকে ব্যাটারি খুলেছে, তখন টান দিয়ে ছিঁড়ে দিয়েছে তার। ওই তার ইলেক-

ট্রিসিটি নিয়ে যেত চার্জ পর্যন্ত। এখন সব ঠিক করতে হলে প্রথমে দুই দড়ির ভিতর ডিসকানেক্ট করতে হলে ডেটোনেটার, নইলে দুর্ঘটনাবশত সার্কিট পূর্ণ হতে পারে। পকেট থেকে বাক নাইফ বের করে প্লাস্টিকের ইনসুলেশন কাটতে শুরু করেছে রানা। তামার তার বেরিয়ে আসছে। সব মিলে তিনটে প্লাস্টিক ইনসুলেশন কেটে মুচড়ে তার আটকে দিতে লাগল পুরো এক মিনিট।

ডেটোনেটারের স্ট্যাটাস বাতি জ্বলে উঠল। পূর্ণ হয়েছে সার্কিট।

'আর মাত্র এক মিনিট, রানা,' বলল সোহেল।

'আমার কাজ প্রায় শেষ,' বলল রানা। 'এবার মুখ ঘুরিয়ে দে, পাঠা তোর মাছ।'

হালকা ডেটোনেটারের একমাথায় হাইপারথার্মের একটা দড়ি আটকে দিল রানা, দ্বিতীয়টা আটকাতে চলেছে, এমন সময়ে রেডিয়োতে শুনতে পেল, 'মাসুদ ভাই, আমি নবী, টর্পেডো আছে আর দেড় শ' গজ।'

'আসুক। আমার কাজ প্রায়... না, হয়ে গেছে!'

দড়ির সংযোগ দেয়া শেষ, উঠে দাঁড়াল রানা, তারপর ঘুরেই দৌড়াতে শুরু করল। জ্বলছে ওর পায়ের তালু। বুঝতে পারছে দুই টর্পেডোর সঙ্গে দৌড়ের প্রতিযোগিতা চলছে ওর। আরও এক শ' ফুট যেতে না যেতেই নবী বলল, টর্পেডো আছে মাত্র এক শ' গজ দূরে। পাখির মত ডানা নেই রানার, কিন্তু যেন উড়ে চলেছে।

'পঞ্চাশ গজ,' বলল নবী। কণ্ঠ শুনে মনে হলো যেন সব দোষ ওর।

আরও কয়েক গজ ছুটল রানা, তারপর রিমোট কন্ট্রোলের বাটন টিপে দিল।

পরের সেকেণ্ডে চারপাশ হয়ে উঠল অতি উজ্জ্বল সাদা। সূর্য

এত আলো দিতে পারে না। জ্বলে উঠেছে হাইপারথার্ম। দুই হাজার ডিগ্রি ম্যাগনেসিয়াম কোর জ্বলছে। জাহাজের ডেকের মাঝ থেকে শুরু করে দু'দিকে ছুটে চলেছে তীব্র গতিতে। যেন ওটার তাপের কাছে গলন্ত মোমের মত নরম লোহার কঠিন ডেক। লোহা টপ টপ করে পড়ছে হোল্ডের ভিতর। ওখান থেকে উঠছে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধযুক্ত ধোঁয়া, চারপাশে তৈরি হচ্ছে পোড়া লোহার মেঘ। উজ্জ্বল আলোয় আকাশের ধূসর মেঘগুলোকে দেখাল ঝকঝকে সাদা। গোটা ডেক কাটা পড়েছে বিস্ফোরকের তাপে, দু'পাশের খোল কেটে সাগরের পাশে নেমে গেল হাইপারথার্ম।

তিন শ' ফুট দূর থেকেও পিঠে তীব্র তাপ টের পেল রানা, চড়-চড় করে পুড়ে যেত সব চুল, কিন্তু বৃষ্টির কারণে রক্ষা পেল। যত দ্রুত জ্বলে উঠেছে হাইপারথার্ম, ঠিক তেমনই পুড়ে শেষ হয়ে গেল। সে জায়গায় থাকল শুধু সরু একটা ফাটল। গনগনে লাল হয়ে আছে দুই পাশের লোহা।

আরও বিশ গজ পেরিয়ে গেল রানা, তারপর জাহাজের বো-র দুই পাশে এসে লাগল টর্পেডো। ঠিক ওখানেই খোল কেটে দিয়েছে হাইপারথার্ম। এক সেকেণ্ড পর এল প্রচণ্ড শকওয়েভ। ওটা যেন একটা দানব, ঘাড় ধরে খপ্ করে আকাশে তুলে নিল রানাকে, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল সাত ফুট দূরে। বো-র সামনের অংশে টর্পেডোর বিস্ফোরণে ছিটকে উঠেছে বিপুল পানি ও দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া পোড়া লোহা। পরের মুহূর্তে আলগা হয়ে খসে পড়ল জাহাজের গোটা বো, সাগরে পড়েই হারিয়ে গেল। ফাঁকা জায়গা পেয়ে হুড়হুড় করে হোল্ডে ঢুকল সাগরের পানি, তার ধাক্কা খেয়ে তিন ভাগের এক ভাগ ফ্লোকিউলেন্ট পাইপগুলোর মাধ্যমে চলে গেল স্টার্নের দিকে। গলগল করে বেরুতে লাগল জাহাজের পাশের ফাটল থেকেও, গিয়ে পড়ছে কমপক্ষে এক শ' ফুট দূরে। রানা এবং ওর দলের সবাই জানত এমনই হবে। এখনও বেশির

ভাগ ফ্লোকিউলেন্ট রয়ে গেছে জাহাজের ভিতর। সব এখন তলিয়ে যাবে সাগরের গভীরে।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল রানা, মাথার ভিতর ঝনঝন আওয়াজ টের পাচ্ছে। ঘুরে চাইল ও, আগে যেখানে ছিল বো, সেখানে উঠে আসছে সাগরের তরল প্রাচীর। নাক নিচু করে ডুবতে শুরু করেছে জাহাজ। মেডিটারেনিয়ান উলফের নাক পুড়েছে, এবার নামতে শুরু করেছে কবরের দিকে। প্রকাণ্ড ডিজেল ইঞ্জিন এখনও ঘুরিয়ে চলেছে প্রপেলারগুলোকে, সতেরো নট গতি তুলে নামছে ওটা নীচে।

'মেজর, আমি সিরাজ,' আকাশে চোখ তুলল রানা, অনেক নীচে নেমে এসেছে কপ্টার। 'যে পরিমাণ ফিউয়েল আছে, মনে হয় আরেকবার নামার চেষ্টা করতে পারি।'

'সে-সময় আপনার হাতে নেই,' সুপারস্ট্রাকচারের দিকে ছুটতে শুরু করেছে রানা। 'পেট-মোটা শুয়োরের মত ডুবছে জাহাজটা। এক মিনিট পেরুনোর আগেই তলিয়ে যাবে।'

'তাও আরেকবার চেষ্টা করব। আপনার সঙ্গে দেখা হবে স্টার্নের রেলিঙে।'

ছুটে চলেছে রানা।

'আর আমরাও পৌঁছে গেছি,' মার্ভেল থেকে বলল সোহেল। 'রেসকিউ ক্রুরা তৈরি, তুই সাগরে পড়লে দেরি না করে তুলে নেব।'

দৌড়ের সময় স্টারবোর্ডের দিকে সরে গেছে রানা, উল্টো দিকে রয়েছে ভয়ঙ্কর ওই ফাটল। ওর পিছনে উঁচু হয়ে উঠছে সাগর, হাঁ করে গিলতে শুরু করেছে মস্ত জাহাজটাকে। এরই ভিতর তিন ভাগের এক ভাগ ডুবে গেছে। প্রতি সেকেণ্ডে উঠে আসছে কালো অতলান্তিক সাগর।

সুপারস্ট্রাকচারে পৌঁছে গেল রানা, এক সেকেণ্ড সময় নষ্ট না

করেই ঢুকে পড়ল সরু গলির মত জায়গাটায়। পিছনের রেলিঙের দিকে ছুটছে। ক্রমেই খাড়া হয়ে উঠছে ডেক। হড়কে যেতে চাইছে পা। কয়েক সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল মেডিটারেনিয়ান উলফের জ্যাক পোস্টের পাশে। ন্যাকড়ার মত ঝুলছে লিবিয়ান পতাকা। অ্যাকোমোডেশন ব্লক পর্যন্ত উঠে এসেছে পিছনের পানি। চারপাশে চাইল রানা। ক্যাপ্টেন সিরাজের কপ্টারকে কোথাও দেখতে পেল না। মনে মনে বলল, 'আশা করি ডোবার সময় জাহাজটা আমাকে অনেক বেশি নীচে টেনে নেবে না!'

ধেড়ে বাঁদরের দক্ষতায় রেলিঙের উপর উঠতে শুরু করেছে রানা, কিন্তু ওখানেই থামতে হলো ওকে। মাথা ঝুঁকে আসা সুপারস্ট্রাকচারের ওপাশ থেকে ঘুরে বেরিয়ে এসেছে কপ্টার। যান্ত্রিক ফড়িঙের পিছন দরজা খোলা, সেখান থেকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে বিশ্রী এক দড়ি। জিনিসটা তৈরি করা হয়েছে অ্যাসল্ট রাইফেলের স্লিং, ফেটিগ জ্যাকেট, সামান্য তার এবং সবশেষে ঝুলছে ক্যাপ্টেন সিরাজের জিন্সের শখের প্যান্ট। ওটা দিয়ে একটা লূপ তৈরি করা হয়েছে।

'এই মেয়ে প্রায় জোর করে আমার প্যান্ট কেড়ে নিয়েছে, এবার ওটার উপর পা রেখে উঠে পড়ুন!' রেডিয়োতে বললেন সিরাজ।

মৃদু হেসে ফেলল রানা।

সুপারস্ট্রাকচারের দোতলায় এক সারি পোর্টহোল বিস্ফোরিত হলো। গলগল করে ভিতরে ঢুকছে পানি, বেরুনোর পথ না পেয়ে বাতাসের চাপ ফাটিয়ে দিয়েছে পুরু কাঁচগুলোকে। ঝট্ করে মুখ সরিয়ে নিয়েছে রানা, চারপাশে ঝরঝর করে নামল কাঁচ। দুই সেকেণ্ড পর ফিরে চেয়ে রানা দেখল নাকের কাছে ঝুলছে ক্যাপ্টেন আলম সিরাজের প্যান্ট।

খপ্ করে ওটা ধরল রানা, লূপের ভিতর ভরে দিল ডান

কনুই। এক সেকেণ্ড পর ঝাঁকি খেয়ে টের পেল ভেসে উঠছে। দড়ির শেষে চরকির মত ঘুরছে ও। তিন সেকেণ্ড পর ঢেউয়ের নীচে তলিয়ে গেল অত বড় জাহাজটা। কবরের নিশানা হিসাবে রয়ে গেল থকথকে আঠার মত জেল, কিন্তু নিকোলাস ক্রিস্টোফার যে পরিমাণ তৈরি করতে চেয়েছে, তার কয়েক হাজার ভাগ কম ফ্লোকিউলেণ্ট ছড়িয়ে পড়েছে।

পাঁচ মিনিট পর অবিশ্বাস্য দক্ষতায় মার্ভেলের হেলিপ্যাডে নামলেন সিরাজ। হ্যাঙারে নামতেই সবার আগে রানা দেখতে পেল বাবুর্চি মোস্তাফা আবুলকে। পরনে তার সর্বক্ষণের কালো সুট, বাম হাতে পরিষ্কার সাদা তোয়ালে, ডান হাতে একটা সার্ভিং ডিশ, ওটা ঢেকে রেখেছে একটা রূপার কাভার দিয়ে।

কপ্টার থেকে রানা নেমে আসতেই একইসঙ্গে হাজির হলো সোহেল, কার্টা, ফারা ও কয়েকজন ক্রু, সবাই ঘিরে ফেলল ওকে। তাদের ভিতর দিয়ে পথ করে নিল মোস্তাফা আবুল, খাবারের ঢাকনি খুলে রানার সামনে বাড়িয়ে দিল।

'আপনি আগেই বলেছেন কী চান, স্যর।'

'আগেই কী চেয়েছি?' ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে রানা, ওর মাথায় এল না কী বলে থাকতে পারে।

আরও গম্ভীর হয়ে গেল বাবুর্চি। কিন্তু চকচক করছে দুই চোখ। 'জানি এটা আসলে ভাল সাইক্লোন না, স্যর, কিন্তু ভাবলাম আপনার ভাল লাগবে গুয়েরে চিজের সঙ্গে লবস্টার সাফ্‌লে এবং বেক আলাস্কা ডেজার্ট।'

এমনই সঠিক সময়ে হাজির হয়েছে সে, এখনও উপর অংশ থেকে উঠছে ধোঁয়া।

এই লোকের সঙ্গে কেউ পারবে না, ভাবল রানা। মৃদু মাথা দুলিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল ডিশ নেয়ার জন্য।

এ বছরে আটলান্টিক মহাসাগরে ওই ঝড় ছিল পনেরোতম। ওটা হয়ে উঠতে পারত ভয়ঙ্কর শক্তিশালী হারিকেন, কিন্তু কী কারণে যেন ঝড়ের চোখ সম্পূর্ণ বৃত্তাকার হতে পারেনি। মিটিওরোলজিস্টরা জানেন না এমনটা কীভাবে হতে পারল। এ ধরনের বিদ্‌ঘুটে ঘটনা আগে কখনও দেখেননি তাঁরা।

যাই হোক, মৌসুমের শুরুতেই ছিল ওই সামান্য ঝড়, কাজেই ওটাকে নিয়ে বেশি ভাবতে যায়নি কেউ। সত্যি করে হারিকেন শুরু হলে তখন সেটা নিয়ে মাতামাতি করে সবাই। কিন্তু দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস জাহাজের সবাই সোহেল আহমেদের সঙ্গে একমত হয়েছে। হারিকেন হতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়া ওই ঝড়ের নাম দেয়া হলো— এম.আর.নাইন।

পনেরো

মোটা চাকাওয়ালা ডিউন বাগি নিয়ে ছুটে চলেছে মাসুদ রানা, সঙ্গে আছে সোহেল আহমেদ, কার্টা অস্টিন ও সার্জেন্ট আমাহ্‌লে। বিকট আওয়াজ তুলছে ইঞ্জিন। তুমুল গতি তুলে চালাচ্ছে রানা। রানার অনুরোধে সঙ্গে আসতে চেয়েছিলেন ম্যাথিউস জাস্টাস, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার হাসপাতাল থেকে ডাক্তার তাঁকে রিলিজ দেননি। তাই নিজের বদলে তাঁর বিশ্বস্ত সহকারী ও সহযোদ্ধা সার্জেন্ট আমাহ্‌লেকে পাঠিয়েছেন জাস্টাস।

ওদের অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় এরই ভিতর পেরিয়ে গেছে। যে কোম্পানি থেকে এই ভেহিকেল ভাড়া নিয়েছে রানা, সেখানে কাজ করে সোয়াকোপমুণ্ড পুলিশের এক সদস্য। সে টাকা বুঝে

নিলেও সময়মত গাড়িটা দিতে পারেনি। তাকে যেতে হয়েছিল ইন্টারপোলের ইতালিয়ান অফিসার সিলভিও বেনেডিক্টোর সঙ্গে একদল ইউরোপিয়ান ইকো-টেরোরিস্টকে ধরে আনতে। এরা আটকা পড়েছিল মরুভূমির ভিতর, তাদের বিরুদ্ধে শক্ত একটা কিডন্যাপিঙের কেস আছে সুইটযারল্যাণ্ডে।

ছাতখোলা বাগি উঠে এসেছে উঁচু একটা ঢিবির উপর, তেরচা ভাবে নামতে শুরু করেছে রানা। সাসপেনশনের কারণে নাচতে নাচতে নামছে গাড়ি। নীচের উপত্যকার দিকে চেয়ে শ্বাস আটকে গেল চার আরোহীর।

মরুভূমির বুকে বসে আছে প্রাচীন সেই জাহাজ, এইচএমএস চ্যালেঞ্জার। দেখে মনে হচ্ছে, এখুনি পাল তুলে রওনা হয়ে যাবে বালির সাগর পাড়ি দিতে। জাহাজের খোলে গিয়ে মিশেছে ছোট ছোট ঢিবি, যেন মৃদু ঢেউ লাগছে গায়ে। চিমনি হারিয়ে গেছে, ভেঙে পড়েছে কার্গো ডেরিক, বছরের পর বছর বালির নীচে পড়ে থেকে কোথাও এক ফোঁটা রং অবশিষ্ট নেই।

জাহাজ থেকে একটু দূরে নেমেছে বাংলাদেশ আর্মির প্রকাণ্ড এক কার্গো হেলিকপ্টার। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ছোট আকারের আরেকটা কপ্টার। আরও রয়েছে দুটো মাঝারি আকারের এক্সকেভেটার। ওগুলোই তিরিশ ফুট বালি খুঁড়ে তুলে এনেছে জাহাজটাকে। আরেক পাশে সাদা এক ছাউনির ভিতর শুয়ে-বসে আছে কয়েকজন সৈনিক ও অফিসার।

কার্টার গাল স্পর্শ করল রানার দুটো আঙুল। 'তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলে। কংগ্র্যাচুলেশন্স।'

মিষ্টি হাসল কার্টা।

ডিউন বাগি আসতে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে তাঁবুর লোকগুলো। তাদের ভিতর থেকে দু'জন এগিয়ে গেল জাহাজের দিকে—একজন বাঙালি; অপরজন দীর্ঘদেহী, গোমড়ামুখো, বয়স্ক

আমেরিকান। লোকটার হাতে মাঝারি আকারের একটা বাক্স। রানা বুঝল, পৃথিবীর বৃহত্তম হীরক প্রতিষ্ঠান ডি বিয়ার্সের লোক, বাক্সে রয়েছে অ্যাসেসমেন্টের যন্ত্রপাতি। একটা র‍্যাম্প লাগানো হয়েছে জাহাজের ডেকে উঠবার জন্য।

র‍্যাম্প থেকে এক ফুট দূরে গাড়ি থামাল রানা, বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন। এখন আর কোনও শব্দ নেই বালির শ্-শ্ আওয়াজ ছাড়া। সিটবেল্ট খুলে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা ও তার সঙ্গের সবাই। রানার দিকে এগিয়ে এল বাঙালি লোকটি। শক্তপোক্ত মানুষ, চোখের মণি চকলেটের মত খয়েরি। চওড়া হাসি দেখা দিয়েছে অফিসারের ঠোঁটে— পূর্ব পরিচিত।

'যাক, হাজির হলেন শেষ পর্যন্ত!' বলল লোকটা। পাশের লোকটির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ইনি তো রীতিমত অস্থির হয়ে উঠেছেন অপেক্ষা করতে করতে।'

কার্টাকে দেখে হাসি ফুটল মার্কিন লোকটার গম্ভীর মুখে। ডি বিয়ার্স-এর অ্যাসেসার চেনে সহকর্মী অস্টিন কার্টাকে।

'ইনি ডি বিয়ার্স-এর ডায়মণ্ড অ্যাসেসার মার্টিন স্মিথসন,' বলল কার্টা, 'আর এঁরা ক্যাপ্টেন মাসুদ রানা, মিস্টার সোহেল আহমেদ ও সার্জেন্ট আমাহ্লে।'

করমর্দন আর হাউ ডু ইউ ডু শেষ হলে আর্মির ইঞ্জিনিয়ার মেজর দেলোয়ারের দিকে ফিরল রানা।

'জাহাজ দেখে কী বুঝলেন?'

'যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক ভাল অবস্থা,' বলল দেলোয়ার হোসেন। 'আপনি বলেছিলেন, জাহাজটা বালির অনেক নীচে থাকতে পারে, তাই উপযুক্ত যন্ত্রপাতি নিয়েই হাজির হয়েছিলাম।'

'ইনি ম্যাথিউস জাস্টাসের প্রতিনিধি সার্জেন্ট আমাহ্লে,' মেজরের চোখে কৌতূহল দেখে বলল রানা। 'আর ইনি কার্টা

অস্টিন। ওঁর কাছেই জাহাজডুবির খবর পেয়ে ওটা খোঁজার কাজে নেমেছিলাম আমরা।'

'এবং রানার কল্যাণেই সাগর ছেড়ে মরুভূমির আট মাইল ভিতরে দেখতে পাচ্ছি আমরা জাহাজটাকে,' বলল কার্টা। 'আমি সারা জীবন খুঁজলেও এটার ধারে-কাছে পৌঁছুতে পারতাম না।'

'ওদিকে অ্যাঙ্গোলার উপকূলে যে তেল-পড়েছে, সব তোলার কাজও প্রায় শেষ করে এনেছে নুমা,' বলল সোহেল। 'আমাদের কাজ শেষ। এবার লম্বা একটা ছুটি নেব!'

মাথা নাড়ল মেজর দেলোয়ার। 'না, স্যর। জেনারেল এই চিঠি দিয়েছেন আপনার জন্যে।' পকেট থেকে একটা খাম বের করে এগিয়ে দিল ব্রিগেডিয়ার (অব.) সোহেল আহমেদের দিকে।

একবার চোখ বুলিয়ে বেজার মুখে রানার হাতে দিল ও সেটা। বস্-এর চিঠি পড়ে হাসি ফুটল রানার মুখে। চিফ খবর দিয়েছেন: বিদ্রোহী জেনারেল টমাস গাধাধার দলবলসহ ধরা পড়েছে সরকারী কঙ্গোলিজ বাহিনীর হাতে। কঠিন একটা কাজ সফল ভাবে শেষ করায় ওদের দু'জনকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন বস্; রানাকে আরেকটা কাজের ভার দিয়েছেন, আর সোহেলকে মেজর দেলোয়ারের সঙ্গেই কপ্টারে করে দেশে ফিরতে বলেছেন, খুব নাকি জরুরি কাজ আছে।

'দেখার মত একটা দৃশ্য, তাই না?' জাহাজের দিকে চেয়ে মৃদু হাসছে দেলোয়ার।

'তাই আসলে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি খুঁজে পেলেন কী করে?' জানতে চাইল কার্টা।

তাঁবু থেকে ট্রে-তে সাজিয়ে কয়েক ক্যান লাগার বিয়ার নিয়ে এল মেজরের ব্যাটম্যান। বিন্দু বিন্দু শীতল ঘাম জমেছে টিনের গায়ে। সবাইকে একটা করে দিয়ে নিজে একটা ক্যানের রিং ধরে টান দিল দেলোয়ার, লম্বা একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'এখানে এসে

বুঝেছি, ধুলোবালি ঠেকাতে হলে বিয়ার দিয়ে গলা ভিজিয়ে রাখতে হবে।'

'তাই ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছেন এগুলো!' ফোড়ন কাটল সোহেল।

সবাই আগ্রহের সঙ্গে নিল ক্যান, কার্টারও কোনও আপত্তি দেখা গেল না, অবশ্য এক ঢোক বিয়ার গিলেই চোখ-মুখ কুঁচকে দিয়ে দিল ক্যানটা রানার হাতে। রানার সৌভাগ্য দেখে ভ্রূ কুঁচকে চাইল সোহেল— তবে মুখে কিছু বলল না। দুই চুমুকে ক্যান দুটো শেষ করে তৃপ্তির সঙ্গে বলল রানা, 'আহ্, একেই বলে সঞ্জীবনী সুধা!'

আবার জানতে চাইল কার্টা, 'এত শীঘ্রি পেলেন কী করে?'

কার্টার দিকে ফিরল দেলোয়ার, 'আপনার প্রশ্নের জবাবটা খুবই সহজ। যিনি এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, তাঁর মুখেই শুনুন।' রানার দিকে চিবুক দিয়ে নির্দেশ করল মেজর।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রানার দিকে চাইল কার্টা।

হাসল রানা। 'আমি কিছুই না। কাজটা করেছে আমাদের রায়হান আর নবী। খুব সংক্ষেপে বলছি: নুমাতে আমার এক বন্ধু আছে, কালো মানিক ল্যারি কিং। তার আছে একটা সুপার কম্পিউটার— নাম ভিনাস। রায়হান ওই হলোগ্র্যাফিক কম্পিউটার ভিনাসের সাহায্য নিয়ে হিসাব কষে বের করেছে লোকেশন।'

'কাজটা নিশ্চয়ই সহজ হয়নি?'

'না। রায়হানের ইঙ্গিত পেয়ে সব তথ্য খুঁড়তে শুরু করল ভিনাস। যে রাতে ঝড়ের ভিতর হারিয়ে গেছিল চ্যালেঞ্জার, তা মাথায় রেখে চারপাশের সব পুরনো জাহাজের লগ ঘাঁটল। সোয়াকোপমুণ্ডের সেই আমলের মানুষের ডায়রি ও মিশনারিদের জার্নাল পরীক্ষা করল। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার মানচিত্র নতুন করে এঁকে নিয়েছিল ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল্টি, সেটাও জোগাড় করা

সম্ভব হলো।'

'তারপর?' অবাক হয়ে শুনছে কার্টা।

'সব হিসাব কষতে শুরু করে আরও তথ্য সংগ্রহ করল ভিনাস। ওই ঝড়ের পর শতাব্দীর পরবর্তী সব মিটিওরোজিকাল ডেটা খুঁজে বের করল। এরপর পাক্কা একটা দিন চিন্তা-ভাবনা করেছে, আজকের উপকূলের ম্যাপ আর অতীতের সেই ম্যাপের ভিতর তুলনা করেছে, তারপর...' থামল রানা। কার্টাকে চমকে দেবে বলে আগে এসব বলেনি। 'দেখেছে কোথাও কোথাও এক মাইল থেকে শুরু করে দশ মাইল পর্যন্ত সাগর ঠেলে এগিয়ে গেছে মরুভূমি, ধাওয়া খেয়ে পিছিয়েছে সমুদ্র। যাত্রী তুলতে তীরের কাছে আসতেই হতো জাহাজকে, কাজেই সেই আমলের উপকূল-রেখার কাছাকাছিই থাকবে ওটা।'

'জিওলজিকাল কারণে যে-কোনও এলাকায় নানা রকমের পরিবর্তন হতে পারে, তার উপর রয়েছে টানা হাওয়ার অত্যাচার,' বলল দেলোয়ার। 'কিন্তু একবার যখন রায়হান সাহেব ম্যাপ তৈরি করে দিল, সহজ হয়ে গেল আমাদের কাজ, কপ্টারের পিছনে ম্যাগনেটোমিটার ঝুলিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আমরা। বালির নীচে ধাতব কিছুর সাড়া পেয়ে গ্রাউণ্ড পেনিট্রেটিং রেইডার ব্যবহার করে সহজেই বুঝে নিয়েছি এটা একটা জাহাজ, সাধারণ কোনও লোহার স্তর নয়। তারপর বাকি ছিল শুধু বালি খুঁড়ে বের করে আনা।'

'ম্যাগনেটোমিটার আমিও তো ব্যবহার করেছি,' বলল কার্টা। 'কিন্তু আমি খুঁজেছি সাগরে। মরুভূমিতে জাহাজ খুঁজতে হবে, বা সাগর এতটা সরে যেতে পারে, সেসব আমার কল্পনাতেও আসেনি।'

'চ্যালেঞ্জারকে খুঁজতে এক বেলা লেগেছে আমাদের,' বলল মেজর দেলোয়ার। 'মাসুদ সাহেব আগেই জানিয়েছিলেন, ভিনাস নাকি বলেছে, বালির তিরিশ ফুট নীচে থাকবে চ্যালেঞ্জার।'

'সত্যিই, আশ্চর্য ওই কমপিউটার!' বলল কার্টা।

'হ্যাঁ,' উজ্জীবিত হয়ে উঠল সোহেল। 'ভাবছি, রায়হান ওই কমপিউটারের সাহায্য নিয়ে লটারির কত নম্বর টিকেট জিতবে যদি বলে দিতে পারে...'

'ব্যস, তুই বড়লোক,' হাসল রানা। মার্টিন স্মিথসনকে একটু উসখুস করতে দেখে বলল, 'আয়, এখন হাতের কাজটা শেষ করে ফেলা যাক।'

'জাহাজের ভিতর ঢুকেছেন?' জানতে চাইল কার্টা।

'আপনাদের সম্মানে ওটার দরজা খুলিনি আমরা,' বলল দেলোয়ার। 'চলুন, ওঠা যাক জাহাজে।'

গ্যাংপ্লাঙ্ক বেয়ে উঠতে শুরু করল ও। অন্যরা ওর সঙ্গে উঠে এল জাহাজের কাঠের ডেকে। আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে চারপাশের বালির স্তূপ। ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে জাহাজ। এখন বাতাসে ভাসছে সামান্য বালি।

'ব্রিজের জানালার কাঁচ ভেঙে পড়েছিল,' বলল দেলোয়ার। 'হয়তো সেই ঝড়ের সময়, বা যখন ডুবে গেল বালির নীচে। ভিতরে শুধু বালি। কিন্তু...' কথাটা ঝুলিয়ে রেখে কিছুক্ষণ কিছুই বলল না ও, তারপর হাত দিয়ে চাপড় দিল একটা হ্যাচের উপর। ধুপ-ধুপ ধাতব আওয়াজ হলো। 'ক্রুদের কোয়ার্টারে ঢুকতে পারেনি মরুভূমি। আগেই হুইল ঘুরিয়ে ঢিলে করে রেখেছি। চলুন, দেখা যাক কী পাওয়া যায়।'

'সম্মানটা কার্টার প্রাপ্য,' হাতের ইশারা করল রানা।

একটু ইতস্তত করে সামনে বেড়ে হুইল ঘোরাতে শুরু করল কার্টা। আরও আধ পাক ঘুরাতেই খুলে গেল ল্যাচ। হ্যাচ কোমিং থেকে ঝরে পড়ল সামান্য বালি। দু'পাশের দেয়ালের ছোট কয়েকটা পোর্টহোল থেকে ভিতরে যাচ্ছে আবছা আলো। মেঝের উপর বিছিয়ে আছে সিকি ইঞ্চি পুরু বালি। এ ছাড়া মনে হয় না

গত এক শতাব্দীর ভিতর কোনও কিছু পাল্টেছে। ঠিকঠাক জায়গায় রাখা আছে আসবাবপত্র। এক পাশে বড় একটা স্টোভ। দেয়ালে ঝুলছে কয়েকটা লণ্ঠন। ম্যাচ থাকলেই যেন জ্বালানো যাবে।

আবছা আলোয় চোখ সয়ে যেতেই ওরা দেখল টেবিলের দু'পাশের চেয়ারে কাপড়ের থলির মত কী যেন। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল, ওখানে পড়ে আছে দু'জন মানুষের মমি হয়ে যাওয়া দেহ। মুখোমুখি বসেছিল তারা। একদম শুকিয়ে গেছে দেহ, চামড়া যেন কর্কশ কোনও ধূসর কাগজ। একজনের পরনে সামান্য লেংটি, শুকিয়ে যাওয়া মাথাটাকে ঘিরে রেখেছে কয়েকটা পালক। অন্যজনের পরনে সেকালে ব্যবহৃত ব্রিটিশ পোশাক। টেবিলের উপর রাখা আছে বিশাল এক হ্যাট। আজ থেকে এক শ' বাইশ বছর আগে ওটার রং সাদা ছিল।

'জিম উফোর্ড,' নিচু স্বরে বলল কার্টা। 'অন্যজন বোধহয় হারেরো যোদ্ধাদের নেতা, রাজা যাকে পাঠিয়েছিলেন হীরা উদ্ধার করার জন্যে।'

'ওরা হামলা করেছে, এমন সময়ে বোধহয় ঝড় শুরু হয়,' বলল রানা। ছোট এক করিডোর ঘুরে এসে দাঁড়িয়েছে কার্টার পাশে। 'কেবিনের ভিতর আরও দশ-বারোটা দেহ পড়ে আছে। লড়াই করেছে ওরা। মারা পড়েছে অ্যাসেগাই-এর খোঁচা খেয়ে। হারেরোদের দেহে কোনও ক্ষত নেই। বোধহয় চ্যালেঞ্জার যখন বালিতে আটকা পড়ে ডুবে গেল, তারপর না খেয়ে মরেছে এরা।'

'কিন্তু এই দু'জন পরস্পরকে খুন করেনি কেন?' জানতে চাইল আমাহ্লে।

'সে সময়ে সুনাম ছিল জিম উফোর্ডের,' বলল কার্টা। 'দু'জন এরা বোধহয় পরস্পরকে ভাল করেই চিনত। এই ঘটনা ঘটবার আগে হয়তো বন্ধুত্বও ছিল তাদের।'

'আজ আর জানার উপায় নেই,' বলল দেলোয়ার।

'মনে হচ্ছে, এই দু'জনই শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিল,' বলল রানা। 'ডিহাইড্রেশনে মারা পড়ে। জাহাজে আর পানি ছিল না।'

সোহেল নিচু হয়ে টেবিলের নীচ থেকে তুলে নিয়েছে একটা ব্যাগ। 'এরকম ব্যাগ আরও একটা পড়ে আছে একটু দূরে।'

পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে স্যাডলব্যাগ। কিন্তু টেবিলের উপর রাখার চেষ্টা করতেই ফড়াৎ করে ছিঁড়ে গেল তলি। মৃদু আলোয় দেখা গেল ছড়িয়ে পড়েছে আনকাট ডায়মণ্ড। পরস্পরের দিকে চাইল ওরা ছয়জন। একটা বিশ ক্যারেট পাথর তুলে নিল কার্টা, পোর্টহোলের আলোয় পরীক্ষা করল। সামান্য আলোর বিচ্ছুরণ দেখে নিয়ে রেখে দিল আবার। দুই হাতের অঞ্জলি ভরে আনকাট ডায়মণ্ড তুলল আমাহ্লে, তারপর আবারও ঝরঝর করে ছেড়ে দিল টেবিলের উপর। তার দিকে চাইল রানা। লোকটা এত হীরা দেখে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছে।

অ্যাসেসারের দিকে ফিরল রানা।

'এবার একটা হিসাব করে ফেলুন, মিস্টার স্মিথসন,' বলল ও। 'পুরোপুরি অ্যাকিউরেট না হলেও চলবে— মোটামুটি। খুব কম-বেশি না হলেই আমরা খুশি হব।'

ক্যাম্প থেকে পেট্রোম্যাক্স এনে জ্বালানো হলো। লাশ দুটোকে ডেকের ওপর নামিয়ে দিয়ে মুখোমুখি চেয়ারে বসে পড়ল স্মিথসন ও কার্টা। মার্কেট-প্রাইস জানা আছে কার্টারও। অল্পক্ষণেই জানাল স্মিথসন, হীরাগুলোর বিনিময়ে ডি বিয়ার্স কোম্পানির কাছ থেকে বিশ বিলিয়ন ডলার আশা করতে পারে রানা। অর্থাৎ, ২০০ কোটি ডলার।

'কম করে ধরেছেন,' আপত্তি জানাল কার্টা। 'বর্তমান বাজার দরে দামটা আরও অন্তত এক বিলিয়ন বেশি হয়।'

এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে রাজি হয়ে গেল মার্টিন স্মিথসন।

জানতে চাইল, বিনিময়টা কখন কীভাবে হবে।

'এখনই হতে পারে,' হীরাগুলো বড় একটা থলেতে ভরে এগিয়ে দিল রানা তার দিকে। 'দশ মিনিটের মধ্যেই চুকে যেতে পারে সব লেন-দেন। আপনি হীরা বুঝে পেয়েছেন, এবার ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানিয়ে দিন কোম্পানিকে ডলারের অঙ্কটা। পাঁচ মিনিট লাগবে তাদের ওই টাকা সুইস ব্যাঙ্কে আমার অ্যাকাউন্টে জমা করে দিতে। আমার ল্যাপটপে সে সংবাদ পৌঁছুতে সময় লাগবে, ধরুন, আরও পাঁচ মিনিট। তারপর আপনাকে আমরা সসম্মানে পৌঁছে দেব হেলিকপ্টার পর্যন্ত। ব্যস, মামলা ফিনিশ।'

হেলিকপ্টারে উঠবার আগে কার্টার কাছে জানতে চাইল মার্টিন স্মিথ, 'আপনি আসছেন না?'

মাথা নাড়ল কার্টা। 'আমি পরে আসব। আমার ব্যাগেজ রয়ে গেছে সোয়াকোপমুণ্ডের হোটেলে।'

হাসিমুখে সবার উদ্দেশে হাত নেড়ে উঠে গেল মিস্টার স্মিথসন হেলিকপ্টারের ভিতর। তাকে বিদায় দিয়ে ফিরে এল ওরা সবাই চ্যালেঞ্জারে। এবার রানা বসল চেয়ারে। তিনটে চেক লেখাই ছিল তিন নামে, ও শুধু তিনটে অঙ্ক বসাল তিন চেকে।

একটা চেক বাড়িয়ে ধরল ও কার্টা অস্টিনের দিকে। চেকে লেখা নাম ও ডলারের অঙ্কটা দেকেই রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেল মেয়েটার চেহারা। চার হাজার দুইশ' মিলিয়ন ডলার!

'এতো টাকা! রানা! আমাকে কেন?'

'পরে বলছি,' দ্বিতীয় চেকটা তুলে দিল ও সার্জেন্ট আমাহ্‌লের হাতে। ছয় হাজার তিনশ' মিলিয়ন ডলার!

চমকে গেছে সার্জেন্ট। 'এত টাকা কীসের জন্যে? কেন?'

'পকেটে রাখুন, বলছি।'

তৃতীয় চেকটা বাড়িয়ে দিল রানা সোহেলের দিকে। দশ হাজার পাঁচ শ' মিলিয়ন ডলার!

'আরে! এত কম? এ তো বাংলাদেশের সবাই মিলে এক বেলা বিরিয়ানি খেলেই খতম হয়ে যাবে!'

'নির্ভর করবে কোথায় খাওয়াচ্ছিস আর কী কী আইটেম থাকছে তার ওপর— সোনারগাঁও হোটেলে, না রাস্তার ধারের ছাপড়ায়। যাক, আর একটা কথাও বলবি না, খবরদার! ওটা পকেটে রেখে সোজা গিয়ে হেলিকপ্টারে উঠবি তুই এখন। তোর হাতেই চেকটা পাঠাতে বলেছেন বস্।'

আমাহ্লে ও কার্টার দিকে ফিরল এবার রানা। 'কর্তৃপক্ষের হুকুমে বিশ পার্সেন্ট পাচ্ছে কার্টা অস্টিন গুপ্তধনের সন্ধান দেবার জন্যে। আর বাংলাদেশের জনগণের কাছ থেকে ত্রিশ পার্সেন্ট পাচ্ছেন ম্যাথিউস জাস্টাসের মাধ্যমে যিম্বাবুইয়ের মুক্তিসেনারা বিপ্লব সফল করার কাজে ব্যয়ের জন্যে। বাকি পঞ্চাশ পার্সেন্ট খরচ হবে বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে।'

একবার চেক আর একবার রানার মুখের দিকে তাকাল সার্জেন্ট, তারপর হঠাৎই পোড় খাওয়া শক্ত মানুষটা চেকটাকে বুকে চেপে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। ওর চোখের সামনে ফুটে উঠেছে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত জন্মভূমির চিত্র। আবেগ কিছুটা প্রশমিত হলে চোখ মুছে জড়িয়ে ধরল রানাকে।

'ক্যাপ্টেন, আমার দেশের সবার হয়ে আমি আপনার প্রতি কৃত...'

'না, না, সার্জেন্ট। আমি কিছুই নই। আপনাদের জন্যে ভালবেসে কেউ যদি কিছু দিয়ে থাকে, সে আমার দেশ। আমরাও যুদ্ধ করে আমাদের দেশকে স্বাধীন করেছি। আপনারাও করছেন। এটুকুর মাধ্যমে আমরা আপনাদের ন্যায়যুদ্ধের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করছি। এজন্য কৃতজ্ঞতা আশা করি না আমরা।'

কার্টা কিছুই বলল না। অপ্রত্যাশিতভাবে এতগুলো টাকা পেয়ে যাওয়ায় মনের ভিতর সারাজীবনের অনেক কষ্টের কথা উথলে ওঠায় পাশ ফিরে চোখ মুছে নিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর গোটা জাহাজটা আর একবার ঘুরে দেখতে গিয়ে রানাকে চ্যালেঞ্জারের বো-র সামনে পেল কার্টা।

উদাস দৃষ্টিতে দূর দিগন্তে চোখ রেখেছে রানা।

'কী ভাবছ?' ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল কার্টা। 'আমাকে একটা ভাল জাহাজ দাও, আর এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটা নক্ষত্র?'

পাশ ফিরে হাসল রানা। 'দেখছি বালির ঢিবি, সত্যিই যেন সাগরের ঢেউ।'

'জাহাজের লগ পড়ছিলাম,' বলল কার্টা। 'জাহাজ ডুবে যাওয়ার পর কয়েক পাতা লিখেছে জিম উফোর্ড। তুমি ঠিক বলেছিলে। ঝড়ের ভিতরই হামলা করেছিল হারেরো যোদ্ধারা। ক্রু আর চোর-চোট্টাদের সবাইকে খুন করে ওরা। কিন্তু উফোর্ডকে কিচ্ছু বলেনি। হারেরোদের নেতা আগে তার হয়ে গাইডের কাজ করত। সে সময়ে একবার সিংহের হামলা থেকে তার প্রাণ রক্ষা করে উফোর্ড। যা-ই হোক, প্রকৃতির মরণ ছোবল এড়াতে পারেনি বেচারা। মরণ তার ঘনিয়ে এসেছিল।'

'ঝড়ের পর কী হলো?'

'ঝড় চলল এক সপ্তাহ ধরে। যখন শেষ হলো, দেখা গেল আর দরজা খুলতে পারছে না ওরা। ব্রিজে যাওয়ার পথও বুজে গেছে বালিতে। পোর্টহোল এত ছোট, কেউ বেরুতে পারেনি। ফাঁদে পড়ে গেল মানুষগুলো। জাহাজে এক মাস চলার মত খাবার ও পানি ছিল, কিন্তু শেষে তাদের সবাইকে মরতেই হলো। একে একে মারা গেল সবাই, থাকল শুধু উফোর্ড ও হারেরোদের নেতা। এরপর আগে মারা গেল গাইড। কারণ আর কোনও লগ নেই।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'লগে আরও একটা কথা লিখেছে উফোর্ড,' বলল কার্টা। 'তুমি আগ্রহী হতে পারো। তারা যখন হারেরো রাজার হীরা চুরি করল, তার পরও ওখানে রয়ে গেল চার ঘটি ভরা হীরা। ইতিহাস থেকে জানি, ওসব হীরা ব্যবহার করেননি রাজা। জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের কাছে সাহায্য চাননি। এসব হীরা এখনও রয়ে গেছে ওখানেই।' মিটিমিটি হাসছে কার্টা।

'পড়ে থাকুক,' হাসল রানা। 'শেষবার যখন তোমাকে সাহায্য করলাম, সাগরে গিয়ে আমাকে লাইফবোট হারিয়ে উঠতে হলো দানবীয় এক সাপের গায়ে। এরপর বিরাট এক সুপারট্যাঙ্কার আমার পায়ের নীচ থেকে হারিয়ে গেল অতল সাগরে। তুমি যদি আবারও হীরা খুঁজতে চাও, আমি আন্তরিক আশীর্বাদ দিচ্ছি তোমাকে, যাও, খোঁজো গিয়ে, তবে আমাকে আর এসবের ভিতর টেনো না। এখন থেকে শুধু সহজ কাজ নেব।'

'দুষ্টুমি করছ? বিপদ ছাড়া তুমি বাঁচবে?'

মাথা নাড়ল রানা।

'হীরাগুলো কিনতে হলো বলে তোমার ওপরওয়ালারা কি খুব অসন্তুষ্ট হবে?'

'না, অসন্তুষ্ট হবে না, মনে খুবই কষ্ট পাবে— আমি এসব হীরা আবিষ্কার করতে পারিনি বলে। তা ছাড়া, বাজার দরে কিনেছে তারা, নিজেদের স্বার্থেই। নইলে মোনোপলি নষ্ট হবে।'

'তা বটে। তুমি কী ভাবছ? ফিরে যাবে ওই চাকরিতে?'

'কিছুক্ষণ আগেও তা-ই ঠিক ছিল। কিন্তু এখন ভাবছি, ইচ্ছে করলেই নতুন করে স্বাধীন একটা জীবন শুরু করতে পারি।'

'হ্যাঁ। স্বাধীনতার কোনও বিকল্প নেই। ম্যাথিউস জাস্টাস যা পেলেন, তাতে অনায়াসেই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে ঘাড় ধরে গদি থেকে নামিয়ে দিতে পারবেন। দেশটা স্বাধীন হবে আবার।'

পাশ থেকে ওকে দেখছে কার্টা। অদ্ভুত নিষ্ঠুর, সেইসাথে আশ্চর্য কোমল লাগছে রানাকে দেখতে। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কার্টা। 'তোমার কল্যাণে যে টাকা পেলাম, বাকি জীবন চাকরি না করলেও চলবে। কিন্তু কোনও না কোনও কাজ খুঁজে নিতেই হবে আমার, নইলে দিন কাটবে না। কিন্তু এখন একটা কাজ আমাকে খুব দ্রুত সারতে হবে।'

'কী কাজ?' ঘুরে চাইল রানা।

'এটা,' রানার ঠোঁটে বসে গেল কার্টার কমলা-কোয়া ঠোঁট।

এক সেকেণ্ড পর সাড়া দিল রানাও।

(সমাপ্ত)

মাসুদ রানা

লাইমলাইট

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সমস্যার যেন শেষ নেই, মস্ত বিপদের মোকাবিলা করছে রানা। ...মরুভূমির ভিতর ডেভিল্‌স্ ওয়েসিস কারাগার থেকে মুক্ত করতে হবে প্রতিভাবান বাঙালি বিজ্ঞানী আসিফ হায়দার চৌধুরিকে। একের পর এক বাধার মুখে পড়ে রানার মনে হলো এবার হার মানতেই হবে বুঝি। কারাগারের ভিতর ঢোকা যত সোজা, তার চেয়ে এক শ' গুণ কঠিন বেরিয়ে আসা। আসলে, বিজ্ঞানী আছেনই বা কারাগারের ঠিক কোন্ জায়গাটাতে?

ওদিকে উন্মুক্ত হচ্ছে ভয়ঙ্কর এক খ্যাপা বিজ্ঞানীর নিষ্ঠুর পরিকল্পনা। অয়েল রিগ দখল করে লক্ষ লক্ষ টন ক্রুড অয়েল ফেলবে সে সাগরে... তৈরি করবে প্রচণ্ড শক্তিশালী এক ঝড়। ধ্বংস করে দেবে সে গোটা একটা শহর। প্রায় অসম্ভব তাকে রোখা। লাখ লাখ মানুষকে বাঁচাতে চাইলে থামাতে হবে ভয়ঙ্কর ওই ঝড়। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব? এদিকে হাতে যে ফুরিয়ে আসছে সময়!

সাগরের মাঝে পুরনো এক সুপারট্যাঙ্কারে কপ্টার থেকে নেমে পড়ল রানা, ঝড়ের ভিতর মুখোমুখি হলো সেই উন্মাদ বিজ্ঞানীর। কী হলো তারপর? ...আর সোয়া শ' বছর আগে হারিয়ে যাওয়া সেই হীরাগুলো?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০